বিক্রমপুর

২য় বর্ষ ১৩২১

বিক্রমপুর

(সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত

দ্বিতীয় বর্ষ—১৩২১

কলিকাতা

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট স্বর্ণপ্রেসে শ্রীমনোরঞ্জন সরকার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও পোঃ ফুলকোচা মহীরামকোল হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২১ সাল

বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল দুই টাকা মাত্র।

বর্ষ-সূচী

চিত্র সূচী

'বিক্রমপুরে'র বিশেষ পৃষ্ঠপোষক স্বধর্ম্মনিরত পরম বৈষ্ণব রাজা

শ্রীনাথ রায় বাহাদুর—

বিক্রমপুর

দ্বিতীয় বর্ষ	বৈশাখ ; ১৩২১	১ম সংখ্যা

নববর্ষ

এস সুন্দর নব বরষরে !

কুসুম-গন্ধে নবীন ছন্দে

জাগে হরষে ধরণীরে।

আজি দীপ্ত নির্ম্মল গগন-তলে

শত রবি-শশী কিরণ ঢালে,

উজ্জ্বল ভাতি হাসে উষা সতী

জল্ জল্ তারা জ্বলেরে !

এস সুন্দর নবীন বর্ষ !

এস সুখ-সন্তোষ হর্ষ !

এস পুণ্য পুলক-গীত নির্ঝর

সুর-মন্দাকিনী-ধারা রে !

অতীত বেদনা, অতীত ব্যথা,

ঝরে গেছে ফুল কেন আর কথা ?

যে গেছে সে গেছে আর কেন মিছে

স্মৃতির বেদনা রে !

এস এস সবে জীবন-আহবে

নবীন হরষে রে,

এস সুন্দর নব বরষরে !

শ্রীযোগানন্দ গোস্বামী।

নিবেদন

জগদীশ্বরের অনুগ্রহে এবার "বিক্রমপুর" দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। এই এক বৎসর আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে যথাসাধ্য মাতৃভূমির সেবা করিয়াছি। প্রত্যেক দেশের লোকই নিজ মাতৃভূমিকে ভালবাসিয়া থাকেন; এমন লোক অতি বিরল যিনি স্বীয় মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও ভক্তিবান্ নহেন। আমাদের মাতৃভূমি বিক্রমপুর অপরের নিকট জলাভূমি স্বাস্থ্যহীন প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইলেও আমাদের নিকট অতুলনীয় স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সমুদ্ভাসিত। এমন স্থান জগতে নাই। শৈশবের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের লীলাস্থল, কর্ম্ম জীবনের শান্তির আগার প্রিয়তম জন্মভূমির কথা কে ভুলিতে পারে?

প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দেশের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে। যিনি দেশের হিতকামনায় সামান্য শক্তিও নিয়োজিত করিতে চাহেন না তিনি বস্তুতঃই দয়ার পাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে বিক্রমপুরবাসিগণ স্বীয় মাতৃভূমির উপযুক্তরূপ সেবা করিতে পারিতেছেন না। বিক্রমপুরের ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অন্যত্র অতি দুর্লভ। আমাদের গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির বাস। তথাপি কেন যে দেশের উন্নতি হইতেছে না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যাহাতে আমাদের দেশের অভাব অভিযোগ বিশেষরূপে আলোচিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। ভাব-বিনিময় ব্যতীত কোন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। বিক্রমপুরবাসী অনেকেই প্রবাসী, কাজেই অনেক সময়ে তাঁহারা দেশের সংবাদাদি জ্ঞাত হইতে পারেন না। দেশের প্রাচীন ইতিহাস ইত্যাদি ত অনেকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত! আমরা এ সকল ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করিবার মানসেই "বিক্রমপুর" প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। গত বৎসর যথাসাধ্য আমাদের সংকল্পানুযায়ী কার্য্য করিয়াছি, তবে দেশবাসীর নিকট হইতে যেরূপ সহানুভূতি পাইব ভাবিয়াছিলাম তাহা পাই নাই; তাহার প্রধান কারণ, আমরাও উপযুক্তরূপে সর্ব্বত্র আমাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের সুযোগ ও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই।

সৌভাগ্যের বিষয় এবার "বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা" পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ায় অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা এবং দেশ মধ্যে সাধারণ শিক্ষাবিস্তার ও পল্লী গ্রামের স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায় নির্দ্দেশের কতকটা আশা করা যায়।

"বিক্রমপুর" গত বৎসর ত্রৈমাসিক আকারে প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই বৎসর দেশবাসীর আগ্রহাতিশয্যে মাসিক আকারে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মাসিক কাগজ প্রকাশ করা অতিশয় ব্যয় সাধ্য এবং আয়াসজনক কার্য্য। পরস্পরের সহযোগীতা ব্যতিরেকে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব-পর নহে। অতএব দেশের ছোট বড় সকলে এ পত্রিকা খানার প্রতি শুভ দৃষ্টি করিলে ধন্য হইব। "বিক্রমপুরের" উদ্দেশ্য কি? "বিক্রমপুর" কি লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে তাহা গত বৎসর সূচনায় লিপিবদ্ধ করিয়া-ছিলাম তথাপি পুনরায় এখানে উল্লেখ করিলাম। বিক্রমপুরের প্রচীন ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য্য, কথা-প্রবচন, উপকথা, বিক্রমপুরের খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের জীবনী, সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা ইত্যাদি নানাবিধ দেশের কল্যাণজনক অনুষ্ঠান কার্য্যতঃ সম্পন্ন করিবার নিমিত্তই ইহার অভ্যুদয়। বিক্রমপুরের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে পরস্পরের যাহাতে প্রীতির ও একতার ভাব পরিবর্দ্ধিত হয় ইহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। জাতিগত, সম্প্রদায়-গত কিংবা অন্য কোনরূপ অনুদার মত 'বিক্রমপুরে' কোন দিন প্রচারিত হইবে না।

যাহাতে অশিক্ষিত জনসাধারণ এবং গ্রাম্য ভদ্রমহোদয়গণ পরস্পরে মিলিত হইয়া নিজ নিজ গ্রামের হিত কল্পে আত্ম-শক্তি নিয়োজিত করিতে পারেন এবং যাহাতে কৃষি-শিল্প প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া আলস্য পরিত্যাগ করতঃ প্রকৃত কর্ম্ম-বীরের ন্যায় এই শোক দুঃখ পরিপূর্ণ দুঃখ-দৈন্য নিপীড়িত দেশে সুখ-শান্তিতে বাস করিতে পারেন আমরা সেই শুভ সংকল্প মনে ধারণা করিয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি। অশিক্ষিত জন সাধারণ ও উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিলে অসাধারণ চরিত্রবত্তার পরিচয় দিতে পারে। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ধর্ম্ম ঐ তিনটিই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার ও সাধারণ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের জ্ঞানাভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। এ দু'টীর অভাবেই আমরা রোগ জ্বালার এবং

পারিবারিক সুখ-শান্তি হারাইতে বসিয়াছি। অতএব বিশেষ করিয়া এ দুটীর প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

বিগত বর্ষে যে সকল লেখক লেখিকা আমাদিগকে প্রবন্ধ ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন এবং যে সকল গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ "বিক্রমপুরের" সর্ব্বপ্রকার ক্রটী বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়াও ইহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন আমরা অন্তরের সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। আশা করি এ বৎসরও আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা লাভ করিব। পরম ধার্ম্মিক, দেশ হিতৈষী রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর এবং বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস এম, এ, মহোদয় আমাদিগকে গত বৎসর বিক্রমপুর পরিচালনে কতক অর্থ সাহায্যও করিয়াছিলেন—তাঁহাদের ঐরূপ বদান্যতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যদি প্রত্যেক শিক্ষিত বিক্রমপুরবাসী 'বিক্রমপুরের' গ্রাহক হ'ন তাহা হইলে আমরা 'বিক্রমপুর'কে অতি শ্রেষ্ঠ মাসিকে উন্নীত করিতে পারিব। 'বিক্রমপুর' বিক্রমপুরবাসীর, এ কথাটা গত বারও বলিয়াছিলাম এবারও বলিলাম। জগদীশ্বর আমাদের সাধু ইচ্ছা জয়যুক্ত করুন। ইহাই তাঁহার চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

প্রহেলিকা

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

—জিলায় মায়াময়ী গ্রাম। গ্রামখানি ছোট কিন্তু সুন্দর।

গ্রামের দক্ষিণদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। তাহার ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া, মায়াময়ী গ্রামের কিয়দ্দূর হইতে আসিয়া, তাহার পাশ কাটিয়া, অল্প পরিসর একটা গ্রাম্য পথ চারি পাঁচ মাইল দূরে হাটখালি নামক প্রসিদ্ধ বন্দরে যাইয়া মিশিয়াছে।

পথের উপর একটা অশ্বত্থগাছ। তাহার মূলদেশ তৈল ও সিন্দুর মণ্ডিত। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে সেখানে পূজা হইত। মায়াময়ী ও তাহার

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামস্থিত লোকসমূহের কোলাহলে সেই নির্জ্জন গ্রাম্যপথ সে দিন মুখরিত হইয়া উঠিত।

দুপুর বেলা রাখাল বালকেরা মাঠে গরু ছাড়িয়া সেই গাছের তলায় বসিয়া মনের আনন্দে খেলা করিত। কখন কখন দুই একটী আতপতাপ-ক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত পথিক তাহার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিত। মাঝে মাঝে বা কোন বালিকাবধূ পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে যাইবার কালীন, ভাগ্যবশতঃ বেহাড়ারা সেখানে ডুলী নামাইলে, মাথার ঘুমটা একটু খুলিয়া, পর্দ্দার আড়ালের পাশ হইতে মাঠের অপর পারে সুদূর বৃক্ষরাজির অন্তরালে অবস্থিত পিত্রালয়ের উদ্দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিত ও চক্ষের জলে বুক ভাসাইত!

সেই রাস্তার বাঁকে বাঁকে পাশাপাশি ভাবে ছোট একটু গ্রাম্যখাল। খাল কাটিয়াই রাস্তা হইয়াছে। হাটখালির খাল নামে উহা পরিচিত। শীতকালে তাহাতে বড় জল থাকিত না। কিন্তু মাঠের ভিতর খালের দুই ধারে তখন সরিষা ও কলাই ফুল ফুটিয়া উঠিত। প্রাতঃসূর্য্যকিরণে চারিদিক তখন সৌন্দর্য্যে ঝক্ ঝক্ করিতে থাকিত। বর্ষা সমাগমে খাল জলে ভরিয়া উঠিত। তখন দেশ দেশান্তর হইতে আগত কত বোঝাই নৌকা তাহার উপর দিয়া কল্যাণময় বাণিজ্য-সম্ভার বহন করিয়া লইয়া যাইত।

• সচরাচর যেমন দৃষ্ট হয়—গ্রামের ভিতর নানা জাতির বাস। তন্মধ্যে কয়েক ঘর কায়স্থ—কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য। তাহা ব্যতীত কতক ঘর বারুই—কতক ঘর নমঃশূদ্র- গোয়াল—সূতার—ধোপা—নাপিত—যুগী এবং মুসলমান।

রায় চৌধুরী বাবুরা মায়াময়ী গ্রামের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত তালুকদার। শিক্ষিত পরিবার বলিয়া সমাজে তাহাদের সুখ্যাতি আছে। তাহাদের ভিতর অনেকে গভর্ণমেণ্ট ও জমীদারের অধীনে চাকরী করিয়া—কেহ কেহ বা ওকালতি, ডাক্তারী বা অন্যান্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে যেন আর তাহাদের পূর্ব্বের সে জমকাল অবস্থা নাই।

হাটখালি যাওয়ার রাস্তা হইতে গ্রামে প্রবেশ করিবার জন্য যে উত্তরাভিমুখী রাস্তা রহিয়াছে তাহা দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই একটী সুন্দর দ্বিতল বাটী দেখা যায়। চৌধুরী বাবুদের ভিতর একজন "জজ" হইয়াছিলেন—ইহা তাহারই বাটী। "জজ বাবুর বাড়ী" নামে ইহা চারিদিকে সুপরিচিত। এক

সময় এই বাটীটীর খুব জাঁকজমক ছিল—এখন সীমানার প্রাচীরসমূহ অনেক স্থলেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অট্টালিকাসমূহও যে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

"জজ বাবুর বাড়ীর" পাশাপাশি রাস্তার ধারে পূর্ব্বমুখী আরও কয়েকখানা পাকা বাড়ী। সে সমুদয় তত সুন্দর নয়। তাহাও চৌধুরী বাবুদেরই। তাহারা নানা পরিবারে বিভক্ত।

চৌধুরী বাবুদের বাটীসমূহের সম্মুখে একটী বড় পুষ্করিণী। দীঘি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক সময়ে জলের সুস্বাদুতা ও নির্ম্মলতাগুণে ইহা মিঠা দীঘি নামে চারিদিকে সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণেও ইহা ঐ গৌরবসূচক নামই বহন করিতেছে। কিন্তু জল এক প্রকার অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে ইহা ম্যালেরিয়া ও কলেরার আকরে পরিণত হইতেছে।

দীঘির চারি পারে চারিটী ঘাটলা। তাহাদের স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বহু বৎসর হইল বাবুদের বংশে রমানন্দ রায় নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে জল পান করিয়া বাঁচিবে ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের সুযশ গাহিবে এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি জীবনের শেষ অবস্থায় তাঁহার সমস্ত জীবনের অতি কষ্টে সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে এই দীঘিটী কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান বংশধর বংশীবাবু বেশ অবস্থাপন্ন লোক কিন্তু স্বীয় গ্রামের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই।—সহরেই তিনি বহুবৎসর যাবৎ বাস করিতেছেন। 'রায়-বাহাদুর' উপাধিলাভের একটা খেয়াল অনেকদিন হইতে তাঁহার মাথার উপর চাপিয়া বসিয়াছে—তাহা লইয়াই তিনি ব্যস্ত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মতিগতির পরিবর্ত্তন হইতেছে। পূর্ব্বে, দেশের দশজনে ভাল বলিলেই আত্ম-প্রসাদে প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিত—এখন আর তাহা হয় না।

'জজ বাবুর বাটীর' প্রায়-পরিত্যক্ত বৈঠকখানা ঘরে গ্রামের মাইনার স্কুল অধিষ্ঠিত। ইহা বহু বৎসরের পুরাতন স্কুল—এই প্রদেশের সর্ব্বপ্রাচীন বিদ্যালয়। এমন দিন গিয়াছে যখন চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামসমূহের মধ্যে ইহাই জ্ঞান-প্রচারের একমাত্র আলোকস্তম্ভ স্বরূপ ছিল। তখন বিদ্যার্থীসমূহে ইহা সকল সময়েই পূর্ণ থাকিত। এমন কি, স্থানাভাববশত: সময় বিশেষে পরিচালকগণকে চিন্তিত হইতে হইত। কিন্তু এক্ষণে ইহার বড়ই দুর্দ্দশা। ইহার কল্যাণে মানুষ হইয়া

ইহার ছাত্রবৃন্দ আজ নানাস্থানে নানাভাবে অর্থ ও যশ উপার্জ্জন করিতেছে কিন্তু ইহার দুর্গতির সীমা নাই। ছাত্র একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। চৌধুরী বাবুদের বিদ্যালয়টীর দিকে দৃষ্টি নাই। মাষ্টার মহেশ বাবু ও পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্য উভয়েই বৃদ্ধ হইয়াছেন। এ বয়সে কোথায় যাইবেন? তাই নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় স্কুল চালাইয়া তাহার নিতান্ত স্বল্প আয়েই কোন প্রকারে অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

স্কুল হইতে কিয়দ্দূরে দীঘির দক্ষিণ পারে গ্রামের পোষ্টাফিস ওরফে গ্রামের "পার্লিয়ামেণ্ট হাউস"। সম্প্রতি তাহার সহিত একটী টেলিগ্রাফ বিভাগও জুরিয়া দেওয়া হইয়াছে। পোষ্টমাষ্টার রাইমোহন বাবু একাই পোষ্টাফিস ও টেলিগ্রাফ আফিসের কাজ করেন।

গ্রামের চারিদিকেই কেমন যেন একটা নিরানন্দের ভাব। কেবল প্রাতে পোষ্টাফিস গৃহে বালক ও যুবকগণের সম্মিলনে একটু সজীবতার ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে—তাহাও ক্ষণকালের জন্য!

পোষ্টাফিসের কাছেই দাতব্য চিকিৎসালয়। কতকটা চৌধুরী বাবুদের, কতকটা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্যে ইহা পরিচালিত। ইঁহারও পূর্ব্বের ন্যায় স্বচ্ছল অবস্থা নাই। প্রাতে সাত ঘটিকার ও বৈকালে পাঁচটার সময় ডাক্তার বাবুর ডাক্তার খানায় উপস্থিত থাকিবার নিয়ম। কিন্তু ডাক্তার কৃতান্ত বাবু বৈকালে কখনও আসিতেন না। প্রাতেও দশটার পূর্ব্বে তাঁহার ডাক্তারখানা খুলিত না। তাঁহার মুখের কাছে কাহারও টেকা দুষ্কর। কথায় কথায় তিনি বড় বড় ডাক্তার সাহেবদের নাম করিয়া ফেলিতেন। রোগিগণ পীড়ার যন্ত্রণা অপেক্ষা তাঁহার ভয়েই অধিকতর অস্থির হইয়া পড়িত। ডাক্তারখানায় বড় একটা ঔষধ থাকিত না। তথাপি ডাক্তার বাবু জলের সহিত মিশাইয়া যে ঔষধটুকু দিতেন, চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামবাসী দীন দুঃখিগণ তাহাই কৃতজ্ঞচিত্তে লইয়া চলিয়া যাইত এবং তজ্জন্য দুই হাতে চৌধুরী বাবুদের ও ডাক্তার বাবুর প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিত। কে বলে কৃতজ্ঞতা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে?

মিঠা দীঘির পূর্ব্ব ও উত্তর পারের কিয়দংশ ব্যাপিয়া যুগী, ধোপা, নাপিত ও শূদ্র পরিবারদের বাসস্থান। সকলেই চৌধুরী বাবুদের প্রজা।

গ্রামে বাজার নাই। একবার একটী বাজার স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ

চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু লোকের অভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মায়াময়ীর কিয়দ্দূরে বিশালী গ্রামে প্রত্যহই বাজার বসিত। তাই, বাজারের বড় একটা প্রয়োজনও ছিল না। নিজ মায়াময়ী গ্রামে সপ্তাহে দুই দিন খালের ধারে অশ্বথ গাছের কাছে হাট মিলিত। লোকের জিনিস পত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য তাই কোনও প্রকার অসুবিধা হইত না।

পূর্ব্বে, গ্রামের লোক জনের অবস্থা বেশ ভাল ছিল—এখন যেন আর তেমন নাই। কেবল যে চৌধুরী বাবুদের অবস্থার অবনতি হইয়াছে তাহা নহে—গ্রামের অন্যান্য বৈদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ভদ্রলোকগণেরও পূর্ব্বের সে স্বচ্ছল অবস্থা নাই। গ্রামের চাষাভূষাগণ—যুগী জোলা ধোপা নাপিত মুসলমান ইত্যাদি অনেকেই চৌধুরী বাবুদের প্রজা। পূর্ব্বে তাহাদের নেতৃত্বাধীনে বেশ আমোদ আহ্লাদে তাহাদের জীবন চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে সকল বিষয়েই অবস্থার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে।

পূর্ব্বে, গ্রামের ভদ্রলোকদের অনেকের বাড়ীতেই দোল দুর্গোৎসব হইত—এখন অনেক বাড়ীতেই হয় না। অনেকের বাড়ীতে এখন দুর্গামণ্ডপের চিহ্নটী মাত্রও নাই। বার মাস তের পার্ব্বণের কল্যাণে গ্রামখানি পূর্ব্বে সকল সময়েই যেন আনন্দে তন্ময় থাকিত। এখনও দুই এক বাড়ীতে পূজাপার্ব্বণ ব্রতাদি নিয়মমত সম্পন্ন হইতেছে কিন্তু সে আনন্দের ভাব নাই। সে বিশ্বাস নাই—জীবনের সে কবিত্ব নাই। পূর্ব্বের সে সরল সুখ এই বিজ্ঞান-কঠোর ভক্তিবিহীন দিনে ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া উঠিতেছে।

দুই একবাড়ীতে দুই একখানা নূতন টীনের ঘর প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু নূতন ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা যেন আর কোনও বাটীতে বড় একটা উঠিতেছে না। যাহাদের পূর্ব্ব হইতে পাকা বাড়ী আছে তাহারা কোনও প্রকারে তাহার সংস্কার করিয়া রাখিতেছে। মাঝে মাঝে দুই একবাড়ীতে ভিটা খালি পড়িয়া রহিয়াছে—গৃহস্বামীর নূতন গৃহ প্রস্তুত করিবার আর অর্থ জুটিয়া উঠে নাই।

শ্যামলতরুলতা-বেষ্টিত গ্রামখানির প্রাকৃতিক দৃশ্য পূর্ব্বেরই ন্যায় চিত্ত-বিমোহন কিন্তু গ্রামের ঘর বাড়ী লোকজন দেখিলে প্রাণে আর তেমন আনন্দের উদ্রেক হয় না। সকলের উপরই যেন কেমন একটা নিরানন্দ ও অলক্ষ্মীর ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। কিছুরই ভিতর যেন প্রাণ নাই—সজীবতা নাই।

ভাবিয়া দেখিতে গেলে সবই আছে অথচ কি যেন নাই। চৌধুরী বাবুরা ও গ্রামের অন্যান্য লোকজন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর 'টাকা' উপার্জ্জন করিতেছেন। প্রতি গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তিই রোজগার করিবার জন্য খাটিতেছে। এমন কি, গ্রামের প্রসিদ্ধ অলসগুলি, যাহারা এতকাল পর্য্যন্ত উপার্জ্জনক্ষম দাদা ও কাকার স্কন্ধে চাপিয়া, হাসিয়া খেলিয়া জীবন কাটাইতেছিল তাহারাও ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু তথাপি কাহারও যেন কিছুতেই আর জুড়িয়া আসিতেছে না। একদিকে যদি অর্থাগম কিছু বাড়িতেছে, অভাব সে তুলনায় শতগুণে বর্দ্ধিত হইতেছে।

কেবল কি মায়াময়ীর? সকল গ্রামেরই ঈদৃশ অবস্থা! কি যেন একটা অশান্তি ও অতৃপ্তিরূপ মহাক্ষুধা সকলকেই প্রপীড়িত করিতেছে। লোকে এখন সুখ সুখ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পাগল কিন্তু সুখ যেন আর কিছুতেই ধরা দিতেছে না। গ্রাম্য জীবনের আর পূর্ব্বের সে প্রাণ-মনোরম ভাব নাই, লোকের পূর্ব্বের সে সরল প্রাণভরা আমোদ আহ্লাদ আর নাই। কৃষককুল খাটিয়া খাটিয়া মরিতেছে—মধ্যমশ্রেণী অন্ন-চিন্তায় ক্লিষ্ট—জমীদারকুল নিরক্ষর। দুঃখ দৈন্য ও অশান্তির প্রতপ্ত নিশ্বাসে আকাশ পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিঠা দীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে একখানা ছোট বাড়ী। এক সময় এ বাড়ীর অবস্থা বেশ ভাল ছিল। এখন আর তাহা নাই। বর্ত্তমানে বাটী খানিতে যে কয়েকখানা ঘর আছে তাহা সবই খড়ের।

ভিতর বাড়ীতে ছয় খানা ঘর। পশ্চিম ও উত্তরের ভিটায় শয়ন ঘর। দক্ষিণের ভিটীতে রান্নাঘর। তাহার কোণে হবিষ্য ঘর। বাটীর পূর্ব্ব দিকে গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের 'ঠাকুর ঘর'। তাহা হইতে কিয়দ্দূরে গোয়াল ঘর ও ঢেঁকি ঘর। বাহির বাটীতে ছোট একখানা ঘর। তাহার মাঝে একখানা তক্তপোষ পড়িয়া আছে।

সেই গৃহের সম্মুখে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। তাহার এক কোণে একটী আমগাছ। গাছটীর বয়স হইয়াছে। এক সময় সুমিষ্ট ফলের জন্য ইহার বড় সুখ্যাতি

ছিল। গ্রামের কত বৃদ্ধ মৃত্যুর পূর্ব্বে এই সিঁদুরে গাছের আম খাইয়া জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া গিয়াছে! কিন্তু এখন ইহাতে বড় একটা আম ধরে না।

প্রাঙ্গণের অপর কোণায় কয়েকটী ফুলের গাছ। তাহাকে ফুলের বাগান বলা চলে না।

সুন্দর সন্ধ্যাকালে যখন উপরে নীল আকাশে একটী একটী করিয়া নক্ষত্র দেখা দিত আর নিম্নে সেই স্থানটুকুতে ফুল ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিত, তখন সেখানে মাঝে মাঝে যূঁই ও গন্ধরাজের পার্শ্বে ফুল্ল মল্লিকা সদৃশ একটী ক্ষুদ্র বালিকার সুন্দর কচি মুখখানি দেখা যাইত। বালিকা তাহার অতি আদরের, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অতি ভালবাসার পাত্র বাবার জন্য ফুল চয়ন করিয়া লইয়া যাইত।

সে আজও ফুল তুলিয়া মহানন্দে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছিল। কে এই বালিকা? কাহারই বা এ বাড়ী?

* * *

* * *

সন্ধ্যা হইয়াছে। অন্তঃপুরে আলো জ্বলিতেছে। এস, প্রিয় পাঠক পাঠিকা! বালিকার সঙ্গে সঙ্গে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করি।

বাড়ীটী বড়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আঙ্গিনার কোথায়ও দূর্ব্বাটী পর্য্যন্ত নাই। এমন পরিষ্কার, যে তাহার উপর সিন্দূরটুকু ফেলিয়া কুড়াইয়া নেওয়া যায়। নব বসন্তের শুভ্র সন্ধ্যালোকে তাহা ধপ্ ধপ্ করিতেছিল।

উত্তরের ঘরের বারেন্দায় বসিয়া একটী বৃদ্ধা মালা জপিতেছিলেন। পশ্চিমের ঘরের দরজার সম্মুখে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলিতেছিল ও ধূপধূনা সুগন্ধ বিতরণ করিতেছিল।

বালিকাকে ফুল লইয়া আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'কি তবু! তোর ফুল তোলা হল?'

'হ্যাঁ আমা' বলিয়া মাথা ঈষৎ নীচু করিয়া বালিকা হাসিমুখে ঠমকে ঠমকে পা ফেলিয়া পশ্চিমের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

* * *

* * *

ইহার কতকটুকু পরে বাড়ীর কর্ত্তা কোথা হইতে যেন বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

একটু মোটা সোটা ধরণের লোকটী। নাতি খর্ব্ব, নাতি দীর্ঘ। দেখিতে তেমন সুপুরুষ নহেন তবে কুৎসিতও বলা যায় না। শ্যামবর্ণ।

তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন তিনি অতি পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। শরীর দিয়া ঈষৎ ঘাম বাহির হইতেছিল।

আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া 'আ বাঁচলেম' বলিতে বলিতে তিনি গায়ের পিরাণ খুলিলেন এবং তাহা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া গায় বাতাস দিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে বারেন্দায় সেই যে বৃদ্ধা বসিয়াছিলেন তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের ভিতর হইতে একখানা হাত পাখা আনিয়া বামহস্তের সাহায্যে দূর হইতে তাহার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া আবার গম্ভীর ভাবে বসিয়া মালা জপ করিতে লাগিলেন। পাখাখানা তুলিয়া তিনি নিজকে বাতাস দিতে লাগিলেন।

উঠানের এক কোণে গাড়ুতে জল ছিল। কতকটুকু পরে তাহার দ্বারা হাত মুখ ধুইলেন। গামছা ছিল, তাহার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মুছিলেন।

তৎপরে পশ্চিমের ঘরের বারেন্দায় উঠিয়া একখানা পিড়ীর উপর বসিয়া আগুণের পাতিল হইতে আগুণ তুলিয়া কলিকায় ভরিবেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে একটী ক্ষুদ্র বালিকা দৌড়াইয়া আসিয়া শুভ্র সুগোল ক্ষুদ্র দুইখানি বাহুদ্বারা তাহার গলা জড়াইয়া আধা আধা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, 'বাবা! এই দেখ, তোমার জন্য আজ কেমন ফুল এনেছি'।

পিতা স্নেহময়ী কন্যার সেই মধুর সম্ভাষণে আনন্দে গদগদ হইয়া তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া কপোলে চুম্বন করিলেন।

তাহার আর তামাক সাজা হইল না। 'দেও বাবা! আমি সেজে দিচ্ছি' এই বলিয়া বালিকা তাহার হাত হইতে কলকি কাড়িয়া নিল এবং কতকটুকু পরে আগুণ ভরিয়া হুঁকা ও কলকি আনিয়া তাহার কাছে দিল।

তিনি ধীরে ধীরে তামাক খাইতে লাগিলেন। বালিকা তাহার ক্রোড়ে গলিয়া পড়িয়া আনন্দোজ্জ্বল চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল।

কন্যা বলিল—বাবা।

পিতা উত্তর করিলেন --কি মা !

কন্যা। কেমন বাবা—কেমন ? সুন্দর ফুল নয় ?

পিতা। হাঁ—বেশ ফুল।

কন্যা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, বাবা ! তুমি না বলেছিলে আজ আমার জন্য পুতুল আন্‌বে !

পিতা। (ঈষৎ হাসিয়া) তাই নাকি ?

তিনি—সহরে আফিসে কাজ করেন। প্রতি শনিবার সেখান হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। আজ সেই শনিবার।

কন্যা মানভরে বলিতে লাগিল—হ্যাঁ বাবা ! বুঝেছি,—তোমায় বুঝেছি। তুমি আমায় পুতুল দেবে না। তোমায় আমি এত করে ফুল দেই, আর তুমি আমায় কিছু দেও না।

পিতা। (হাসিতে হাসিতে) না না দোব।

এমন সময় আঙ্গিনার অপর দিক হইতে একটী রমণী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বারেন্দার সোপানের সর্ব্ব নিম্নের ধাপের উপর এক পা রাখিয়া বলিলেন, "ওকে ছাই দেবে ! মাথামুণ্ডু দেবে। ও, কথা শুনে না—কাজ কর্ম্ম করে না—লেখা পড়া করে না—ওকে কিছু দিও না।"

কন্যা কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, "শুনি নি কিসের ? তুমি তো মা ! সব সময়ই বাবার কাছে আমার নামে লাগাও।"

মাতা বলিলেন—কোথায় কথা শুনিস্। প্রাতে পড়তে বলেছিলেম, পড়েছিলি ? খুকীকে রাখ্‌তে বলেছিলেম—রেখেছিলি ? (স্বামীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে) দেখ, ওকে কিছুই দিও না।

কন্যা। "আচ্ছা না দিলে যাও ! তোমরা সকলেই আমাকে মন্দ বল। চাই না চাই না—যাও।" বলিতে বলিতে বালিকা আধা আধা কাঁদ কাঁদ ভাবে মুখ ফুলাইয়া মানিনীর ন্যায় চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

তাহা দেখিয়া পিতা তাহাকে আদর করিয়া বলিলেন, "না মা ! রাগ করো না। আমি তোমায় পুতুল দিচ্ছি। এই নাও তোমার পুতুল—এখন তো হ'ল।"

বলিতে বলিতে তিনি সম্মুখস্থ পিরানের পকেট হইতে স্নেহের পুতুল কন্যার

হাতে গুটি দুই তিন চিনা মাটীর পুতুল দিলেন এবং স্নেহমাখা বাহুর দ্বারা তাহার ক্ষুদ্র দেহ খানা স্বীয় কোলে লইয়া আবার সোহাগ ভরে তাহার বদন চুম্বন করিলেন।

সেই আদরে গলিয়া বালিকা তখন বলিল, 'বাবা! তুমি আমায় আগে বলনি কেন? বেশ পুতুল বাবা।' নিম্নের ঠোট একটু বাহির করিয়া, একটু মুখ গম্ভীর করিয়া, সে তখন আপনা আপনিই বলিতে লাগিল 'সুশী বলে তার পুতুলের মত আর কারও পুতুল নেই। কাল দেখ্‌বো তাকে। বাবা! তুমি আমায় ভালবাস।'

তখন সে পা ছড়াইয়া পুতুল কয়টীকে কোলে লইয়া আদর করিতে বসিল। মাতার দিকে চাহিয়া বলিল, 'মা! আমাকে একটু সাদা নেকড়া দিবে? পুতুলের কাপড় পরাব।'

মাতা উত্তর করিলেন, 'নিও, কালকে ভোর বেলা'।

বালিকা আনন্দে পুতুল লইয়া খেলিতে বসিল।

বালিকার নাম প্রভাবতী। পিতামাতার ডাক নাম ছিল ভবি অথবা ভবু।

তাহার পিতার নাম রমাপ্রসাদ রায়। তিনিও চৌধুরী বাবুদের বংশসম্ভূত কিন্তু তাহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে। পিতার আমলের যে একটু তালুকের অংশ ছিল ও কয়েক বিঘা জমী ছিল তাহার উপসত্ব হইতেই তাহার পরিবারের কতকটা ভরণ পোষণ হইত। তাহা ছাড়া চাকরি বাবদ মাসিক ত্রিশটী টাকা বেতন পাইতেন।

তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরপ্রসাদ রায় দিনাজপুরে কুড়িটাকা মাহিয়ানায় জমিদারের অধীনে নায়েবের কাজ করিতেন। তিনি সপরিবারে সেখানে থাকিতেন— মাঝে মাঝে যাহা পারিতেন সংসারের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে পাঠাইয়া দিতেন। দুই ভাইয়ের তেমন অর্থ ছিল না, তবে একের অন্যের প্রতি বড় ভালবাসা ছিল।

রমাপ্রসাদ বাবুর একটি পুত্র ও দুইটী কন্যা। পুত্র—নগেন্দ্র - খুল্লতাতের কাছে থাকিয়া লেখা পড়া করিতেছিল। বয়স—বৎসর বার তের।

হরপ্রসাদ বাবুরও একটি মাত্র পুত্র—নাম খগেন্দ্র—বয়স বছর নয় দশ—ও তিনটি কন্যা। সকলেই তাহার নিকট থাকিত।

রমাপ্রসাদ বাবুর কষ্টের সংসার কিন্তু তথাপিও তিনি সুখী। তাহার প্রধান কারণ তাহার স্ত্রী। তিনি তাহার স্নেহের পক্ষপুট দিয়া সমস্ত পরিবার খানিকে যেন সমস্ত দুঃখ-কষ্টের আক্রমণ হইতে আবরিয়া রাখিয়াছিলেন।

ছয় দিবসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর, শনিবার সন্ধ্যাকালে যখন রমাপ্রসাদ বাবু স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তখন প্রথমই প্রণয়িনীর, প্রীতি-প্রফুল্ল হাসি ভরা মুখখানি দেখিয়া সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেন। স্ত্রীর কল্যাণে তাহাকে একদিনও ছেলেপেলের খাওয়া দাওয়া বা সংসারের অন্য কোনও বিষয়ের জন্য চিন্তা করিতে হইত না। যেখানে যাহা পাইতেন তাহার হাতে আনিয়া দিতেন। তিনি তাহা স্বামী ও অন্যান্য পরিজনবর্গের সুখের জন্য ব্যয় করিয়া নিজেকে সুখী মনে করিতেন।

যেমন স্বামী—তেমন স্ত্রী। রমাপ্রসাদ বাবুর চরিত্রগুণে যেমন গ্রামবাসিগণ মুগ্ধ ছিল, তাহার স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরীও তেমনি হৃদয়ের কোমলতায় ও মাধুর্য্যে সকলকে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, স্বামী স্ত্রী একভাবাপন্ন না হইলে পরিবারের সুখই বা কোথায়? অর্থ সুখের আকর নহে। সুখ পরার্থে —আত্মত্যাগে। তাহারই আর এক নাম ভালবাসা। যে সংসারে স্বামী স্ত্রীর সত্বায় নিজকে মিশাইয়া দিয়াছে—স্ত্রী স্বামীর অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে—দুজনে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, সেখানে শান্তি বিরাজ করে —লক্ষ্মী চিরকাল বাস করেন।

স্বামী ও স্ত্রী প্রাণাধিকা কন্যাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন এমন সময় মাথায় একটা ঝুড়ি ও হাতে 'ডুলা' লইয়া ভৃত্য নদীরাম হাট হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎপরে ডান্ হাত হইতে মাছের ডুলাটি উঠানের এক কোণায় রাখিতে যাইবে এমন সময় মোক্ষদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি মাছ এনেছ? দেখি'।

এই বলিয়া তিনি একটু উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিলেন 'কৈ মাছ! বা! বেশ তো বড়'।

তৎপরে তিনি একটা ঘটী হইতে নদীরামের হাতে জল ঢালিয়া দিলেন। সে তখন তাহার মাথার বোঝা নামাইয়া আঙ্গিনার এক কোণায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

এদিকে মোক্ষদাসুন্দরী বেগুণ, কুমরা ইত্যাদি তরিতরকারী একে একে বাহির করিয়া ধুইয়া ধুইয়া ঘরের বারেন্দায় তুলিয়া দিতে লাগিলেন। সেখানে যে বৃদ্ধা বসিয়াছিলেন তিনি তাহা গৃহের ভিতর লইয়া গেলেন।

মোক্ষদাসুন্দরীর রান্না প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। কেবল মাছের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। ডুলা হইতে বাছিয়া বাছিয়া গোটা কয়েক মাছ লইয়া তিনি রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। বাকী মাছ কয়টী নদীরাম হাঁড়ীর ভিতর জিয়াইয়া রাখিয়া দিল।

শনিবার দিবস স্বামী আসিবেন বলিয়া মোক্ষদাসুন্দরী খাবার একটু ভাল বন্দোবস্ত করিতেন। সেই দরিদ্র পরিবারের পক্ষে সেই রজনীটী বড়ই আনন্দের ছিল।

নদীরাম সে বাড়ীর অনেক দিনের পুরাতন ভৃত্য। গ্রামের ভিতর মাঝে মাঝে এমন দুই চারিটী পরিবার প্রায়ই থাকে, যে দেখিলে মনে হয় যেন বিধাতা দুই পরিবারের মধ্যে প্রভু ও ভৃত্য সম্পর্ক আজন্মকাল হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। রমাপ্রসাদ বাবুর পিতার অধীনে নদীরামের পিতা চাকরি করিত এবং তাহার পূর্ব্বে তাহার পিতামহ এ পরিবারে চাকরি করিয়া গিয়াছে। নদীরামও একপ্রকার বাল্যকাল হইতেই এই পরিবারে কাজ করিতেছে।

তাহার মাহিনা ছিল মাসিক তিন টাকা। অনেক সময় তাহা বাকী পড়িয়া থাকিত। আবার প্রয়োজন হইলে বিশ পঁচিশ টাকা অগ্রিম নিত।

এমন প্রভুপরায়ণ ভৃত্য দুর্লভ। প্রভুর জিনিসটীকে সে নিজের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান মনে করিত। কিন্তু একটী কথা বলিতে হইবে যে অনেক সময় ইচ্ছা না হইলে শত চেষ্টা করিয়াও তাহার দ্বারা কোনও কাজ করান যাইত না। ইচ্ছা হইলে আবার সে সারাদিন না খাইয়া কাজ করিত।

অনেক সময় সে রমাপ্রসাদ বাবুর মুখে মুখে কথার উত্তর দিত। এজন্য তাঁহার মাঝে মাঝে নদীরামের উপর ভারি রাগ হইত। এক একবার বলিতেন, না! আর পারা যায় না, অসহ্য হয়ে উঠেছে, ও'কে না উঠিয়ে দিলে চলে না।

একবার উঠাইয়াও দিয়াছিলেন কিন্তু নদীরাম তাহা শুনিয়া বলিয়াছিল, "এ বাড়ী হতে আমাকে তাড়িয়ে দেয়—এমন সাধ্য কার?" এই বলিয়া সে বিশেষ মনোযোগ সহকারে কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। রমাপ্রসাদ বাবু গম্ভীর মুখ করিয়া বলিলেন "তোকে দিয়ে আমার আর কাজ নেই। তুই উঠে যা"।

নদীরাম তাহার কোনও উত্তর করিল না। সে কাজ করিতে লাগিল।

রমাপ্রসাদ বাবু এবার একটু বিশেষভাবে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তোমায় বল্‌ছি তুমি কাজ করো না—আমার বাড়ী থেকে চলে যাও।

নদীরাম নিরুত্তর।

দুপুর বেলা কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া স্নানান্তে সে মোক্ষদাসুন্দরীর কাছে আসিয়া বলিল 'খাবারটা দিনতো'।

তিনি থালা ভরিয়া ভাত বাড়িয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার সম্মুখে তাহা ধরিয়া দিলেন। তাহার বরখাস্তের শেষটা যে কোথায় দাঁড়াইবে তাহা তাহার অবিদিত ছিল না।

সে অন্যান্য দিবসের ন্যায় মনের আনন্দে আহার করিতে লাগিল। এমন সময় রমাপ্রসাদ বাবু বাটীর ভিতর আসিয়া বলিলেন—"তুই এখনও আছিস্—তোকে না বরখাস্ত করেছি।"

নদীরাম তদুত্তরে বড় দেখিয়া একটা ভাতের গ্রাস মুখে দিতে দিতে মাথা নত করিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে বলিল 'আপনি করেছেন—মা তো করেন নি'।

রমাপ্রসাদ বাবু স্ত্রীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। মোক্ষদা সুন্দরী মনের আনন্দে নদীরামকে ষোড়ষোপচারে খাওয়াইলেন। ইহার পর রমাপ্রসাদ বাবু আর কখনও নদীরামের বরখাস্তের বিষয় মুখে আনেন নাই।

(ক্রমশঃ)

ঢাকায় শিখধর্ম্মের শেষ চিহ্ন

শিখ-গুরু নানক সাহেবের ধর্ম্ম এক সময়ে যে ঢাকা নগরীর চতুর্দ্দিকে বিশেষ-রূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে কূপ, মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

ইদগার কিছুদূরে পিলখানার নিকট একটী প্রাচীন শিখ সঙ্গত * আছে।

* ডাঃ টেলর বলেন- "The Hindoo places of worship in this city are 52 Akhras, 55 Kali Barees, and 12 *Sanghats*.

এখানে উচ্চবেদীতে একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে গুরু নানকের পুণ্য পদ-চিহ্ন উৎকীর্ণ—উহা শিখেরা পূজা করিয়া থাকেন। প্রাঙ্গণমধ্যে অষ্টকোণবিশিষ্ট একটি ইন্দারা দৃষ্ট হয়। ইহা 'গুরু নানকের কূপ' † বলিয়া স্থানীয় লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। জনশ্রুতি যে, শিখগুরু নানক এক সময়ে ঢাকায় আগমন করেন এবং তিনি স্বয়ং এই ইন্দারার জলপান করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের স্পর্শহেতু এই কূপোদকের অলৌকিক শক্তি আছে একথা শুনিতে পাওয়া যায়। রোগ-মুক্তির জন্য আজিও বহু হিন্দু এখান হইতে জল লইয়া যান। সম্প্রতি এই ইন্দারায় একখানি প্রস্তর ফলক পাওয়া গিয়াছে। উহা গুরুমুখী ভাষায় লিখিত। ইহার মর্ম্ম এই যে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মোহান্ত প্রেমদাস এই ইন্দারা সংস্কার করাইয়াছিলেন।

গুরু নানক ঢাকা আসিয়াছিলেন একথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। নবম গুরু টেগ বাহাদুর সম্রাট ঔরংজেবের সময় ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন, এবং তিনি এখানে বহু শিষ্য দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাকেই সাধারণ লোকে গুরু নানক বলিয়া মনে করিয়া থাকিবে। ঘোড়দৌড়ের মাঠের নিকট একটী শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। শিখেরা এখানে সম্মিলিত হইয়া 'গ্রন্থ সাহেবের' পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পণ্ডিত চণ্ডীচরণ সার্ব্বভৌম

বিক্রমপুরের অন্তর্গত আউটাসাহী একটী জন-সমৃদ্ধ পল্লী। এই পল্লীর অভ্যন্তরে, প্রকৃতি রচিত শ্যামল-সৌন্দর্য্যের মধ্যে মহাত্মা চণ্ডীচরণ সার্ব্বভৌম জন্ম গ্রহণ করেন। চণ্ডীচরণের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, একজন নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। বিনয়, সৌজন্য ও পরোপকার-প্রবৃত্তি তাঁহাকে জন-সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের তিনটী মাত্র

† 'The well is known Guru Nanak's well, after Guru Nanak, the founder of the Sikh Religion.' Bradley Birt.

পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে চণ্ডীচরণ দ্বিতীয়। চণ্ডীচরণ ১২৫১ সনের ৬ই আষাঢ় তারিখে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

চণ্ডীচরণের বয়স যখন পাঁচ কি ছয় বৎসর তখন হইতে তাঁহার লেখা পড়ার চর্চ্চা আরম্ভ হয়। এ সময় গ্রাম্য বিদ্যালয়ে, বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষার উত্তম সুযোগ ছিল, চণ্ডীচরণ কিছুদিন এই স্থানে বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করেন। বহু বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করায়, তাঁহার পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিবার অভিলাষ করেন। সে সময় ব্রাহ্মণ মাত্রেই আপন আপন সন্তানদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা প্রদান মানসে প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠীসমূহে প্রেরণ করিতেন। কেন না তখনও এদেশে ইংরেজি শিক্ষাকে আপনাদের ধর্ম্মজীবন লাভের অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন। এ কুসংস্কার এখনও তাঁহাদের মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। “আদুরে পুত্র” বলিয়া চণ্ডীচরণের পিতা তাঁহাকে ভিন্ন গ্রামের চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ না করিয়া, গ্রাম্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশের টোলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই স্থানে এক বৎসর কালের মধ্যে চণ্ডীচরণ আপন মেধা ও প্রতিভার প্রভাবে, কলাপ ব্যাকরণের কৃদ্‌বৃত্তি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া টীকা, পঞ্জী, কবিরাজ, বিল্বেশ্বর প্রভৃতি ব্যাখ্যাগুলি পাণ্ডিত্যের সহিত শিক্ষা করেন। অধ্যাপকের অনুমতিক্রমে তখনকার দিনে এক চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ, ভিন্ন ভিন্ন চতুষ্পাঠীতে গমন করিয়া, শাস্ত্রালোচনায়, পরস্পরকে পরাজয়ের চেষ্টা করিতেন; ইহাতে বিচারনৈপুণ্য, কূটবুদ্ধির অতি আশ্চর্য্য ভাবে বিকাশ সাধন হইত। চণ্ডীচরণ বয়সে ছোট হইয়াও ঐরূপ শাস্ত্রালোচনার বা তর্কযুদ্ধে অনেক বিজ্ঞ ছাত্রকে পর্য্যন্ত পরাজিত করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনে ও শ্লোক রচনায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা দেখিয়া চারিদিকে তাঁহার প্রতিভার যশঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। চণ্ডীচরণের স্মৃতি-শক্তির যে অত্যন্ত প্রখরতা ছিল, তাহা যিনি তাঁহার অধ্যয়নের প্রণালী দেখিয়াছেন তিনিই সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। কেননা, অন্যান্য ছাত্রগণকে যে পাঠ শিক্ষা করিতে সারাদিন পরিশ্রম করিতে হইত, অথচ তাঁহার মেধার এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি ছিল, যে তাহাতেই তাহার একেবারে সে পাঠগুলি কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। ব্যাকরণের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এরূপে শিক্ষা করিবার পর তাহার একটা বড় চতুষ্পাঠীতে যাওয়ার ইচ্ছা জন্মিল। তৎকালে পারবোয়ার শুভড্যা নিবাসী প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ অভয়াচরণ

বিদ্যাভূষণের পাণ্ডিত্যের কথা চণ্ডীচরণের কর্ণগোচর হয়। শুনা যায়, অন্যূন দুই বৎসর কাল, সেখানে ব্যাকরণ, সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। আমতলীর লক্ষ্মীদাস বাচস্পতি তথন নিজ গ্রামে, এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষা ও অন্নদান করিতেছিলেন। ব্যাকরণের পরিশিষ্টে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা লোকসমাজে তথন প্রচারিত হইয়া পড়ায়, আমাদের চণ্ডীচরণের বড়ই ইচ্ছা হইল, এই অধ্যাপকের নিকট পরিশিষ্ট অধ্যয়ন করেন। লক্ষ্মীদাস বাচস্পতি মহাশয়, চণ্ডীচরণের প্রতিভার কথা পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন, সুতরাং অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সহিত চণ্ডীচরণকে আপনার প্রিয় শিষ্যবর্গের মধ্যে স্থান দান করেন। উপযুক্ত গুরুর সঙ্গলাভ করিয়া চণ্ডীচরণও অত্যন্ত উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত আপনার অধ্যয়ন পরিচালনা করিতে লাগিলেন। প্রতিভা ও বিচারশক্তি তাঁহার এই স্থানে সর্ব্বাধিক পরিস্ফুট হওয়ার সুযোগ ঘটিল। কেননা, তাহাকে নানা স্থান হইতে সমাগত পণ্ডিত ও প্রতিভাসম্পন্ন মেধাবী ছাত্রদিগের সঙ্গে বিচার করিতে হইত। কারণ, ছাত্রবর্গের মধ্যে বয়সে বড় না হইলেও পাঠে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আনন্দের বিষয়, বহু ছাত্রকে তর্ক-যুদ্ধে পরাজিত করিয়াও তিনি অহঙ্কারী হইয়া উঠেন নাই। তাঁহার বিনয়, সৌজন্য, মিষ্ট ব্যবহার, তাঁহার পিতৃদেবের চরিত্রের সাদৃশ্য সূচনা করিত। এই ছাত্রের জন্য অধ্যাপক লক্ষ্মীদাস আপনাকে কিরূপ সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেন তাহা বলাই বাহুল্য।

এখানে ব্যাকরণের পরিশিষ্ট, এবং সাহিত্য, অলঙ্কার রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে গমন করেন। ন্যায়শাস্ত্রে প্রবীণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে পয়সাগাঁর সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন তর্কে ও জ্ঞানে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। চণ্ডীচরণ তাঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন।

কথিত আছে যে, সারদাচরণ তৎকালে যে কেবল বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া আদৃত ছিলেন তাহা নহে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও অদম্য উৎসাহ, সর্ব্বোতোমুখী নদীর ন্যায় দেশের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-কল্পে নিয়োজিত ছিল। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার ও উন্নতিকল্পে যে নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের

পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার সমসাময়িক ২।৪ জন পণ্ডিত ভিন্ন আর কোন চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত, তেমন দিতে পারেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বতসমাজ সংস্থাপন-কল্পে সারদাচরণের অক্লান্ত পরিশ্রম বস্তুতই বড় প্রশংসার্হ। সারদাচরণই সারস্বত সমাজের প্রথম কার্য্য-নির্ব্বাহক অধ্যক্ষ, এবং প্রধান সম্পাদকরূপে সভার কার্য্য পরিচালনা করিতেন। পরিশেষে, অন্যতর সম্পাদক ও সহকারী সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি সমাজের অনেক উন্নতি সাধন করেন। উক্ত সমাজের রক্ষা-কল্পে সারদাচরণ অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতেন। ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও সমাজের বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠাবান্ সম্পাদক মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং পুরাপাড়ার স্বভাব কবি ও সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ৺জগদ্বন্ধু তর্কবাগিশ মহাশয় তাঁহার উক্ত কর্ম্মে সহযোগী ও বিশেষ উৎসাহী বন্ধু ছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় কবিতা এবং প্রবন্ধ রচনায় ও বক্তৃতা শক্তিতে যথেষ্ট প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। যে প্রসন্ন তর্করত্ন বিক্রমপুরে একটী অক্ষুণ্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়া দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, শুনা যায়, সারদাচরণের জীবিত কাল পর্য্যন্ত তিনিও বিক্রমপুরে প্রধানতম পণ্ডিতের আসন অলঙ্কৃত করিতে পারেন নাই। এমনিই বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য সারদাচরণকে ভূষিত করিয়াছিল। সারদাচরণ চণ্ডীচরণের মত প্রতিভাবান্ ছাত্র পাইয়া আপনার সমস্তটুকু বিদ্যা তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য দিবারাত্রি চেষ্টিত থাকিতেন। ন্যায়ের প্রথম গ্রন্থ "ভাষাপরিচ্ছদ" ও "ব্যাপ্তিপঞ্চক" প্রভৃতি গ্রন্থ এক পক্ষ কালের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করিয়া চণ্ডীচরণ যখন তাহার গুরুদেবের বিস্ময় উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিল, তখন সারদাচরণ কি এক অভিনয় আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাহা যাহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনার মর্ম্ম অবগত আছেন তাহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। উত্তর কালে ন্যায়ের বিবিধ জটিল তর্কসমূহের মীমাংসায় চণ্ডীচরণ যখন অধ্যাপকের অভূতপূর্ব্ব জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হইয়া উঠিলেন, সে দিন সারদাচরণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ হইল। আমরা শুনিয়াছি, প্রসন্ন তর্করত্ন ও সারদাচরণ যখন ন্যায়ের কূট-যুদ্ধে পরস্পরের সম্মুখীন হইতেন, তখন, সারদাচরণ আপনার কৃতী ছাত্র, চণ্ডীচরণকে নিকটে রাখিয়া বলিতেন "দেখুন, তর্করত্ন মহাশয়, অগ্রে আমার এই ছাত্রের সঙ্গে আপনার বিচার যুদ্ধ চলুক,

আমার এই ছাত্রকে যদি পরাস্ত করিতে সমর্থ হন, তবে আপনার সঙ্গে আমার বিচার হইবে।" এই উক্তিকে তর্করত্ন মহাশয় দাম্ভিকের উক্তি মনে করিতেন, বস্তুতঃ তর্করত্ন মহাশয়ও আমাদের দেশে কম বড় পণ্ডিত ছিলেন না ; তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক কথা এখনও নানা লোকের মুখে মুখে প্রচলিত। কথিত আছে, কোন একস্থানে বিদায় গ্রহণ করিতে যাইয়া, জমিদার বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষকে কি কথা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু তাঁহারা সেই বৃদ্ধ পণ্ডিতের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ইংরেজি ভাষায় কি আলাপ করিতে থাকেন, ইহাতে তর্করত্ন মহাশয় নিজকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন এবং এই বলিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া আসেন যে যতদিন ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিয়া ইংরেজিতে কথা বলিয়া বিদায় নেওয়ার উপযুক্ত না হইব, ততদিন আর এ বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করিব না। কিন্তু প্রতিভার এমনই শক্তি যে এক বৎসরের মধ্যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি আপনার প্রতিজ্ঞানুরূপ ইংরেজী ভাষায় কথোপকথন করিয়া বিদায় আনিয়াছিলেন।

এই প্রতিভা-সম্পন্ন তর্করত্ন মহাশয়কেও আমাদের তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের ছাত্র চণ্ডীচরণ তর্কযুদ্ধে সময় সময় বিশেষ বিব্রত করিয়া তুলিতেন। শুনিয়াছি তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের অসাধারণ শিক্ষার গুণে ও সহায়তায় সেই বিচার বিতর্কের কোন মীমাংসা হইত না, অনেক সময়, বিচার-দ্বন্দ্বে ভোরের সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া যাইত, বালক চণ্ডীচরণের পক্ষে, এত দীর্ঘ কাল, বিচার বিতর্ক লইয়া অত বড় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট অবিচলিত ভাবে অবস্থান করা, কম বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক নহে।

চণ্ডীচরণ ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাঁহার পিতার ইহা বড় ইচ্ছা ছিল না, সাংসারিক অসচ্ছলতার জন্য তিনি তাঁহার পুত্রকে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সে সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কিছু কিছু উপার্জ্জন চলিত, কেন না, গ্রামস্থ লোক বা চতুষ্পার্শ্বের লোকেরা অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ঐরূপ পণ্ডিতদের নিকট হইতে, অর্থ দিয়া পাতি গ্রহণ করিত। কিন্তু দৈবক্রমে, চণ্ডীচরণের পক্ষে তাহার অন্যথা হইয়াছিল। কি ভাবে তাহার অন্যথা হইয়াছিল সে ইতিহাসটুকুও চণ্ডীচরণের প্রতিভারই পরিচয় প্রদান করে।

চণ্ডীচরণ যখন, লক্ষ্মীদাস বাবাজির টোলে অধ্যয়ন করেন, তখন, একদিন আপন অধ্যাপকের সহিত নিমন্ত্রণ উপলক্ষে, একটী দুর গ্রামে গমন করেন। সেখানে স্নানের ঘাটে বহু পণ্ডিতের মধ্যে বৈয়াকরণ কেশরী পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাকে দেশের মধ্যে খুব বড় পণ্ডিত জানিয়াও জ্ঞানপিপাসু উৎসাহী চণ্ডীচরণ পরিশিষ্টের কোন দুরুহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় চণ্ডীচরণকে বালক দেখিয়া প্রথমতঃ সহজ উত্তর প্রদান করেন, কিন্তু চণ্ডীচরণ সে উত্তরে দোষ প্রদর্শন করায় এবং তর্কে বিতর্কে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় সে প্রশ্নের মীমাংসায় প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। একটী অল্প বয়স্ক বালকের এইরূপ দীর্ঘকাল তর্কবিতর্কের সামর্থ্য দেখিয়া, তাহার প্রতিভার গুণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও চমৎকৃত হন। এই অবধিই চণ্ডীচরণের প্রতি বিদ্যাভূষণের স্নেহদৃষ্টি পতিত হয়, এবং এই প্রগাঢ় প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রকে ন্যায়শাস্ত্র পড়াইতে কৃতসঙ্কল্প হন, ও স্বয়ং চণ্ডীচরণের পিতার নিকট গিয়া ভিক্ষা-স্বরূপ বালককে প্রার্থনা করেন। এত বড় বিখ্যাত একজন পণ্ডিত যখন চণ্ডীচরণকে আদর করিয়া ন্যায়শাস্ত্র পড়াইতে চাহিলেন, তখন চণ্ডীচরণের পিতা কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। সে দিন পিতার হৃদয় পুত্রের কৃতিত্বে কতদূর আনন্দিত হইয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া বলা কঠিন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, বিদ্যাভূষণ মহাশয় একদিকে যেমন প্রবীণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তেমনি ধার্ম্মিক বলিয়াও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। পাণ্ডিত্যে পশ্চিম বঙ্গের তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়, তাঁহার একজন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বস্তুতঃ বৈয়াকরণ কেশরী বলিয়া বিখ্যাত হইলেও নানা শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন তাঁহারই নিজের হাতে গড়া। সারদাচরণ সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র হইলেও তাহাকে আপন পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন, ও নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতেন। চণ্ডীচরণের সম্পূর্ণ শিক্ষার ভার, এ সময় তিনি সারদাচরণের হাতে সমর্পণ করেন, এবং চণ্ডীচরণের অনেক প্রশংসাবাদ করেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া চণ্ডীচরণ উপাধি লাভের প্রত্যাশায় নবদ্বীপ গমন করেন। নবদ্বীপ সে সময় সংস্কৃত বিদ্যালোচনার এক প্রকৃষ্ট কেন্দ্র ছিল। আমাদের এদেশে উপযুক্ত শিক্ষালাভ হইলেও তখনকার দিনের রীতি অনুসারে নবদ্বীপে যাইয়াই উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতে হইত।

নবদ্বীপের হরমোহন তর্কচূড়ামণি একজন প্রবীণ পণ্ডিত, তাঁহার নিকট কিছু দিন পাঠ গ্রহণ করেন। বালক চণ্ডীচরণের ন্যায়শাস্ত্রে অদ্ভুত প্রতিভা অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহাকে অতি অল্পদিন পরেই "সার্ব্বভৌম" উপাধিতে ভূষিত করেন, এবং দেশে যাইয়া চতুষ্পাঠী সংস্থাপনের আদেশ করেন। তর্ক-চূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, চণ্ডীচরণ যদি শাস্ত্রালোচনায় নিবিষ্টমনা হয়, অন্য কোন বিষয়ে যদি চণ্ডীচরণের মন ডুবিয়া না যায় তবে কালে, চণ্ডীচরণ বিক্রমপুরে একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন। বস্তুতঃ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথা নিষ্ফল হয় নাই, ধর্ম্ম-জীবনে প্রবিষ্ট হইয়া যখন চণ্ডীচরণ তাহার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেলেন, তখন আস্তে আস্তে তাঁহার সমস্ত জ্ঞান প্রতিভা বিলীন হইয়া গিয়াছিল। আমরা তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস পরে আলোচনা করিতেছি।

গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আমাদের নবীন অধ্যাপক সার্ব্বভৌম মহাশয় স্বগ্রাম আউটসাহীতে আগমন করিয়া একটী ন্যায়ের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। এ সময় এই গ্রামে আরও বহু পণ্ডিত, ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, এবং ছাত্রদিগকে অন্নদান করিয়া পুত্রবৎ পালন করিতেন। এই সকল পণ্ডিতদের মধ্যে ভবানীশঙ্কর তর্কবাগীশ, বঙ্গচন্দ্র তর্কভূষণ, জগদ্বন্ধু তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সকলেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, কালীকান্ত শিরোমণি (যাঁহাকে বঙ্গের লোকে দ্বিতীয় রঘুনন্দন আখ্যা প্রদান করিয়াছিল, তিনি) এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন, ভবানীশঙ্কর তর্কবাগীশ মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় বঙ্গদেশের মুখে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়।

গ্রামে চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় রীতিমত ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন, এ সময় তিনি বহু পুস্তক নিজের হাতে লিখিতেন, এবং সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক, ন্যায়ের টীকা প্রভৃতি রচনা করিতেন। কিন্তু কি কি পুস্তক, কোন্ কোন্ টীকা তিনি লিখিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই, কিন্তু আমরা জানি তাঁহার স্বহস্তে লিখিত অনেকগুলি পুস্তক, অযত্নে উলুপোকার করাল গ্রাসে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, অনেকগুলি বই, আজও

তাঁহার অক্লান্ত অধ্যাবসায়ের সাক্ষ্যরূপে অধস্তন বংশীয়দিগের গৃহে বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু চতুষ্পাঠিসংস্থাপনের পর অতি অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও তিনি অধিক দিন, শাস্ত্রালোচনায় মনকে নিবিষ্ট রাখিতে পারিলেন না। জ্ঞানে যেন তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল না, আরও কোন অজানিত স্বর্গীয় সম্পদের জন্য তাঁহার মন পাগল হইয়া উঠিল। কঠোর শাস্ত্রালোচনা যেন দিন দিনই তাঁহাকে সংসারের সমস্ত বন্ধনের প্রতি উদাস করিয়া তুলিতে লাগিল।

শৈশবে, ধর্ম্মের জন্য তাঁহার অপরিসীম একাগ্রতা দেখিয়া, এবং এক সাধু ব্যক্তির ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়া চণ্ডীচরণের পিতা ও আত্মীয় স্বজন সকলেই মনে করিয়াছিলেন, সংসারে চণ্ডীচরণকে মায়ার বন্ধনে বাঁধিয়া রাখা অথবা কোন প্রলোভনে মুগ্ধ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। কালে সেই আশঙ্কাই কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

চণ্ডীচরণ দেবাদিদেব মহাদেবের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। পৌষ ও মাঘের প্রচণ্ড শীতকেও অগ্রাহ্য করিয়া তিনি শেষরাত্রিতে নিজে স্নান করিতেন এবং মহাদেবকে স্নান করাইতেন। গ্রামের মধ্যভাগে একটী ভগ্ন দেবমন্দিরে বসিয়া তিনি নিয়ত ভগবানের আরাধনায় রত থাকিতেন। কখন কখনও তিনি উন্মুক্ত প্রান্তরে, নির্জ্জন বনে ভগবানের ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন।

মেহার কালীবাড়ীতে প্রায়ই তাঁহাকে যাইতে দেখা যাইত। গভীর নিশীথে একাকী পথ চলিতে, অথবা, নির্জ্জনস্থানে উপাসনা করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও ভয় ছিল না। মূর্ত্তিপূজাকে তিনি প্রথমতঃ জীবনের প্রধান ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পশুবলি দ্বারা দেবতার পরিতুষ্টি সাধন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। কিন্তু ক্রমে যতই তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হইতে লাগিল, ততই তিনি মূর্ত্তিপূজার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন ও পশুবলিকে একটা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে করিতেন।

এই প্রবল ধর্ম্মোন্মাদনার সময় তিনি গৃহীর ধর্ম্মে আপনার আদর্শ খুঁজিয়া না পাইয়া এবং প্রকৃত ধার্ম্মিকতার নামে অনেক ধর্ম্মহীন কার্য্যানুষ্ঠানের সূচনা দেখিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করেন। এই সংকল্পের কথা তিনি কাহাকেও

জানিতে দেন নাই। মায়ের প্রতি চণ্ডীচরণের অপরিসীম ভক্তি ছিল, কিন্তু মাকেও এ বিষয়ে তিনি কোন কথা বলেন নাই, তবে প্রথমবার সন্ন্যাস ধর্ম্মগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়া তিনি যে দিন গৃহত্যাগ করেন, এবং এক বিজন অরণ্যগর্ভস্থ দেবমন্দিরে, আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার মা তাঁহাকে অনেক বলিয়া কহিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চণ্ডীচরণ বিবাহ করেন নাই। মাতাপিতার চেষ্টাকে তিনি তাঁহার ধর্ম্মের উদার ব্যাখ্যাদ্বারা বিফল করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠকে তিনি বিবাহাদি দ্বারা গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনে অনুরোধ করেন। মাতাপিতাকে বলেন, আমি ধর্ম্মের জন্য গৃহত্যাগী হইলাম। কিন্তু আমার আর দুই ভাই তোমাদের সেবার জন্য রহিল।

ভগবানকে জীবনে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা যখন তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, তখন তিনি এক প্রকার উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন, সর্ব্বদা কি চিন্তা করিতেন, আর মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে দেবতার নাম উচ্চারণ করিতেন। আপন ছোট ভাইর নিকট তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি একদিন গভীর নিশীথে যখন মেহার কালী বাড়ী হইতে বাড়ীর দিকে যাত্রা করি, তখন পথে আসিতে আসিতে দেখিতে পাই, সম্মুখে ভীষণ সমুদ্র গর্জ্জন করিতেছে, তখন জ্যোস্না উঠিয়াছিল, জ্যোস্নার আলোকে দেখিলাম, কোন দিকে পথ নাই, সম্মুখে অনন্ত জলধি আর মাথার উপর অনন্ত আকাশ। আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না; সেই নির্জ্জন সমুদ্রতীরে আমি একটী উচ্চ ভূমিতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইলাম, স্বপ্নে কত কি অদ্ভুত ছবি দেখিলাম,—সে দিন হইতে আমার মস্তিষ্ক ঠিক নাই।"

চণ্ডীচরণ আপনার জীবনের মধ্য বয়সে গৃহত্যাগ করেন। কাশীধামে দণ্ডী সমাজে তিনি প্রবিষ্ট হন, সেখানে কিছু দিন সাধারণ সন্ন্যাসীর বেশে অবস্থান করিয়া, ভারতের সমুদয় তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ করেন। পরিশেষে হিমালয়ে মহা-প্রস্থান করেন। হিমালয় হইতে তিনি আর এদেশে ফিরিয়া আসেন নাই। সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও তিনি একবার নবদ্বীপের রাজসভায়, হিন্দুদের মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে এক সারগর্ভ শাস্ত্রসঙ্গত বক্তৃতা করেন। সন্ন্যাস জীবনেও তাঁহার অগাধ শাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া নবদ্বীপের মহারাজ এবং অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তিনি যখন তীর্থে তীর্থে

সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতেন তখন আমাদের এদেশবাসী কোন কোন পণ্ডিতের সহিত নাকি তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম জীবনের যাহা চরম পরিণতি, সেই পরিণতিকে লাভ করিয়া যে তিনি মনুষ্য জীবন সার্থক করিতে পারিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার সাধনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কেননা, তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অপেক্ষা, প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-জীবন লাভকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

পল্লীগ্রামের বালকগণের নৈতিক শিক্ষার উপায় কি ?

আমাদের পল্লীগ্রামগুলি, ঠিক পল্লীগ্রামই আছে, ইহা কেহ জোরের সহিত বলিতে পারেন না। পল্লীগ্রাম সহর নহে, অথচ সহরের সকল ভাবের প্রত্যেকটী তরঙ্গ আসিয়া ইহাকে আঘাত করিতেছে। ইহার ভিতরে সহরের বিরূপ ভাবটা যে ভাবে প্রবেশ করিতে সুবিধা পাইতেছে, সহরের যেটুকু ভাল সে টুকু আসিবার তেমন সুযোগ ঘটিয়া উঠিতেছে না। সহরের অবিনয়, স্বৈরাচার, শ্রদ্ধাবিহীনতা ও অসংযম গ্রামগুলিতে অনায়াসে তাহাদের স্থান করিয়া নিতেছে; কিন্তু উহার সর্ব্ব বিষয়ে প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব, বড় হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অদম্য চেষ্টা, আত্মনির্ভর-প্রিয়তা আবার তেমন প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। সহরের ভাব ও ভাষা পল্লীগ্রামে যেরূপ বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, এবং উহার সবল স্বৈরাচার ও অবিনয় গর্ব্বিত শ্রদ্ধাবিহীনতা ও অসংযম, তদ্রূপ গ্রামে ভীরু কুকর্ম্মশীল আত্মাভিমানশূন্য নিন্দুক দলের সৃজন করে।

সর্ব্বত্রই আমাদের যুবক দলের পরিণাম সম্বন্ধে একটা ত্রাস ও ভীতির কম্পন অনুভব করি। অথচ তাহাদিগকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিণতি দান করিবার চেষ্টা কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। আজ কাল কোথাও কোথাও এসকল জন্য নানারূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে।

অনেকের বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত দেশে নৈতিক উৎকর্ষ সাধন অসম্ভব হইবে। একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যায় যে উহা একটা ভুল ধারণা মাত্র।

দেশের অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে থাকেন। নৈতিক অপকর্ষের কারণ কি, তাহা আমরা কেহই তেমন তলাইয়া দেখিতে যাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ, সে কয়েক জনের বিদ্যাবত্তার মূল্য নিরূপণ করিয়া দেয়। চরিত্র এবং বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা এক নহে। অথচ আমরা সকলেই ওই খানেই ভুল করিয়া বসিয়া আছি। যিনি বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পাশ লইয়া আমাদের সম্মুখে বাহির হন, তাহার অবিনয় ও নানা প্রকার গর্হিতাচরণের একটা সুসঙ্গত কারণ খুঁজিয়াই বেড়াই; কিন্তু কেহই এমন কথা জোর করিয়া বলি না যে তাহার বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা তাহাকে চরিত্র প্রদানের যথেষ্ট সহায়তা করে নাই। তাহার অবিনীত ও স্বৈরাচারী হইবার কোন অধিকার নাই। আর যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দু চারটা পাশের জন্য সংগ্রাম করিতে যান নাই, অথচ প্রবৃত্তির সংগ্রামে নিজকে সতত জয়ী রাখিতে অবিরাম চেষ্টা করিতেছেন তাহার সঙ্গে আলাপ ব্যবহারেও কোন প্রকার ভদ্রতা রাখিবার প্রয়োজন আছে, ইহা মনেই করি না। যেখানে চরিত্রোৎকর্ষের উপযুক্ত সম্মান নাই, সেখানে যে অপকর্ষ আসিয়া অধিকার করিবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি যে প্রকার, তাহাতে ছাত্রদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর শিক্ষকের কোন প্রভাব আসিয়া পড়িতে পারে না। আবার যিনি নীতি শিক্ষা দিবেন তাঁহার নীতিতে, চরিত্রে অমিত বলের এবং প্রতি ছাত্রের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন।

আমাদের বালকগণের নৈতিক চরিত্র গঠন করিতে হইলে, অন্যের প্রতি শুধুই দোষারোপ না করিয়া অথবা তাহাদের ত্রুটীর আলোচনায় সময়ক্ষেপ না করিয়া নিজেদের সে বিষয়ে একটু যত্ন নিতে হইবে।

নীতিশিক্ষা বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা স্কুল কলেজে সম্যক্ সম্পন্ন হইতে পারে না। শাস্তির ভয়ে কতকগুলি বিধি মানিয়া চলাকেই নীতিশিক্ষার উপায় বা পরিণতি বলা যাইতে পারে না। বিধি মানিয়া চলিবার স্বাভাবিক

প্রণোদনাতেই উহার বিকাশ। অবিনয়, অশ্রদ্ধা, স্বৈরাচার ও অসংযম নৈতিক শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। ব্যক্তিগত চরিত্রে এ সকল কটীই আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন রাখে। কোন মণ্ডলীর নিয়মে কেহ বাধ্য থাকিতে চাহে না। এসকল দুর্নীতির জন্তই আমরা কোন শুভানুষ্ঠানে বিশ্বাস এবং যোগ দান করিতে সমর্থ হই না।

কি কি কারণে এ সকল দুর্নীতি আমাদের যুবক ও বালকদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহার সম্যক্ আলোচনা করিলে উহা দূর করিবার কতকগুলি সদুপায় স্থির হইতে পারে। ইহার যত বেশী আলোচনা হইবে প্রকৃত কারণ ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিলেই যুগপৎ নানা সুসঙ্গত কারণ মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রায় সকল গুলির প্রভাবই যুগপৎ কার্য্য করিয়া থাকে। সুবিধার্থে আমরা একটীর পর একটীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মনুষ্যত্বে অবজ্ঞা প্রকাশ।

কি বালক কি যুবক তাহাদের মধ্যেও যে ন্যায় ও অন্যায় বিচার করিবার একটা সহজ ক্ষমতা আছে, অভিভাবক ও বয়স্কগণ ব্যবহার দ্বারা তাহা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। ঘোড়া ও গরুকে বেত মারিয়া যেনন ডাহিন ও বাম শিখান হয়, শৈশব হইতে ছেলেদের শিক্ষাও অনেকটা সেইরূপই হয়। যিনি আমাদিগকে নৈতিক শিক্ষা দিতে প্রয়াসপর হইবেন, তাঁহার যদি বিশ্বাস না থাকে যে আমাদের ততটুকু মনুষ্যত্বও আছে, যদ্দ্বারা আমরা তাঁহার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, সেখানে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইলে আমরা বিস্মিত হইব না। উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিবার অনুরূপ মনুষ্যত্বের দাবীটুকু যিনি মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত নহেন তিনি যে মহত্তর অপর কিছু অনায়াসে দান করিতে পারেন সে বিশ্বাস আমাদের কই? বালকদের অন্যায় ও ক্রটী দেখিলে আমরা শাস্তি দেই, কিন্তু সহানুভূতির স্বরে একবারও কি বলি, যে এটা তোমার মস্ত ভুল হইয়াগিয়াছে, আশা করি এ ভুল তোমার আর হবে না। অনবধানতা দেখিলে উহার মস্তিষ্কে কিছুই নাই, চেষ্টা করিলেও কিছু করিতে পারিবে না, এর বৃথা প্রয়াস, বামন হয়ে চাঁদে হাত, এর জন্ত যত্ন নেওয়ায় কোন ফল নাই, এরূপই বলি, কিন্তু কখনও কি মনে করি এওতো মানুষ, হয় ত বা আমারই শিক্ষা ক্রটীতে ইহার জীবনটা নষ্ট

হইয়াছে ; কিন্তু যত কিছু দোষ ওই ছেলেটার। কিন্তু অনবরত নিজের সকল বিষয়ে যে শুধুই একটা ধিক্কারের বোঝা বহন করিতেছে তাহার আত্মাভিমান কি অসঙ্কুচিত থাকিতে পারে ?

মাঝের মানুষটা খুব ছোট বেলা হইতে এরূপ শত ক্ষুদ্র ত্রুটীতে, বালসুলভ নানা চপলতার জন্য বিকৃত হইয়া ক্রমশঃ ম্রিয়মাণ হইতে থাকে, কিছুতেই সতেজ থাকিতে পারে না। ক্রমে একদিন দেখা যায় তাহার সকল স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে। তখনই ভীষণ দুষ্কর্ম্ম-রত, হৃদয়হীন ব্যক্তি সমাজে দেশে ও গ্রামে নানা ব্যভিচারের সৃজন করে। খুব ছোট বেলায় যখন দিদিমার পূজার ফুল তুলিবার জন্য একটী সজীব প্রাণ প্রভাতে পাখীর কলরবের পূর্ব্বে উল্লাসে মত্ত হইয়া যত রাজ্যের যত সুন্দর ফুল সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে তখন যদি উদ্যত যষ্টি নিতান্ত নির্ম্মম ভাবে আদেশ প্রচার করে "কাল হইতে পড়া শুনা ফেলে যদি ফুল তুল্‌লে যেতে দেখি তাহা হইলে আর পৃষ্ঠের অস্থি থাকিবে.না।" এই ফুল তোলাতে বালক হৃদয়ে প্রতিদিন যে সজীবতা সঞ্চিত হইতেছিল তাহা একদিনেই বন্ধ হইয়া গেল। নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করার পন্থা আমরাই রুদ্ধ করিলাম। এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে তাহার মধ্যের ক্ষুদ্র মানুষটি কি বিদ্রোহী হইয়া উঠে না ? কি করিয়া ফুল তুলিবার আনন্দটুকু উপভোগ করিবে একবারও কি সেরূপ ষড়যন্ত্রে গোপনে লিপ্ত হয় না ? কোন অন্যায় সে যে ইহাতে দেখিতে পায় না অথচ জোর করিয়া ইহাকে অন্যায় বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে। অতি ক্ষুদ্র দুই একটী ঘটনায়ও এরূপ ভাবে আমরা তরুণ মনুষ্যটীকে নির্দ্দয় ভাবে নির্জ্জিত করিয়া রাখি। কিন্তু কালে তাহারই মধ্যে মনুষ্যটীকে না দেখিলে তাহাকেই দোষ দিয়া থাকি।

ওরূপ নির্ম্মম আদেশের পরিবর্ত্তে প্রথম দিনটা আমরা এরূপও বলিতে পারিতাম "ফুল তোলাই একা কাজ নয় পড়াশুনাও কর্‌তে হবে। আরও সকালে এসে পড়্‌তে বস্‌তে হবে"। ফুল তোলার উন্মত্ততায় যে ত্রুটী করিয়াছে, তাহা সংশোধন জন্য সে নিজেই চেষ্টা করিত। সে চেষ্টার পরিণামে আমরা একটী সবল মানুষ দেখিতে আশা করিলে নিরাশ হইতাম না।

একটী ক্ষুদ্র ঘটনা এখানে বিবৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমি সেদিন একটী স্কুলে আমার কোন বন্ধু মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিতে

গিয়াছিলাম। নীচের দিকের কোন এক শ্রেণীর মৌখিক পরীক্ষা। একজন মাষ্টার—ভিন্ন ঘরে একজন একজন করিয়া পরীক্ষা নিতেছেন।

আর ক্লাসের সকল ছাত্রগুলিকে একটী কোঠায় পুরিয়া রাখা হইয়াছে। ছেলেদের ভীষণ গোলমালে শীঘ্রই আমাদিগকে অস্থির হইয়া পড়িতে হইল। সকল মাষ্টার মহাশয়ই একবার একবার কয়েকটী ছেলেকে বেত মারিয়া গেলেন। ফের গোলমাল হইলে বিশেষভাবে বেত প্রহার করিবেন, শাসাইয়া গেলেন। হেড্ মাষ্টার মহাশয়ও বোধহয় একবার গিয়াছিলেন। তাঁহাদের ফিরিবার পর ২।৩ মিনিট ছেলেরা খুব শান্ত থাকে। পরে ক্রমে ক্রমে গোলমাল বাড়িতে থাকে। পরিশেষে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। আমি একান্ত সকৌতুকে ইহা দেখিতেছিলাম। অবশেষে পরীক্ষক মাষ্টার মহাশয় আসিলেন, তিনি রিক্তহস্ত। মনে করিলাম বুঝি হস্ত পৃষ্ঠের সম্বন্ধ করিবেন। কিন্তু তিনি সে সব কিছুই করিলেন না। তিনি আসিতেই প্রায় সকল চুপ। নাতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"কিরে তোরা! একেবারে হাট মিলিয়ে বসেছিস্। একটু লজ্জাও করে না! ও ঘরে পরীক্ষা! এতগুলি মেয়ে লোক থাকিলেও তো এত গণ্ডগোল হয় না! পুরুষের মত চুপ করে বসে থাকতো।" ইহাতে আশ্চর্য্য ফল প্রদর্শন করিল। ওখানে প্রায় সকলেই ১০।১২ বৎসরের ছেলে। অথচ ইহার পরে কেহই তেমন একটা গণ্ডগোল করিল না। মাষ্টার মহাশয়কে সকলেই খুব শ্রদ্ধা করিত। কেহই প্রায় ভয় করিত না। সকলেই তাঁহার নিকট সহজভাবে যাইয়া দাঁড়াইতে পারিত। তৎপর দিবস তিনি যাহাদের পরীক্ষক তেমন ২।১টি ছেলেকে অন্যের অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান বলিয়া গর্ব্ব করিতে দেখিয়াছি।

পরে তাঁহার সহিত আলাপে পরিতৃপ্ত হইলাম। তাঁহার একটা কথা মনে বেশ লাগিল "ওরা যেখানটায় মানুষ সেখানটা ওদের সম্মুখে এনে ধরাই আমাদের কাজ। যেই ওরা উহা ঠিক ধরতে পেরেছে বুঝিলাম, তখনই আমরা নিশ্চিন্ত"।

মানুষ গড়িতে হইলে নিজেকে মানুষ হইতে হইবে। রবিবাবুর কথা একটা মনে পড়ে "আপনি দুর্ব্বল হলি, বল দিবি তুই কারে"। যখন নিজের মনুষ্যত্বে বিশ্বাস নাই তখন অপরের মধ্যে যে মনুষ্যত্বোপযোগী উপাদান যথেষ্ট আছে, উহাতে আস্থা প্রদানকরিবার শক্তি কোথায়? কাজেই পুত্র শিষ্য ও ছাত্রকে আমরা উপযুক্ত শিক্ষাদানের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ি। যখন তাহাদের মধ্যের

মানুষটীর আমরা অবমাননা করি, তখনই আমাদের চতুষ্পার্শ্বে অবাধ্য পুত্র, শ্রদ্ধাবিচ্যুত শিষ্য ও বিদ্রোহী ছাত্রই দেখি।

যে পরিমাণে আমি যার মধ্যের মানুষটিকে যত্ন করিব, সম্মান করিব সে সেই পরিমাণে আমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন থাকিবে। সেখানেই প্রীতির ভিত্তি। মনুষ্যত্বের সম্মানজাত প্রীতি আমাদের নৈতিক চরিত্র বিকাশে কিরূপ সাহায্য করে সে বিষয়ে পরে আমরা আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে সমাজ যখন অপরাধ ও পাপাচরণ এতদুভয়ের শাস্তি দিতে সক্ষম ছিল তখন অপরাধের মত গোপনে পাপাচরণ করিতেও লোকে ভীত হইত। এখন যে সকল অপরাধ আইন অনুসারে দণ্ডনীয়, কেবল সেরূপ কোন কাজ করিতেই সাধারণে ভয় পায়।

গার্হ্য ও বাহ্য জীবন।

এখন আর পূর্ব্বের মত পাপাচরণের বিরুদ্ধে সমাজে তেমন কড়া শাসন নাই। তবু যে অধিকাংশ লোক পাপাচরণ হইতে বিরত, তাহা কতক পূর্ব্বাভ্যাস প্রসূক্ত ও আংশিক লোকলজ্জা ভয়। কুপ্রবৃত্তিগুলি সহজেই উদ্রিক্ত হয় ও সংক্রামক হইয়া উঠে। দুঃসাহসী একজন কেহ লোকলজ্জাভয় পরিত্যাগ করিয়া কোন প্রকার পাপাচরণ করিলে উহা যে ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়ে সে অভিজ্ঞতা বোধ হয় প্রায় সকলেরই আছে। যেখানে সমাজ শাসনের ক্ষীণাবশেষটকু এখনও আছে, সেখানে পাপাচরণে কোনরূপ শাস্তি এখনও দেখা যায়। পাপাচরণ ও দুর্নীতি গোপনে এবং একাকীই অনুষ্ঠিত হয়। তবু সমাজ তাহার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিত। কারণ তখন কাহারও জীবন দ্বিধাবিভক্ত ছিল না। সমাজের বাহিরে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা সম্ভব হইলেও সেখানে কোন দুষ্কর্ম্ম করা তাহার অধিকারে থাকিত না।

কিন্তু এখন জীবন দুইটি। একটী বাহ্য—সামাজিক। অপরটী গার্হ্য—ব্যক্তিগত বা অপ্রকাশ্য।

সামান্য একটি স্কুলের ছেলে বলিয়া বসে, বাড়ীতে আমি কি করি, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বাহিরে, আমি যাহাই করি, তজ্জন্য স্কুলে আমি দায়ী হব কেন? স্কুলের কোন নিয়ম অমান্য করিলে আমি শাস্তির যোগ্য।

ছোট গ্রাম। কোন প্রকারে একটি খেলোয়ারের দল গঠিত হইল। হয়ত একটি লম্বাচোড়া নামাকরণ হইয়া গেল। গ্রামের কোন বয়স্ক ছেলে হয়ত

দলপতি নির্ব্বাচিত হইল। এরূপ স্থলেও আমরা শুনিতে পাইতেছি যে অতি ছোট একটী ছেলে বলিতেছে—Captain, সেতো Foot ball clubএর Captain। যতক্ষণ খেলা হইবে ততক্ষণ তাহাকে মানিয়া চলিব। কিন্তু কোথায় মাঠের বাহিরে কবে আমি সিগারেট খাব, কাহার সহিত তুএকটা বচসা হবে, তজ্জন্য আমাকে কিছু বলিবার অধিকার আমি তাহাকে দেই নাই। এসকল অবিনীত বালকের নিকট হইতে শুধু প্রাচীনত্বের দাবীতে সম্মান লাভের আশা কত দূরে তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এখন সর্ব্বত্রই এরূপ তুইটী জীবন দাঁড়াইতেছে। চারিদিক হইতে যেন প্রতিধ্বনি উঠিতেছে যে বাহ্য জীবনে যখন আমি তোমাদের একজন হইয়া আসিয়াছি, তখনই কেবল কোন অসঙ্গত ব্যবহারের জন্য আমি তোমাদের নিকট দায়ী। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতা তোমাদের নিকট বাঁধা রাখিতে আমি আসি নাই। সেখানে আমি কি করি বা না করি তাহার কৈফিয়ৎ আমি কাহাকেও দিতে বাধ্য নহি।

যেখানে প্রবৃত্তির উদ্দামতাকে বাধা দিবার জন্য কোন উচ্চ বৃত্তির অনুশীলন অথবা কোন প্রকার শাস্তির ভয় নাই, সেখানে যে উহা চরিত্রকে অসংযত ও তুর্নীতপরায়ণ করিয়া তোলে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমাদের জীবন এরূপ দ্বিধা বিভক্ত হওয়াতে অধিকাংশ স্থলেই যে নিরুপদ্রবে পাপাচরণ করিবার সুযোগ ঘটিতেছে ইহা বলিবার আর আবশ্যক নাই।

ইহার কুফল নিবারণ জন্য ও বালকদলের নৈতিক উৎকর্ষ সাধন জন্য গ্রামে গ্রামে Foot ball ও Cricket Club এর পরেও ছোট ছোট সমিতি সৃজন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। Foot ball ও Cricket clubগুলিকে উহার অঙ্গীয় করিয়া নেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

(ক্রমশঃ)

বিক্রমপুর

দ্বিতীয় বর্ষ	জ্যৈষ্ঠ ; ১৩২১	২য় সংখ্যা

সংস্কৃতশাস্ত্রে বাঙ্গালী

শুভক্ষণে প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর আদিশূর কণোজ হইতে গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। এবং শুভক্ষণে মহারাজ শ্যামল বর্ম্মা বাঙ্গলাদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কালক্রমে পূর্ব্বকথিত ঋষি-কল্প ব্রাহ্মণসন্তানগণ বাঙ্গলাদেশের নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়েন। বর্ত্তমান সময়ের রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বঙ্গের উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব, দক্ষিণ সর্ব্বত্রই বাস করিতেছেন।

হিন্দুশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, সংস্কৃত ভাষা দেব ভাষা বলিয়া আখ্যাত। এই দেব ভাষা প্রথমে কি ভাবে কোন্ সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে, ইতিহাস তাহা অবধারণে অক্ষম। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর আদি গ্রন্থ ঋক্‌বেদ এই ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং পৃথিবীর আদি সভ্য সমাজ এই দেব ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ ; শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি সহস্রাধিক উপনিষদ্ ; সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন ; মাহেশ পাণিনি, কলাপ, মুগ্ধবোধ, সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতি ব্যাকরণ ; রামায়ণ, মহাভারতাদি কাব্য ; ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, বিষ্ণু, মার্কণ্ডেয়, স্কন্দ, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণ ; সম্বর্ত্ত, যাজ্ঞবল্ক প্রভৃতি সংহিতা ; রঘু, কুমার, ভট্টি, মাঘ প্রভৃতি কাব্য ; শকুন্তলা, উত্তররামচরিত, বীরচরিত্র, মালতীমাধব প্রভৃতি নাটক ; চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ; পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কাদম্বরী প্রভৃতি কথাগ্রন্থ ; গর্গসংহিতা, সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্র, শঙ্করভাষ্য, শ্রীভাষ্য, শারীরকভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্য ; যাস্কের নিরুক্ত প্রভৃতি নিরুক্ত,

গান্ধর্ব্ববেদ এবং নারদীয় শিক্ষা প্রভৃতি সঙ্গীত শাস্ত্র, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, কুলার্ণব, যোগিনী, ব্রহ্ম যামল, রুদ্র যামল প্রভৃতি তন্ত্র শাস্ত্র এইরূপ অগণ্য মহামূল্য রত্নহারাবলী যাঁহাদের কর্ত্তৃক গ্রথিত হইয়াছে বাঙ্গালী রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত কিনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করার চেষ্টা হইবে।

আমরা বাঙ্গালী, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ আমাদের জন্ম যে মহামূল্য রত্নরাশি, মহামূল্য সম্পত্তি, রাখিয়া গিয়াছেন, অকৃতী আমরা আলস্যবশতঃ তাহার তত্ত্বানুসন্ধানও করিতেছি না ইহা অল্প পরিতাপের বিষয় নহে।

কয়েক জন বৈদ্য-কুল-তিলক বাঙ্গালীও যে সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহাও এ প্রবন্ধের আলোচ্য। ফলতঃ ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, মহারাজ বল্লালসেন, কুল্লুক ভট্ট, ভবদেব ভট্ট, পশুপতি, হলায়ুধ-ভট্ট, জীমূতবাহন, শ্রীধরস্বামী, জয়দেব, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, অর্জ্জুনমিশ্র, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, দেবীবর, বাচস্পতি মিশ্র, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণানন্দ, গদাধর ভট্টাচার্য্য, জগদীশ তর্কালঙ্কার, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, উদয়নাচার্য্য, শঙ্করমিশ্র, গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, কান্তভট্ট, পুরুষোত্তম তর্কালঙ্কার, শূলপাণি, শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম, শ্রীকৃষ্ণ বা কেশবমিশ্র, চক্রপাণি দত্ত, কবিকর্ণপূর, বিশ্বনাথ কবিরাজ, শ্রীপতিদত্ত, ভরতমল্লিক, ত্রিলোচন দাস, রূপগোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, বল্লভাচার্য্য, জীব গোস্বামী, উমাপতিধর, শরণ, গোপীনাথ তর্কাচার্য্য, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, পূর্ণানন্দ গিরী প্রভৃতি বাঙ্গালী মহাপুরুষগণ তাঁহাদের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের দ্বারা বাঙ্গলাদেশকে ও বাঙ্গালী জাতিকে সভ্য-জগতে সুপরিচিত করিয়াছেন। তাঁহারা কে, কোন্ সময়ে, কোন্ বংশে জন্ম ধারণ করিয়া আমাদিগকে কি কি মহামূল্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। আমার ক্ষুদ্র শক্তি এইরূপ বৃহৎ কার্য্যের উপযুক্ত না হইলেও পূর্ব্বপুরুষদের গুণগরিমা কীর্ত্তন পুণ্যকার্য্য ও অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ কঠিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলাম; পদে পদে আমার ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা; সুধীগণ ঔদার্য্যগুণে ভ্রম সংশোধন করিয়া বাধিত করিলে কৃতার্থ হইব।

আমরা সর্ব্ব প্রথমে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-কুল-তিলক কুল্লুকভট্টের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কুল্লুক ভট্ট

রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্র ভূমি এখন "বাঙ্গলা" দেশ বলিয়া খ্যাত। বাস্তবিক ঐ প্রদেশগুলি একই রাজ্যের আংশিক খণ্ডের বিভিন্ন নাম মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যে একই বাঙ্গালীজাতির অন্তর্গত তাহা বলা বাহুল্য। কুল্লুক ভট্ট রাজসাহী জিলার অন্তর্গত নন্দনাগ্রামে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণবংশে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দিবাকর ভট্টের ঔরসে খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রে কুল্লুকের পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় নিম্নলিখিত রূপে বিবৃত আছে। যথা :—
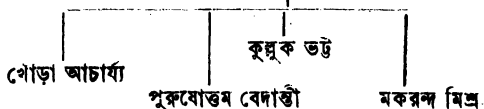
এই মৌন ভট্ট মহারাজ বল্লালসেনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি মহারাজ বল্লালসেন হইতে নন্দনা গ্রাম ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া নন্দনা গ্রামে বাস করেন। তদনুসারে তদ্‌বংশীয়েরা নন্দনা বাসী গাই বা "নান্‌সী" গাই বলিয়া খ্যাত হন। কুল্লুক ভট্ট পরে "গুয়া খরা" গ্রামে বসতি করেন। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কুল্লুক ভট্টের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় কুলীনদিগের কৌলিন্যের শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেবীবর ঘটক যেরূপ মেল বন্ধন করেন উদয়নাচার্য্যও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের পরিবর্ত্ত প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলের নিয়ম বন্ধন করেন। উদয়নাচার্য্যের রচিত "ভাদুড়ী কুলবংশাবলী" নামকগ্রন্থ এবং অন্যান্য বারেন্দ্র-কুল-শাস্ত্র অনুশীলন করিলে উদয়নাচার্য্য খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। পরবর্ত্তী লঘু ভারত প্রভৃতি গ্রন্থাদিও ঐ মত সমর্থন করে। সুতরাং উদয়নাচার্য্যের শিক্ষাগুরু কুল্লুক ভট্ট ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত কাউয়েল, অধ্যাপক মেক্‌ডনেল প্রভৃতির মতে কুল্লুক ভট্ট খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। নবদ্বীপচন্দ্র গৌরচন্দ্র খৃঃ ১৪৮৫ অব্দে আবির্ভূত হন। সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য গৌরাঙ্গ দেবের সহাধ্যায়ী সুতরাং রঘুনন্দনও খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। রঘুনন্দন তৎকৃত উদ্বাহতত্ত্বাদি গ্রন্থে কুল্লুক ভট্টের মত নিজ মতের সমর্থন জন্য পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। কুল্লুক ভট্ট পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক হইলে ঐরূপ কুল্লুক ভট্টকে নিজ মত সমর্থন জন্য প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা স্বাভাবিক নহে। বারেন্দ্র-কুল-শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে কুল্লুক ভট্টের সমসাময়িক অন্যান্য বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের পরস্পর তুলনায় কুল্লুক ভট্ট খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়াই ধার্য্য হয়। "গৌড় ব্রাহ্মণ" প্রণেতা মহিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এবং "সম্বন্ধ-নির্ণয়" প্রণেতা লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতেও কুল্লুক ভট্ট চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন সুতরাং পাশ্চাত্য মনীষীদের মতের সহিত কুল্লুক ভট্টের আবির্ভাব সময় সম্বন্ধে আমরা ঐক্যমত হইতে পারিলাম না। এবং আমাদের ঐ সম্বন্ধে মতই বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করি।

কুল্লুক ভট্ট "মন্বর্থ মুক্তাবলী" নামে মনুর এক টীকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই মন্বর্থ মুক্তাবলী গ্রন্থই কুল্লুক ভট্টকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে এবং এই টীকা গ্রন্থ লিখিয়া তিনি বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। কুল্লুক ভট্টের টীকার পূর্ব্বে মেধাতিথির ও গোবিন্দ রাজের দুই খানি মনুর সুন্দর টীকা গ্রন্থ আছে। ঐ উভয় টীকাই কুল্লুকের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু কুল্লুক ভট্টের টীকা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রতীচ্য ও প্রাচ্য সমুদয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই মনু পাঠ না করিলে সংস্কৃত অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ মনে করেন, এবং মনু পাঠ করিতে হইলে কুল্লুক ভট্টের টীকা ভিন্ন মনু পাঠও অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত অধ্যাপক মেক্‌ডনেল "কুল্লুক ভট্টের মনুর টীকা বিশদ টীকা বলিয়া ও কুল্লুক গোবিন্দ রাজের টীকাই সংকলন বা অপহরণ করিয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "The most famous commentary on Manu is that of Kulluk Bhatta, composed at Benares, in the fifteenth century, but it is nothing more than a Plagiarism of Govinda Raj, a commentator of the twelfth century." (A History of Sanskrit literature by Prof. Macdonell—page 429) মেকডনেলের মতে "কুল্লুক ভট্টের মনুর টীকাই মনুর টীকাগ্রন্থ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে গোবিন্দরাজ যে মনুর টীকা লিখেন কুল্লুক ভট্ট খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বানারস বসিয়া সেই গোবিন্দরাজের টীকাই অপহরণ বা সংকলন করিয়া নিজ টীকা গ্রন্থ লিখিয়াছেন।" বাস্তব পক্ষে অধ্যাপক মেক্‌ডনেলের এই মত আমরা বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করি না। গোবিন্দরাজের টীকা, মেধাতিথির টীকা এবং কুল্লুক ভট্টের টীকা একত্র পাঠ করিলেই সুধীবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, অধ্যাপক মেক্‌ডনেলের কথা সমর্থিত হইতে পারে না। মেধাতিথি ও গোবিন্দ রাজের টীকা যে কুল্লুক ভট্ট পাঠ করেন নাই এমত নহে এবং কোন কোন বিষয়ে তিন টীকাকারের একই মত হইতে পারে কিন্তু তজ্জন্য যে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীর গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন এ কথা গ্রাহ্য নহে। মেক্‌ডনেল সাহেব তাঁহার পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন "Sir W. Jones was, however, the pioneer of Sanskrit studies in the West." অর্থাৎ সার উইলিয়ম জোন্‌সই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মধ্যে সংস্কৃত অধ্যয়ন সম্বন্ধে প্রথম পথপ্রদর্শক।

মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্‌স্‌ কুল্লুক ভট্টের টীকা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তদ্দ্বারাও অধ্যাপক মেক্‌ডনেল্‌ মহাশয়ের মত সমর্থিত হইতেছে না। সার উইলিয়ম জোন্‌স্‌ কুল্লুক ভট্ট কৃত মনুর টীকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "That it is the shortest yet the most luminous, and the least ostentatious yet the more learned, the deepest yet the most agreeable commentary ever composed on any author, ancient or modern, European or Asiatic." অর্থাৎ কুল্লুক ভট্ট কৃত মনুর টীকা মনুর অপরাপর টীকা হইতে সংক্ষিপ্ততম অথচ অতিশয় পরিষ্কার ও উজ্জ্বল, ইহা একেবারেই বাগাড়ম্বরহীন অথচ পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ, গাম্ভীর্য্যতম অথচ হৃদয়গ্রাহী। কি প্রাচীন কি আধুনিক কালের ইউরোপীয় কি আসিয়াবাসী কোন গ্রন্থকারের কোন গ্রন্থের এইরূপ বিশদ টীকা আর রচিত হয় নাই। *

কুল্লুক ভট্ট পরিণত বয়সে বোধ হয় 'মন্বর্থ মুক্তাবলী' গ্রন্থ লিখিয়া থাকিবেন কারণ এই টীকা গম্ভীর গবেষণা ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ অথচ তিনি কাশীবাসী হইয়া এই টীকা লিখেন। মন্বর্থ মুক্তাবলীর একটী অনতিদীর্ঘ ভূমিকা গ্রন্থকার গ্রন্থপ্রারম্ভে ৫টী শ্লোকে লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, সাধু দেশ পূজিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে গৌড় দেশে নন্দনা গ্রামে দিবাকর ভট্টের ঔরসে তাঁহার জন্ম। পণ্ডিত মণ্ডলীর হিতার্থ কাশী ক্ষেত্রে গঙ্গাতীরে বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে বাস করিয়া তিনি এই 'মন্বর্থ মুক্তাবলী' রচনা করিলেন। কুল্লুক ভট্ট তাঁহার নিজ পরিচয় প্রদানার্থ উপক্রমণিকায় নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিয়াছেন।

"গৌড়ে নন্দনবাসীনাম্নি সুজনৈর্ব্বন্দ্যো বরেন্দ্র্যাং কুলে
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লুকভট্টোঽভবৎ।
কাশ্যাং মুত্তরবাহীজহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈঃ
তেনেয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিদুষাং মন্বর্থমুক্তাবলী।"

মন্বর্থ মুক্তাবলী লিখার উদ্দেশ্য তিনি এই শ্লোকে "হিতায় বিদুষাং" এই এক কথায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভগবৎ-কৃপায় তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

---

* ধরণীধরের একখানা, সায়নাচার্য্যের মাধবী নাম্নী একখানা, নন্দরাজকৃত একখানা, মন্বর্থচন্দ্রিকা, কামধেনু নামে অপর দুইখানা সাধুর টীকা বর্ত্তমান আছে কিন্তু কুল্লুকের মনুর টীকা এই সমুদয় টীকা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

কুল্লুক ভট্টের অধস্তন বংশধরদিগের পরিচয় আমি এখনও অবগত হইতে না পারায় এই প্রবন্ধে তাঁহাদের নাম ধামাদি লিখিতে পারিলাম না তজ্জন্য দুঃখিত ও লজ্জিত আছি। বারেন্দ্র-কুল-শাস্ত্রে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকাই আমার এই অসামর্থ্যের কারণ। কোন বারেন্দ্রকুলাচার্য্যের নিকট অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইতে পারিলে অথবা কোন বারেন্দ্রকুলজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ দয়া করিয়া আমাকে কুল্লুক ভট্টের পরবর্ত্তী বংশধরদিগের বংশাবলী অবগত করাইলে পাঠকবর্গকে তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিতে বাসনা করি।

কুল্লুক ভট্টের ভ্রাতা পুরুষোত্তম বেদান্তীর বংশ তাহেরপুরের রাজবংশ এবং অপর ভ্রাতা "খোড়া ভট্টাচার্য্যের" সন্তান মনোড়ার ভট্টাচার্য্যগণ বটেন। ফলে মন্বর্থমুক্তাবলী এবং কুল্লুক ভট্ট কৃত যমসংহিতার টীকা কুল্লুক ভট্ট ও তদ্ ভ্রাতাগণের বংশধরদিগের অমূল্য সম্পত্তি এবং কুল্লুক ভট্টের গ্রন্থ সমুদয় বাঙ্গালী-জাতির গৌরব।

আমরা কত লোকের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে অগ্রসর হই অথচ কুল্লুক ভট্টের ন্যায় মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার্থ অন্ততঃ আমরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কি দায়ী নহি ?

শ্রীকামিনীকুমার ঘটক।

কৃতজ্ঞতা

নৈরাশ্য আঁধারে ঢাকা হৃদয়ের দ্বার,
সহসা গিয়েছে খুলে কাহার পরশে ?
নির্জ্জীব জীবনে তব জীবন-সঞ্চার
কার করুণায় হ'ল একটী নিমেষে ?

তৃষিত নিদাঘে আহা! তৃষিত পরাণে,
কার স্নেহ বারিধারা আসিল নামিয়া ?
হ'ল স্নিগ্ধ দগ্ধ প্রাণ, প্রেম-প্রতিদানে
কে তোমারে দিল স্নেহ আপনা ভুলিয়া ?

সংসার-আবর্ত্তে পড়ি, দারিদ্র্য-পীড়নে,
লক্ষ্যহারা আঁখি-নীরে ভেসেছিলে যবে,
কে তোমারে অলক্ষিত প্রীতি-আলিঙ্গনে
করেছিল আপনার—তিলেক না ভেবে ?

চিরসাথী জীবনের সুখে দুঃখে তুমি
ভুলি না তোমারে যেন কভু অন্তর্যামী।

৯ই বৈশাখ, ১৩২১।

শ্রীযোগানন্দ গোস্বামী

বালকগণের শিক্ষা ও শিক্ষক

আমরা যাহা কিছু করি, যাহা কিছু দেখি, শুনি বা ভাবি তৎসমুদয়ই আমাদের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এবং তাহাদের প্রভাবানুযায়ী আমাদের চরিত্র গঠিত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পুনঃ পুনঃ করা যায়, তাহাই অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায়। অভ্যাসই চরিত্রে বিশেষত্ব আনয়ন করে। কোন বিষয়ে অভ্যাস দৃঢ় করা একটু কঠিন। পরন্তু একবার অভ্যাস হইয়া গেলে উহার উচ্ছেদ সাধন অতীব কঠিন; অনেক সময় উহা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার কোন বিষয় বাল্যে অভ্যাস করা যত সহজ হয়, পরবর্ত্তীকালে তত সহজ হয় না। বাল্যে যে অভ্যাস গঠিত হয় তাহা পরিত্যাগ করা বড়ই শক্ত। অনেক কৃচ্ছ্রসাধনের পর বাল্যের কোন দুরভ্যাস দূর করিয়াছি বলিয়া মনে ভাবিতেছি, কিন্তু অল্প সময় মধ্যেই উহার পুনরাবর্ত্তন দেখিয়া হয়ত নিরাশ হইতেছি।

এ সকল বিষয় চিন্তা করিলে কেহই অতি শৈশব হইতে পুত্রকন্যার চরিত্র গঠনে মনোযোগী না হইয়া পারেন না। অনেক পিতামাতাই হয়ত ইচ্ছা করেন সকলে তাহার পুত্রকন্যাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে প্রশংসা করুক, কিন্তু সেই প্রশংসা লাভের জন্য তাহাদের কোনরূপ চেষ্টা দেখা যায় না।

সকলেই জানি অনুকরণ শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। জ্ঞানতঃই হউক আর অজ্ঞানতঃই হউক, সর্ব্বদাই আমরা অনুকরণ করিতেছি ও অনুকৃত হইতেছি। তথাপি একবারও সতর্ক হইতেছি না—কি জানি পাছে আমাদিগকে

অনুকরণ করিয়া কেহ কোন কুঅভ্যাসের বশবর্ত্তী হয়। সাধারণতঃ বালকগণ পিতামাতা ও তৎস্থানীয়দিগের, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ভগ্নী ও শ্রদ্ধেয় প্রতিবেশিগণের অনুকরণ করিতে তৎপর হয়।

অনেক সময় সমবয়স্কদিগের স্বভাবের অনুবর্ত্তন অজ্ঞাতসারে করিয়া ফেলে। যখন যে সংসর্গে যায় সেখানকার রুচি, ভাব ও ভাষা তাহাদের উপর একটু না একটু প্রভাব বিস্তার করিবেই।

বিভিন্ন সংসর্গের প্রভাব একে একে অলোচনা করিলে বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আশা করি।

বালকগণের চরিত্র-গঠনে পিতামাতার দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অথচ অনেকেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিলে, মিথ্যা কথা বলা হইল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। দু' একটা উপদেশের কথা বলিলেই যদি বালকগণের চরিত্রের ঐশ্বর্য্য বাড়িত, তাহা হইলে এ বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন কখনও হইত না। অনেকেই পুত্রকন্যাকে সত্য কথা বলিতে উপদেশ দেন, কিন্তু কি করিয়া সত্য কথা বলিতে হয়, কি করিলে যথার্থ সত্য ব্যবহার করা হয়, তাহা দেখাইবার অবকাশ অনেকেরই ঘটে না। তাহাদিগকে সত্য বলিতে ও ব্যবহার করিতে আমরা যথেষ্ট সুযোগ দেই বলিয়াও মনে হয় না। অথচ শৈশবাবধি মিথ্যা বলিবার অভ্যাস ও নানারূপে নিজের ত্রুটী ও দোষ ঢাকিবার চেষ্টা কিরূপে নীতি ও চরিত্র বিকৃত করিয়া তোলে তাহা আমরা সকলেই জানি।

তাহার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিলে অতি অল্প ছেলেকেই বিনয় ও দৃঢ়তা সহকারে বলিতে শুনিয়াছি, "আমি মিথ্যা বলি না"। সত্যকথা বলিবার অভ্যাস জন্মাইতে পিতা অপেক্ষা মাতার দায়িত্ব হয়ত একটু বেশী। সকল বিষয়ই পূর্ব্বে মায়ের চোখে পড়ে। সন্তানের সুপ্রবৃত্তিগুলির বিকাশ-জন্য মাতার অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

অনেক সময় মাতা পুত্রকন্যাদিগের প্রতি অতিরিক্ত আদর প্রদর্শন করেন। যিনি যথার্থ স্নেহশীলা, যিনি পুত্রের প্রকৃত কল্যাণকামী, তাঁহাকে আর স্নেহ প্রদর্শন করিতে হয় না। তাঁহার শাসনের মধ্যে মায়ের করুণ স্নেহ, তিরস্কারের মধ্যে মায়ের ব্যথিত হৃদয়ের অভিমান, শত কঠোরতার মধ্যে মায়ের ব্যাকুল যত্ন সন্তান মাত্রেই অনুভব করিতে পারে। কিন্তু যেখানে আদর প্রদর্শন অধিক,

সেখানে হৃদয় দেখিবার ও অনুভব করিবার অবসর কম। কাজেই আদুরে ছেলেগুলি শৈশবের পরে মাতার অবাধ্য ও নানা কুক্রিয়াপ্রবণ হইয়া উঠে। সহিষ্ণুতার সহিত স্নেহশীলা মাতার যত্নে উহাদিগকে পালন করিবার শিক্ষা ক'জনের দেখা যায়? খুব ক'রে খাওয়াইলেই ছেলেপেলের প্রতি আদর যত্ন দেখান হয় না; এবং পৃষ্ঠোপরি মুষ্টি পতনেই উহাদের যথেষ্ট শাসন হয় না। আমার ছেলে আমার কথা শুনিবে না এ অভিমানে ক'জন মায়ের চোখ ছলছল হ'য়ে উঠে? যে মায়ের এরূপ অভিমান থাকে তাঁহার ছেলে কোন কালেও অবাধ্য ও অশান্ত হয় না।

আমার ত্রুটির জন্য আমার পুত্রের মুখ নত হবে, এ বিশ্বাসে ক'জন পিতা পূর্ব্ব হইতেই ছেলের চরিত্র-গঠনে সতর্ক হয়? আমার পুত্র আমার ব্যবহার দেখে হয়ত মিথ্যা ব্যবহার, মিথ্যা কথা শিখিবে, এ আশঙ্কায় ক'জন রমণী নিজ গৃহ-দ্রব্যের ক্ষতি গণনা না করিয়া প্রতিবেশীর নিকট সত্য বলিতে প্রস্তুত হন? আমার অনুদারতা আমার পুত্রকন্যার চরিত্র বিকাশে প্রতিবন্ধকতা করিবে এ ভাবনায় ক'জন পিতা মাতা, আত্মীয় পরিজন ও প্রতিবেশীর প্রতি সদয় ব্যবহার, রোগে শুশ্রূষা ও তাহাদের অভাবে মুক্ত হস্তে দান করেন? ক'জন পিতা ক'জন ভ্রাতা নিজ বিনয় ব্যবহার দ্বারা পুত্র ও ভ্রাতাকে বিনীত হ'তে শিক্ষা দেন? কাজেই বালকগণের অবিনয়, অনুদারতা ও পদে পদে সত্যের অবমাননা দেখিয়া আমরা দুঃখিত হই, বিস্ময়াবিষ্ট হই না। 'সদা সত্য কথা বলিবে ও অবিনয়ী হইবে না' ইত্যাদি উপদেশের কথা অনেক বালকই শৈশবে পড়িয়া থাকে; কিন্তু কি করিয়া সত্য কথা বলার অভ্যাস করিতে হয়, কিরূপ ব্যবহারে বিনয় প্রদর্শন হয় তাহারা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। যাহারা এ উপদেশ দেন তাহাদের অনুকরণ মাত্র করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত থাকে। কি করিলে কতকগুলি সৎ অভ্যাস শৈশবে উহাদের অজ্ঞাতসারে দৃঢ় হইয়া উঠে প্রত্যেক পিতামাতারই সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সত্য কথা বলা, বিনয়ী হওয়া, উপযুক্ত পাত্রে সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি কয়েকটী সদ্‌গুণ শৈশবে আরোপিত হইলে, উহা উত্তর কালে ঐ বালকের চরিত্রে অমিত বল সঞ্চয় করিবে। দুই চারিদিন সত্য কথা বলিয়াছে, তাহাতেই

সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। যতদিন এ অভ্যাস দৃঢ় না হয় ততদিন পিতা-মাতার সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যখন কোন কিছু করিবার ভঙ্গী আমাদের সুপরিচিত ও সহজ হইয়া দাঁড়ায় তখনই উহাকে সুপরিণত অভ্যাস বলিতে পারা যায়। অনেক সময় ভয়ে অথবা নানা বাহ্য কারণে আমরা কোন বিষয়ে অভ্যস্ত হই। সেইরূপ অভ্যাসের হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে অনেক সময় ইচ্ছা হয় এবং কখনও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে আমাদের তেমন অস্বস্তি বোধ হয় না। যাহাতে সদভ্যাসগুলির জন্য একটা সহজ গর্ব্ব বালকদের মধ্যে থাকে আমাদের তাহাও দেখা উচিত। তাহা হইলে ঐ অভ্যাসের ব্যতিক্রম ঘটিলে উহাদের ভয়ানক অস্বস্তি বোধ হইবে ও অনুশোচনা আসিবে। যাহাতে উহা হইতে কখনও বিচ্যুত হইতে না হয় তজ্জন্য নিজেরাই চেষ্টা করিবে।

বাল-সুলভ-চঞ্চলতায় অনেক সময়ে উহারা গৃহে অনেক জিনিষ নষ্ট করে, তখন অনেক সুগৃহিণীরই ধৈর্য্য-বিচ্যুতি ঘটে এবং অবোধ বালককে যথেষ্ট লাঞ্ছনা দেন। এই শাস্তির ফলে, অন্য কোন সময়ে কোন দোষ, ত্রুটি তাহাদের অগোচরে করিয়া ফেলিলে বালকগণ সহজে স্বীকার করে না। এরূপ ভাবে দিনের পর দিন, একটী ত্রুটি ঢাকিতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। একটী মিথ্যাকে ঢাকিতে বহু মিথ্যার রচনা করে। সত্য কথা বলিবার একটী মাত্র অভ্যাস সৃষ্টি করিতে পারিলে উহাদিগকে বহুবিধ পাপ ও প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইয়া পড়ে। ভুল ত্রুটি সকলেরই হয়। গৃহ-দ্রব্য একবার নষ্ট হইয়া গেলে, ছেলেকে তিরস্কার করিলে কি প্রহার করিলে উহার উদ্ধার সাধন হইবে না। ইহার জন্য রাগ করিয়া ছেলের মধ্যের আর একটী ভাল জিনিষকে নষ্ট করা কি উচিত? তখন ছেলেকে তিরস্কার পর্য্যন্ত না করিয়া সে ক্ষতি নীরবে সহ্য করাই ভাল। তাহাকে একটু করুণ স্বরে বুঝাইয়া দিলে, কোন ভুল ত্রুটির জন্য সে আর মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে না; যাহাতে সেরূপ ভুল না করে তজ্জন্য সাবধানও হয়।

জিনিষটী নষ্ট করিয়া ফেলিবে এই ভয়ে কোন প্রতিবেশীকে হয়ত পুত্রের সম্মুখেই বলিতেছি, 'সেটী তো ঘরে নাই'। হয়ত অজ্ঞ পুত্রটী বাবাকে কি মাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, 'না, উহাত ঘরের কোণেই আছে আমি

খুঁজিয়া আনি', তখন হয়ত পিতামাতা তাহাকে ধমকাইতেছেন, এবং এরূপ মিথ্যা বলায় যে দোষ নাই তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন। সেই ছেলেটী অন্য সময়ে এরূপ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবে না এরূপ আশা করাই অন্যায়। প্রতিদিন এমন শত ক্ষুদ্র বিষয় হইতে আমাদের পুত্রকন্যাগণ শিক্ষা পাইতেছে—ইহা মনে করিয়া চলিলে অনেক উপকার হয়। যদি কখনও সাংসারিকতার খাতিরে ওরূপ ব্যবহার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা যাহাতে পুত্রকন্যাগণের অসাক্ষাতে হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। পিতা-মাতা ও অন্যান্য পরিজনের আচার ব্যবহারের তারতম্যে বালকদের স্বভাব কিরূপ বিভিন্ন হয় তাহার একটী কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত এস্থলে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

একবার একটী গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছি। সে বাড়ীর পাঠশালায় দুটী ৭৷৮ বৎসর বয়স্ক ছেলে পড়ে। একদিন শুনি পাঠশালা হইতে বাহির হইয়া একটী অপরটীকে বলিতেছে "দেখ পণ্টু, আজ যেয়ে তোর মার কাছে বলিস্ যে তুই ক্লাসে প্রথম ছিলি। আমিও আমার মার কাছে বল্‌ব।" পণ্টু উত্তর করিল, "কেন?" অপর বলিল "তা'হ'লে তোর মা তোকে খুব ভাল বল্‌বে, আর খুব আহ্লাদ ক'রে খাবার দিবে।" পণ্টু এবার বলিল "যা' মিথ্যা কথা যে।" অপরটী একটু তিরস্কারের স্বরেই বলিল "আরে তাতে কি বোকা! একটুখানি মিথ্যা কথা কইলে কি হয়?" পণ্টু এবার সবলে উত্তর করিল "যা' আমি মিথ্যা কথা কইতে পার্‌ব না।" তখন উভয়ে বাড়ীর দিকে চলিল। আমার কৌতূহল বড়ই বাড়িল; পরে সমুদয় জানিলাম। পণ্টু নাকি বাড়ী যেয়েই মাকে একটু নালিশের সুরে বলিতে-ছিল "মা, দেখত, নধা আমাকে খামকা খামকা মিথ্যা কথা শেখায়।" মা জিজ্ঞাসায় সমুদয় জানিয়া পুত্রকে বলিলেন "হাঁ, ঠিকইতো, মিথ্যা কথা বল্‌বে কেন? আজ পড় নাই, কাল ভাল করে পড়িলেই তো প্রথম হতে পার্‌বে।"

তার পর এ দুই পরিবারের লোকদিগের ব্যক্তিগত চরিত্র ও দুই মায়ের চরিত্র ও ব্যবহার সবিশেষ জানিতে পারিয়াছিলাম। ঐ ঘটনার পর হইতে উহাদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলাম। অবশেষে এক

দিন উভয়কে নির্জ্জনে পাইয়া নানা আলাপ জুড়িয়া দিলাম। মাঝখানে জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানে কমলা পাওয়া যায় না ?" উভয়েই বলিল "না, এখন পাওয়া যায় না।" আমি "তোমাদের কমলা পেলে খেতে ইচ্ছা হয় ?" উভয়ে "হাঁ"। আমি "রামবাবুর বাগানে একটা যে কমলা গাছ,আর তার মধ্যে যে কমলা পাকিয়া আছে ; এই এত বড় বড় লাল টুক্ টুকে। তোমাদের খেতে ইচ্ছা করে ?" উভয়ে "হাঁ, খুব ইচ্ছা করে।" আমি "কি করে খাবে ?" সহসা পল্টুর দিক ফিরিয়া শুধু তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরের বাগান কি ক'রে অন্‌বে" ? পল্টু "চা'ব, যদি দেয়।" আমি "না দিলে"। "আর কি করব"। আমি "সাম্‌নে তো কেউ নাই, কার কাছেই বা চাবে ?" পল্টু "পরের বাগানেরটা না চেয়ে আন্‌লে চুরি হবে যে ?" তখন নধার দিকে চাহিলাম উত্তরের অপেক্ষায় বলিলাম "তুমি কি কর ?" নধা "আমি করি কি, চারিদিক দেখি, যদি দেখি যে কেউ নাই, তারপর আস্তে আস্তে গাছে উঠি। পট্ পট্ কমলা ছিড়ে খাই আর 'টোফর' ভরি। তারপর দেখি যে সাম্‌নে আর কেউ নাই, তখন তাড়াতাড়ি গাছের থেকে নেমেই এক দৌড়ে বাড়ী আসি। আর মার কাছে কমলাগুলি দেই।" আমি 'তোমার মা যদি জিজ্ঞাসা করেন কোথায় এগুলি পাইলি ?" উত্তর "বল্‌ব, কিনে এনেছি"। আমি "যদি জিজ্ঞাসা করেন পয়সা কোথায় পাইলি।" উত্তর "বল্‌ব যে স্কুলের একজনের কাছে পয়সা পাইতাম সেই পয়সা দিয়া কিনেছি।" আমি "তার নাম কি যদি জিজ্ঞাসা করেন।" উত্তর "একজনের নাম বলে দিব, মাতো ওপাড়ার মুসলমানদের কাউকে চিনেন না।" আমি কিছুকাল বিস্ময়াবিষ্টের মত চাহিয়া রহিলাম।

দুইটী বালকের শিক্ষার এরূপ পার্থক্যের জন্য কে দায়ী তাহা আর না বলিলেও চলে। আমি নধার সঙ্গে আরো অনেক আলাপ করিয়াছি, তাহাতে তাহার প্রকৃতিটী যে বেশ সরল ইহা অনুভব করিয়াছি। ন্যায় অন্যায় বিচারের ক্ষমতাও আছে। মিথ্যাকে এরূপ ভাবে পাইয়া বসিবার অভ্যাস হয়ত অশিক্ষা বা বিকৃত শিক্ষার ফল।

সমবয়স্ক বালকদের মধ্যে সময় সময় অতি সামান্য কারণে ঝগড়া হয়। সেই ঝগড়াতেও অনেক সময় বালকের মাতা কিম্বা বর্ষীয়সী আত্মীয়া কেহ ছেলের পক্ষ সমর্থন জন্য আসিয়া উপস্থিত হন। তাদের ছেলেটী যে কোন দোষ করিতে

পারে না তাহা নানা ভাবে বলিতে থাকেন। ছেলের পরিণাম নষ্ট করিবার মত এমন আর একটী সহজ উপায় আর নাই। ইহাতে ছেলে যে দোষটুকু করিয়াছে তাহা যে দোষ সেটুকু সে কোন কালেই বুঝিবে না। অনেক সময় প্রকাশ্যে সমর্থন না করিয়াও, ছেলেকে সান্ত্বনা দিবার ছলনায় বলিয়া বসি, "ওরা ভারি খারাপ, ওদের সঙ্গে যাস্ কেন?" ইহাতেও ঐ রকম দোষই ঘটে। নিজের ত্রুটির দিকে দৃষ্টি পড়ে না। নিজের ত্রুটি দেখিবার অনভ্যাসেই দুর্নীতির প্রথম জন্ম। সেখানে যদি মাতা বা কোন অভিভাবক ছেলেকে বলেন "এক কাঠি কখনও বাজে না, তোমারও নিশ্চয় কোন দোষ আছে; ওরা মিছামিছি তোমার সাথে ঝগড়া করিতে আসিবে কেন? ফের এরকম ঝগড়া হইলে আমি তোমাকেই সাজা দিব।" তখন কেহ কেহ আত্ম দোষ যে অতি অল্প সেটুকু বলিয়া ফেলে। না বলিলেও ঝগড়ার জের মিটাইতে আসিয়া এরূপ ধমকে নিজের প্রতি একটু দৃষ্টি না পড়িয়া পারে না। আমার দোষ কোথায় দেখিবার জন্য একটা গোপান অনুসন্ধান চলে। ইহার পর হইতে সে যে কোন কাজই করুক না কেন, নিজের দোষ আছে কিনা, ভালরূপ না দেখিয়া মায়ের নিকট যাইতে সাহস পায় না। অতি শৈশবে এইরূপে যে আত্মানুসন্ধানের বীজ উপ্ত হয় তাহাই পরিণত বয়সে তাহাকে সকল প্রলোভনের প্রথম আঘাতেই সচকিত করিয়া তোলে। ঐরূপ প্রলোভনের প্রভাব দৃঢ় হওয়ার পূর্ব্বেই উহা দমন করিবার চেষ্টায় তাহার সামর্থ্যের কখনও অপ্রাচুর্য্য ঘটে না।

মানুষ হবার পক্ষে বালক কালের কল্পনাকেও বাদ দিলে চলে না। সেও যে একদিন পৃথিবীর কাজে আসিবে, খুব বড় হইবে, এরূপ একটা কল্পনা থাকায় অনেক উপকার হয়। বড় হবার পক্ষে যে যে গুণ প্রয়োজন তাহা আরও করিতে চেষ্টিত হয়। ক্ষুদ্রতা ও অনুদারতা বর্জ্জনেরও প্রয়াস করে। একটী বলিষ্ঠ মানুষ উহার অন্তরে প্রতিষ্ঠান খুঁজিতে থাকে। নিজের অবস্থা, সহায়, সুবিধা ভুলিয়া আশার রাজ্য ফাঁদিয়া বসে। সেখানে চেষ্টার উল্লাসে ও মানুষ হবার উগ্র আকাঙ্ক্ষায় অনেক ক্ষুদ্র প্রলোভন আসিয়া বিমুখ ফিরিয়া যায়। নিজের মধ্যে মানুষটীকে নিয়া নিজে পরিতৃপ্ত থাকে। ছেলেদের কল্পনাকে বহিঃসংসারের লেনাদেনায় ফেলিয়া নির্দ্দয় ভাবে পেষণ করিলে একটী ব্যবসায়ী বিষয়ী, অথবা অর্জ্জনপ্রিয় কল তৈরি করা চলে কিন্তু মানুষ করা চলে না।

প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় সংসারের সকল লাভ ক্ষতি, অভাব অভিযোগের মধ্যে ছেলেকে টানিয়া তাহার সহজ স্ফূর্ত্তিকে ম্রিয়মাণ করিয়া দেওয়া, শত অভাবক্লিষ্ট পরিবারের অক্ষম অভিভাবকদের নিত্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের ছেলেদের লেখা পড়ার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন, পারিবারিক অভাব মোচন, তাহারা ইহাই মাত্র জানেন; কিন্তু উহার উদ্দেশ্য যে মনুষ্যত্ব বর্জ্জন নহে ঐ দিকে তাহাদের খেয়াল থাকে না। যে পদস্থ, যাহার ঘরে প্রচুর অর্থসংস্থান আছে, তাহার নিকট নত হইয়া চলা, তাহাদের পাপাচারে, দম্ভে, উপেক্ষায় যদি হৃদয় মন ক্ষুণ্ণ হয় তবু তাদের সম্মান করা, তাহাদের শত অবহেলা বহন করিয়াও, হাসি মুখে তাহাদের মতানুবর্ত্তন করা, শতবার অপমানিত হইয়াও, ইঙ্গিত মাত্র তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াই যেন ছেলেদের একান্ত কর্ত্তব্য। ছেলেদের মধ্যে যে মানুষটী জাগিয়া উঠিতেছিল, নিজকে সাহস দিতেছিল—তুমিও তো মানুষ, তোমার চরিত্র চেষ্টা ইহাদের অপেক্ষাও অধিক, অগ্রসর হও ইহাদের অপেক্ষা গরীয়ান্ হও—অভিভাবকদের এই হীনতা, অভিমানবোধশূন্যতায়, উহা যে অনেক স্থলেই পঙ্গু হইয়া পড়ে, ইহা আমরা অহঃরহঃ দেখিতেছি।

আজ কাল ক'জন অভিভাবক তাহার ছেলেকে অতি শৈশব হইতে শিক্ষা দেন—

বরমসি ধারা, তরুতলে বাসো, বরমপি ভিক্ষা বরমুপবাসো,
বরমপি ঘোরে নরকে পতনং ন চ ধনগর্ব্বিতবান্ধবশরণং ॥

[বর্ষার বৃষ্টিপাত, তরুতলে বাস, ভিক্ষা, উপবাস এমন কি ঘোর নরক বাস বরং বরণ করিবে তথাপি ধনগর্ব্বিত বান্ধবের শরণ লইবে না। ধনগর্ব্বিত ব্যক্তিরা প্রায়ই অপরের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানে না। অভিমানকে ঐশ্বর্য্যের পদে লুণ্ঠিত দেখিবার পূর্ব্বে নরকে বরং স্থান মাগিয়া লইও।] এরূপ অভিমানই আমাদিগকে নানা প্রকার হীনতা হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম। আমাদের দেশের অতি হীনাবস্থার লোকের মধ্যেও এরূপ অভিমান অনেক স্থলে দেখিয়া গৌরব বোধ করিয়াছি। কোন এক গ্রামের জমিদারের বাড়ী সে দিন মহাসমারোহে নিমন্ত্রণ। তাহাদের সিকদারগণ সকলেই কাজ করিতেছে। কোথাও কাজে কিছুমাত্র ত্রুটি বা অবহেলা হইতেছে না। বেলা তখন ৩।৪ টা, জমিদার বাবু জানিলেন, কেশব, তাঁহাদের এক পুরাতন সিকদার, এ বাড়ী খাইবে না।

সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে জল গ্রহণ পর্য্যন্ত করিতে অস্বীকৃত। উহাকে ডাকাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশব বলিল, "কর্ত্তা, আমার নিমন্ত্রণ হয় নাই। কেহ আমাকে নিমন্ত্রণ করে নাই। আজ নিমন্ত্রণের বাড়ীতে আমি খাইতে পারিব না।" জমিদার মহাশয় ইহাতে উষ্ণ না হইয়া ধীরে বলিলেন, "আমার একটা ভুল হইয়াছে বলিয়া তুমি আমার মনে এরূপ একটা কষ্ট দিবে।" কেশব কর্ত্তার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "কর্ত্তা আমি তো আপনার পায়ের জুতা। সর্ব্বদাই হাজির আছি। আর এ বাড়ী তো আমারই। কোন কাজের ত্রুটি দেখিলে, আমাকে মন্দ বলিতে পারিতেন। আমি না ডাকিতে আপনিই তো সব দিন এসে খাই। আজ নিমন্ত্রণের দিন আমারে মাপ দিতে হইবে। এই হুকুম আমি মানিতে পারিব না।" জমিদার মহাশয় নিজেই পরাজয় স্বীকার করিলেন ও কেশবকে বলিলেন, "আচ্ছা দিনের বেলা না হয় না খাইলে। আমি এখনই অভয়কে (পূজারী) পাঠাইতেছি, সে তোমাকে তোমার বাড়ীতে যাইয়া রাত্রিতে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে।"

এরূপ সহজ অভিমান ছেলেদের মধ্যে সুকৌশলে জাগাইয়া তোলা ও পোষণ করিতে অবসর দেওয়ার চেষ্টায় আমাদের সকলেরই দৃষ্টি রাখা উচিত। অতি ছোট বেলায়ও উহা সময় সময় বেশ পরিস্ফুট হয়। একটী ৩॥ বৎসরের ছেলে দূরে কপাটের আড়ালে দাড়াইয়া কাঁদিতেছে। পিতা খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে কাঁদিস্ কেন?" পুত্র "তুমি আমাকে খেতে ডাক, আমি তোমার সঙ্গে খাব।" তৎপূর্ব্বে বড় ভাইটী "বাবা আমি তোমার সঙ্গে খাই" বলিয়া বসিয়া গিয়াছে। তদবধি তিনি পরিবারের প্রত্যেককে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, যেন উহাকে কোন ভুল ত্রুটির জন্য তিরস্কারাদিও না করা হয়। (এই ঘটনার বিষয় আমি এক বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি।)

আর একটী ঘটনা বেশ শিক্ষাপ্রদ বলিয়া এখানে সন্নিবেশ করিলাম। আমার কোন বন্ধু তার গ্রামের স্কুলে নবম শ্রেণীতে অঙ্ক পরীক্ষা নিতেছেন। একটী ৮ বৎসরের ছেলে সে ক্লাশে নূতন ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহার অঙ্ক কষিবার ক্ষিপ্রতা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া সে প্রায়ই ভুল করায় বড়ই কম নম্বর পাইল। ছেলেটী তার নিকট বাড়ীতে একটু আব্দার পাইত। সেই সাহসে নম্বর বেশী দিবার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি

ছেলেটীকে বলিলেন "আচ্ছা, কত নম্বর চাও ? প্রথম হ'তে পার এত নম্বর দিয়ে দিই। কিন্তু যদি অন্যান্য ছেলেরা বলে যে তুমি ভিক্ষা করে প্রথম হয়েছ, তাতে কিন্তু আমার দোষ নাই।" তৎক্ষণাৎ সে বলিয়া উঠিল "না কাজ নাই, ফেল হই তাও ভাল, তবু ভিক্ষা চাই না।" সবল মানুষটী তখন পরীক্ষা ফেলের বিপদকে কিরূপ সহজে উপেক্ষা করিল ইহা ভাবিতে কাহার না আনন্দ হয় ?

যাহারা ছেলেকে মানুষ তৈয়ারি করিতে চেষ্টা না করিয়া সুধু উপার্জ্জনক্ষম দেখিতে চান, তাহারা উত্তর কালে সেই পুত্র দ্বারাই উপেক্ষিত হন। যে ধনাহরণ জন্য অপরের তোষামোদ করিতে কখনও দ্বিধা বোধ করে নাই, নিজের মর্য্যাদানাশে একদিনও নিভৃতে অশ্রুমোচনের অবকাশ পায় নাই, তাহার সমুদয় বিচারবুদ্ধি যদি সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারে তজ্জন্য আমরা নিতান্তই আশ্চর্য্য হইব না। অর্থই মানুষের মূল্য নিরূপণ করে না, এরূপ উপদেশ ক'জন অভাবগ্রস্ত অভিভাবক ধীর চিত্তে দিতে পারেন ? উপবাস সহ্য করিও তবু হীনতাকে আশ্রয় করিও না, একথা যে অভিভাবক তাঁহার নিজ চরিত্রে ও ব্যবহারে ছেলেকে বুঝাইয়া দেন, তাহার ছেলে প্রকৃতই একটী তেজস্বী মানুষ হইয়া উঠে। যাহারা পুত্রকে কৃতবিদ্য ও প্রতিষ্ঠাবান্ দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহাদের নিজেদেরও নিষ্ঠাবান্, উদার, সংযমী ও অভিমানী হওয়া আবশ্যক। অতি দরিদ্রের ছেলেরও যে সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান পাইবার দাবী থাকিতে পারে, তজ্জন্য ৺ঠাকুরদাসের পুত্র বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্তের পরে অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয় না। বিদ্যাসাগরকে অমিতপ্রতিভাবান্, একমাত্র দৃষ্টান্ত বলিয়া কেহ আপত্তি করিলে—আমরা আরও বহু দৃষ্টান্ত এখানে দিতে পারি। বাহুল্য ভয়ে এখন বিবৃত করিতে বিরত রহিলাম।

অনেক অভাবগ্রস্ত পরিবারের বালককেও পরদুঃখকাতর ও দানে মুক্তহস্ত দেখা যায়। সে স্থলে অনেক অভিভাবকই ছেলেকে বড় উৎপীড়ন করেন। নানারূপ ব্যঙ্গোক্তি করিয়া তাহার ঐ সুকুমার ভাবটীকে নষ্ট করিয়া ফেলেন। ওরূপ না করিয়া তিনি যে অভাবহেতু তাহার এরূপ দান সমর্থন করিতে পারিতেছেন না তজ্জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া ছেলেকে বিরত করিতে পারেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্ত।

পণ্ডিত ৺অদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্ন

প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত স্বর্গীয় কালীকান্ত শিরোমণি মহাশয়ের পর পণ্ডিত অদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্নের ন্যায় বিক্রমপুরে অপর কোন পণ্ডিতই সর্ব্ববাদীসম্মত প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ১৭৪৯ সকের ২৩শে চৈত্র বিক্রমপুরস্থ ফুরশাইল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় হাতে খড়ি হইবার পর ইনি পয়সা গাঁ নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ৺পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ এবং বিখ্যাত স্মার্ত্ত পুরাপাড়া নিবাসী ৺দীননাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরে নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ ৺রামনাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে অধ্যয়ন শেষ করিয়া ন্যায়রত্ন উপাধি লাভ করেন। ভাগ্যকূলস্থ জমিদারবর্গের আদি-পুরুষ ৺গুরুপ্রসাদ রায় মহাশয়ের আনুকূল্যে ইনি হুগলী জেলার বলাকরের প্রাচীন পণ্ডিত ৺জগদানন্দ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হ'ন।

শিক্ষা।

বাসগ্রামে আসিয়া বিদ্যাদানের জন্য এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলে পর নানাস্থান হইতে বহু বিদ্যার্থী আসিয়া অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ন্যায়রত্ন মহাশয় বিদেশী ছাত্রগণকে আহার ও বাসস্থান প্রদান করিয়া বিদ্যাদান করিতেন। উত্তরকালে সেই সকল ছাত্রের মধ্যে অনেকেই সংসারে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এখানে ঐ সকল পণ্ডিতগণের কাহারো কাহারো নাম উল্লেখ করা গেল। বিক্রমপুরের অধুনাতন প্রধানতম স্মার্ত্ত (কলিকাতা প্রবাসী) কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মহেশ্বরদির জগচ্চন্দ্র স্মৃতিভূষণ, ময়মনসিংহ রাম-গোপালপুরের রাজ-পণ্ডিত মহেশ্বর সিদ্ধান্তরত্ন, কালীপুরের সভাপণ্ডিত বরদাকান্ত ন্যায়বাগীশ প্রমুখ শত শত কৃতি ছাত্রগণ দেশ-বিদেশে যশোগান করিতেছেন।

পণ্ডিতা রমাবাই ও মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, প্রভৃতি অনেক মহাত্মা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাটীতে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন।

কৃতিত্ব।

ইনি সুদীর্ঘকাল পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসর পর্য্যন্তও রুগ্নাবস্থায় ইনি গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক সংস্কৃত উপাধি ও মধ্য পরীক্ষার পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপ বিবুধজননী সভায় উপাধি পরীক্ষায় তথায় উপস্থিত থাকিতেন।

ইনি উদারচেতা সরলমতি ও ধর্ম্মবীর ছিলেন। ভাগ্যকূলের ভাগ্যবান ভূম্যধিকারিগণ ইঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

১৮২৯ শকের ৪ঠা পৌষ তারিখে ৮০ আশী বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন। বিক্রমপুরের মৃত প্রসিদ্ধগণের নামের সহিত ইঁহার নাম চিরদিন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বিক্রমপুরে "আওর গাওর"

মুন্সীগঞ্জ সবডিভিসনের অধীনস্থ প্রসিদ্ধ পাইকপাড়া গ্রামের দাক্ষণে খিলপাড়া গ্রাম অবস্থিত। উক্ত খিলপাড়া গ্রামের পূর্ব্ব অংশেই আমাদের প্রবন্ধোক্ত আলোচ্যস্থান বিরাজমান। মিরকাদিমের প্রসিদ্ধ খাল এই আওর গাওরকে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। যাহারা ঐ খাল দিয়া যাতায়াত করে উক্ত স্থান দুইটী তাহাদের নিকট সুপরিচিত।

বহুদিন যাবতই 'আওর গাওর' এর নাম লোকমুখে শুনিয়া আসিতেছি এবং এতৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকিয়া যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিলুম। 'আওর গাওর' দুটী ক্ষুদ্র প্রাচীন দীঘিমাত্র, পরস্পর প্রায় পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত। আওরের দীঘি গাওর দীঘির কয়েকপা দূরে ইহার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বিদ্যমান। আওর দীঘি এখনও সম্পূর্ণরূপে ভরাট হয় নাই;—চৈত্র বৈশাখ মাসেও তথায় জল থাকে কিন্তু দীঘিটী দলঘাসে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্নাবস্থায় আছে। গাওর দীঘি কাল-

---

* প্রত্যেক বিক্রমপুরবাসী তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রামের মৃত পণ্ডিতগণের ও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের জীবনী লিখিয়া পাঠাইলে আমরা তাহা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিব। বিঃ সঃ

প্রভাবে ভরিয়া গিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী শস্যক্ষেত্রের সহিত প্রায় সমতল হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে গাওর বা গাউয়ারের নামটীই বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ কিন্তু আওর বা আউয়ার নামটীও গাওর বা গাউয়ারের সঙ্গে সঙ্গে লোক মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়; এতদ্ব্যতীত আওর এর আর কোনও প্রকার বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় না।

পূর্ব্বে এই দুইটী স্থানের নামই লোকে ভক্তিভাবে স্মরণ করিত ও পবিত্র জ্ঞানে তথায় পূজা দিত। এখন একমাত্র গাওরই লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে—আওরের অনুসন্ধান কেহই করে না।

স্থানীয় প্রবীণ বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন যে এই গাওর দীঘিতে পূর্ব্বে হিন্দুরা অতি জাঁকজমকের সহিত ছাগমহিষাদি বলি দিয়া পূজা দিত। এখনও হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই এখানে দুগ্ধ দিয়া থাকে। কেহ কেহ মিষ্টান্ন ফলমূল এমনকি টাকা পয়সা পর্য্যন্ত দিয়া যায়। দুগ্ধ দিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট তারিখ নাই—সংবৎসরের মধ্যে যে কোনও দিন উহা দেওয়া যায়, তবে সাধারণতঃ শনি কি মঙ্গলবারেই অধিক লোকের সমাগম হয়। বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতেও লোকে এখানে আসিয়া দুগ্ধাদি প্রদান করিয়া থাকে।

বর্ষাকালে উক্ত গাওর দীঘির সীমার মধ্যে যে কোনও স্থানের জলেই লোকে দুধ ঢালিয়া দেয় কিন্তু বর্ষা অন্তে যখন জল শুকাইয়া যায়, তখন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের মাটী আপনাআপনিই ফাটিয়া উঠে, তথায়ই লোকে দুধ ঢালিয়া দিয়া যায়। এখানে যে কেবলমাত্র গাভী দুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ প্রভৃতি ঢালিবার প্রথাই আছে এমন নয়,—সময় সময় স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধও দিতে দেখা যায়। স্থানীয় লোকেরা সময়ে সময়ে তথায় পান সুপারি সিন্দূর প্রভৃতিও দিয়া থাকে।

এস্থানে এত দুধ পড়ে যে স্থানটী অবিরত আর্দ্রই থাকে। প্রক্ষিপ্ত-দুগ্ধের কতকাংশ মৃত্তিকাতে শুষিয়া যায়, অবশিষ্টাংশ পশু পক্ষীরা পান করিয়া থাকে। প্রদত্ত মিঠাই ও টাকা পয়সা প্রভৃতি রাখাল বালকেরা সযত্নে কুড়াইয়া লয়। বর্ষা অন্তে যখন জল শুকাইয়া যায়, তখন উক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানটী চিনিতে কোনও আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, কারণ

দুগ্ধপানোন্মত্ত কুকুরের চীৎকারে ও কাকের কলরবে স্থানটী সদাই মুখরিত থাকে।

এস্থানের জল ও মাটী বড়ই পবিত্র বোধে ভক্তিভাবে গ্রহণ করতঃ লোকে সযত্নে বাটী নিয়া যায় এবং ঘর বাড়ীতে উহা ছড়াইয়া দেয়। এরূপ করিলে বাটীতে কোনও প্রকার রোগ প্রবেশ করিতে পারে না, এই বিশ্বাস। এই স্থানের জল ও মাটী একত্রে গুলিয়া গরুকে খাওয়াইয়া দেওয়ার প্রথা আছে; ইহাতে নাকি গাভী রোগশূন্য হইয়া বলিষ্ঠ হয় এবং অধিক দুগ্ধ দেয়। উক্ত ফলের প্রত্যক্ষতার প্রমাণ স্থানীয় লোকের অনেকেই স্বীকার করিয়াছে। তাহারা আরও বলে যে—উক্ত স্থানের মাটী ও জল একত্রে গুলিয়া স্ত্রীলোকের স্তনে প্রলেপ দিলে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় এবং স্তনথুম্‌কা প্রভৃতি স্তনরোগ উক্তপ্রকার প্রলেপে সহজেই সারিয়া যায়।

বিবাহাদি শুভকর্ম্মের পূর্ব্বে স্থানীয় লোকেরা—কখনও কখন দূরবর্ত্তী লোকেও—এখানে বাদ্যাদি সহযোগে পূজা দিয়া থাকে। এরূপ ভাবে কত দিন হইতে যে এই স্থানে লোকে পূজা দিতেছে ও দুগ্ধাদি প্রদান করিয়া আসিতেছে তাহা কেহই নির্দ্দিষ্টরূপে বলিতে পারে না,—তবে যাহা চলিত প্রবাদ বলিয়া পাইয়াছি তাহাই আমরা সর্ব্বসাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করিলাম :—

(১) প্রবীণ প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন যে কত দিন যাবত এইস্থান এরূপ ভাবে পূজ্য ও পবিত্র বিবেচিত হইয়া আসিতেছে তাহা বলিবার জো নাই তবে তাহারাও নাকি শৈশবে শুনিয়াছেন যে মিরকাদিমের খালের উপর বল্লাল সেনের ইষ্টক নির্ম্মিত পুল কি উক্ত খাল কাটাটা যেন সে দিনকার কথা; ইহার বহু পূর্ব্বে এখানে এক মুনি কঠোর তপঃ সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি সিদ্ধিবলে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সাধন করিতে পারিতেন। তাঁহার নাম কেহই বলিতে পারে না। ক্রমে তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যাবলী ও নাম দেশ-বিদেশে প্রচার হইয়া পড়ে। নাম শুনিয়াই লোকে তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিত এবং বিপন্মুক্তি বা মনস্কামনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে উক্ত মুনিকে লক্ষ্য করিয়া অনেকে মানত করিয়া অভীষ্ট ফল লাভ করিত।

জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রায় বার্দ্ধক্য উপনীত। সংসারে স্ত্রী ভিন্ন তাহার বিপুল ধনসম্পত্তি ভোগের নিমিত্ত আর কেহই ছিল না। নিঃসন্তান বলিয়া বৃদ্ধ-দম্পতি বড়ই মনঃকষ্টে কাল যাপন করিতেছিল। ঘটনাচক্রে উক্ত ধনীব্যক্তি একদিন হঠাৎ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় মুনির নামে এরূপ মানত করিয়া বসিল –"যদি আমার দুটী পুত্র সন্তান হইত তবে আমি একটী ঐ মুনির নামে উৎসর্গ করিতাম।"

ভগবানের চক্র বুঝা ভার। যথাসময়ে উক্ত বৃদ্ধ দম্পতির ক্রমে ক্রমে দুইটী পুত্র প্রাপ্তি ঘটিল কিন্তু পুত্রমুখ দর্শন করিয়া তাহার মোহমুগ্ধ মন পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গেল। মুনি এ ঘটনার অনেক পূর্ব্বেই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া ভগবানের অঙ্কে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল -মানতের কথা ধনীর আর মনে নাই। উক্ত ব্যক্তি সস্ত্রীক পুত্রদ্বয়সহ ঘটনাচক্রে গাওর দীঘির উপর দিয়াই বর্ষাকালে নৌকাযোগে শ্বশুরালয়ে যাইতেছিল। যাইতে যাইতে—হঠাৎ নৌকা থামিয়া গেল—আর নড়েও না; জলও তথায় তখন কম ছিল না, কাজেই নৌকা ঠেকিবারও কোনও সম্ভাবনা নাই, অথচ মাঝিদের অক্লান্ত পরিশ্রমেও নৌকা আর নড়ে না। এইরূপে দিবারাত্রি পার হইয়া গেল—পরদিনের মধ্যাহ্নও প্রায় অতিবাহিত হইয়া চলিল, নৌকা তবু এক পাও নড়িল না। আরোহীবৃন্দ অনাহারে বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে—বিশেষ ছেলে দুটীর মুমূর্ষাবস্থা। পিতা কারণ চিন্তায় নিমগ্ন—তখন সে শুনিতে পাইল কে যেন বলিতেছে—"এইত সেই গাওর দীঘি, পুত্রোৎসর্গের প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গিয়াছ, মানত আদায় না করিলে এ যাত্রা আর কাহারও রক্ষা নাই।" বৃদ্ধের সকল কথা মনে পড়িল—সেও বেশ বুঝিল যে যদি মানত আদায় না করা হয় তবে আর রক্ষা নাই; অমনি স্ত্রীকে সব খুলিয়া বলিলেন, স্নেহপ্রবণা মাতা পুত্র-শোকে চীৎকার করিয়া উঠিল কিন্তু শোক করিলে কি হইবে? একটী—না দিলে যে দুটীই যায়।

এদিকে বৃদ্ধ পিতা পাষাণে বুক বাঁধিয়া মায়ের কোল হইতে দ্বিতীয় ছেলে-টীকে কাড়িয়া লইয়া জলে ফেলিয়া দেয়; দিবা মাত্রই নৌকা আপনাআপনিই ছুটিয়া চলিল—দেখিতে দেখিতে ছেলেটী ডুবিয়া গেল। শোকার্ত্ত দম্পতির

মর্ম্মভেদী করুণ বিলাপে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ এই অশরীরিবাণী বৃদ্ধ দম্পতির কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল—"তোমরা আর বৃথা শোক করিও না; তোমাদের পুত্র আমার অঙ্কে স্থান পাইয়াছে; সে এখন আমার—তত্ত্বাবধানে আছে, তোমাদের এই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে লোকে চিরকাল ভক্তিভাবে দুগ্ধাদি প্রদান করিয়া প্রতিপালন করিবে।" সেই নিক্ষিপ্ত ছেলে-টীকে লক্ষ করিয়াই লোকে আজ পর্য্যন্তও দুগ্ধাদি প্রদান করিতেছে।

(২) পুরাকালে এই গাওর দীঘির পারে একটী দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, কে উহার স্থাপয়িতা তাহা সকলেরই অবিদিত। উক্ত দেবী মূর্ত্তির নাম ছিল "গাওরঠাইন"। এই "গাওরঠাইন" গরু বাছুর ও ছোট ছোট ছেলেপিলের রক্ষাকর্ত্রী দেবী। গর্ভবতী গাভী কি গর্ভস্থ বৎসের অথবা প্রসূতী বা ভ্রূণের কোনও অনিষ্ট না হয় এবং যথাসময়ে সুপ্রসব হয় এই উদ্দেশ্যেই উক্ত দেবীকে লক্ষ্য করিয়া এখানে দুগ্ধাদি মানত করা হয় ও তাহাই এখানে দেওয়া হয়।

(৩) "আওর গাওর, তিন পাড়ে দেওয়ার।" প্রসিদ্ধ রামপাল দীঘির কিছু পশ্চিমে 'দেওয়ার' নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে—উহার বর্ত্তমান নাম 'দেওসার'। উক্তগ্রামে একটী বিস্তীর্ণ দীঘি এখনও বিদ্যমান আছে—উক্ত দীঘিটী দেখিলেই মনে হয় যে, কোনও কারণে উহার খনন কার্য্যটা শেষ হয় নাই। দেওসারের দীঘি এখান হইতে প্রায় ১ঘণ্টার পথ। কথিত আছে যে, আওর, গাওর ও দেওসারের দীঘি তিনটী এক রাত্রিতেই নাকি খনন করা হয়। একই রাত্রে এরূপ তিনটী দীঘি খনন করা আজ কালকার দিনে অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কোনও যোগবলবিশিষ্ট মুনি নাকি দৈববলে ইহা সম্পন্ন করিয়াছেন।

(৪) আওর ও গাওর দুটী হিন্দু দেব ও দেবীর নাম,—সম্পর্কে ভাই ভগ্নী। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে গাওর দীঘিতে বর্ষান্তে প্রচুর পরিমাণে কৈ, শিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি মৎস্য পাওয়া যায়। এই মৎস্যের উদ্দেশ্যে প্রায় ৮।৯ বর্ষ পূর্ব্বে স্থানীয় জনৈক মুসলমান উক্তস্থানে (যথায় দুধ দেওয়া হয়) একটী পুকুর খনন করাইতে আরম্ভ করে। পুকুরটী প্রায় ৯।১০ হাত গভীর করা হয়। যথা-সময়ে উহার খনন-কার্য্য শেষ হইয়া গেলে পর কর্ম্মক্লান্ত মাটিয়ালদল (খনন-কারিগণ) পাড়ে বসিয়া আরামে তামাকুপানে লিপ্ত থাকে; অকস্মাৎ পুকুরের মধ্যস্থল হইতে এক ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হয়। শব্দ এত গভীর হইয়াছিল যে

স্থানীয় লোকেরা ব্যাকুলচিত্তে ব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত সভয়ে তথায় দৌড়িয়া দেখিতে আসে। আসিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে সকলেই দেখিল যে প্যাড়ের মাটী সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পুকুরটী একেবারে ভরিয়া গিয়াছে এবং উক্ত স্থানটী প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়ই ভরাট অবস্থায় আছে। বিধাতার বিধান কে বুঝিবে? অতঃপর আর কেহই উহা খনন করাইতে সাহস করে নাই।

আমাদের কথা :—দুগ্ধাদি প্রদানার্থ দূরগ্রামাগত লোকের সহিত সময়ে সময়ে উক্তস্থানীয় দখলকার ও অন্যান্যের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। আগন্তুক স্থান নির্দ্দেশে অসমর্থবিধায় পার্শ্ববর্ত্তী আবাদীক্ষেত্রের একটু আধটু অপচয় করিয়া বসে, বাগ্‌বিতণ্ডার ইহাই একমাত্র কারণ হইয়া পড়ে। এস্থানটুকুর সীমা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক একটা বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত করতঃ যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি খালের সীমা পর্য্যন্ত একটা রাস্তা করিয়া দেন তবে জনসাধারণের বিশেষ উপকার হয় ও অতীত স্মৃতির রক্ষণহেতু তাঁহার নামও চিরকাল লোকের মুখে মুখে ঘুরিয়া অমর হইয়া থাকে। এই অমরকীর্ত্তি লাভার্থ স্থানীয় জমিদার ও সহৃদয় ব্যক্তিবৃন্দের দৃষ্টিপাত প্রার্থনা করিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

জীবনযাত্রায় দিক্ নির্ণয়

জগৎমাতার অঙ্গে অঙ্গে নবীনতার নিত্য-নিদর্শন শত সহস্র সজীব সুষমা স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি মায়ের সমস্ত লীলা-চাঞ্চল্য অতিক্রম করিয়া তাঁহার বার্দ্ধক্য ধরিয়া ফেলিয়াছে। পৃথিবীর শিলাস্থিপঞ্জরের পরতে পরতে নাকি তাহার বয়ঃসমষ্টির অঙ্কপাত দেদীপ্যমান। এ বয়সের আবার "গাছ পাথর" নাই, কিন্তু তবু পৃথিবীর কুত্রাপি জড়তার কোন জীবিত-চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না। সর্ব্বত্রই যেন মুক্ত প্রাণের ফুল্ল চাপল্যের উদ্দামপ্রবাহ সদা বর্ত্তমান।

পৃথিবীর এ চাঞ্চল্য কাহারও ভাবিয়া বুঝিতে হয় না। যে কোন সময়ে যে কোন জায়গায় দাঁড়াইয়া আমরা দেখিতে পাই যেন সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ শত সহস্র

কর্ম্মস্রোত মিলিত হইয়া এক মহাস্রোতে পরিণত হইয়াছে। আর এ মহাস্রোত আপন বিশালতায় আপনি বিস্মিত হইয়া, প্রচণ্ড বেগের দুর্দ্দান্ত আঘাতে সমস্ত বিশ্ব ব্যাকুল করিয়া হেলিয়া দুলিয়া কোন্ এক অজানিত দেশের পানে অবিরাম অবিশ্রাম ছুটিতেছে। ইহা ভিন্ন পৃথিবীর দৈহিক আর একটা গতি আছে, তাহা আহ্নিক ও বার্ষিক গতি বলিয়া কথিত। পৃথিবী আপনা আপনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এইরূপ অস্থির হইয়া কেবলই ঘোরে বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহার নাম রাখিয়াছেন জগৎ। এ বড় মজার স্থান। এখানে যে আসিবে তাহাকেই ঘুরিতে হইবে, স্রোতমাঝে নিক্ষিপ্ত গলিত-পত্রের ন্যায় আমরা পৃথিবীর সংস্পর্শে আসিতে না আসিতেই একটা গতি প্রাপ্ত হই এবং কেবলই ঘুরি। চলিয়া ফিরিয়াও ঘুরি, ঘুমঘোরেও ঘুরি, জানিয়া বুঝিয়াও ঘুরি, না জানিয়া না বুঝিয়াও ঘুরি!

পৃথিবীর এই চঞ্চল গতি এবং সুস্থির মতি দেখিয়া আমাদের স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে সে তাহার শ্রেয়ঃ জানিয়াছে, গন্তব্যপথ চিনিয়াছে, তাই অভীষ্ট-সিদ্ধির অবাধ আনন্দ-প্রবাহ দিকে দিকে প্রবাহিত করিয়া আবেগভরে ছুটিয়া চলিয়াছে।

গতি বলিতেই গন্তব্য স্থান এবং তাহার অবস্থানের দিক্‌টা স্বতঃই আমাদের মনে আসিয়া উদিত হয়। চলিতে হইলেই আমাদিগকে ঠিক করিতে হইবে যে কেন কোথায় যাইতেছি এবং কোন্ দিকে যাইতেছি। বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন জীব এই সব ঠিক না করিয়া এক পাও চলিতে পারে না। এ বিষয়ে যে যতটা উদাসীন হইবে ব্যর্থ জীবনের নিদারুণ লাঞ্ছনা তাহাকে ততটা বেশী ভোগ করিতে হইবে।

পৃথিবী আজ কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া চলিতেছে। তাহার অবিরাম গতির কোন বিরতি নাই; একাগ্রতার হ্রাস বৃদ্ধি নাই; পন্থা-পরিবর্ত্তনের কোন ব্যগ্রতা নাই; দিন, মাস, বর্ষ ধরিয়া একই নিয়মে একই গতিতে একই ভাবে চলিতেছে। প্রাণারাধ্যের দর্শনজনিত উদ্বুদ্ধ প্রাণের পূর্ণ পরিতৃপ্তি ভুবন ভরিয়া ছড়াইয়া ছড়াইয়া কেবলই ছুটিতেছে।

জীবন-প্রভাতে শীত-সঙ্কুচিতা পৃথিবী যখন ঘোরান্ধকারের ভীম আবর্ত্তে পড়িয়া আকুল প্রাণে ছট্‌ফট্ করিতেছিল তখন উন্মুক্ত-প্রাণ জ্যোতিষ্মান সূর্য্যদেব আপনার কৃপা-কোমল শত সহস্র হস্ত পৃথিবীর অঙ্গে সংবাহিত

করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। সহানুভূতির সুখ-সংস্পর্শে তাহার প্রতি অঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়াছিল।

সেই অবধি পৃথিবী সূর্য্যদেবকে বেড়িয়া বেড়িয়া কেবলই ঘুরিতেছে, আর সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ তাহারি পদে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে, এরূপ একাগ্রতা আছে বলিয়াই আজ পৃথিবীর অঙ্গে আনন্দ যেন ধরে না।

সূর্য্যদেবের রশ্মিমালার প্রথম স্পর্শেই পৃথিবীর দিকে দিকে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। বিহঙ্গবঁধুর কল-কাকলীতে তাহার প্রীতি-সম্ভাষণ গীত হইতে থাকে। তাহার স্বর্ণ-কিরণ রত্ন-ভূষণের সুবিমল-ছটায় দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইয়া যায়! উচ্ছ্বসিত-প্রাণ লতাপত্রের বিলাস-লাস্যে কোমল কুসুমের প্রস্ফুট হাস্যে পৃথিবীর প্রাণের হাসি ফুটিয়া উঠে।

এমন মুক্ত প্রাণের অবাধ উন্মত্ততার মধ্যেও অতৃপ্ত বাসনার বিষাদ-ক্রন্দন শ্রুত হইয়া থাকে। পৃথিবী সমগ্র প্রাণে সমগ্রভাবে সূর্য্যদেবকে ধরিয়া রখিতে চায়, তাই যখন যে অংশে সূর্য্যদেবের করুণা-বরিষণের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তির তিলমাত্র ব্যত্যয় ঘটে পৃথিবীর সে অংশই বিষাদ-কালিমা মণ্ডিত হইয়া পড়ে। যতক্ষণ না আবার সেই করুণা-ধারা সরল সহজভাবে সেই অঙ্গে প্রবাহিত হইয়া যাইবে ততক্ষণ এ দুঃখ দূর হইবে না। সূর্য্যদেবের কৃতজ্ঞ অনুচর শশধর পৃথিবীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার সুধা-স্নিগ্ধ হাসি-রাশি লইয়া পৃথিবীকে সান্ত্বনা দিতে আসে, কিন্তু তাহার বিষাদ-বহ্নির তীব্র তাপে চারু-চন্দ্রের কমহৃদি গলিয়া যায়। সে দেখিতে দেখিতে মলিন হইয়া যায়। কৃতজ্ঞ হৃদয়ের কঠোর কর্ত্তব্য তাড়-নায় রোজই তাহাকে আসিতে হয়, কিন্তু প্রত্যহই তাহাকে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। বহু সাধ্য-সাধনায় মাসান্তে একবার পৃথিবী চন্দ্রকে সুখী করিবার জন্য হাসিয়া উঠেন, কিন্তু সেই হাসির স্রোতেও তাহার বিষাদের কালিমা একেবারে বিধৌত হইয়া যায় না। এমন একাগ্রতা একনিষ্ঠা না থাকিলে কি প্রাণপ্রিয়ের সন্ধানপ্রাপ্তিজনিত অনাবিল আনন্দের সুখ-স্বাদ পাওয়া সম্ভব হয়?

এই যে ভূমানন্দের প্রবল প্রবাহ উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে আমাদিগকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া অশ্রান্ত অক্লান্ত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে ইহাতেও ত আমাদের

প্রাণে ব্যাকুলতার কোন চিহ্ন দেখিতে পাই না। চির আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিয়াও আমরা সদাই নিরানন্দ, হা হুতাশই আমাদের জীবনের সম্বল ; ব্যর্থতাই আমাদের সাধনার সিদ্ধি।

আমাদের জীবনে এমন হওয়াই স্বাভাবিক, আমরা যে জীবনপথের পথভ্রান্ত পথিক। জানি না—জানিতে চেষ্টাও করি না—কেন কোথায় যাইতেছি, কোথায় যাইতে হইবে। সুধু গড্ডলিকাপ্রবাহের মত স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, যদি সময়ে অসময়ে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ হইয়া যায়, স্রোতের বেগে ডুবিয়া যাই তাতে কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নাই, বুদ্ধিশক্তির দোহাই দিয়া আমরা অন্যান্য প্রাণীর উপরে আমাদের আসন নির্দ্দেশ করিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু ব্যবহারে অনেক সময়ে আমরা পশু হইতে বড় উর্দ্ধে আছি বলিয়া মনে হয় না। চোখের সম্মুখে দেখিতেছি যে কত শত লোক অন্ধের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া পাপ-তাপের পঙ্কিল কূপে ডুবিয়া মরিল, মনুষ্যত্বাভি-মানী মানব আমরা শতে শতে সহস্রে সহস্রে সেই একই ভাবে একই কূপে ডুবিয়া মরিয়া মানবজনমের সার্থকতা সম্পাদন করি, ইহার চেয়ে আবার পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে ?

গোড়াতেই দিক্ ভুল করিয়া বসিয়া আছি। পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। এখন কোন দিকে কোন লোককে চলিতে দেখিলেই সেটাকে পথ বলিয়া মনে করি ; এবং তাহার পিছু হাঁটিতে আরম্ভ করি। এরূপে জীবনে শত শত লোকের পথে হাঁটিতে হাঁটিতে তাহাদের মূর্খতা এবং আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতার ফল পদে পদে ভুগিয়া আসিতেছি।

আমাদের বিচিত্র ব্যবহারের কথা ভাবিলে আমরা আপনা আপনিই বিস্মিত না হইয়া পারি না। হয়ত স্থির করিলাম খুলনা যাইব। যাত্রী দলে মিশিয়া পড়িয়া ট্রেণে যাইয়া উঠিলাম, কতক দূরে যাইয়া জানিতে পারিলাম, যে ট্রেণে উঠিয়াছি সেটা গোয়ালন্দ যাইবে, ক্ষুণ্ণ মনে আক্কেল সেলামি প্রদানকরতঃ স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, হয়ত সেবারের খুলনা যাওয়া আমার ঐখানেই স্থগিত রহিল।

মান্দ্রাস্ যাওয়ার জন্য বোম্বে মেলে উঠিয়া নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়া পড়িলাম। বহুক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল। সচকিতে একজন সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"মহাশয়! মাদ্রাস্ আর কতদূর?" উত্তরে সে এমন উচ্চহাসি হাসিল যে তাহার ব্যাঙ্গ-তরঙ্গের প্রত্যেক আঘাত আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম। কোন প্রকারে আত্মগোপন করিয়া এক ষ্টেসনে নামিয়া পড়িলাম, যথাসময়ে পৃথিবী যে গোল তাহা সপ্রমাণ করিয়া যেখান হইতে রওনা হইয়াছিলাম ঠিক সেইখানে ফিরিয়া আসিলাম। যাত্রার দোষেই যে এরূপ হইয়াছে তাহা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে বেশী সময়ের দরকার হইল না, কাজেই যাত্রা পরিবর্ত্তনের জন্য একেবারে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

জীবন ভরিয়া এমন কত যাত্রাই পরিবর্ত্তন করি তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু শিক্ষা ত কিছুই হয় না!

আমাদের সমগ্র জীবনে যে সুধু একটী মাত্র কাজ করিতে হইবে তাহা আমরা ভাবিও না শিখিও না। আমরা আমাদের জীবনটা শত সহস্র খণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া ফেলি। লোকে খণ্ড খণ্ড ইষ্টক গাথিয়া গাথিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইমারত গড়িয়া ফেলে। আর আমরা বাসগৃহের "মাল মসল্লা" একটু একটু করিয়া অপব্যয় করিতে করিতে বাসভূমিকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করিয়া লই! গড়িতে আসিয়া ভাঙ্গিতে বসিয়াছি; তাই জীবনের দুঃখ ঘুচিল না, প্রাণের পিপাসা মিটিল না, জীবনের জ্বালা জুড়াইল না।

জীবনটাকে আমরা কালে কালে ভাগ করি, ক্রিয়ানুযায়ী ভাগ করি, ধর্ম্মানুযায়ী ভাগ করি, এবং আরও এরূপ কত "ভাগাভাগি" আছে তাহার কূল কিনারা নাই।

শৈশবটা ত ঘুমের ঘোরে, মায়ের ক্রোড়ে, খেলা-ঘরে বেশ কাটিয়া যায়। বাল্যকালই বিদ্যোপার্জ্জন এবং উদ্বাহ বন্ধনের সুষ্ঠু সময় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। "উদ্বন্ধন" শব্দটি উদ্বাহবন্ধনের অপভ্রংশ কিনা তাহা ভাষাতত্ত্ববিদেরা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু বর্ত্তমানে বিদ্যোপার্জ্জন এবং উদ্বাহবন্ধনের একত্র সমাবেশ দেখিয়া মনে হয় যেন কোন মহাপুরুষ মানবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আগম নিগমের পথ পাশাপাশি করিয়া রাখিয়াছেন। যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে বাগ্‌বাদিনী বীণাপাণির সেবা করিয়া চঞ্চলা কমলার কৃপালাভ হয় ভালই, নতুবা ঐ উদ্বাহের বন্ধন রজ্জু গলায় বাঁধিয়া প্রেম-পাত্রটী লইয়া সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেই আয়াস-লভ্য নির্ব্বাণ-মুক্তি অনায়াসেই লাভ হইবে।

শৈশব-বাল্যের দশা অতিক্রম করিলে যৌবন আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা যে বয়সেই হউক, তখন অর্থোপার্জ্জন আর বিলাস-ব্যসন; পাছে

"দুদিনের সুখ　　　দুদিনে ফুরায়
দীপ নিভে যায় আঁধারে"

এই ভয়ে আমরা 'হেসে নেই দুদিন বইত নয়'?

ফলে বার্দ্ধক্য তাহার শোকজীর্ণ জরাজীর্ণ অস্থি-চর্ম্ম-সার 'মোহনিয়া' মূরতি লইয়া কঙ্কাল-ঝঙ্কারে নৃত্য করিতে করিতে আমাদের জীবনে আসিয়া আপন আধিপত্য বিস্তার করে। সুবর্ণ-সুযোগ হেলায় হারাইয়া অমূল্য রত্ন অপব্যয় করিয়া ভিখারী সাজিয়া বসিয়া আছি; এখন রোগতাপে অনুতাপে পুড়িয়া পুড়িয়া প্রাণটা রসশূন্য কৃষ্ণ অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে। জীবনের এ ভাগই ধর্ম্মোপার্জ্জন বা ঈশ্বরোপাসনার জন্য পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট থাকে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই এ "মরা নদীতে" কখনও বাণ ডাকে না, অহরহ কেবল মনে পড়ে "শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"। এখানে শ্যামসুন্দরের স্মিত কান্তি অধিকাংশ জীবনেই মরুভূমে পারিজাত-বিকাশের ন্যায় অসম্ভব, পূর্ব্ব-জীবনের ব্যর্থতার ব্যথা আর ভবিষ্য-জীবনের ভাবী ভীষণতার নিদারুণ ছবির মাঝে বর্ত্তমানের বার্দ্ধক্য-দুর্ব্বল মনস্বিতা তিষ্ঠিতে পারে না। কেবলই অস্থি-পঞ্জর ভেদ করিয়া হা হুতাশের সহিত নিরাশার গান বাজিয়া উঠে, তাই বার্দ্ধক্য-বিজড়িত কণ্ঠে কেবলই—

"অসার সংসারে　　　আসা বারে বারে
জানিলাম অন্তরে কেহ কার নয়"

অসার সংসারে গীত হইয়া থাকে।

বার্দ্ধক্যের জন্য ধর্ম্ম রাখিয়া দিয়া আমরা বৃদ্ধের সঙ্গে ধর্ম্মের একটা বাহিক সংস্রব সৃষ্টি করিয়া লইয়াছি। ধর্ম্মের কথা এবং বার্দ্ধক্যের কথা আমাদের একই সময়ে মনে উদিত হয়, কারণ রূপেগুণে উভয়েই এখন অনেকাংশে সমতুল! ধর্ম্মের কথা বলিতেই ক্লেশ-কাঠিন্য-পূর্ণ একখানা কাষ্ঠ-শুষ্ক নীরস ছবি আমাদের নয়নসম্মুখে ভাসিয়া উঠে; আমরা শিহরিয়া উঠি। তাই যাহারা সুখ চায়, যাহারা শান্তি চায়, সজীবতার রস-সম্ভোগে বিভোর থাকিতে চায়

তাহারা সবলে ধর্ম্মকে বার্দ্ধক্যের দিকে বিতাড়িত করিয়া ত্রিকালের জন্য নিশ্চিন্ত হয়।

এরাই কিন্তু আবার ক্ষণপরেই বজ্র-নির্ঘোষে সংসারে অশান্তির কথা, অসুখের কথা, কঠোরতার কথা কহিয়া কহিয়া লোকের কর্ণ বধির করিয়া দেয়।

কেহ বলেন,—সংসার একটা দুর্ভেদ্য-প্রাচীর-বেষ্টিত ভয়ঙ্কর কারাগার! আমরা কৃত-দুষ্কর্ম্মের নিষ্ঠুর নিয়তির অত্যাজ্য ফলভোগের নিমিত্ত এই বন্দিশালে আনীত মায়া-শৃঙ্খলিত জীব।

কেহ বলেন,—তপনের তাপে নিত্য-তপ্ত শৈলা-ভীষণ বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতে সংসার একটা মৃগ-তৃষ্ণিকা, আর আমরা সেখানে তৃষিত তাপিত মোহমুগ্ধ মৃগ!

সংসারের কঠোরতার কথা ছন্দোবন্ধে কতভাবে গীত হইয়া থাকে, যাঁহারা এই ভীষণতার হাতে অব্যাহতি চান তাঁহাদেরই জন্য এই কুলীশ-কঠোর নীরস ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে।

সুপ্রচলিত পদ্ধতি হইতে একটু স্খলিত হইলেই ভীষণ নরক! এই সব হতভাগ্যদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য শত সহস্র বিভীষণ নরক আপনাদিগের বুভুক্ষু উদর পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাদের ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া অহর্নিশি অপেক্ষা করিতেছে।

কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"তব পূজা না আনিলে দণ্ড দিবে তারে
যমদূত লয়ে যাবে নরকের দ্বারে
ভক্তিহীনে এই বলি যে দেখায় ভয়
তোমার নিন্দুক সে যে ভক্ত কভু নয়!"

পথের কঠোরতা এবং নরকাগ্নির নৃশংস চিত্র লোককে সাধারণতঃ ধর্ম্মের পথ হইতে দূরে রাখিতেছে। এই ভীষণতার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের ক্রিয়াশক্তি বিলুপ্ত হইতে থাকে। তাহারা জড়বৎ নিশ্চলভাবে স্রোতের মুখে ভাসিয়া যায়। কেহই জীবনযাত্রায় ধর্ম্মপথে সহজে অগ্রসর হইতে চাহে না। কিন্তু "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—মুক্তির আর পথ নাই, নিত্যধামে যাইবার ইহাই এক মাত্র পথ।

তবে এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি ? আমরা কি সুধু বসিয়া বসিয়া ভীষণতার কথা ভাবিয়া ব্যাকুল হইব ?

আর বসিয়াই বা থাকিব কেমন করিয়া ? আজীবন ব্যর্থতার নিষ্ঠুর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রাণে নিদারুণ জ্বালা অনুভব করিতেছি, আর যে জ্বালা সহে না।

ঐ দেখ নবজাত শিশুটি সংসারের কঠোরতায় ক্লিষ্ট হইয়া কেবলই যেন ছট্‌ফট্ করিতেছে, সে কোন প্রকারেই আপনাকে এ সংসারের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারিতেছে না, তাই সে সময়ে অসময়ে কেবলই কাঁদে, তাহাকে ভুলাইয়া বুঝাইয়া রাখা হয় সত্য ; কিন্তু সে অহর্নিশি কি যেন একটা তীব্র যাতনা অনুভব করে। যখন তাহাকে নীরব নির্জ্জন গৃহকোণে শায়িত রাখা হয় তখন সে স্বপ্নঘোরে তাহার আদিনিবাসের বিচিত্রসৌন্দর্য্য, অফুরন্ত শান্তির ছায়া দেখিতে দেখিতে হাসিয়া উঠে, কিন্তু অচিরেই সে তাহার ভুল বুঝিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়, কেহই তাহার প্রাণের বেদনা বুঝে না।

এইরূপে শিশুকাল কাটিয়া যায়। বাল্যকালে মা আমাদের কি বুঝিয়া জানি না খুব বেশী স্নেহ-মমতা দেখাইয়া থাকেন। আমরা সদাই তাঁহার আদরে সোহাগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকি। কিছুদিনের মধ্যেই দেখি মায়ের স্নেহের উপরে আবার ভাগ বসিয়া যায়। মাও সব দিক সব সময়ে ঠিক রাখিয়া উঠিতে পারেন না। আমরা প্রাণে প্রাণে নিরাশার বেদনা অনুভব করি।

এইরূপে কিছুকাল সুখে দুঃখে কাটিয়া যায়। মা আদর করিয়া আমাদের জীবনের সঙ্গে অন্য একটি জীবনের খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেন। আমরাও প্রাণের আবেগে নূতন সংশ্রবটাকে খুব একটা স্পৃহণীয় বস্তু বলিয়া মানিয়া লই। সেখানে ভাগবণ্টনের গোলযোগের সম্ভাবনা না থাকিলেও সদাই আমরা একটা কল্পিত ভয়ের নিত্য-জাগ্রত মূর্ত্তি দেখিয়া অনেক সময়ে হতাশ হইয়া পড়ি। তাই জীবনের প্রতি পদে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জাতীয় সমগ্রতার 'পরখ' করিতে থাকি। মানুষের ত্রুটী, মানুষের ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। আমাদের জীবনসঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীও আমাদিগকে সমগ্র সুখের অধিকারী করিয়া উঠিতে পারে না। যখন লোকে আমাদিগকে পূর্ণ সুখী মনে করে তখনও আমাদের প্রাণের ভিতরে নিরাশার ভেরী রহিয়া রহিয়া বাজিয়া উঠে।

এই স্বভাবের অভাবটা দূর করিতে হইলে একটা পূর্ণ কিছু চাই। কোন দিকে, কোন ভাবে, কোন বিষয়ে যেন কোন অভাব না থাকে। যতদিনে না এমন কিছু পাইব ততদিন কেবলই কাঁদিতে হইবে।

সুধু সচ্চিদানন্দ প্রেমময় পুরুষেই এতগুলি গুণ সম্ভব। যতদিন না তাঁহাকে সব-চেয়ে-আত্মীয়রূপে প্রাণ ভরিয়া 'আবরিয়া' রাখিতে পারিব ততদিন আমাদের সুখশান্তি ভোগতৃপ্তি সকলই অসম্ভব।

প্রেমময় রস-স্বরূপকে পাইবার প্রয়াসেরই নাম ধর্ম্ম, যে ভাবে তাঁকে চিনিতে পারি, যে ভাবে তাঁকে বুঝিতে পারি, যে ভাবে তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারি তাহাই ধর্ম্ম, তাই ধর্ম্ম ভিন্ন জীবনে আর অন্য কোন পন্থা নাই, এ ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ হইতে অন্ত পর্য্যন্ত চিরকালই চলিবে, ইহার সময়াসময় নাই, জীবনে যাহা কিছু করি তাহা এই ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ রাখিয়াই করিতে হইবে, ইহা ছাড়া কর্ম্ম থাকিতে পারে না। ধর্ম্মহীন জীবন আর অনীশ্বর জগৎ একই বস্তু।

ধর্ম্ম কি কখনও নীরস হইতে পারে? ধর্ম্মকে যাহারা কঠোর বলিবে ধর্ম্ম তাহারা বুঝে না বলিলে কিছুই অন্যায় করা হয় না। রসময় রস-স্বরূপের ধ্যানে, চিন্তায়, কার্য্যে রস না থাকিলে রস থাকিবে কোথায়?

এস আমরা কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ঐ অনন্ত সমুদ্রের প্রেমময় প্রবাহমাঝে আমাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া প্রতি পলে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহারি স্পর্শ অনুভব করি, তাঁহারি গানে কর্ণ তৃপ্ত করি, তাঁহারি রূপ দেখিয়া দেখিয়া আমাদের তৃষিত, তাপিত, সদাবিক্ষুব্ধ, অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করি।

আমাদের জীবনের পথ নির্ণয় করিতে প্রতিনিয়ত তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন, অঙ্গুলি সঙ্কেতে তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে তাঁহারি পানে আহ্বান করিতেছেন, তাঁহার বাঁশী অনন্তকাল ধরিয়া অক্লান্ত অশ্রান্তভাবে বিশ্বময় সুস্বর-লহরী ছড়াইয়া ছড়াইয়া কোমলে করুণে ধীরে গম্ভীরে আমাদিগকে ডাকিতেছে। এস, আমরা সেই অনাদি অনন্ত বিশ্বকারণের বাঁশীস্বরে দিক্‌নির্ণয় করিয়া, পৃথিবীর ন্যায় একাগ্রতা, একনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত সেই "গুরোর্গরীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" ভগবানের পদপ্রান্তে

ছুটিয়া যাই, আমাদের জীবন ধন্য হইবে, কাল্পনিক কঠোরতার নীরস-স্বপ্ন অচিরে মিলাইয়া যাইবে, আমরা দেখিব—

"নিমেষে তাঁহার পুণ্যপরশ
ক'রে দিয়ে গেছে চিত্ত সরস
উথলিয়া উঠে বক্ষে হরষ
(আমরা)　　অবশ হইয়া থাকি"

শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হরিষ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত

বৈশাখ মাসের প্রত্যেক মঙ্গলবারে বিক্রমপুরের মহিলারা গৃহের মঙ্গলের জন্য এই ব্রত করিয়া থাকেন।

ব্রতকথা

এক বিধবা গোয়ালিনীর সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। সাত ছেলে ও মেয়েটীকে নিয়া গোয়ালিনী অতি কষ্টে দিন কাটাইত। গোয়ালিনীর সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ। তু'বেলা আহার জোটে না। কোন প্রকারে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা মেয়ে ও ছেলে সাতটিকে মানুষ করিতে লাগিল। গোয়ালিনীর ব্যবসায়ও বন্ধ, কাজেই তাহার এতগুলি ছেলেপেলের আহার জোটান বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়িল। সে নিজে নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া এখন ছেলে কয়টিকে মানুষ করিয়া তাহাদের বিবাহ করাইয়াছে। কিছুদিন যায়, একদিন এক ব্রাহ্মণ-কন্যার সহিত গোয়ালিনী সই পাতাইল। সইএর অবস্থা বেশ ভাল। তাঁহার সাহায্যে গোয়ালিনী অনেক সময় অনেক উপকার পাইতে লাগিল। একদিন গোয়ালিনী ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সই, তোমার এত ঐশ্বর্য্য কিসে হইল'? সই বলিল, 'আমার একটি ব্রত আছে সেই ব্রতের ফলে আমার এত ঐশ্বর্য্য হইয়াছে'। গোয়ালিনী বলিল, 'সই, এ ব্রত অন্য কেহ কি করিতে পারে না'? ব্রা—'কেন পারিবে না! মনের ঐকান্তিক ভক্তির সহিত মা চণ্ডীকে ডাকিলে অবশ্যই তিনি মুখ তুলিয়া চাহিবেন। সকলেই তাঁহাকে ডাকিতে পারে'। গো—'আমি এ ব্রত করিব। ব্রতের উপকরণাদি আমাকে বলিয়া দাও। আমার আর কষ্ট সহ্য

হয় না'। সই বলিল, 'এ ব্রত করিতে বিশেষ কিছুই ব্যয় করিতে হয় না। তুমি এ ব্রত অনায়াসেই করিতে পার। বৈশাখ মাসের প্রত্যেক মঙ্গলবারে এই ব্রত করিতে হইবে। আর যতকাল জীবিত থাকিবে এই ব্রত ভঙ্গ করিতে পারিবে না'। গোয়ালিনী তাহাতেই স্বীকৃত হইল। ব্রাহ্মণী তখন নিয়মাদি বলিয়া দিলেন। একটি কলার "মাইজের" আগায় সিন্দূরের ফোঁটা দিয়া 'মাইজ' বসাইতে হইবে। মাইজের মধ্যে একটি জবাফুল, ধান, দূর্ব্বা ও একটি ফল দিবে। দৈ ক্ষীর ইত্যাদি নৈবেদ্য দিতে হয়। পরে ব্রাহ্মণ আসিয়া মা চণ্ডীর উদ্দেশে এই সকল উৎসর্গ করিবেন। এই ব্রত করিয়া ভাত ভিন্ন অন্য সমস্তই খাইতে পারে'। গোয়ালিনী তাহাই করিল। বৈশাখ মাস পড়িলেই প্রত্যেক মঙ্গলবারই এই ব্রত করিতে লাগিল। সে যে দিবস প্রথম ব্রত করিল, সেই দিনই দৈ বেচিয়া অনেক পয়সা পাইল। চণ্ডী মায়ের বরে, গোয়ালিনীর ধন জন দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। এখন আর গোয়ালিনীর কোন কিছুরই অভাব নাই। ধন-দৌলৎ, লোকজন ইত্যাদিতে উহার বাড়ী ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল। এইরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দে পুত্র ও পুত্রবধূদের লইয়া, আমোদে আহ্লাদে দিন যায়। কিছুদিন পরে গোয়ালিনী একদিন সইকে বলিল, 'সই আমার এত ঐশ্বর্য্য আর সহ্য হয় না। টাকা পয়সার ঝন্ ঝন্, লোকজনের এত হাসি গল্প, ঘোড়াশালায় ঘোড়া, হাতীশালায় হাতী, এসব আর আমি দেখিতে শুনিতে পারিতেছি না। কত বৎসর যাবৎ কান্না কাহাকে বলে, জানি না। আমার কেবলই কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে'। সই এ কথা শুনিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইল, 'এ ব্রত করার পর হইতে তোমার দুঃখ ঘুচিয়াছে। কত সুখ-সম্পদে, বৌ, ঝি, ছেলেপেলে নিয়া দিন কাটিতেছে তুমি এ ব্রত ভাঙ্গিও না'। গোয়ালিনী তাহা মানিল না। ব্রাহ্মণী শেষটায় বিরক্ত হইয়া তাহাকে ব্রত ভঙ্গ করিতে বলিলেন। গোয়ালিনী নিজে আর ব্রত করে না। বধূদের সকলকেও এই ব্রত করিতে নিষেধ করিয়াছে। বড় বৌ কিন্তু লুকাইয়া ভিন্ন ঘরে ব্রত করিল। মা চণ্ডী প্রসন্ন হইয়া তাহাদের সুখশান্তি বজায় রাখিলেন। এদিকে গোয়ালিনী নিজের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া ব্রাহ্মণীর কাছে কাঁদিয়া বলিল, "সই, ব্রত তো ভঙ্গ করিয়াছি কিন্তু ইহাতেও যে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। আমি কাঁদিবার সুযোগ পাইলাম না। আমাকে কাঁদিবার উপায় বলে দাও'। ব্রাহ্মণী বলিল,

"রাজার বাড়ীতে একটি হাতী মরিয়াছে, তুমি উহাকে উপলক্ষ করিয়া কাঁদিতে থাক"। গোয়ালিনী তাহাই করিল। হাতীকে ধরিয়া কাঁদিবা মাত্র হাতী বাঁচিয়া উঠিল। সকলে দেখিয়া অবাক্! রাজার নিকট খবর গেল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া গোয়ালিনীকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। গোয়ালিনী সইএর নিকট গিয়া বলিল, "সই, আমি এবারও শোক করিতে পারিলাম না। আমি কাঁদিবা মাত্র হাতী বাঁচিয়া উঠিল। শীঘ্র আমাকে কাঁদিবার উপায় বলিয়া দাও"। ব্রাহ্মণী রাগ করিয়া বলিল, 'কেন, আমি তো তোমাকে আগেই বলিয়াছিলাম যে তোমার এত সুখ শান্তি, ভাল লাগিবে না'। গোয়ালিনী বলিল, 'না সই, আমি কোন কথা শুনিব না। আমার কেবলই কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে'। ব্রাহ্মণী বলিল, 'যদি তোর একান্তই কাঁদিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে মেয়ের বাড়ী বিষের লাড়ু পাঠাইয়া দে'। গোয়ালিনী তাহাই করিল। একটি লোক দিয়া এক হাঁড়ী বিষের লাড়ু পাঠাইয়া দিল। এবার গোয়ালিনী মনে করিল যে এখন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারিব। এদিকে লোকটি লাড়ুর হাঁড়ী নিয়া যাইতে লাগিল। পথে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইল। মা চণ্ডী এই লোকটির জন্য ব্রাহ্মণের বেশে পথে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তুমি ঐ পুকুরে স্নানাদি করিয়া আইস। আমি তোমার হাঁড়ীর প্রহরী রহিলাম'। লোকটি স্নান করিতে গেল। ঠাকুর ভাবিতে লাগিলেন, আমার ভক্তের হৃদয়ে যেন শোক প্রবেশ করিতে না পারে। তাই ঠাকুরের বরে বিষের লাড়ু অমৃতের লাড়ু হইয়া রহিল। লোকটি আসিয়া তাহার হাঁড়ী লইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। সকলেই এই জিনিস খাইয়া প্রশংসা করিতে লাগিল আর বলিয়া দিল, দিদি-মাকে, মাকে বলিও যেন আরও কিছু লাড়ু পাঠাইয়া দেন। গোয়ালিনী সেই দিন কিছুই আহার করে নাই। কতক্ষণে মেয়ের মৃত্যুর বার্ত্তা নিয়া আসিবে, সেই আশায় পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, কিন্তু লোকটি আসিয়া বুড়ীকে তাহার আশানুরূপ বার্ত্তায় সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। গোয়ালিনীর কান্না হইল না, মেয়ে ও নাতি পুতি মরে নাই। কৈ তারা মর্‌বে, আর বুড়ী প্রাণ ভ'রে কাঁদবে, তাহা না হইয়া বিপরীত হইল। এই মঙ্গল বারেও বড় বৌ লুকাইয়া ব্রত করিয়াছিল। গোয়ালিনী ধীরে ধীরে সইয়ের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত।" "সই, আমার আর সাধ মিটিল না। বিষের বড়ীতে মেয়েটা মরে নাই"। ব্রাহ্মণী

এবারও অনেক বুঝাইল। গোয়ালিনী তাহা শুনিল না। তখন ব্রাহ্মণী বলিল যে, বড় বৌ কিংবা তোমরা কেহই আগামী মঙ্গলবারে ব্রত করিও না। তাই করা হইল। সেই মঙ্গলবারে কেহই আর ব্রত করিল না। মঙ্গলচণ্ডীর শাপে গোয়ালিনীর যে যেখানে ছিল, সকলেই সেখানে মরিয়া রহিল। গোয়ালিনী আর কাহাকেও জীবিত না পাইয়া প্রাণ ভরিয়া কান্না আরম্ভ করিল। এরূপ ভাবে সাত রাত্রি, সাত দিন অনবরত কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। আর কাঁদিতে পারে না। তাহার আবার সকলকে পাইতে ইচ্ছা হইল। পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়া আবার সংসারের সাধ হইল। সে সইকে ডাকিতে লাগিল। সই আসিয়া বলিল, 'কেন, এখন আবার আমাকে ডাকিতেছ কেন? বসিয়া সাধ মিটাইয়া কাঁদ'। তখন গোয়ালিনী সইয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'সই, আমার সকল সাধ মিটিয়াছে, আমি আর কাঁদিতে পারিব না। আমার আবার সকলকে দেখিতে ইচ্ছা করে। কি করিয়া আমি আবার সকলকে পাইব, সে উপায় বলিয়া দাও'। তখন সই বলিল, 'আবার মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কর, তবে আবার তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে'। তখন গোয়ালিনী আবার ব্রত করিল। মঙ্গলচণ্ডীর মঙ্গল ইচ্ছায় গোয়ালিনীর সকল বাঁচিয়া উঠিল। আবার পূর্ব্ব সুখ শান্তি ফিরিয়া আসিল। সোণার মঙ্গলচণ্ডী গড়াইয়া পুত্রবধূদের ব্রত করাইল। সে অবধি সর্ব্বত্র এ ব্রতের প্রচার হইল। এ ব্রত করিলে লোকের গৃহে শান্তি হয়। হর্ষ ছাড়া বিষাদ হয় না। সুখ ছাড়া দুঃখ হয় না, এই ব্রত করিলে লোকে সুখে, শান্তিতে, ধনে জনে দিন পাত করিতে পারে। তাই ইহার নাম হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রত।

শ্রীসরযূবালা গুহ।

ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন

বিগত ২৮শে ফাল্গুন হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতা কালীঘাটে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের যে সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, সংবাদপত্র পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে তাহাতে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, তাহার একটি ব্রাহ্মণেতর জাতির যজ্ঞোপবীত গ্রহণ, অপরটি

সমুদ্রযাত্রা। উভয় বিষয়ই সম্মিলন অশাস্ত্রীয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নাকি শাস্ত্রীয় বিচার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের বিচারের কোন মুদ্রিত বিবরণী আমাদের হস্তগত হয় নাই। কেবল সভাপতি সুসঙ্গের মহারাজা বাহাদুরের মুদ্রিত অভিভাষণের একখণ্ড আমরা পাইয়াছি। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা অবলম্বনে আমি দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বিক্রমপুরে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল, সুতরাং 'বিক্রমপুর' পত্রিকায় বিষয়টির আলোচনা অসমীচীন হইবে না।

সভাপতি মহাশয় দেশকালপাত্রভেদে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের পক্ষপাতী (১)। সভাপতি মহাশয়ের ইহাও অবিদিত নাই যে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজে প্রকৃত ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি বিরল, এবং যে সকল কারণে ব্রাহ্মণত্বের প্রাচীন আদর্শ লোপ পাইতেছে, তাহাদের সকলগুলির নিরাকরণ আমাদের সাধ্যায়ত্তও নহে (২)। ব্রাহ্মজ্ঞানহীন কেবলমাত্র ব্রহ্মসূত্র-গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে 'বিপ্রপশু' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এই মর্ম্মে একটি শ্লোকও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন (৩)। ব্রাহ্মণের বাহ্যাভ্যন্তরশুচিতা না থাকিলে তিনি ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতে পারেন না, ইহাও সভাপতি মহাশয় স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন (৪)। সভাপতি মহাশয়ের এই সকল উক্তি সত্য হইলে, হয় আধুনিক বঙ্গসমাজের পৌণে ষোল আনা ব্রাহ্মণকে উপবীতধারণের অযোগ্য গণ্য করিয়া শূদ্রত্বে অবনত করা উচিত, নতুবা ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসাধারণের মত বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট, তাহাদিগকে উপনয়নের অধিকার প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করা কর্ত্তব্য। যুক্তি মানিতে গেলে এই দুইয়ের অন্যতর ব্যতীত সমাজ সংস্কারের আর তৃতীয় পথ নাই। ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহ এখন শেষোক্ত অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থাই অবলম্বন করিতেছেন। যদি দেশকালপাত্রভেদে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও

(১) পরিশিষ্টে (১) দ্রষ্টব্য।
(২) পরিশিষ্টে (৪) দ্রষ্টব্য।
(৩) পরিশিষ্টে (৫) দ্রষ্টব্য।
(৪) পরিশিষ্টে (৬) দ্রষ্টব্য।

পরিবর্জ্জন শাস্ত্রসম্মত হয়, তাহা হইলে কায়স্থ-বৈশ্য প্রভৃতি জাতির যজ্ঞসূত্রের দাবী ব্রাহ্মণসম্মিলনের আপত্তিজনক হওয়া সঙ্গত নহে।

সভাপতি মহাশয়ের মতে পাশ্চাত্যজাতিসমূহ এখন নানাবিধ লৌকিক বিদ্যায় সমুন্নত এবং তাহাদের নিকট আমাদিগকে জ্ঞান আহরণ করিতে এবং যাহা শিক্ষণীয় তাহা শিক্ষা করিতেই হইবে (১)। এস্থলে স্বভাবতঃই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, যে সকল লৌকিক বিদ্যা পাশ্চাত্য শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে না গেলে একেবারেই কিম্বা ভালরূপ আয়ত্ত করা যায় না, সেগুলি অর্জ্জন করাও যখন অবশ্যকর্ত্তব্য, তখন পাশ্চাত্যদেশে গমন ব্যতীত সেই সকল বিদ্যাশিক্ষার আর কি উপায় থাকিতে পারে? এই এক যুক্তিদ্বারাই কি সমুদ্রযাত্রার বিপক্ষে সমুদয় তর্ক খণ্ডিত হয় না? বস্তুতঃ 'পাশ্চাত্যজাতিসমূহের নিকট যাহা শিক্ষণীয় তাহা শিক্ষা করিতেই হইবে' এবং 'পাশ্চাত্যদেশে যাইতেই হইবে' এতদুভয় সমানার্থক। শুনিয়াছি বিদ্যার্থীর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা দূষ্য নহে এই মর্ম্মে শাস্ত্রে প্রমাণও আছে, এবং সম্মিলনের অধিবেশনে নাকি সেইসকল প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা থাকুক বা নাই থাকুক, দেশকাল-পাত্রভেদে যখন শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা পরিবর্ত্তনীয়, এবং পাশ্চাত্যবিদ্যাশিক্ষা যখন অবশ্যকর্ত্তব্য, তখন সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রতিকূল হইলে তাহার পরিবর্ত্তন সভাপতি মহাশয়ের মতানুসারেই একান্ত সঙ্গত।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের কথাগুলি ব্রাহ্মণসম্মিলনের বিশেষরূপ প্রণিধানযোগ্য। আমি জানি সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে সকলের মত ঈদৃশ উদার নহে। (২)

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয়ের একটি মহাবাক্যের প্রতি ব্রাহ্মণসম্মিলনের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন :—

"ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়া কেবল মাত্র আস্ফালনে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি উপহাসাস্পদ হইবেনই"।

আমরা সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার যে সকল অংশ উল্লেখ করিলাম, ব্রাহ্মণসম্মিলন সে গুলির প্রতি মনোনিবেশ করিলে দেখিতে পাইবেন যে তাঁহারা

(১ পরিশিষ্টে (২) দ্রষ্টব্য।

(২) পরিশিষ্টে (৩) দ্রষ্টব্য।

কিরূপ বিপথগামী হইতেছেন। সময় থাকিতে এখনও তাঁহাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা যে প্রাধান্য রক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের এই 'মহাসম্মিলন' আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইবে, ইতিহাসের ধারার প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা কঠিন হইবে না।

হিন্দুর জাতীয়তা নষ্ট না হয়, তজ্জন্য সমাজের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তিদিগকে সভাপতি মহাশয় সাবধান করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস হিন্দুর জাতীয়তা কি, তাহা শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ অল্পই বুঝিয়া থাকেন। জাতীয়তা যাগযজ্ঞ বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ নহে, উহা অন্তরের জিনিস, চিৎশক্তিতে উহার বিকাশ, জনসাধারণের চিন্তাপ্রণালীতে উহার অভিব্যক্তি। নিরপেক্ষভাবে ভারতবর্ষের ও ভারতীয় আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাসাদি আলোচনাদ্বারা স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি একটি সশ্রদ্ধ মমত্ব অনুভব করিতে অভ্যাস করা, এবং পুরাকালে জ্ঞানবিজ্ঞান ললিতকলা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের যে প্রাধান্য ছিল, আধুনিক প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত কালোচিত নিয়মানুসারে প্রতিযোগিতা করিয়া সেই প্রাধান্য পুনরুজ্জীবিত ও তাহার বিস্তারসাধন করা,—জাতীয়তা বলিতে প্রকৃত-পক্ষে ইহাই বুঝায়। এইরূপ জাতীয়তা বিকাশে যাঁহারা দেশবিদেশে নব নব জ্ঞান অর্জ্জন করিতে যান, তাঁহারাই প্রধান নায়ক। ইহা সত্য যে বিদেশপ্রত্যাগত পাশ্চাত্যালোকমুগ্ধ একদল হিন্দু ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে সভ্যতার নামে অনেক অপকর্ম্ম করিয়াছেন, স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা অপেক্ষা ঘৃণার ভাবই বেশী পোষণ করিয়াছেন। হিন্দুসমাজে তাঁহা-দিগকে পুনর্গ্রহণ না করা বিশেষ অসঙ্গত হয় নাই। প্রায়শ্চিত্ত বলিতে যদি জাতীয় ভাবসমূহ ও নির্দ্দোষ দেশীয় রীতিনীতি ও আচারপদ্ধতির বশ্যতাস্বীকার বুঝায়, তবে প্রায়শ্চিত্তও অসঙ্গত নহে। কিন্তু যখন বর্ণধর্ম্ম জাতীয়তার পক্ষে একান্ত আবশ্যক ছিল, সেদিন গিয়াছে, এখন স্বদেশবৎসলতা নামক একটি নূতন ভাব জাতীয়তার পরিপোষকরূপে দেখা দিয়াছে, বর্ণও চারিটিতে নিবদ্ধ নহে, বিবহাদি বিষয়ে বর্ণগত বৈষম্যও প্রাচীন কাল হইতে অনেক কঠোর, সুতরাং সমাজের নিম্নস্তরসমূহের এই

জাগরণের দিনে, সাম্যবাদ ও প্রজাতান্ত্রিক শাসনের এই অভ্যুদয়ের দিনে, আধুনিক বর্ণধর্ম্ম কি পরিমাণে জাতীয়ভাবের অনুকূল বা পরিপন্থী তৎ-সম্বন্ধে মতদ্বৈধের যথেষ্ট হেতু আছে, অতএব জাতীয়তারক্ষার জন্য বর্ণধর্ম্মের আবশ্যকতা এখন বিচারসাপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ নহে। এসম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত মনীষিগণের চিন্তাশক্তিপ্রয়োগ বিশেষ আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে। যদি ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনের সভাপতি মহাশয়ের এই উক্তি বাস্তবিকই সত্য হয় যে "ব্রাহ্মণ কখনও সঙ্কীর্ণমনা হইতে পারেন না; ব্রাহ্মণত্ব ও অনুদারতা পরস্পর বিরুদ্ধলক্ষণাক্রান্ত", তবে আশা করা যায় বর্ণধর্ম্মসম্বন্ধে নিরপেক্ষ আলোচনায় ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইবেন, এবং দেশকালপাত্রানুযায়ী ব্যবস্থাদ্বারা হিন্দুসমাজকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিবেন।

পরিশিষ্ট

ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বি, এ, মহারাজ বাহাদুরের অভিভাষণ।

সন ১৩২০ সাল, ২৮শে ফাল্গুন। কলিকাতা—কালীঘাট।

(১) "যাঁহারা সমাজের প্রকৃত কল্যাণকামী, তাঁহারা যেন হিন্দু জাতির জাতীয়ত্ব নষ্ট করিতে চেষ্টা না করেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কাল, দেশ, পাত্রানুসারে সেগুলি যতদূর পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্জ্জিত হইতে পারে তাহারই চেষ্টা করা সমীচীন, ব্রাহ্মণ সমাজ এ বিষয়ে যথাশক্তি চিন্তা করিবেন, এরূপ আশা করা যায়। যুগভেদে ব্যবহারিক ধর্ম্মভেদ ঋষিগণের অনভিপ্রেত নহে। "কৃতে তু মানবো ধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং শঙ্খ লিখিতৌ"—ইত্যাদি ঋষিদেরই মত। "কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ" এ কথা পণ্ডিতগণের সুবিদিত। মনু বলিতেছেন—"অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে। অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥" কাল, দেশ, পাত্রানুসারে বিধি ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনীয় বা পরিবর্জ্জনীয়। শাস্ত্র চিরকালই এই নিয়মের বশবর্ত্তী ছিলেন; "দেবরেণ সুতোৎ-পত্তি র্মধুপর্কে পশোর্বধঃ। দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং বরস্য চ" প্রভৃতি বচনেই ইহার প্রমাণ।"

(২) "পাশ্চাত্যজাতিসমূহ এখন নানাবিধ লৌকিক বিদ্যায় সমুন্নত ও

তাঁহাদের অধ্যবসায় এবং জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা অতি বলবতী। তাঁহাদের নিকট হইতে যাহা শিক্ষণীয় তাহা শিক্ষা করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য জাতির নিকট হইতে পূর্ব্বতন ঋষিগণ জ্যোতিষতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। "নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং" ইহা তাঁহাদেরই কথা। তাঁহাদের ইহাও মত যে

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥"

ভগবান্ মনু বলিতেছেন :—

"স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মং শৌচং সুভাষিতং।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥"

অতএব যে কোন জাতি হইতে অথবা যে কোন ব্যক্তি হইতে জ্ঞান আহরণে কোনও দোষের কারণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ কখনও সঙ্কীর্ণমনা হইতে পারেন না; **ব্রাহ্মণত্ব ও অনুদারতা**, পরস্পর বিরুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত। "চণ্ডালমপি বিত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ" ইহা ব্রাহ্মণেরই উক্তি।"

(৩) "সত্য বটে পূর্ব্বতন ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ স্ত্রীজাতি ও শূদ্রকে বেদ পাঠের অধিকার দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই, কিন্তু তাহাদের অন্য প্রকার শিক্ষালাভের কোনও বাধা শাস্ত্রে কোথায়ও উক্ত হইয়াছে কি? আমার বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও নহে। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই যে স্ত্রী ও শূদ্রের শিক্ষার অতি প্রকৃষ্ট উপায়ই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। লোকালোক পর্ব্বতের ন্যায় সমাজের একদিক (পুরুষভাগ) নিয়ত জ্ঞানালোক সমুজ্জ্বল হইবে, অন্যদিক্ (স্ত্রীভাগ) গাঢ়তম অজ্ঞান তমসাবৃত থাকিবে, ইহা আর্য্যঋষির কল্পনায় আসে নাই। প্রাচীনভারতের সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী প্রভৃতি অশিক্ষিতা ছিলেন, এই কথা যাঁহারা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে আমি অক্ষম। ব্রাহ্মণ সম্মিলন দেশকালোচিত স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর ব্যবস্থা করিতেও চেষ্টা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।"

(৪) "বর্ত্তমান কালে আমাদের মধ্যে প্রকৃত মুখ্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির একান্ত অসদ্‌ভাব ঘটিয়াছে, আমাদের অধিকাংশই এখন "ব্রুবাণ ব্রাহ্মণ" মাত্র। এরূপ হওয়ার বহুবিধ কারণ বিদ্যমান; সে সমস্তের প্রতীকার কতকগুলি আমাদের সাধ্যায়ত্ত এবং কতকগুলি নহে।"

"ব্রহ্মতত্ত্বং না জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥"

(৬) "ব্রাহ্মণ যদি নিষ্কাম, নির্লোভ, নির্দ্বন্দ্ব, নিরহঙ্কার, শান্ত, দান্ত, উপরত ও তিতিক্ষু না হইতে পারেন তবে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব অটল থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণোচিত বাহ্যাভ্যন্তরশুচিতা না থাকিলে তিনি ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতে পারেন না।"

(৭) "ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়া কেবলমাত্র আস্ফালনে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি উপহাসাস্পদ হইবেনই।"

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজর্ষি বেণ

খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে হিমালয়ের পাদদেশে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনী উদ্যানে যে মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেও অনেক বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কাশ্যপ, কণকমুনি এবং ক্রকুচন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। শাক্যসিংহের মাতুলপুত্র দেবদত্ত এক প্রকার বৌদ্ধ ছিলেন; তিনি শাক্যসিংহকে বুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেন না; কিন্তু কাশ্যপ, কণকমুনি এবং ক্রকুচন্দকে বুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেন।

খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিয়াংচাঙ্ ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গদেশের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ নগরে তিনটি বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছেন। কর্ণসুবর্ণ তৎকালে রাঢ় প্রদেশের রাজধানী ছিল। কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসাবশেষ এক্ষণ ভাগীরথী তীরে রাঙ্গামাটি নামে কথিত হয়। এই সময়ে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী শশাঙ্ক রাঢ় প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। কথিত তিনটি বিহারের বৌদ্ধগণ দেবদত্তের মতাবলম্বী বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা কাশ্যপ, কণকমুনি, ক্রকুচন্দ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের উপাসনা করিতেন, কিন্তু শাক্যসিংহকে বুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

প্রকৃত পক্ষে শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বহু বুদ্ধ ছিলেন, তন্মধ্যে

মাত্র কতিপয় ব্যক্তি বুদ্ধ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। অন্যান্য বুদ্ধগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অতি প্রাচীনকালে বেণ নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। বেণের পুত্র প্রসিদ্ধ পৃথী। পৃথী কখন কখন পৃথু নামেও কথিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের ৮ মণ্ডলের ৯ম সূক্তের ১০ম ঋকে পৃথীকে 'বৈন্যঃ' বলা হইয়াছে। সায়ন বলিয়াছেন :—

"বৈন্যো বেণস্য পুত্রঃ পৃথী এতৎ সংজ্ঞকো রাজর্ষিঃ"

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৩ সূক্তের ১৪ ঋকে লিখিত আছে : —

"প্রতদ্দুঃশীমে পৃথবানেবেনে প্ররামে বোচ মস্থরে মেঘবৎসু।"

সায়ণ বলেন :—

"দুঃশীমে দুঃশীমনাম্নি পৃথবানে পৃথবানঃ পৃথিস্তস্মিন্ বেনেচ অসুরে বলবতি রামে"

এখানে বেদে বেণের প্রশংসা দৃষ্ট হয়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৮ সূক্তের ঋষি পৃথু। তাঁহার পঞ্চম ঋকে পৃথু বেনের পুত্র বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছেন।

ঋগ্বেদে কোন স্থানে বেণের নিন্দাসূচক কোন কথা দৃষ্ট হয় না। বেণ ঋগ্বেদ রচনা শেষ হওয়ার পূর্ব্বতন রাজর্ষি, তাঁহার পুত্র পৃথু ঋগ্বেদের একজন ঋষি।

কিন্তু প্রচলিত মনুসংহিতা এবং পুরাণে বেণের নানা প্রকার নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীনতম গ্রন্থে বেণের নিন্দা নাই, অথচ তাঁহার নাম উল্লেখ আছে; পরবর্ত্তী গ্রন্থে তাঁহার নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য এই বর্ণনার প্রতি আমাদের সন্দেহ হয়। কেহ বলিতে পারেন যে মনু বেদের অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন; অতএব তাহাতে সন্দেহ করার কারণ হইতে পারে না, তাঁহাদের নিকট আমাদের উত্তর এই যে প্রচলিত মনুসংহিতা মনু প্রণীত গ্রন্থ নহে।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে :—

"বেণোবিনষ্টোঽবিনয়াৎ" ৭।৪১

বেণ অবিনয়ে বিনষ্ট হইয়াছেন।

"স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ॥" ৯।৬৭

বেণ রাজর্ষি প্রাচীনকালে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন ; তিনি কামোপহত-চেতন হইয়া বর্ণসঙ্কর জন্মাইয়াছেন।

বেণ যে সময়ে নরপতি ছিলেন সে সময়ে বর্ণভেদ ছিল কি না তাহা সন্দেহ-জনক। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে তৎকালে আর্য্য এবং দস্যু মাত্র এই বর্ণ ছিল।

বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে যে বেণ ঋষিদিগকে এই আদেশ করিলেন :—

"ন দাতব্যং ন হোতব্যং ন যষ্টব্যঞ্চ বো দ্বিজাঃ"।

হে দ্বিজগণ (হরির উদ্দেশ্যে) দান করিও না; কোন প্রকার যজ্ঞ করিও না।

তদনন্তর ব্রাহ্মণগণ বলিলেন যজ্ঞাদি না করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না ; এবং পৃথিবী বিনষ্ট হইবে।

দেখা যাইতেছে মনুর মতে বেণ অবিনয়ী ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে বর্ণ-সঙ্কর হইয়াছে। এক বর্ণের ঔরসে অন্য বর্ণের স্ত্রীগর্ভে যে সন্তান হয় তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলা যাইতে পারে ; অর্থাৎ অসবর্ণ বিবাহে যে সন্তান হয় সেই সন্তান বর্ণসঙ্কর। উচ্চ বর্ণের কন্যা নিম্নবর্ণের পুরুষে বিবাহ করিলে তাহা প্রতিলোম বিবাহ, এরূপ বিবাহের সন্তান অপকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর। উচ্চ বর্ণের পুরুষ নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে সে বিবাহের সন্তান উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর। কোন কোন স্থলে এই নিয়মের অন্যথা দৃষ্ট হয়। যথা, যযাতি দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিলেন, দেবযানীর সন্তান বর্ণসঙ্কর হইল না। বিশ্বামিত্রের ভগিনী ব্রাহ্মণে বিবাহ করিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্রের ভগিনীর গর্ভজাত পুত্র বর্ণসঙ্কর নয়।

বর্ণসঙ্কর কি কেবল বেণের সময়েই হইয়াছে ? ইহা বিশ্বাস করা যায় না। পুরাণে মহাভারতে কত অসবর্ণ বিবাহের উল্লেখ আছে।

কেহ যদি বলেন যে এই বর্ণসঙ্কর বিবাহোৎপন্ন সন্তান নয়, তাহার প্রমাণ কি ? বেণ যে বিবাহসংস্কার উঠাইয়া দিয়াছিলেন একথা বলা হয় নাই।

বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায় যে তিনি যজ্ঞের বিরোধী ছিলেন। যজ্ঞে নানাপ্রকার পশুবধ হইত ; ব্রাহ্মণগণ "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা স্তস্মাৎ যজ্ঞে বধোবধঃ।" এই নিয়ম প্রচার করেন। বেণ সম্ভবতঃ এতাদৃশ ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। এজন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে কুশাদ্বারা বধ করেন। যাঁহারা কুশাদ্বারা বধ করা বিশ্বাস করেন তাঁহারা বেণের অত্যাচার বিশ্বাস করিবেন। বিংশতি শতাব্দীতে অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিবেন না।

মায়াদেবী-সুত যে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহাতে জাতিভেদ নাই। শচীদেবী-সুত প্রচারিত ধর্ম্মেও জাতিভেদ নাই। এই দুই মহাত্মার প্রচারিত ধর্ম্ম এ সম্বন্ধে এক প্রকার। তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, যবন, মুসলমান, ম্লেচ্ছ সকলেই সমান। এতাদৃশ ধর্ম্ম প্রচলিত হইলে হিন্দুধর্ম্ম মতে বর্ণসঙ্কর হইবে। অতএব বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি হওয়া নিন্দার বিষয় নহে।

আর একটি বিষয় যজ্ঞ করিতে নিষেধ করা। প্রকৃত পক্ষে ইহা "অহিংসা পরমঃ ধর্ম্মঃ" প্রচার। ব্রাহ্মণদিগকে তিনি যজ্ঞে পশুবধ করিতে নিষেধ করেন।

এই দুইটি বিষয়দ্বারা অনুমান যে রাজর্ষি বেণ শাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী একজন বুদ্ধ।

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

গ্রন্থ সমালোচনা

সচিত্র সপ্তকাণ্ড রাজস্থান। শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত ও প্রকাশিত। পটিয়া, চট্টগ্রাম। ৩৯২ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৲। রাজস্থান হিন্দুর একমাত্র গৌরব-স্থল। গ্রন্থকার টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে রাজপুতানার মিবার, অম্বর, মারবার, বিকানীর, যশল্মীর, বুন্দি, কোটা প্রভৃতি স্থানের ঐতিহাসিক বিবরণী পয়ার-ছন্দে রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং গ্রন্থের নাম দিয়াছেন 'সচিত্র সপ্তকাণ্ড রাজস্থান।'

বিপিন বাবুর কবিত্ব শক্তি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। রাজস্থানের বিরাট ইতিহাসকে তিনি কবিতার আকারে জনসমাজের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আমাদের দেশে এখনও গদ্য অপেক্ষা পদ্যের আদর অত্যন্ত বেশী। গদ্য এখনো শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ, বাহিরে জন-সঙ্ঘের নিকট তাহার ততটা পসার প্রতিপত্তি নাই। কাশীরামদাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বিজয় গুপ্তের ও নারায়ণদেবের পদ্ম-পুরাণ, ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল, কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গের ঘরে ঘরে আবাল-

বৃদ্ধ-নর-নারীর প্রিয়। স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের ও বর্দ্ধমানের মহারাজার প্রকাশিত গদ্য মহাভারত এখনো জনসাধারণের নিকট ততটা সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। কাজেই বিপিন বাবুর পয়ার ছন্দে রচিত রাজস্থান সাধারণের বিশেষরূপে মনোযোগ আকর্ষণ করিবে বলিয়া মনে হয়। রাজস্থান—একাধারে কাব্য, ইতিহাস ও উপন্যাস। বাঙ্গলায় কত নাটক, উপন্যাস ও কাব্য যে উহার সাহায্যে বিরচিত হইয়া বঙ্গভাষার কলেবর অলঙ্কৃত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কাজেই এইরূপ একখানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের বহুল প্রচারের এবং বহুজনের রসবোধের ব্যবস্থা করিয়া কবি দেশের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

রাজস্থানের ইতিবৃত্ত যেমন মধুর ও চিত্তাকর্ষক, কবির রচনাও তেমনি চিত্ত-রঞ্জক। পয়ার, ত্রিপদী, প্রভৃতি ছন্দের মাধুর্য্যে এবং শব্দ-সম্পদে ভাব-গৌরবে রাজস্থান বঙ্গের একাখানা মহার্ঘ শ্রেষ্ঠ কাব্যের আসন অধিকার করিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট রাজস্থানের চরিত্রাখ্যান নূতন না হইলেও ইহা যে 'নিতুই নব' একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কবি বিপিন-বিহারীর রচনা কিরূপ সরল এবং প্রাঞ্জল হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদৃচ্ছা ক্রমে এখানে কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম। যথা :-

"করিয়া পার্ব্বত্য রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন,
চিতোর উদ্ধারে রাণা করিল মনন।
একদিন বীরবর আছে চিন্তায়ুত ;
উপনীত হেনকালে মল্লদেব দূত।
দূত কহে 'নরবর করি নিবেদন,
কন্যা-সম্প্রদানে প্রভু করেছে মনন।'
ক্ষণেক চিন্তায় রাণা সম্মত হইল।
আনন্দিত হ'য়ে দূত চিতোরে ফিরিল।
শুনিয়া অমাত্যগণ বিষাদে কহিলা,—
'বল প্রভু কেন হেন বিপাকে ঠেকিলা।
বিবাহ করিতে যাবে অরাতির ঘরে,
কে বলিতে পারে শত্রু কি কুচক্র করে।'
রাণা বলে—"মন্ত্রিগণ করিও না ভয়,
শত্রু-পুরী নহে তাহা মিত্রপুরী হয়।

ঘটে নাই ভাগ্যে দেখা পিতৃ-সিংহাসন,
এ সুযোগে যদি পারি করিতে দর্শন।
কি দুঃখ মরিলে বল, মরিব চিতোরে,
পিতৃ-পুরুষের অস্থি আছে যার ক্রোড়ে।
একদিন বুকে তার পাই যদি স্থান,
একদিন করি তার বারি বিন্দু পান।
সে মোর যথেষ্ট হবে সেই স্বর্গ-সুখ,
কেন বন্ধুগণ তাতে হও পরাঙ্মুখ।' ইত্যাদি।

তারপর,

'অনন্ত হয়েছে সান্ত মা হয়েছে মেয়ে,
যে তারে দুস্তরে তারে পায় করে নেয়ে।

অতি সুন্দর!

লেখক সুকবি তাই কঠোর ঐতিহাসিক সত্যকেও অতি সুন্দর কাব্যাকারে প্রকাশে সমর্থ হইয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারতের ন্যায় ইহা বঙ্গের ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া উচিত। বাস্তবিকই

'রাজস্থানের কথা অমৃত সমান,
বিপিন বিহারী কহে শোনে পুণ্যবান।'

গ্রন্থের স্থানে স্থানে সামান্য ছন্দপতন, শব্দযোজনার ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল। মাঝে মাঝে দুই একটী উপমাও আমাদের নিকট শ্রুতিকঠোর এবং অসমঞ্জস বলিয়া মনে হইল, যেমন ;—

'ফুটবল সম সবে ঘুরে ধরা' পরে,
ঠিক্ নাই কবে কেবা কার পায়ে পড়ে।' ইত্যাদি।

এত বড় গ্রন্থে এসব সামান্য ত্রুটির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিপিন বাবুর পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীকেই ইহার একখণ্ড গ্রন্থ ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বর্ত্তমান বিলাসিতার যুগে এইরূপ গ্রন্থ অমূল্য সম্পদ, শিক্ষার সোপান। ইতিহাস ও কাব্যের এইরূপ একত্র সমাবেশ জগতের কোন দেশের সাহিত্যের কোন গ্রন্থে আছে কিনা সন্দেহ। ভাষা এত সরল ও প্রাঞ্জল যে সামান্য লেখাপড়াজানা স্ত্রীলোকেরাও পড়িবার সময় ইহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারিবেন। ইহাই কবির রচনার সার্থকতা জ্ঞাপন করিতেছে। সপ্তকাণ্ড রাজস্থান প্রচার করিয়া বিপিন বাবু বাঙ্গালা সহিত্যে অমর হইলেন। তাঁহার বাণী-আরাধনা সার্থক হইয়াছে—দেবী সরস্বতীর আসন-কমলের একটা অমর পাপড়ী তাঁহার যশ-মণ্ডিত ললাটে শুভ আশীর্ব্বাদের ন্যায় অর্পিত হইয়াছে। আমরা কবির দীর্ঘ জীবন কামনা করি, তিনি পূর্ব্ব বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

---

২৩০ বিক্রমপুর

দ্বিতীয় বর্ষ | আষাঢ় ; ১৩২১ | তৃতীয় সংখ্যা

মাতৃশক্তি—ভারতীয় স্ত্রীমণ্ডলীর নিকট আবেদন

সমাজের অভিব্যক্তি পুরুষান্তরভোগী ফলবিশেষের মত ভবিষ্যানুবর্ত্তী। যে প্রথা যখন প্রবর্ত্তিত হয়, যে রীতি যখন জন্মলাভ করে, যে আচার অনুষ্ঠান যখন উদ্ভুত হয়, তাহার চরম ফলাফল ঠিক তাহার তৎকালীন সময়ের ভিতর পাওয়া যায় না, তাহার পূর্ণ বিকাশ তাহার পরবর্ত্তী কালে ঘটিয়া থাকে। মধ্যযুগে ভারতবর্ষীয় সমাজে যে রূপান্তর ঘটিয়াছিল, বর্ত্তমান ভারত আজিও তাহার ফলভোগ করিতেছে, এবং তদানীন্তন কালে যে সব বিধি বিধান ও অনুশাসন রচিত হইয়াছিল, নাগপাশের মত আজও তাহা স্থবির ভারতের সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া রহিয়াছে।

তুলনায় সমালোচনা উঠিলেই আমরা রামায়ণ ও মহাভারতীয় ভারতকে স্মরণ করিয়া থাকি। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতীয় ভারত ও বর্ত্তমান ভারতের মাঝখানে মধ্যযুগ যে নদীপ্রবাহের মত বিভাগের রেখা টানিয়া গিয়াছে, সে কথা আজ বিস্মৃত হইলে চলিবে না। ভূমিকম্প, তুষারস্রাব, বন্যা, আগ্নেয়স্রাব প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় যেমন পৃথিবীর আকারকে বারংবার পরিবর্ত্তিত করিয়াছে; স্থলের উপর জল বহাইয়াছে, জলের উপর স্থলকে আনিয়াছে, পর্ব্বতকে সমভূমি করিয়াছে, সমভূমিকে পর্ব্বত করিয়াছে; তেমনি তাহার অন্তর্জ্জীবনের বিপ্লবের উপর বিপ্লব ঘটিয়া বন্যার উপর বন্যা বহিয়া অগ্ন্যুদ্গারের উপর অগ্ন্যুদ্গার ঘটিয়া তাহাকে ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতীয় যুগের পরবর্ত্তী ভারতে ভারতের প্রকৃত অন্তর্জ্জীবনের চিত্র যাহা ছিল, যুগান্তরের তরঙ্গে তাহা

কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমাদের জাতীয় চিত্রশালায় তাহা আজ খুঁজিয়া পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। মধ্যযুগে ভারতবর্ষীয় সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিপ্লব-সঙ্ক্ষুব্ধিত আলোড়নময় এক প্রচণ্ড সংঘর্ষণের একটা ভয়াবহ অভিনয় মাত্র। জাতির সহিত জাতির, ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের—একটা প্রচণ্ড বিরোধের সংঘর্ষণে চারিদিকে অগ্নি উৎকীর্ণ হইয়া উঠিতেছিল এবং সে আগুণে প্রাচীন বৈদিক যুগাবশেষ-চিহ্ন যজ্ঞ-প্রদত্ত হবির মত জ্বলিতেছিল!

সুতরাং রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা যে নারীচিত্র দেখিতে পাই, ক্ষোভের সময় তাহা স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান ভারতকে গালি পাড়িলে যে বিশেষ সমীচীনতা প্রকাশ পায়, এরূপ কিছুতেই মনে হয় না। মধ্য যুগের বিপ্লব ভারতের জাতীয় ভিত্তিকে প্রবল ভূকম্পনের মত পর্য্যুদস্ত করিয়া তোলে, এবং ধর্ম্মবন্ধনের মতই তাহার সমাজবন্ধন তখন বিকৃত ও বিরূপ হইয়া পড়ে। ভারতীয় স্ত্রী-সমাজের অবস্থা এই সময় হইতেই হীন হইয়া পড়ে, শিক্ষা-সংস্কার বিলুপ্ত হয়, মানসিক শক্তি চালনার পথ রুদ্ধ হয়, গৃহের ভিতর ও বাহির হইতে সর্ব্বপ্রকার অধিকার প্রত্যাহৃত হয়, এবং ক্রমশঃ দেশের স্ত্রী-সমাজ সজীব স্বতন্ত্র মনঃশক্তিসম্পন্ন মানুষ হইতে গৃহের ব্যবহৃত ও রক্ষিত পদার্থসমূহের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়েন।

ভূগর্ভস্থ অগ্নিস্রাব যখন জনপদ উৎসাদিত করে, ভূধর উদ্ভূত করে, সাগর উদ্বেলিত করিয়া দেশসমূহকে সংযোগ-সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করে, ও দূরত্ব হইতে সম্মিলিত করে, তখন সৃষ্টির ভিতর তাহা একটা স্থায়ী স্থান অধিকার করিয়া লয়, সংঘটক কারণের তিরোভাবের সঙ্গে তাহা তিরোহিত হইয়া যায় না। মধ্যযুগের বিপ্লব ভারতবর্ষীয় সমাজের স্নিগ্ধ শ্যাম সমতলে যে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল, তাহার শিলাসূচীময় কঙ্করোৎকীর্ণ স্তূপ সমগ্র জাতির জীবনযাত্রার সহজ সরল সুগম পন্থাকে প্রাচীরবৎ অবরোধ করিয়া আছে; ইহাকে দূর করিতে, অপসারিত করিতে ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিতে আজ সহস্র কর্ম্মীর সাধনা চাই, শক্তি চাই, বজ্রবাহুর প্রয়োগ চাই।

স্ত্রী-শিক্ষা সংস্কারের নামে আজিও দেশের অর্দ্ধেক লোক ভ্রূভঙ্গি করিয়া থাকেন। দেশের নীতিবিদ্‌গণ তাঁহাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী, সুতরাং সেই ভয়াবহ পদার্থটির মোটেই তোমরা উৎকর্ষ সাধন

করিয়ো না, তাহা হইলে কালে তাহা তোমাদের ধ্বংসবিধান করিবে।" সুতরাং বর্গীর ভয়, জুজুর ভয়ের মত দেশে স্ত্রীশিক্ষার নামেও একটা আতঙ্ক সমগ্র সমাজ বেড়িয়া সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন গোল দাঁড়াইতেছে এই যে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা না দিলে, তাহার নিকট হইতে যেটুকু পাওনা সেটুকু ঠিক্ পাওয়া যায় না। বঞ্চনার অমোঘ ফল ক্ষতি। যে বঞ্চিত হয় তাহার অপেক্ষা যে বঞ্চনা করে তাহার ভাগেই শূন্যের মাত্রা বৃহত্তর হয়। মনুষ্যত্বের যে নিত্য অধিকার হইতে সমাজ নারীকে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহার ফলস্বরূপ সে আপনি সেই অধিকার হইতে দিন দিন ভ্রষ্ট হইতেছে, জগতের অপরাপর জাতি যেখানে আপন আপন গৌরব-কেতন উড়াইয়া উল্লাসে জীবনযাত্রা-পথে অগ্রসর হইতেছে, সেখানে সে সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; আপন খর্ব্বতায়, দৈন্যে, হীনতায় সকলের পিছনে দাঁড়াইয়া নিতান্ত কৃপাপাত্রের মত সে চাহিয়া আছে! অতীত তাহার একটা ছিল বটে—জ্ঞানগরিমাময়, শৌর্য্যবীর্য্যময়, কীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাময়, গর্ব্বগৌরবময়—একটা মহনীয় অতুলনীয় অতীত তাহার ছিল বটে, কিন্তু সে শীতস্পৃষ্ট বনানীর বাসন্তী সুষমার মত আজ কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে! মৃত তরুর শুষ্ক কঙ্কালের নীচে দাঁড়াইয়া আজ সে শুধু উর্ণা বয়ন করিতেছে! বলা বাহুল্য মাত্র যে বর্ব্বরতা বর্ব্বরতাকেই জন্মদান করে। যে মূঢ়তার ভিতর সমাজ নারীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে সেই মূঢ়তা প্রতিনিবৃত্তস্রোত জলরাশির মত তাহাকেই মগ্ন করিয়া দিন দিন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার শিক্ষা সাধনা সংস্কার—তাহার শক্তি সাধ্য প্রচেষ্টা—সব ডুবাইয়া সে প্রবাহ স্ফীত হইয়া উঠিতেছে!

মানুষ অমৃতের পুত্র, অমৃতের অধিকারী—একদা ভারতবর্ষ এ বাণী ঘোষণা করিয়াছিল। আমাদের নারীসমাজ—মানুষ তাহারা নয় কি? অমৃতের এই অধিকারীত্ব—বিশ্ব জুড়িয়া যে আমন্ত্রণের উদাত্ত স্বর ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহা কি তাহার জন্যও উচ্চারিত হয় নাই? বিস্মৃতির তিমিরময় কোণে বিশ্বের অবহেলা ও গ্লানির ভিতর সমাহিত হইয়া আত্মাববোধ-বিরহিত এ জীবন কে তাহাদের দিয়াছে? অন্ধের মত অপরের ধৃত যষ্টির অগ্রভাগ ধারণ করিয়াই কি তাহার জীবনের পথ-চলা সাঙ্গ করিতে হইবে, তাহার আপন চক্ষের দর্শনমণির জ্যোতিঃ উদ্‌ভ্রান্ত বিচারের জল্পনাজালে আজীবন আচ্ছন্ন হইয়া

থাকিবে, তাহার শ্রেয়ঃ পরিত্যক্ত, কর্ম্ম উপেক্ষিত, জীবন মিথ্যায় পর্য্যবসান লাভ করিবে! মানুষের ভিতর যে দেবতা আছেন, তিনি অবহেলায় জাগেন না, শ্রদ্ধার মন্ত্রে তাঁহার উদ্বোধন ও বিশ্বাসের অঞ্জলি দানে তাঁহার অধিষ্ঠান সূচিত হইয়া থাকে, এ কথা আমাদের সমাজ আজ ভুলিয়া গিয়াছে। যে মন্ত্রশক্তির প্রভাবে মৃৎ-প্রতিমা প্রাণবন্ত হয় তাহার মূলে এই এক অখণ্ড বিশ্বাস নিহিত নয় কি? হায় আমাদের হতভাগ্য দেশ! মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যেখানে মৃণ্ময়ী প্রতিমাকে চিণ্ময়ী করিবার ব্যবস্থা আছে, সেখানেই ঘরে ঘরে চিণ্ময়ী প্রতিমা কাল্পনিক বিভ্রমের অনুশাসনে মৃণ্ময়ী হইয়া আছে, বিশ্বমানবের অর্চ্চনার স্বর্ণ-দেউল সমাজের নিক্ষিপ্ত আবর্জ্জনায় চির-সমাহিত হইয়া গিয়াছে!

মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আত্মাবোধ। এই স্থল হইতেই তাহার অনন্ত শক্তিধারার উৎস-মুখ খুলিয়াছে। শাস্ত্রানুশাসন, দেশাচারের নির্দ্দেশ, সামাজিক বিধি—মানুষকে কর্ম্মপথে, ন্যায়পথে প্রবর্ত্তিত করিতে পথপার্শ্বে বৃতির মত সহায়তা করিতে পারে মাত্র, নিয়োগ করিতে পারে না। মানুষ স্বতশ্চল, স্বৈরশাসক, তাহার আত্মাবোধই তাহার চেতনার উদ্বর্ত্তন-কেন্দ্র। তাহার আপন চেতনার ভিতর তাহার নিবৃত্তি প্রবৃত্তি, প্রয়োগ ও বিরতিকে প্রাণ লাভ করিতে দেওয়া চাই, নহিলে তাহার সজীবত্ব সচেতনত্ব লোপ পায়। একটা কিছু কহিয়া, একটা কিছু বুঝাইয়া, সমস্ত জীবনের দুঃসাধ্য দায়ীত্ব ভারকে একটা সৌকর্য্যাভিমুখী সহজ নির্দ্দেশের অনুবর্ত্তী করিয়া দিয়া, 'যেন তেন প্রকারেণ' জীবনটা কাটাইয়া দেওয়ার বিধি দু এক দিনের জন্য চলিতে পারে, কিন্তু সে ত সত্য নয়, মানুষের সত্য কার জীবনের, সত্য কার প্রয়োজনের ভিতর জন্মলাভ করে নাই, পরগাছার মত সমাজবৃক্ষের বিশাল কাণ্ডের উপরে বাত্যা-সঞ্চিত ধূলি-স্তরের উপর গজাইয়া উঠিয়াছে, নিত্য কালের মান-মন্দিরে তাহা একদিন অপরিহার্য্যতঃ ধরা পড়িবেই। যাহা মিথ্যা, যাহার মূল সত্যে নিহিত নাই, তাহা কখনও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। মানুষ আপনার অন্ধতায়, বিভ্রমে, মূঢ়তায়, বিধির পরে বিধি গড়িতে থাকে, আচারের পরে আচার সৃষ্টি করিতে থাকে, ধারার পরে ধারা প্রবর্ত্তিত করিতে থাকে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তাহা জীবনের সত্য স্বরূপেতে পঁহুছায়, উর্ণার মত তাহা কেবলই ছিঁড়িয়া

যাইতে থাকে, মৃৎ-স্তূপের মত কেবলই গলিয়া যাইতে থাকে, মানুষ সার্থকতার সাক্ষাৎ ততদিন কিছুতেই পায় না।

কার্লাইল বলিয়াছিলেন, * "মানুষ যখন মনে করে, যে বাঞ্ছিত পদার্থ লাভের আশা অথবা সুখ লাভের আশা—ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক সুখের প্রলোভন মানুষকে মহৎ কর্ম্মে প্ররোচনা দান করে—তখন সে সমগ্র মনুষ্যজাতির বিরুদ্ধে গ্লানি উচ্চারণ করে। যে দরিদ্র সৈনিক অর্থের নিকট আপনার জীবন বিক্রয় করিয়াছে, তাহার সামরিক শিক্ষা ও দৈনিক বেতন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটা গর্ব্ব বোধ আছে,—সে তাহার আপনার অন্তর্নিহিত শক্তির বোধ, বীরের সম্মানের বোধ; মানুষের অন্তরের অন্তরতম তলে বিচেতনে যে আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাহা সুখলাভ প্রিয়-লাভের চেষ্টা নয়,—ঈশ্বরের এই সৃষ্টিতে আপনাকে ঈশ্বরের হাতের সৃষ্টি বলিয়া পরিচয় দিবার গূঢ় কামনা। সে কামনা ব্যক্ত করিবার অভিলাষ উদ্দীপ্ত করিয়া তোলা যাক্, অতি হীন দিন-মজুর যে, তাহারও চিত্তবর্ত্তিকা তাহার মহিমার প্রভায় জ্বলিয়া উঠিবে! তাহার অন্তরের মাঝখানে যে একটি সূক্ষ্ম চেতনার শিখা স্তিমিত হইয়া আছে, তাহাকে একবার প্রজ্বলিত করিয়া তোলা যাক্, তাহার নিম্নতম সমস্ত প্রবৃত্তি তাহার স্পর্শে একযোগে জ্বলিয়া উঠিবে।" দুর্ভাগা ভারতের দুর্ভাগিনী কন্যাগণ! মানুষ তাহারা নয় কি? যে অধিকার পথপার্শ্বের হীনতম ভিক্ষুকের আছে, দীনতম শ্রমজীবীর আছে, সেই অধিকার—বিধাতার এই মহিমাময় সৃষ্টিতে আপনাকে বিধাতার হাতের গড়া মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার এই অধিকার তাহাদের নাই কি? পুত্তলিকার মত তাহাদের চরণ আছে, তত্রাচ চলিতে পারে না, কর্ণ আছে তত্রাচ শুনিতে পায় না, চক্ষু আছে তত্রাচ দেখিতে পায় না, অতীত কালের অনুশাসন দোলকযন্ত্রের মত তাহাদের অত্যন্ত পরিমিত যে স্থানটুকুর ভিতর বাঁধিয়া দিয়াছে, তাহার ভিতর তাহারা ধীরে দুলিতেছে; জাতির প্রয়োজন ও সঙ্কটের আর্ত্ত স্বর তাহার ফ্রেমে আঁটা বিচরণ-স্থানের বাহিরে প্রত্যাহত ঝড়ের বাতাসের মত কাঁদিয়া মরিতেছে।

চক্ষু থাকিলে কর্ণ অনাবশ্যক, অথবা কর্ণ থাকিলে চক্ষু অনাবশ্যক, এরূপ

* Hero-worship, The Hero as Prophet.

কথা অবশ্য কেহই বলেন না, অথচ আমাদের বিজ্ঞ সমাজনেতৃগণ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে স্ত্রীদিগের গৃহকর্ম্মনৈপুণ্য একমাত্র বাঞ্ছনীয় গুণ, জীবনের ও সমাজের সমস্ত প্রয়োজনের দাবী তাহাতেই সমাহিত, অপর যাহা কিছু তাহা সব অনাবশ্যক।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, সমাজ নারীর নিকট হইতে কি আশা করেন। ভৃত্যের অজ্ঞানুবর্ত্তিতা, সেবকের পরিচর্য্যা—প্রসাদজীবীর আত্মবিলোপ—জীবনের কারবারে ছিদ্রদুষ্ট এই মুদ্রা কয়টিই কি তাহার মূলধন? মানিয়া চলা যাক্ আর না যাক্ সত্য কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না, সমাজ নারীর নিকট প্রত্যাশা করেন, জীবনের সহযোগীতা—পুরুষের সঙ্গে পরস্পরের সহায়তার যে অবিচ্ছিন্ন যোগের উপর ভগবান তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহারই পরিপূর্ণতা। এই পূর্ণতাকে পূর্ণ করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, যত খানি প্রয়োজন—দৈন্য, আত্মবিলোপ, অনুবর্ত্তিতা—তাহাই শ্লাঘনীয়, গ্রহণীয়; যাহা কিছু বিরুদ্ধ, বিপরীত, তাহাই গর্হণীয়, বর্জনীয়। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের স্ত্রী সমাজের যে অবস্থা তাহাতে এই উদ্দেশ্যের সফলতা ও সার্থকতার পথ কতটা আছে—এখনও তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসে নাই কি?

কর্ত্তব্য সম্পাদন ও ধারণা করিতে গেলে প্রথমে চাই দায়িত্ববোধ, মানব-মনীষার তাহা ভিত্তিস্তর। মানুষের মনুষ্যত্বের প্রথম উপাদান এই দায়িত্বোপ-লব্ধিতে প্রকটিত। বর্ত্তমান ভারত তাহার স্ত্রী-সমাজকে এই দায়িত্বোপলব্ধির সুযোগ কতটা দিয়াছে তাহা এ স্থলে একবার আলোচনা করা যাক্। 'মানুষ' বলিতে আমরা হস্ত-পদ-নাসা-কর্ণ-মস্তকবিশিষ্ট জীবের অবয়ব-সমষ্টিকেই যে বুঝি এরূপ ঠিক্ বলা যায় না। মানুষের যে আভ্যন্তরীণ সত্তা মানুষের ইচ্ছা ও আকা-ঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, চেষ্টাকে জাগ্রত করে, শুভ ও অশুভ বোধকে লালন করে, বুদ্ধিকে বিকশিত করে, জ্ঞানকে উন্মেষিত করে;—সে-ই মানুষের প্রকৃত সত্তা, অন্যথা পৃথিবীর অনন্ত জীবপুঞ্জের ভিতর মানুষও একটা জীবপর্য্যায় মাত্র, বিধাতার জগতের উপর তাহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কিছুমাত্র নাই। মানুষের এই মনঃশক্তি, যাহা লইয়া মানুষ মানুষ, যাহা ব্যতিরেকে জগতের অপরাপর জীবপর্য্যায়ের সহিত তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য নাই—দেশের স্ত্রী-সমা-জের সেই মনঃশক্তি আজ কোথায় সমাহিত? সমাজ, জাতি যাহার উৎসঙ্গে

লালিত হইতেছে, বর্দ্ধিত হইতেছে, প্রকৃতি গ্রহণ করিতেছে, তাহারাই কি সমাজের আবর্জ্জনা, তাহারাই কি জীবনের অপগতি? সেই কোন্ যুগে কোন্ রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার উৎক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ তাহার স্ত্রী-সমাজকে গোপনতার অন্তরালে আত্মবিলোপের দুর্ভেদ্য তিমিরে রক্ষার নিরাপদ দুর্গ রচনা করিয়াছিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে তবু তাহাদের সে অজ্ঞাতবাসের অনন্ত রাত্রি পোহাইতেছে না, যে তিমিরে সে তিমিরেই তাহাদের দিন কাটিতেছে! অন্ধকারে বাস করিয়া তাহাদের চক্ষের জ্যোতিঃ মরিয়া গিয়াছে, নিস্তব্ধতার বিরাম তাহাদের শ্রুতিপথে প্রস্তরের মত চাপিয়া আছে, নিশ্চেষ্টতায় তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া গিয়াছে! ভারতবর্ষের স্ত্রী-সমাজ? এই জড়বৎ মৃত্যুকালিমাচ্ছন্ন বিবর্ণ স্ত্রী মূর্ত্তিগুলি—এই কি তাহারা? তবু ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে ভারতবর্ষের দেবতা নারীরূপে পূজা পাইতেছেন,—শক্তি শিবের বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, মহেশ্বর অন্নপূর্ণার দ্বারে অন্ন যাচ্ঞা করিতেছেন, কিশোরীর প্রসন্নতার জন্য মথুরানাথ ভূমিতে জানু নত করিয়া আছেন! ভারতবর্ষ যে রূপকে তাহার পূজামন্দিরে স্থাপিত করিয়া অর্চ্চনা করিতেছে, সে রূপ তাহার চরণতলে নিষ্পিষ্ট হইতেছে, তাহার উষ্ণশ্বাসে আকাশ ভরিয়া উঠিতেছে, নেত্রনীরে ধরণী সিক্ত হইতেছে! আশ্চর্য্য পূজাপদ্ধতি এ!

গার্হস্থ্যধর্ম্ম নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—সহস্রবার তাহা স্বীকার্য্য। জীবিকা উপার্জ্জন যেমন পুরুষের কাজ, গার্হস্থ্য কর্ম্ম তেমনি নারীর-ই কাজ। জীবনের ইহা আধিভৌতিক অংশ, তাহা চরম ও পরম বিষয় নয়। জীবনরক্ষায় জীবমাত্রের যাহা প্রয়োজন, ইহা তাহারই অঙ্গীভূত, কিন্তু একমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন ও আরামসাধন মানুষের মনুষ্যত্বের উপাদান নহে, তাহার যে চেতন অংশটা তাহার জড় অংশকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে পরিণতি প্রদান করাতেই তাহার শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব। মানুষের জীবনের গতি নদীর অবাধ, নিরন্তর-প্রবাহিত ধারার মত দিকে দিকে উৎসারিত হইয়া গিয়াছে, থামিবার জায়গা তাহার কোথাও নাই, একটা উচ্চ ভূমি পার হইলেই তাহার চলা শেষ হয় না, ক্রমাগতই তাহাকে বন্ধুরতা অতিক্রম করিতে হইতেছে; পিছনে সে যাহা ডুবাইয়া যাইতেছে, তাহার মূল্যে তাহার ভবিষ্যৎ বিকায় না। প্রবাহমুখে নিমজ্জিত পশ্চাতে ত্যক্ত এই ভূখণ্ডের মতই মানুষকে সম্পন্ন কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া সম্মুখের অসম্পূর্ণ কর্ম্মভারের

প্রতি অগ্রসর হইতে হয়, কোনও খানে গিয়া সে বলিতে পারে না, এইখানে আমার কাজ শেষ হইল, অতঃপর আমি থামিলাম।

মনুষ্যত্বের এই যে ধারা বিভিন্নমুখী চেষ্টায়, বিভিন্নমুখী কর্ম্মে সহস্ররূপে সহস্র দিকে ধাবমান হইতেছে, জাতির, সমাজের স্থিতি যাহাতে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহার কেন্দ্র-মূলে কাহার শক্তি বসুন্ধরার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত অনাহতরূপে বিদ্যমান? জননীগণ! ভগিনীগণ! সে শক্তি যে তোমরা! জীবন ক্রীড়াভূমি নয়, বিলাসাগার নয়, বিরাম-শয্যাও নয়—ধূলার ভিতর অঙ্গ গোপন করিয়া যে হীনতম কীট দণ্ড কয়েকের পরমায়ু লইয়া বিচরণ করিতেছে, তাহারও জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে, আমার আত্মবিস্মৃতা জননী ও ভগিনীগণ তোমাদেরই তাহা নাই কি? তোমার অঙ্কশায়ী যে শিশুকে তুমি স্তন্যদানে পালন করিতেছ,—দেখ নাই কি ভাল করিয়া বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতে না হইতে সেও তোমার নামে অবজ্ঞায় অধর কুঞ্চন করে! পশু অপেক্ষাও হীন, -জড়ের মত নিশ্চল, যন্ত্রের মত নির্ব্বিকার, ফুৎকারবাহী বেণুদণ্ডের মত স্বরহীন—এই কি তোমাদের জীবন? বিধাতার এই মহিমাময় সৃষ্টিতে বিধাতার হাতের গড়া মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার সে অধিকার কোথায় তোমার আজ? সমাজের মিথ্যা দম্ভ, উপশাস্ত্রের অত্যুক্তি ও অত্যাচার—জীর্ণ জটিল জালের মত ছিন্ন করিয়া এস নারী আজ মনুষ্যসমাজের অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে বাহির হইয়া এস! জননীগণ! দাবী কর তোমার পুত্রগণের নিকট হইতে সেই অধিকার, যে অধিকার তুমি তাহাদের দিয়াছিলে, এবং যে অধিকার হইতে তাহারা তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছে! জাতির উন্নতি? হায় অন্ধ জনমণ্ডলি! কোথায় তাহার ভিত্তি? ধনসম্পদে নয়, যান্ত্রব ঔৎকর্ষে নয়, শক্তিবত্তায় নয়, জ্ঞানমত্তায় নয়, জাতীয় উন্নতির সে মূল ও স্থিতি জাতির চারিত্রিক উপাদানে নিহিত, এবং সে উপাদান একমাত্র মাতাই শুধু পুত্রকে দিতে পারেন!

ভারতবর্ষের সমসাময়িক যে সব জাতি সভ্যতার শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, সেই গ্রীস, রোম, মিশর জগতের ইতিহাসের কোন্ পৃষ্ঠায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেই উচ্চ গগনস্পর্শী তূর্য্যনিনাদ কোথায় আজ লুপ্ত হইয়াছে! কিন্তু এই রিক্তবেশ ভিক্ষু ভারতবর্ষ জরা-নমিত লোল মূর্ত্তিতে চারিধারে আকীর্ণ মৃত জাতির শবের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে! বিস্মিত হইয়া সকলে চাহিয়া বলিতেছে, কোথায় পাইল এ এই জীবনীশক্তি, এই অক্ষয় প্রাণ! শক্তিশূন্য এই

দীন কোথায় পাইল এ অমরতা! ভারতবর্ষ মরে নাই তাহার চরিত্র গৌরবে, ভারতবর্ষ মরে নাই তাহার আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে, ভারতবর্ষ মরে নাই তাহার সমগ্র সমাজের সম্মিলিত একাগ্রমুখী সাধনায়! যে সাধনায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পুরুষ, নারী, গৃহী, সন্ন্যাসী সমভাবে যোগদান করিয়াছে; যে সাধনায় কেহ কাহাকে অতিক্রম করে নাই, যে সাধনায় কেহ কাহারও হন্তারক হয় নাই!

ভারতবর্ষ সমাজকে যে উচ্চ ভূমির উপর উন্নয়ন করিয়াছিল, একা পুরুষই কি তাহার স্থিতি প্রদান করিয়াছিল, আর কীটের মত নারী আবর্জ্জনায় সমাহিত হইয়াছিল? ভারতের ইতিহাস এ সাক্ষ্য বহন করে না! পুরুষ আহরণ করে, নারী তাহা রক্ষা করে। সৃষ্টির ভিতরে ইহা বিধাতার নির্দ্দিষ্ট নিয়োগ। ভারতবর্ষের জ্ঞান, ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যা অনাবৃত কর্পূরের মতই উড়িয়া যাইত, যদি তাহা কেবলমাত্র পুরুষের শিক্ষাভবনে বদ্ধ থাকিত এবং সমাজের অন্তর্জ্জীবনে প্রবেশ করিয়া জাতির অন্তরের রসে জীর্ণ হইতে না পাইত! মূল মৃত্তিকার তলে থাকে বলিয়া যে তাহা গাছের কিছু নহে, ইহা নিশ্চয়ই কেহ মনে করে না, শাখা কাণ্ড-ফুল-ফল-পল্লব-সমন্বিত নভরোধী তাহার যে বিপুলতা—তাহা শুধু সেই মাটীর গভীর তলে অদৃশ্য মূলপুঞ্জের উপরেই নির্ভর করে। নারী সমাজের এই অলক্ষ্য গোপন মূলের মত; সমাজের শিরায় উপশিরায় যে রস প্রবাহিত হইতেছে নারী তাহার সংবাহিকা শক্তি, উপেক্ষায় তাহাকে পায়ের নীচে দলিত করিলে কিম্বা আত্ম-গৌরব-মদে তাহাকে ছিন্ন করিলে সে অপচার সমস্ত জাতির মস্তকের উপর অবতরণ করিবে! বর্ত্তমান যুগের ভারতবর্ষ আপনাকে সে অভিশাপ হইতে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছে কি? এ কথার উত্তর দিতে ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানও হয় ত লজ্জায় অধোবদন হইবেন!

স্ত্রী-সমাজের অবনতি সমগ্র সমাজকে অবনত করে কিনা বিগত শতাব্দী তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অবশ্য এরূপ কিছুতেই বলা যায় না যে আমাদের এই বিলীয়মান যুগে উল্লেখযোগ্য শ্রদ্ধাযোগ্য বিষয় কিছুই ছিল না, কিন্তু তত্রাচ তাহা যে জাতির স্বাধীন চেতনা নয়, সমাজ যে সচেতনে অপেক্ষা বিচেতনে তাহার অনুবর্ত্তন করিতেছিল, একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। সমাজ যাঁহাতে অবস্থিত, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বর্দ্ধিত—তাঁহাকেই শিক্ষা ও সংস্কার হইতে সর্ব্বথা বঞ্চিত করিয়া, মানুষের অধিকার হইতে বিতাড়িত করিয়া, জাতির সত্তার বাহিরে

নিক্ষেপ করিয়া সমস্তটা দেশ অপরূপ প্রাধান্যমদে আমাদের সমাজ কূর্ম্মটিকে লঘু-পক্ষ ব্যোমচারী বিহঙ্গ কল্পনা করিয়া তাহাকে গগনমার্গে প্রেরণ পূর্ব্বক তাহার বৈকুণ্ঠ প্রয়াণের আশা পোষণ করিতেছিলেন! কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম শুধু শিশুদের জন্য নয়, বয়স্কদের জন্যও তাহা ব্যবস্থিত এবং জ্ঞানী অজ্ঞানী তুল্যরূপেই তাহার ব্যভিচারের ফল ভোগ করিয়া থাকেন। জগতের যিনি বিধাতা পুরুষ, তিনি এ স্থলে কাহাকেও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন না।

উৎস-মুখে জলধারা যখন বন্ধ হইয়া আসে, তখন নদী মরিয়া যায়। মানুষ তখন স্মরণ করে যে দুর্দ্দর্শ গিরির অরণ্যাচ্ছন্ন গোপন কন্দর হইতে যে জলপ্রবাহ এই নদীকে বিস্তারে, শক্তিতে, উচ্ছ্বাসে, কলরোলে জগতের কাছে প্রেরণ করিয়াছিল, সে জলপ্রবাহ আর ইহাকে ধারা দান করিতেছে না, শিলারুদ্ধ হইয়া তাহা মরিয়া গিয়াছে; যে নারীর উৎসঙ্গে জাতি জন্মগ্রহণ করে, যাহার অঙ্গুলি ধারণ করিয়া প্রথম পদক্ষেপ করিতে শিখে, শারীর প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে নারী তাহাকে মানস প্রকৃতি দান করে,—জননী, ভগিনী, জায়া, দুহিতারূপে যে নারী তাহার জীবন বেষ্টন করিয়া আছে,—তাহাদের চিত্ত-নদীর ধারাকে পঙ্কিল আবর্জ্জনাদুষ্ট করিয়া জাতি কখনও স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। দুর্দ্দর্শ গিরির গোপন কন্দর হইতে প্রবাহিত এই যে অদৃশ্য ধারাটি—ইহাই যে জাতির প্রাণ; মিথ্যা দম্ভের মোহে জাতি এ কথা যখনই বিস্মৃত হয়, তখনই আত্ম-বিনাশের পথ মুক্ত করে। ভারতের সংস্কারহীন অন্তঃপুরের শুষ্কস্রোত পঙ্কধারাই কি আজ ভারতের সমগ্র জাতির চিত্ত-ধারাকে মলিন করিয়া তুলিতেছে না? যত কিছু তাহার হীনতা, যত কিছু তাহার দৈন্য, যত কিছু তাহার কলঙ্ক, তাহার তমসাচ্ছন্ন অন্তর্জ্জীবনের নিশ্চলতা হইতেই কি জন্মগ্রহণ করিতেছে না? শৈশবে—সংস্কার-অর্জ্জন ও ধারণা-গঠনের সময় যে অজ্ঞান ও অপসংস্কারের ছাপ লাগিতেছে, বিদ্যা-মন্দিরে স্ফটিক পাত্রে রক্ষিত গণ্ডুষ জলে সে মসীলেখা কখনও উঠিতেছে না এবং উঠিবে না; অগ্নি দহন করে না, এ কথা বলিলেই অগ্নির দাহিকা শক্তি লোপ পায় না। জাতির যাহারা প্রাণস্বরূপ, তাহাদের জাতীয় সত্তার বাহিরে আবর্জ্জনায় নিক্ষেপ করিয়া জাতি কখনও জীবন লাভ করিতে পারিবে না। সমাজে নারীর প্রভাব যেখানে যত কম, সেখানে নৈতিক অবনতি তত গভীরতর। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গসমাজ যখন অন্তঃপুরে

পদার্পণ করিতেন না,—সে সময় বাহির বাড়ীর পৃথক্ খণ্ডে যে লীলা অভিনীত হইত, তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহিতে বঙ্গবাসীর মুখ কি নত হইবে না? শ্রীহট্ট অঞ্চলে অদ্যাপি এ প্রথা বর্ত্তমান আছে। সমাজের এ কলঙ্ক কালিমা যেদিন বিদূরিত হইবে,—পশু-মানবের অপকলঙ্ক হইতে মানুষের গৌরব-গরিমা তাহার ললাটে বিভাতিত হইবে, যেদিন জননী পুত্রের অঙ্গুলি ধারণ করিয়া দাঁড়াইবেন, পত্নী পতির পার্শ্বে দাঁড়াইবেন! স্ত্রী সমাজ যেখানেই ক্রীড়া-পুত্তলী ও বিলাসোপকরণ হইয়া আছেন সেখানেই সমাজের অধোগতি অনিবার্য্য হইয়াছে। পুত্র কখনও শুভ প্রকৃতি বিশিষ্ট হইতে পারে না, মাতা যদি তাহাকে প্রতি পদক্ষেপে দুষ্প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা না করেন। পতি কখনও আপনার উন্নত হৃদয়-গরিমা বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন না, পত্নী যদি তাহার পরিপন্থী হন। দুর্ব্বল, অক্ষম শক্তিহীন নারী—তাহারই ক্ষুদ্র মুষ্টির ভিতর সমগ্র জাতির চারিত্রিক বিকাশ বদ্ধ—জাতি আজ এ কথা স্মরণ করুন।

নারীর শ্রেষ্ঠ শক্তি, মাতৃশক্তি। এত বড় একটা শক্তির অপচার যে দেশ আপনার আলস্য-লালিত নিশ্চেষ্টতার ভিতর পরম যত্নে পালন করিতেছে,—যে দেশ বলে, 'নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ঘটিতে দিও না, তাহা হইলে হে প্রভুপদপ্রাপ্ত পুরুষগণ! তোমাদের আপন ব্যক্তিত্ব তাহার নীচে চাপা পড়িবে; তাহাদের নেত্রুন্মীলন করিয়ো না, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের বিচারক হইয়া বসিবে; তাহাদের চরণের শৃঙ্খল মোচন করিয়ো না যেহেতু তাহারা তোমাদের অতিক্রম করিবে', সে দেশ একের স্বার্থকে আত্যন্তিক রূপে রক্ষা করিতে গিয়া সমগ্র জাতির স্বার্থকে কি সমূলে উচ্ছেদ করে নাই? জড়ের সাহচর্য্য কি তাহাদিগকেও জড় করিয়া তোলে নাই? অন্ধতার সঙ্গ কি তাহাদিগকেও অন্ধ করিয়া তোলে নাই? আপনাদের রচিত কারার দুয়ার রক্ষা করিয়া তাহারা কি আপনাদিগকে বন্দী দশায় আনয়ন করে নাই?

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট মদ্য শ্রেষ্ঠত্বাভিমান। মানুষ যখন মনে করে যে তাহার উপর বিচারক আর কেহ নাই, তাহার কর্ম্মের কৈফিয়ৎ লওয়ার আর কেহ নাই, তখন সে ঠিক্ আপনার ভার-সাম্য রক্ষা করিতে পারে না, স্বেচ্ছাচার তখন তাহার অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সমাজের একটা অংশকে মৃতের মতন নির্ব্বিচার আনুগত্যের নাগপাশে অষ্টাঙ্গে বন্ধন করিয়া অপর অংশকে বেকসুর

খালাস দেওয়া—ইহাকে সমাজের শক্তি সামঞ্জস্য বলে না, শক্তির অপব্যয় ও অপচার বলে। ইহা সমাজের মৃত্যু আনয়ন করে।

প্রাণীমাত্রেই জীবনধারণের চেষ্টা করিয়া থাকে, ও তদুপযোগী আয়োজন ও প্রয়োজনে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া থাকে। মানুষ যদি সৃষ্টির এই প্রাথমিক অবস্থার ভিতরেই চিরকাল দাঁড়াইয়া থাকে, যদি কেবল মাত্র জীবন ধারণের আয়োজনে ও প্রয়োজনের ভিতরেই যদি তাহার শক্তি ও প্রচেষ্টার শেষ সীমা হয়, তবে জীব জগতের অন্যান্য জীব পর্য্যায়ের সহিত তাহার কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। কেবলমাত্র জীবন ধারণ করিয়া মানুষ মানুষ হইতে পারে না, জীবন ধারণ করিয়া জীবন ধারণের উদ্দেশ্যটা তাহার সঙ্গে পূর্ণ করা চাই; নহিলে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যর্থ, তাহার জন্য সৃষ্টি ভরিয়া কাননে কান্তারে জলে স্থলে আকাশে বাতাসে যে বিরাট আড়ম্বর চলিয়াছে সৃষ্টির ইতিহাসে তাহার কোনও অর্থ, কোনও সার্থকতা নাই। সহায়তার আদান প্রদান জড়ের সঙ্গে চেতনেরও চলিয়াছে। "অরা ইব রথনাভৌ" একটা অখণ্ড যোগের উপর সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত। অথচ আধখানা জগৎ জুড়িয়া যাহারা অবস্থিত—সেই নারীরই তাহাতে স্থান নাই? ঘূর্ণ্যমান সমাজ-চক্রের মাঝখানে কীলকের মত যাহারা মনুষ্য সমাজের যোগসন্ধি ধারণ করিয়া আছে, তাহাদের স্থানচ্যুতি কি সমগ্র সমাজের স্থানচ্যুতি ঘটাইবে না?

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরানিবোধত!" ভারতের কন্যাগণ, জাগ, তোমরা জাগ, তোমাদের শ্রেয়ঃকে তোমরা বরণ করিয়া লও। যে দুর্ভাগা জাতি মিথ্যা অহমিকার মোহে আপনার কল্যাণকে পদতলে দলিত করিয়া তোমাদের কারাকূপে নিক্ষেপ করিয়াছে,—কল্যাণিগণ! তোমরা আপনি তাহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াও! জননীগণ! জান না কি তোমরা সন্তানের প্রথম পদক্ষেপের শিক্ষা তোমার শিক্ষা, ভাষা শিক্ষা তোমার-ই কণ্ঠের অনুকৃতি, বিচার বুদ্ধি তোমার প্রদর্শিত বুদ্ধির প্রতিচ্ছায়া? অর্জ্জিত সংস্কারের সমষ্টি লইয়া মানুষ গঠিত হয়, তোমার সন্তানকে আরণ্য পশুর হস্তে প্রতিপালিত হইতে দাও আহারে বিহারে রুচিতে সেও শ্বাপদত্ব প্রাপ্ত হইবে। মানুষ মানুষ হয়, মানুষের সংস্কার অর্জ্জন করিয়া ও মানুষের পদ্ধতিতে তাহার অনুশীলন করিয়া। এই সংস্কার, এই অনুশীলন মনুষ্যত্বের এই বিকাশ-সাধন মনুষ্য-সন্তান কোথা হইতে

প্রাপ্ত হয়? শিক্ষাগারে নয়, সভাসমিতিতে নয়, রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে নয়, বিজ্ঞানাগারে নয়, সমাজের নিকট নয়, পিতার নিকট নয়, অয়ি আমাদের জননীগণ! মনুষ্য-সন্তান তোমা হইতেই তাহা প্রাপ্ত হয়! ক্ষুদ্র নও, দুর্ব্বল নও, অক্ষম নও, তুমি নারী, সমগ্র সমাজের শুভ, জাতির শুভ তোমার হস্তে বিধৃত রহিয়াছে, বাহির হইয়া এস তুমি মানবের অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে জীবনক্ষেত্রে! উষার মত অনবদ্য মহিমায় তোমরা তিমির-মগ্ন জাতির জীবনে শুচি রুচির জ্যোতিতে উদিত হও; গঙ্গোত্রীর পাবনী ধারার মত তোমার পবিত্রতায় তাহার সব কলঙ্ক ধৌত করিয়া লউক!

ভারতের প্রাচীন ঋষি বলিয়াছিলেন, "আত্মানং বিদ্ধি"!—আপনাকে জান! কেননা মানুষের মনুষ্যত্ব-লাভের পথ, আপনাকে জানার ভিতর নিহিত। যে শাস্ত্র তোমাকে নিয়ত শুনাইতেছে "তুমি কিছু নও, তোমাতে কিছু নাই," সে মিথ্যা উপশাস্ত্রের চীৎকার তোমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে দিও না, যে দেশ একদা নারীকে শক্তি-স্বরূপিণী বলিয়া দেবী-বৎ পূজা করিয়াছে,—যাহার সাহচর্য্য ভিন্ন পুরুষের ক্রিয়া নিষ্ফলা হইয়াছে—এ বাণী তাহার বাণী নয়, যে আচার আজ অভিশাপের মত সমগ্র দেশকে মন্ত্রমোহিত করিয়া রাখিয়াছে—এ বাণী তাহার রচিত ছদ্মভাষ! কিছু নহ তোমরা? কল্যাণীগণ! শুনিয়ো না তোমরা এ মিথ্যাগ্লানি! অপরের আরোপিত ক্ষুদ্রতায় আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া, অপরের রচিত দৈন্যে আপনাকে দীন করিয়া আমার কোটি কোটি দুর্ভাগিনী ভগিনীগণ! তোমরা আপনাকে অবগত হও, তোমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে অবগত হও, তোমাদের আত্মবোধকে অবগত হও, তোমাদের আত্মমর্য্যাদাকে অবগত হও! জাগিয়া ওঠ তোমরা, দম্ভে নয়, দ্বন্দ্বে নয়, বিরোধে নয়, আপনার অহঙ্কারে নয়, আত্মসুখচেষ্টায় নয়, আপনার প্রাধান্য গর্ব্বে নয়; স্নেহশালিনীগণ! যে স্নেহ তোমাদের অক্ষম শিশুর কাছে আপনার সমস্ত ক্ষমতাকে জাগাইয়া তোলে,—দুঃখকে আনন্দস্বরূপ করে, বেদনাকে বিস্মৃত করে, ক্লেশকে মধুর করে, শক্তিকে প্রাণপূর্ণ করে,—যে স্নেহ অনুরাগ তোমার নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা অভিলাষকে নিমজ্জন করে, তোমার আপন সত্তাকে উৎক্রান্ত করে,—সেই মহনীয় শক্তির গৌরবে তোমরা জাগ; অধঃপতনের দুর্গতি ও দুর্দ্দশা হইতে জাতিকে রক্ষা কর! দুর্নীতি যেখানে জন্ম গ্রহণ করে, কদাচার ও কুপ্রথা

যেখানে লালিত হয়, নীচতা ক্ষুদ্রতা যেখানে নীড় রচনা করে, অন্ধকার যেখানে বিষাক্ত কীট সমূহকে জন্মদান করে—গৃহলক্ষ্মীগণ! সেই কি তোমাদের গৃহ? সেই গৃহে তোমরা সন্তানকে অবাধে বিচরণ করিতে দিতেছ, প্রিয়তমের বিশ্রাম-শয্যা রচনা করিতেছ, সহোদর ভ্রাতার প্রীতি-মিলনের আসন সংস্থান করিতেছ? দেখিতেছ না কি তোমরা চাহিয়া অন্ধকারে সন্তানকে তোমরা যে স্তন্য পান করাইতেছ—তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিষ পান করাইতেছ! কুরুচি, কুশিক্ষা, কুনীতি—তোমার অঙ্কশায়ী শিশুসন্তান তোমার স্তন্যের সঙ্গে গ্রহণ করিতেছ! যে হস্তে তোমরা প্রিয়তমের ললাটের ঘর্ম্ম মুছাইতেছ—দেখিতেছ না কি তোমরা তোমাদের হস্তলিপ্ত পঙ্ক তাহার সঙ্গে তাঁহার ললাটে লেপন করিয়া দিতেছ! তোমাদের ক্ষুদ্রতায় দীনতায় তাঁহাকে আক্রান্ত করিতেছ! আজ এ জাতির অবনতির পাপ জান কি কল্যাণীগণ, কাহার মস্তকের উপরে পুঞ্জিত হইতেছে? ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে, সমাজ সাক্ষ্য দিবে, জাতি সাক্ষ্য দিবে—আত্মজ্ঞান, আত্মাব-বোধ-বর্জ্জিতা নারী! সে পাপ তোমার মস্তকের উপরেই স্তূপীকৃত হইতেছে! তুমি অবনত হইয়া জাতিকে অবনত করিয়াছ, তুমি ছোট হইয়া জাতিকে ছোট করিয়াছ! তুমি উত্থিত হও, পতিত জাতি উঠিয়া দাঁড়াইবে, তুমি মহনীয়া হও, কলঙ্কিত সমাজের মহিমা-গৌরবে জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে!

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

প্রহেলিকা.

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নদীরাম লোকটা বড় বোকা—সরল—শান্ত। চেহারাটাও বুদ্ধি সদৃশ,—পাঁচ হাত লম্বা—নাকটা চেপ্টা—রংটা কাল—পা দুখানা মস্ত মস্ত। কিন্তু ঈদৃশ কুৎসিৎ কলেবরের অভ্যন্তরে যে হৃদয়টি লুক্কায়িত ছিল, তাহা প্রভু ও প্রভুপত্নীর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসায় এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে পূর্ণ ছিল।

এই সুযোগে, উত্তরের ঘরের বারেন্দায় উপবিষ্টা তবুর আমার কথাটীও বলিয়া নেই। 'আমা' বালিকার ভাষায়, 'আজি মা' কথাটীর সুমিষ্ট অপভ্রংশ বিশেষ। তিনি রমাপ্রসাদ বাবুর পিতার কনিষ্ঠা ভগ্নী। বাল-বিধবা। তাহার ভাগ্যে শ্বশুরালয় দর্শন হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই পিতার সংসারে আছেন।

এক সময় গ্রামে ইহার দুর্দ্দান্ত প্রতাপ ছিল। তখন ইহার মুখের কাছে কেহ দাঁড়াইতে পারিত না। গলা এমন ছিল, যে মিঠা দীঘির এপার হইতে ডাক দিলে ওপারের ধোপা ও নফরের বৌরা থর থর কাঁপিয়া উঠিত। কিন্তু এক্ষণে বয়স হইয়াছে—পূর্ব্বের সে তেজ আর নাই। এখন কেবল ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় ও তাহাদের সন্তান সন্ততিগণের সুখদুঃখের দিকে চাহিয়া জীবন কাটাইতেছেন। রমাপ্রসাদ বাবু ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনেকটা ইহার যত্নেই মানুষ হইয়াছেন। উভয়েই ইহাকে বড় ভক্তি করিতেন—ভালবাসিতেন ও যত্ন করিতেন।

একটু রাত্রি হইয়া আসিল। মোক্ষদা সুন্দরী রান্না শেষ করিয়া, নদীরামকে আহারের জায়গা প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিলেন।

সান্ধ্যকৃত্যাদি সমাপন করিয়া রমাপ্রসাদ বাবু তামাক খাইতেছিলেন ও পিশিমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। নদীরাম আসিয়া বলিল, 'রান্না হয়েছে।'

'যাই' বলিয়া, তিনি হাতের হুঁকা রাখিলেন। তৎপরে ক্রীড়ানিরতা কন্যার দিকে চাহিয়া, 'চলমা খেতেচল' বলিয়া তাহাকে ডাকিলেন।

তবু তখনও পুতুল লইয়া ব্যস্ত। পিতার আহ্বান শুনিয়া 'চল বাবা' বলিয়া, পুতুল কয়টি আঁচলে লইয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া, স্নেহভরে এলোথেলো কেশগুচ্ছ সমূহকে হাতদিয়া কপাল হইতে ধীরে ধীরে সরাইতে সরাইতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

রমাপ্রসাদ বাবু তবুকে বড়ই ভালবাসিতেন। কেন বাসিতেন? বুঝি, তাহার মুখখানি তাহার নিজ জননীর স্নেহপূর্ণ মুখখানির কথা স্মরণ করাইয়া দিত। বুঝি, বালিকার স্নিগ্ধ ব্যবহারে, কোমলকণ্ঠে, তিনি তাঁহার স্নেহের ও যত্নের আভাস পাইতেন।

প্রকৃতির কি মধুময়ী সৃষ্টি এই কন্যা! কত কোমলতা ও মমতা দিয়া তাহার প্রাণটি গঠিত। সে যেমন পিতাকে ভালবাসিতে জানে—এমন বুঝি কেহ কাহাকে ভালবাসিতে জানে না। তবু তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভালবাসাটুকু দিয়া তাহার বাবাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। খাইতে—বসিতে—চলিতে—ফিরিতে সকল সময়ই সে তাহাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিত। যে দিন হইতে সে কথা কহিতে শিখিয়াছে, সে দিন হইতে বাবা কাজকর্ম্ম করিয়া বাড়ী আসিলে—তাহার গলা জড়াইয়া কত কি মধুর অর্দ্ধস্ফুটিত কথায় সে তাহাকে আদর করিত। বাবা পরিশ্রান্ত হইলে তাহার গা মোছাইয়া দিত—পাখা দিয়া বাতাস করিত—শেষে তাহার কোলে বসিয়া—তাহার সহিত কত কি আলাপ করিত। বাবার কাপড়খানা—বাবার লাঠিখানা—বাবার খড়মজোড়া—কত না পরিপাটী করিয়া রাখিয়া দিত। সংসারে বাবা ছাড়া সে আর কাহাকেও জানিত না—বাবাও তাহাকে একমুহূর্ত্ত না দেখিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন।

মোক্ষদাসুন্দরী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। পিশিমা আসিয়া নিকটে উপবেশন করিলেন। রমাপ্রসাদ বাবু তাহার সহিত ও স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে করিতে আনন্দচিত্তে আহার করিতে লাগিলেন ও মাঝে মাঝে কন্যাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। তখন, পিশিমা ক্রমে ক্রমে হরপ্রসাদ ও তাহার স্ত্রীর কথা—নগেন্দ্র ও খগেন্দ্রের বিষয়,পাড়াপ্রতিবেশীদিগের সুখদুঃখের নানা কথা উঠাইলেন। ছোট খুকী ঘুমাইয়াছিল—একবার তাহার কথাও উঠিল। এই প্রকার নানা প্রসঙ্গের মধ্যে আহার শেষ হইলে—রমাপ্রসাদ বাবু হাতমুখ ধুইয়া, পান তামাক খাইতে খাইতে পিশিমার সহিত গল্প সল্প করিতে লাগিলেন।

কতকক্ষণ পরে নদীরামের আহার শেষ হইলে—নিজের আহার শেষ করিয়া—থালবাসন গুছাইয়া—মোক্ষদাসুন্দরীও শয়নঘরে আগমন করিলেন।

সেখানে পানের বাটা ছিল—একটী পান লইয়া সাজিয়া খাইলেন। ততক্ষণ বাটীর সকলেই প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ছোট খুকীকে 'আমা' সন্ধ্যার একটু পরেই ঘুম পাড়াইয়াছিলেন—তাহার জন্য একটু দুধ ঢাকিয়া রাখিলেন।

তখন তিনি পান চিবাইতে চিবাইতে আনন্দোৎভাষিত নেত্রে অর্দ্ধনিদ্রিত স্বামীর দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টির ভিতর কত না সুখই নিহিত ছিল।

হা সুখ! তুমি কোথায়? এই যে দরিদ্রা রমণী—স্বামী ও তাহার পরিজনবর্গের সুখবিধানের জন্য সারাদিবসের পরিশ্রমের পর নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছে—তাহার হৃদয়ে? না, ঐ যে রাজরাণী হীরামণিমুক্তা পরিয়া, গভীর রজনী পর্য্যন্ত স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া, অবশেষে শয্যাপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িতেছে—তাহার প্রাণে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—নগর

বৈশাখের শেষ ভাগ। বড়ই গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সন্ধ্যাকালে নদীতীরে দুইটী বালক স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিতেছিল।

অতিদূরে, নদীর অপর পারে, গ্রামের পশ্চাতে, রক্তিম সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছিল। পাখীগুলি কোলাহল করিতে করিতে এপার হইতে ওপারে কুলায় ফিরিতেছিল। দিবসের জনকোলাহল ক্রমে ক্রমে নিবিয়া আসিতেছিল।

ধীরে ধীরে নিস্তব্ধতার ভিতর পৃথিবীটী ডুবিতে লাগিল।

বালক দুইটী প্রায় সমবয়স্ক, একে অন্যের বন্ধু।

প্রথমটীর বয়স বছর ষোল—দেখিতে বেশ সুন্দর। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ, চক্ষুদ্বয় বড় বড়, উজ্জ্বল। নাম বিজয়।

দ্বিতীয়টীর নাম আনন্দমোহন। তাহার ন্যায় সুশ্রী নহে, তেমন বলিষ্ঠও নহে। মুখখানি সরলতাব্যঞ্জক। দেখিলে মনে হয়, যেন সংসারের কুটিলতা, মলিনতা, প্রাণে এখনও প্রবেশ লাভ করে নাই। কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া সে কোমল মুখখানিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

বন্ধুদ্বয় সমপাঠী।

অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আনন্দ বলিল, বিজয়! ঐ দেখ সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে। চেয়ে দেখ, নদীর ওপারের গাছের মাথাগুলি কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। আহা! বড়ই সুন্দর!

বিজয় উত্তর করিল, হাঁ ভাই! বড় সুন্দর।

আনন্দ। কতকগুলি জিনিস আছে তাহারা যেন চিরনূতন। কত দিনইতো

ঐ সূর্য্যকে ঐ ভাবে ডুবে যেতে দেখ্‌লেম, কিন্তু দৃশ্যটী আর পুরাতন হলোনা। কি আশ্চর্য্য!

বিজয়। ভাই! সুন্দর দেখা না দেখা, যার যার মনের উপর নির্ভর করে। তুমি ভাবুক, তাই ওকে প্রতিদিনই সুন্দর দেখ। আমি তো তোমার মত তত আমোদ পাই না। আনন্দ! আমার বড় ইচ্ছা করে, তোমার মত প্রাণটী নিয়ে, প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি করে, আনন্দ উপভোগ করি। কিন্তু, আমার সে প্রাণ কৈ?

আনন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, এই বুঝি ভাই! তোমার ঠাট্টা আরম্ভ হ'ল। এমন যদি কর, তা হলে তোমার কাছে আর মনের কথা বলবনা।

বিজয় ঈষৎ দুঃখব্যঞ্জকস্বরে বলিল, না ভাই! ঠাট্টা করিনি। সত্যিই, তোমার মত আমার মনটী হলে, আমার বড়ই ভাল লাগ্‌তো। তুমি যে ভাই! দেবতা।

আনন্দ কোনও উত্তর করিল না। আকাশের যে কোণে সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া চাহিয়া রহিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া বিজয় বলিল, কি ভাই! রাগ কল্লে না কি?

আনন্দ। কি বল্লে—রাগ? হাঁ, রাগ করেছি বৈ কি? তোমার উপর রাগ করব্ একথা যে তুমি ভাবতে পার, এতে তোমার উপর রাগ হয়েছে। তৎপরে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বিজয়! তোমার উপর যে দিন রাগ হ'বে, তার পূর্ব্বেই যেন আনন্দমোহনের মৃত্যু হয়।

একে অন্যের দিকে চাহিল। একপ্রাণ কি যেন অব্যক্তভাষায় অন্য প্রাণের সহিত মধুর আলাপ করিল। উভয়ের চক্ষুদ্বয় আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কতকক্ষণ পরে বিজয় বলিল, কাল ক্রিকেট খেল্‌তে যাবে তো?

আনন্দ। না ভাই! আমায় মাপ কর। খেলাতে যেন আমি তেমন সুখ পাই না।

বিজয় ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, তা পাবে কেন? তার চেয়ে সারাদিন বসে বসে ভাব্‌লেই লাগ্‌বে ভাল। না, ওসব কথা শুন্‌বনা। কাল যেতেই হবে।

আনন্দ। বল তো যাব। ভাই! জানতো। খেলতে আমার বড্ড ভয় করে।

বিজয়। তা তো করবেই। কোন দিনই যে খেলনা। খেল্‌তে ও নাকি ভাল লাগেনা। আয়নায় নিজের চেহারাখানা দেখছ কি ?

আনন্দ। (হাসিতে হাসিতে) দেখেছি দেখেছি। খেল্‌লেই যদি গায় জোর হতো, তা হলেতো আর কথাই ছিল না।

বিজয়। (হাসিয়া) ছি! তা হবে কেন ? জোর হয় গল্প কল্লে অথবা একলা একলা বসে ভাবলে।

বলিতে বলিতে হঠাৎ সে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, ঐ যা! সুধীর বাবুর বাসায় আর আজ যাওয়া হলোনা। আমাদের ফার্ষ্ট ইয়ারের ছেলেদের না আজ তাঁর ওখানে একত্র হওয়ার কথা ছিল।

সুধীর বাবু কলেজের দর্শন ও ইতিহাসের প্রফেসার।

আনন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, তাতো ছিলই। গেলে না কেন ?

সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া আনন্দের দিকে প্রেমপুলকিত চক্ষে চাহিতে চাহিতে বিজয় বলিল, তুমি গেলে না কেন ?

আনন্দ। আমার যাকে দেখ্‌লে ভাল লাগে তাকে দেখ্‌বার জন্য এখানে এসেছি। তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি সুধীর বাবুর বাসায় যাও।

আবার প্রেমভরা প্রাণে একে অন্যের দিকে চাহিল। আনন্দে হৃদয় ছাপিয়া উঠিল। দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিজয় বলিল, ভাই সুধীর বাবুর মত এমন লোক আর দেখা যায় না। কতবড় বিদ্বান্, আর কেমন চরিত্র! ছেলেদেরই বা কত ভালবাসেন। সব প্রফেসার যদি তাঁর মত হতো!

আনন্দ। তা হলে কি আর কথা ছিল!

বিজয়। ভাই! আমার ইচ্ছা করে তাঁর মত হতে। আজ ত আর তাঁর ওখানে যাওয়া হলোনা। চল, একদিন তাঁর সাথে দেখা করে আসি।

আনন্দ। বেশত, চল কালই যাওয়া যাক্।

বিজয়। না, কাল যাওয়া হবে না। ও মশায়, আপনি বুঝি মনে করেছেন, কাল না খেলেই ফাঁকি দিবেন। তা হচ্ছে না। কাল শনিবার, কাল খেলতেই হবে। রবিবার ও খেল্‌তে হবে। সোমবার বৈকালে যাব।

আনন্দ। (হাসিতে হাসিতে) আচ্ছা—আচ্ছা—ভয় নেই তোমার।

যেমন করেই হউক কাল খেলবই। তবে যদি হাত পা ভাঙ্গে, তার দায়ী তুমি।

বিজয়। একটু ক্রিকেট খেল্‌লেই যদি হাত পা ভাঙ্গে তা হলে তো আর উপায় নেই। অমন শরীর না রাখ্‌লেই পার। সে কথা যাক্—তোমায় যে বইখানা দিয়েছিলাম তা পড়া শেষ হল?

আনন্দ। কি, বৃত্রসংহার? না এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নি। বেশ বই।

বিজয়। আমার কাছে কিন্তু তেমন ভাল লাগে নি।

আনন্দ। কেন? এমন সুন্দর ইন্দুবালার চরিত্রখানা থাক্‌তেও ভাল লাগ্‌ল না! কেমন তার প্রাণটী—পরের দুঃখে সকল সময়েই কাতর।

বিজয়। সত্যিবটে সে কোমল কিন্তু আমার যেন মনে হয় বড় বেশী কোমল। এমন বীর রুদ্রপীড়ের পাশে, অমন ঘ্যান্ ঘ্যানে প্যান্ প্যানে বাঙ্গালী স্ত্রী ভাল লাগে না। দেখতো মেঘনাদ, যেমন সে তেমনি তার উপযুক্ত স্ত্রী প্রমীলা।

বলিতে বলিতে সে হর্ষোৎফুল্লমুখে গলগল করিয়া মেঘনাদবধকাব্যের নানাস্থান হইতে কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল ও আনন্দকে বলিল, ভাই! একেই বলি কবিতা, যা প্রাণমন মাতাইয়া তোলে। তোমার নিজের কোমল প্রাণ, তাই ইন্দুবালাকে ভাল লাগে।

একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল, ভাল বই পড়ে যেমন আমোদ পাওয়া যায়, এমন যেন আর কিছুতেই নয়। যতক্ষণ তা নিয়ে থাকা যায়, ততক্ষণ কিযেন একটা মধুর ভাবে প্রাণটী বিভোর হয়ে থাকে।

আনন্দ। তা ঠিক্। তবে কিনা, বই নিয়েও সব সময় থাক্‌তে ভাল লাগেনা। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে—

বিজয়। চুপ কল্লে যে? বুঝেছি। তুমি বলছিলে মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বসে ভগবানের চিন্তা কল্লে তার চেয়েও বেশী সুখ পাওয়া যায়। ভাই! তুমি যে এতে কি সুখ পাও, তা আমি ভাল করে বুঝে উঠ্‌তে পারি না।

আনন্দ। অম্‌নি করে একলা বসে থাক্‌তে কেনই যেন আমার ভাল লাগে। ভাই! কি ভাবি, কেমন করে তোমায় বলব? আমার প্রাণে যে তখন কোথা হতে আনন্দের তরঙ্গ ছুটে আসে, তা আমি বুঝে উঠতে পারিনা। বিজয়! এস, দুজনে বসে একবার তাঁর নাম করি।

বিজয়। আচ্ছা—এস।

তখন একটু রাত্রি হইয়াছে। পশ্চিমাকাশে শুক্লা নবমীর চাঁদ দেখা দিয়াছে। নদীবক্ষে তাহার দুই একটী কিরণ আসিয়া পড়িতেছে। নদীতীর একপ্রকার জনশূন্য—চারিদিক নিস্তব্ধ। ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে।

আনন্দ বিজয়ের হাত ধরিল। উভয়ে একটী শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত স্থানের সম্মুখে যাইয়া পদযুগল হইতে জুতা খুলিল! উপরের দিকে একবার কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া আনন্দ জোড়াসন করিয়া বসিল। বিজয় তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। ক্রমে, আনন্দের চক্ষু বুজিয়া আসিল—বিজয়েরও বুজিল।

তখন, সরলপ্রাণ আনন্দ ভক্তিগদগদচিত্তে বলিতে লাগিল, হে দয়াময় প্রেমময় ভগবান! আমরা শিশু, কিছুই জানিনা। সংসারের কিছুই বুঝিনা। আমাদিগকে সৎপথে নিয়ে যাও, তোমাতে ভক্তি দেও, ভালবাসা দেও। তোমাকে ভালবেসে যেন আমরা সকলকে ভালবাসতে পারি। আমরা যেন কখনও পাপপথে না যাই, পরের মনে কষ্ট না দেই। দয়াময়! দয়াময়! তুমি দয়া না কল্লে, কে আমাদের দিকে চাহিবে? আমরা যে প্রভু! শিশু, নির্ব্বোধ।

বলিতে বলিতে, সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। বালকের প্রাণ—উধাও কোথায় যেন উড়িয়া গেল! সে কাঁদিয়া ফেলিল। প্রাণপ্রিয় বন্ধুর প্রেমস্পর্শে বিজয়ের সর্ব্বশরীরও যেন মধুময় হইয়া উঠিল।

তখন, উপরে অসংখ্য নক্ষত্ররাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রদেব আর একটু উপরে উঠিয়া বালকদ্বয়ের মস্তকোপরি শুভ্র কিরণ বিকীরণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের জন্য, যেন সেই স্থানটী পবিত্র দেবমন্দিরে পরিণত হইল।

আনন্দ বলিল, বিজয়! একটী গান গাও। তোমার সেই গানটী।

বিজয় গাহিতে আরম্ভ করিল। তাহার স্বর অতি মধুর। নৈশাকাশ পূর্ণ করিয়া, তাহা উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতে লাগিল। চন্দ্রের কিরণ সম্পাতে বিজয়ের সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর হইয়া উঠিল।

আনন্দমোহন বন্ধুবরের স্কন্ধোপরি বাহুযুগল স্থাপন করিয়া মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিতে লাগিল। সেই সুন্দর মূর্ত্তি, সেই মধুর স্বর-লহরী, সেই ভক্তিভাবোদ্দীপক সঙ্গীত, সকলের একত্র সমাবেশে সেই সময় তাহার চক্ষে বিজয় দেবতা বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল।

*　　　*　　　*　　　*

রাত্রি একটু অধিক হইয়া পড়িল। আনন্দ বলিল, 'চল ভাই! এখন বাসায় যাই'!

বিজয় বলিল, 'চল'। উভয়ে উঠিয়া নগরের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

কতকদূর আসিয়া আনন্দ বলিল, চল তোমাকে বাসায় দিয়ে আসি।

দুই বন্ধু হাত ধরাধরি করিয়া, কত-কি আলাপ করিতে করিতে, গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কতকক্ষণ পরে উভয়ে বিজয়ের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

আনন্দ বলিল, বিজয়! তুমি এখন যাও। আমি আমার ঘরে যাই।

বিজয় হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, কেন, তুমি আমাকে পৌহুঁছে দিতে পাল্লে—আমি বুঝি আর তোমাকে তোমার বাসা পর্য্যন্ত দিয়ে আস্‌তে পারি না? চল, তোমাকে তোমার বাসায় দিয়ে আসি।

এই বলিয়া সে যে রাস্তায় তাহারা তাহার গৃহে আসিয়াছিল, ঘুরিয়া আবার সেই দিক দিয়া আনন্দের বাটীর দিকে চলিল। এই প্রকার আগমন ও প্রতিগমন, তাহাদের প্রায় প্রত্যহই বারংবার ঘটিত। একের অন্যকে ছাড়িয়া যাইতে বড় কষ্ট বোধ হইত।

কতদূর যাইয়া বিজয় বলিল, আনন্দ! আমাদের মত সংসারে কে সুখী? কাদের এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা?

আনন্দ। আমার যেন কেন মনে হয়, যে ভালবাসাকে আমরা সচরাচর নিঃস্বার্থ ভালবাসা বলি তার যেন বড় একটা প্রাণ নাই, যেন যে কোন মুহূর্ত্তেই তাহা বাতাসের ন্যায় উড়ে যেতে পারে। আমার বোধ হয়, এ ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী —আজ আছে, কাল নেই। আজ আমাদের দুজনের ভিতর যে প্রকার প্রাণের টান্, যদি আজীবন এরূপ থেকে যায়, তা হলে মনে হয় জীবনটা কত না সুখের হয়। কিন্তু, তাতো হবার নয়। দুদিন পরে, সবই হয়তো আর একরকম হয়ে যাবে। বিজয়! এমন দিন হয়তো আস্‌বে, যখন আমাকে দেখে, আজ তোমার যেমন আনন্দ হচ্ছে, আর একজনকে দেখে, তার চেয়ে আরও অধিক আনন্দ হবে, আমাকে তুমি ভুলে যাবে। সংসারের মায়াচক্রে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে, না জানি কোথায় যাবে তুমি,—আর কোথায় বা যাব আমি? নিঃস্বার্থ ভালবাসা—সুধু ভালবেসে সুখ বলে ভালবাসা—আজীবন সে ভালবাসা আমরা বাসব,—আমাদের তেমন

ক্ষমতা হবে,—ইহা কি সম্ভব ? তবে, যে কয়দিন ভালবাসতে পারি, সে কয়-দিনই সুখ। ইচ্ছা ক'রে, ভবিষ্যতের ভিতর চক্ষু নিক্ষেপ ক'রে, এ সুখস্বপ্ন ভাঙ্গতে ইচ্ছা করে না। বিজয়! তোমার কি মনে হয়, চিরকাল আমরা একে অন্যকে এম্‌নি ভালবাসতে পারব ?

বিজয় উৎসাহ সহকারে বলিল, কেন, পার্‌ব বৈ কি ? সারাজীবন কি এক-জনকে ভালবাসা যায় না ?

আনন্দ। দেখো ভাই! যা বল ভেবে বলো।

বিজয়। আর তুমি!—তুমি বুঝি আমায় ভুলে যাবে ?

আনন্দ। কেমন করে বলব ? ভগবান জানেন।

উভয়ে চুপ করিল।

কতকটুক পরে আনন্দ বলিল, দেখেছ কেমন সুন্দর চাঁদ উঠেছে। এমন সুন্দর রাত্রিতে প্রাণটা ঘরের ভিতর পড়ে থাকৃতে চায় না। চায়, মুক্ত প্রকৃতির ভিতর নিজকে ছেড়ে দিতে। এখন, জ্যোৎস্না গায় মেখে নদীর জলগুলি না জানি কতই সুন্দর দেখাচ্ছে। চল, বিজয়! আর একবার নদীতীরে যাই।

বিজয় উত্তর করিল, চল।

দুইজনে আবার নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল—নদী, তরঙ্গে তরঙ্গে জ্যোৎস্নার টিপ্‌ পরিয়া, চিকি চিকি ঝিকি মিকি করিতে করিতে, যেন কত সুখের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধীরে বহিয়া যাইতেছে। উচ্ছ্বাস নাই—আবেগ নাই—ধীর সমীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা উৎক্ষিপ্ত করিয়া, নদী বহিয়া যাইতেছে। সমস্ত প্রকৃতি নীরব, নিস্তব্ধ—যেন মূর্ত্তিমতী কবিতা সুন্দরী নদীবক্ষে কেশজাল বিস্তার করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

আনন্দ বলিল, আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর! সুন্দর ভগবানের কি কি অপূর্ব্ব লীলা!

উভয়ে নদীতীরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে শোভা অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিল।

রাত্রি গভীর হইতে চলিল। বন্ধুদ্বয় আর অধিকক্ষণ ভ্রমণ করা সঙ্গত মনে না করিয়া, যে যাহার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সে রাত্রিতে, আনন্দ কাহার মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল ? কাহার মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে তৎপর দিবস প্রাতে সে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছিল ?

স্বপ্নদেবী স্বীয় রঞ্জিত পক্ষপুটে কাহার মধুমাখা মুখের চিত্রপটখানি বহন করিয়া বিজয়ের নয়নের সম্মুখে রজনীতে ধারণ করিয়াছিল ? কাহার মধুমাখা প্রাণটীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সে পরদিবস আনন্দচিত্তে পাঠাভ্যাসে রত হইয়াছিল ?

বাল্যকালের প্রেম। প্রাণমনমুগ্ধকারী সে অমৃত যে আস্বাদন না করিল সে হতভাগ্য। তাহার জীবনের একভাগ অপূর্ণ রহিয়া গেল !

এই বালক দুটী কে ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিজয়ের পিতা চন্দ্রনাথ বাবু ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট। পূর্ব্বে—সহরেই কাজ করিতেন। অনেক দিন হইল সেখান হইতে বদলী হইয়া গিয়াছেন।

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন বিজয়ের বয়স বছর আট নয় হইবে। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরেশচন্দ্র তাহাকে কলেজিয়েট স্কুলের ষষ্ঠ-শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া গেল।

নূতন বালকটীকে দেখিয়া অনেকগুলি ছেলে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

তন্মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি ভাই ?

আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় আগে পড়্‌তে ?

আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, তুমি মার্‌বেল খেলতে জান ? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিজয় কয়েক জনের উত্তর দিল, কয়েকজনের দিল না। প্রশ্ন চলিতে লাগিল।

বিজয় বালকটী স্বভাবতঃ সাহসী, কিন্তু সেও এত প্রশ্ন সহ্য করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার চক্ষে জল দেখা দিবার উপক্রম হইল।

তাহা দেখিয়া বালকগণের মধ্যে একজন বলিল, ভাই ! ওকে বিরক্ত করোনা। ও কাঁদছে।

তখন আর একজন বলিল, বা ! তুমি কাঁদছ ? বেশ।

আর একজন আসিয়া বলিল, কি হে, তুমি কেঁদে ফেল্‌লে ? আমরা তো তোমায় কিছু বলিনি। তোমরা দেখে যাওহে সবে।

এমন সময় কোথা হইতে একটী বালক আসিয়া পূর্ব্বোক্ত বালকটীকে সজোরে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া বলিল, "ওকে বিরক্ত কচ্ছ কেন" ? বিজয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "এস ভাই ! তুমি আমার সাথে।"

এই বালকটীই আনন্দ। সে সচরাচর নিরীহ ও শান্ত কিন্তু মাঝে মাঝে কোথা হইতে তাহার প্রাণে এমন সাহস ও তেজ আসিয়া পড়িত, যে সমপাঠিগণ তখন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করিত না।

বালকগণ যে যাহার মনে চলিয়া গেল। আনন্দ বিজয়কে সঙ্গে করিয়া তাহার পার্শ্বে লইয়া বসাইল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় থাক ?

আনন্দ উত্তর করিল, আমার বাবার নাম নীলমাধব বাবু। ঐ যে স্কুলে আস্‌তে বড় রাস্তার ধারে একটা লাল বাড়ী দেখা যায়, তার কাছেই আমাদের বাসা।

বিজয় হাসিয়া বলিল, তাই নাকি ! ঐ লালবাড়ীই যে আমাদের বাসা। বাবা বদলী হয়ে এখানে এসেছে। আমরা অল্প কয়দিন হলো এখানে এসেছি।

আনন্দ। বা ! চমৎকার !

তৎপর উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইল। ক্রমে এগারটা বাজিল। ছাত্রেরা যে যাহার স্থানে যাইয়া বসিল। বেত্রহস্তে ভীষণমূর্ত্তি ভবানী-মাষ্টার দর্শন দিলেন।

মাষ্টার লোকটী দেখিতে কাল—লম্বা—কৃশ। মেজাজ্‌টা রুক্ষ—খিট্‌খিটে। চুলগুলি—উস্ক খুস্ক।

ছাত্রগণ ভবানীমাষ্টারকে যমের প্রত্যক্ষ অবতার বলিয়া মনে করিত। বেত্র সঞ্চালনে তাহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা। তাহার হস্তস্থিত সেই ভীষণ অস্ত্রের তাহার নিজ দত্ত একটী নাম ছিল। "দুঃশাসনের" স্পর্শ ভোগ না করিয়াছে এমন ছাত্র ক্লাসে কেহই ছিল না। তাহার নামে ও দর্শনে তাহারা কাঁপিয়া উঠিত। তিনি

ছাত্রদিগের দিকে কুটমট করিয়া চাহিয়া মাঝে মাঝে প্রায়ই বলিতেন, জানিস্‌তো দুঃশাসন অর্থ কি,—দুষ্টকে শাসন করা যায় যদ্দারা।

'দুঃশাসনের' প্রয়োগ ছাড়া অন্যান্য উপায়েও তিনি ছাত্রগণের বুদ্ধির উন্মেষ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

তিনি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। প্রশ্ন আরম্ভ হইল। কেহ সঠিক উত্তর দিতে পারিল, কেহ পারিল না। প্রায় সকল বালকের পৃষ্ঠেই বেত পড়িতে লাগিল। তাহা ছাড়া, কাহারও উপর হুকুম হইল, "যা, তুই বাইরে যেয়ে, এক পা হয়ে সূর্য্যের দিকে দাঁড়িয়ে থাক্"। কাহারও উপর হুকুম হইল, "নাকে খত দে, পড়া না শিখে আর কখনও স্কুলে আসবি না"। কাহারও উপর, মাথায় স্লেট লইয়া 'নিলডাউন' হইয়া থাকিবার আজ্ঞা প্রচারিত হইল। দুইটী বালককে বেঞ্চের উপর মুখোমুখী করিয়া দণ্ডায়মান করিয়া দেওয়া হইল, আজ্ঞা ক্রমে একজন আর একজনের কাণ সজোরে টানিতে লাগিল। অন্য দুইটী, দুই পা ফাঁক করিয়া, রোডস্ ও সাইপ্রাসের কলোসাসের মত দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রথম দিন, তাই বিজয় কোন প্রকারে বাঁচিয়া গেল। তথাপি, একবার ব্যাকরণের একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে অশক্ত হওয়ায়, মাষ্টার তাহার কর্ণের দিকে হাত বাড়াইয়াছিলেন। বিজয় মনে মনে ভাবিল, একি ভয়ঙ্কর স্কুল! প্রথম দিনেই এমন কাণ লইয়া টানাটানি!

হঠাৎ, একটী ছেলে বাহিরের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, ছার! চেয়ে দেখুন, বেণী পড়ে গেছে।

বেণী বালকটী স্বভাবতই রুগ্ন। রৌদ্রে সূর্য্যের দিকে চাহিতে চাহিতে তাহার মাথাটী ঘুরিতেছিল। হঠাৎ, সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

মাষ্টার 'দুঃশাসন' হস্তে বাহিরের দিকে দৌড়াইয়া গেলেন। তাহার বিশ্বাস, বেণী মূর্চ্ছার ভাণ করিতেছে। কিন্তু, দেখা গেল সে সত্য সত্যই অজ্ঞান।

তখন, তাহাকে ধরাধরি করিয়া ক্লাসে আনা হইল। ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গেল। হেডমাষ্টার সেকেণ্ডমাষ্টার ইত্যাদি অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কেহ মাষ্টারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনার এ কাজটা ভাল হয় নি'। মাষ্টার কিন্তু তজ্জন্য একটুও লজ্জা বোধ করিলেন না। তাহার বিশ্বাস, ছেলেদিগকে এপ্রকার শাসন না করিলে, তাহাদের মাথা খাওয়া হয়। যাহা হউক, অনেক চেষ্টার পর, অনেক জলসিঞ্চনের পর, বেণীর জ্ঞানের উদ্রেক হইল। তাহাকে পাল্কীতে করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

বালক বিজয়, এসব কাণ্ডকারখানা দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, এ এলেম কোথায়।

ভয়গ্রস্তহৃদয়ে স্কুলের ছুটীর পর, সে গৃহে ফিরিয়া আসিল। থাকিয়া থাকিয়া, ধৃতবেত্রহস্ত মাষ্টারের ভীষণমূর্ত্তি তাহার মানসপটে জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

সংস্কৃত শাস্ত্রে বাঙ্গালী *

(২) রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও রঘুনাথ শিরোমণি

ঘূর্ণায়মান ভাগ্য-নেমির ঘূর্ণনে জাতিবিশেষ, দেশবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ একবার উর্দ্ধে উঠিতেছে একবার নিম্ন দেশে পতিত হইতেছে; প্রকৃতি দেবীর এই সনাতন নিয়মের বাহিরে কাহারও থাকার সাধ্য নাই। হিন্দুর ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠানরাজ সদর্পে সিংহাসনারূঢ় হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে ১৫২৬ খৃঃ অঃ পাণিপথে ইব্রাহিম লোডীর শোণিত-স্রোতের সহিত দিল্লীর পাঠানরাজ্য ভাসিয়া গেল। মোগল বংশের অভ্যুদয় হইল। বাবর সিংহাসনারূঢ় হইলেন। ইতি পুর্ব্বেই ১২০৩ খৃঃ পশ্চিম বঙ্গ বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক মুসলমানরাজ্যভুক্ত হয়। ১৩৩০ খৃঃ অঃ মহম্মদ

* 'সংস্কৃত শাস্ত্রে বাঙ্গালী' নামধেয় প্রবন্ধে আমাদের বহু বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থের সহায়তা অবলম্বন করিতে হইবে, প্রবন্ধটী শেষ হইলে ঐ সমুদয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামের তালিকা প্রদান করিব। প্রবন্ধের প্রারম্ভে ঐ তালিকা দেওয়া অসুবিধাজনক বলিয়াই সংপ্রতি ঐ তালিকা দেওয়া হইল না। লেখক।

টোগলকের সময় পূর্ব্ববঙ্গও দিল্লীর পাঠান রাজ্যভুক্ত হয়। আবার মহম্মদ টোগলকের রাজত্বের শেষ ভাগেই ১৩৪৫ খৃঃ অব্দে সামসা উদ্দীনের সময়ে বাঙ্গালার মুসলমান-রাজ দিল্লীর অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীন হইলেন। এইরূপে বাঙ্গালায় মুসলমানাধিকার দৃঢ়ীভূত হইল। সমুদয় পাঠানরাজগণ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ততদূর আক্রমণ না করিলেও মুসলমান ফকির, এবং প্রাদেশিক কাজীগণের অত্যাচারে হিন্দু সমাজ প্রমাদ গণিল। যাহারা ততদূর দৃঢ়চিত্ত ও স্বধর্ম্মপ্রাণ নহে তাহারা ধনলোভে বা রাজপুরুষের কৃপার জন্য বা অত্যাচার হইতে অব্যাহত থাকিবার নিমিত্ত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল; কিন্তু সাধারণ হিন্দু সমাজ দেখিলেন রাজা হিন্দু ধর্ম্মের ও সমাজের রক্ষক নহেন, হিন্দু সমাজ নিজকে নিজে রক্ষা না করিলে উপায় নাই। এই বিশাল বিচিত্র জগতে প্রত্যেক দেশেরই উপযোগী এক একটি বিশিষ্টতা আছে, যাহা রক্ষিত না হইলে দেশ ও সমাজ ধ্বংসমুখে নিপতিত হয়। হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর সমাজ, হিন্দুর বিশেষত্ব, হিন্দুর গৌরব পূর্ব্বপুরুষের সম্মান রক্ষা করিতে হইলে হিন্দু সমাজের অগ্রণীগণকেই হিন্দু সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, হিন্দুগণ ইহা অক্ষরে অক্ষরে বুঝিতে পারিলেন। এইরূপে হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার দায়িত্ব বাঙ্গালী বুঝিতে পারিয়াছিল তজ্জন্যই মুসলমান রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালায় বহু মনিষী ব্যক্তির অভ্যুদয় আমরা দেখিতে পাই।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপে পূর্ণ প্রতিভার কয়েকটী মূর্ত্তিমান বিগ্রহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপের যে এত প্রসিদ্ধি এবং এত গৌরব এই কয়েকটী মহা-সত্ত্ব ব্যক্তির আবির্ভাবই তাহার কারণ। একই সময়ে প্রেমের সাক্ষাৎ অবতার শচীনন্দন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, সূক্ষ্মধী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, ধর্ম্মশাস্ত্রব্যাখ্যাতা স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, এবং প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগম বাগীশ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এক অধ্যাপকের নিকট ইঁহারা শিক্ষিত হন এবং অনেক কাল পরস্পর সহাধ্যায়ী ছিলেন। মহাপ্রভু ভগবানের সাক্ষাৎ বিগ্রহ বলিয়া পূজিত। তাঁহার জীবনী-সম্বন্ধে শত শত প্রামাণিক গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। কৃষ্ণানন্দ "তন্ত্রসার" সংগ্রহ করিয়া শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব এবং গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী সাধকগণের

সাধনার পথ প্রদর্শন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। রঘুনাথ ও রঘুনন্দন বাঙ্গালার গৌতম ও মনু বলিয়া এখনও পূজিত।

রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা স্থির করার জন্য কোন কষ্ট-কল্পনার বিষয় নাই। মহাপ্রভুর জন্ম ১৪০৭ শকের মাঘিপূর্ণিমা তিথিতে অর্থাৎ খৃঃ ১৪৮৫ অব্দে হইয়াছিল এবং ১৫৩৩ খৃঃ তাঁহার তিরোভাব হয়। মহাপ্রভুর সমসাময়িক শিষ্য প্রশিষ্যদিগের প্রামাণিক গ্রন্থে তাহা সুন্দররূপে বিবৃত আছে। বিশেষ চৈতন্য প্রভুর জন্মদিন হইতে চৈতন্যাব্দ এখনও প্রচলিত সুতরাং মহাপ্রভুর প্রাদুর্ভাব সময় সম্বন্ধে কোনও গোলযোগ নাই। রঘুনাথ ও রঘুনন্দন মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী কিন্তু উঁহারা উভয়েই তাঁহা হইতে কিছু বয়োবৃদ্ধ ছিলেন সুতরাং উঁহারা ১৪৭৫ খৃঃ অব্দের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন মোটামুটী এইরূপ ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। এবং মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে এই মহাপুরুষদ্বয় স্বর্গারোহণ করেন সুতরাং রঘুনাথ ও রঘুনন্দন খৃঃ ১৪৭৫ হইতে ১৫৪৫ সময়ের লোক বলিয়া নিঃসন্দেহ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ১৪৯৪ খৃঃ হোসেন সাহা গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। তৎপূর্ব্ব গৌড়েশ্বরের একজন পদস্থ কায়েস্থ কর্ম্মচারীর অধীনে হোসেন চাকরী করিতেন। হোসেন সাহা পরে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া হিন্দুদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। প্রসিদ্ধ রূপ ও সনাতন গোস্বামী হোসেন সাহার মন্ত্রী ছিলেন সুতরাং রঘুনাথরঘুনন্দনপ্রমুখ হিন্দু-সমাজাগ্রণীদিগের ঐ সময়ে শাস্ত্র ও ধর্ম্মালোচনার বিশেষ সুযোগই ঘটিয়াছিল। রূপ ও সনাতন গোস্বামী খৃঃ ১৪৮৯ হইতে ১৫৮৮ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সনাতন গোস্বামী তাঁহার "পদাবলী" গ্রন্থে তৎকালের বঙ্গের বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

"ভারতে কাশী, কাঞ্চী, অবন্ত্যাদি অঙ্গ
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে প্রামাণ্য হল আজি বঙ্গ।
রঘুনন্দন, রঘুনাথ আর শ্রীচৈতন্য
পণ্ডিত বাসুদেব গুরুত্ব হেতু ধন্য।
রঘুনন্দ, হরিহরজ গঙ্গাদাস-পৌত্র
কাণাভট্ট সাহরী শূলপাণি দৌহিত্র

ন্যায় স্মৃতি তত্ত্বজ্ঞানে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ,
সর্ব্বদেশ হতে আসে বুভুৎসু গরিষ্ঠ,
ময়ূর কুল্লুক ভট্ট আচার্য্য উদয়ন
আদি কবিশিরোমণি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ॥" ইত্যাদি

রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত "পঞ্চখণ্ড" নামক বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বসতি খণ্ডের দিঘীরপার নামক গ্রামে কাত্যায়ন গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক কুলে গোবিন্দ ভট্ট নামক মহাতপস্বী ব্রাহ্মণের ঔরসে সীতাদেবী নাম্নী এক সৌভাগ্যবতী ব্রাহ্মণীর গর্ভে খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও মতে তাঁহার জন্ম ১৩৯৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৭২ খৃঃ অব্দে হয়। বৈদিক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীধরাচার্য্য, খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে তৎকালীন ত্রিপুরেশ্বর "ধর্ম্মপা" কর্ত্তৃক যজ্ঞার্থ মিথিলা হইতে আহূত হন। রঘুনাথ উক্ত শ্রীধরাচার্য্য হইতে ঊনত্রিংশৎ পুরুষ *। রঘুনাথের এক চক্ষু কাণা থাকায় তাঁহাকে সাধারণতঃ কাণা ভট্ট বলিত। রঘুনাথের একজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন; তাঁহার নাম রঘুপতি। রঘুপতি রাজা সুবুদ্ধিনারায়ণের কন্যা বিবাহ করেন। সুবুদ্ধিনারায়ণ রঘুপতি হইতে কুলাংশে ছোট ছিলেন। সুবুদ্ধিনারায়ণ রঘুপতির মাতার অজ্ঞাতে, কৌশলে, রঘুপতির নিকট কন্যা বিবাহ দেন। সীতা দেবী তেজস্বিনী ও কুল গৌরবের বিশেষ পক্ষপাতিনী ছিলেন; সুতরাং ঐ বিবাহ রঘুপতির মাতার বিশেষ অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল। ঐ বিবাহ অবধি—সীতাদেবী স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুপতির সংশ্রব ত্যাগ করেন। রঘুনাথের মাতার আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। সুবুদ্ধিনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি অতিশয় সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন কিন্তু ঐ তেজস্বিনী রমণী কুলগৌরবের নিকট অর্থ ও সম্পত্তিকে ধূলিকণার ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন, এমন কি পাছে সুবুদ্ধি রঘুনাথের কুল ধ্বংস করে তজ্জন্য তিনি দশম বর্ষের ন্যূন বয়স্ক রঘুনাথকে নিয়া জীবনোপায়ের কি হইবে তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া দেশত্যাগী হইলেন এবং

* "বৈদিক সংকলিনী" নাম্নী বৈদিক কুলগ্রন্থ এবং প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তদবধি রঘুনাথ নবদ্বীপবাসী হন আর শ্রীহট্টে আসেন নাই।

শ্রীহট্টে থাকার সময় রঘুনাথ স্বগ্রামবাসী শিবরামতর্কসিদ্ধান্তের নিকট বর্ণমালা ও ব্যাকরণের কতক দূর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। শ্রীহট্টে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হয়। নবদ্বীপে যাইয়া সীতাদেবী শিশু পুত্রকে নিয়া বড়ই অন্নকষ্টে পতিত হন। অন্নকষ্টে তাঁহার তেজস্বিতা ম্লান হইতেছিল, আবার শ্রীহট্টেই বা চলিয়া আসেন এরূপ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। এই সময়ে ভগবদিচ্ছায় তাঁহার অন্নের এবং শিশু রঘুনাথের শিক্ষার একটা সংস্থান হইল। তৎকালে রাঢ়ী শ্রেণীর সাহবির শ্রোত্রিয় বংশীয় বাসুদেব সার্ব্ব-ভৌম নবদ্বীপে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। বাসুদেব বঙ্গের অদ্বিতীয় বৈদান্তিক অথচ ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ, সাহিত্য, তন্ত্র প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। কালে বঙ্গে বাসুদেব সার্ব্বভৌম, কাশীতে ত্রৈলঙ্গী পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং মিথিলায় পক্ষধর মিশ্র তৎসময়ে ভারত-বর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। সীতা দেবী বাসুদেবের শরণা-পন্ন হন এবং বাসুদেবকে পিতৃ-সম্বোধন করেন। বাসুদেব তীক্ষ্ণবুদ্ধি রঘুনাথের সহিত সামান্য আলাপ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন এ বালক কালে জগতে মানুষ বলিয়া পরিচিত হইবে। তিনি সীতাদেবীর প্রস্তাবে সম্মত হন এবং সীতাদেবী ও রঘুনাথকে স্বীয় পরিবার ভুক্ত করিয়া নেন এবং নিজেই রঘুনাথকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তদবধি রঘুনাথ বাসুদেবকে দাদামহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং পরবর্ত্তী সময়ে অনেকে রঘুনাথকে বাসুদেবের দৌহিত্র বলিয়াই মনে করিত।

যাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের জন্মগ্রহণদ্বারা দেশ ও সমাজ পবিত্র হয়, প্রায়শঃ দেখা যায় বাল্য-জীবনেই তাঁহারা তাঁহাদের ভাবী জীবনের আভাস দেন। রঘুনাথের বাল্য জীবনের তদ্রূপ অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তিনি যখন পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে শিবরামের নিকট প্রথম বর্ণ শিক্ষা করেন তখন ঐ শিশুটী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল প্রথম "ক" কেন হইল "গ" প্রথম হইলে ক্ষতি কি ছিল? আবার বাসুদেব সার্ব্বভৌম এক দিন ছাত্রদের নিকট

বসিয়া বলিতেছিলেন "দেখ এবার আমাদের বাড়ীর সকল গাছেই আম হইয়াছে।" দশম বর্ষীয় চপল রঘুনাথ তখনই বলিয়া উঠিলেন, "দাদা মহাশয়, এবার আমাদের বাড়ীর কাঁঠাল, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি সকল গাছেই প্রচুর আম হইয়াছে, কেমন দাদা মহাশয় ঠিক নয় ?" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তাহা কেমন করিয়া হইবে রঘু ?" কেন আপনিত বলিলেন সকল গাছে আম হইয়াছে। খেজুর, নারিকেল, কাঁঠাল গাছ কি গাছ নয় দাদামহাশয় ? সার্ব্বভৌম বিরক্ত হইলেন না, সুখী হইলেন। এইরূপ অনেক সুন্দর সুন্দর কিম্বদন্তী রঘুনাথ সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তৎসমুদায়ের আলোচনার অবসর নাই। সাধারণ ভাবে, সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে, এই সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশারদ বাঙ্গালীদিগের পরিচয় প্রদানই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইঁহাদের জীবনীলিখক ইঁহাদের প্রত্যেকের, প্রত্যেক গ্রন্থের আলোচনা করিয়া তৎকালের বাঙ্গালা দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ইতিহাস সংকলনে সমর্থ হইবেন।

রঘুনাথ, বাসুদেবের নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি, তন্ত্র, জ্যোতিষ, বেদান্ত, ন্যায় প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং সূক্ষ্মবুদ্ধি রঘুনাথ অতিঅল্পকালেই সর্ব্বশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন বিশেষতঃ দর্শন শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু নবদ্বীপে পাঠ করিয়া তাঁহার এই বলবতী জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারিতা হয় নাই। তৎকালে মিথিলা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রধান স্থান ছিল। ভারতের কোন স্থানে ঐ সময়ে মিথিলার মত ন্যায়দর্শনের চর্চ্চা হইত না অথচ মৈথিলী পণ্ডিতগণ ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ কোন বিভিন্ন প্রদেশীয় ছাত্রকে লিখিয়া আনিতে দিতেন না। পাঠ সম্পূর্ণ হইলে বিদেশী ছাত্রদিগের অধীত গ্রন্থগুলি কাড়িয়া লওয়া হইত। মৈথিলীদের এই কূপমণ্ডূকতায় ভারতের অন্য প্রদেশীয় ছাত্রদের ন্যায়দর্শন পাঠের বিশেষ অসুবিধা হইত। রঘুনাথ শুনিলেন পক্ষধর মিশ্র বা পক্ষীল স্বামী মিথিলার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক। গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত "চিন্তামণি" নামক ন্যায়গ্রন্থের "আলোক" নাম্নী এক টীকা পক্ষধর লিখিতেছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমানাচার্য্য এবং ছাত্র যজ্ঞ-মিশ্র উপাধ্যায়ের নিকট পক্ষধর ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন আমূল পাঠ

করিয়া দর্শন শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। স্বয়ং বাসুদেব সার্ব্ব-ভৌম পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র কিন্তু ন্যায়ের কোন পুস্তক তাঁহার নিকট ছিল না সুতরাং রঘুনাথ বাসুদেবের নিকট ন্যায় দর্শন পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন না।

রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায় ও বৈশেষিক পাঠ করিবার জন্য মিথি-লায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন কিন্তু বাসুদেব মত দিলেন না। যাহা হউক অবশেষে রঘুনাথ পক্ষধরের নিকট উপস্থিত হইলেন। যখন রঘুনাথ পক্ষধরের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন বহু ছাত্র এবং অনেক অধ্যাপক বেষ্টিত হইয়া পক্ষধর শাস্ত্রালোচনা করিতেছিলেন। রঘুনাথ পক্ষধরকে প্রণাম করিয়া নিজ মনোগত ভাব জানাইলেন। উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে রঘুনাথের নিকট প্রশ্ন হইল "আপনি দর্শন ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন কি?" রঘুনাথ সদর্পে উত্তর করিলেন, "কাব্যে আমাদের কোমল বুদ্ধি, তর্কশাস্ত্রে আমাদের তার্কিক বুদ্ধি, তন্ত্রে আমরা যন্ত্রিত-ধী এবং ভগবদ্‌বিষয়ে আমাদিগকে সংযত-আত্মা বলিয়া জানিবেন।" পক্ষধর নবাগত ছাত্রের সহিত আলাপে সুখী হইলেন এবং তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন।

অল্প সময়েই রঘুনাথ ন্যায় ও বৈশেষিকে পরম পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। ন্যায় ও বৈশেষিক সম্বন্ধে তাঁহার কোন গ্রন্থই পাঠের বাকী রহিল্ না। এই সময়ে পক্ষধর "সামান্য লক্ষণা" নামে একখানা টীকা গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। রঘুনাথ ঐ টীকার কতকগুলি দোষ বাহির করেন, তাহা নিয়া পক্ষধর মিশ্রের সহিত রঘুনাথের কতিপয় দিবসব্যাপী বিচার হয়। বিচারে রঘুনাথ জয়লাভ করেন, অধ্যাপক শিষ্যের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি রঘুনাথকে "শিরোমণি" উপাধিতে ভূষিত করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ তোমার পাঠ সম্পূর্ণ হইয়াছে। তোমাকে পড়াইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তুমি এইক্ষণ অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন কর।" এবং ন্যায় ও বৈশেষিকের সমস্ত পুস্তক তাঁহার সঙ্গে দিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় আর পুস্তক রাখিয়া দিলেন না। *

* পূর্ব্বে টোলের ছাত্রগণ সমুদয়েই পুস্তক লিখিয়া পাঠ করিতেন। মৈথিলিগণ বিদেশী ছাত্রদের নিজ নিজ লিখিত পুস্তক দেশে আনিতে দিতেন না কিন্তু রঘুনাথ হইতে ঐরূপ পুস্তক রাখিতে পক্ষধর সাহসী হন নাই।

রঘুনাথ নবদ্বীপে আসিয়া টোল করিলেন। এই সময় হোসেন সাহার রাজত্ব শেষ হয়। পুনর্ব্বার নবদ্বীপে ব্রাহ্মণদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়। বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম পুরুষোত্তমবাসী হন। সুতরাং রঘুনাথ শিরোমণির টোলে বহু ছাত্র আসিতে লাগিল। এই সময়ে রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায় ও বৈশেষিক সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ লিখেন তন্মধ্যে গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত "চিন্তামণি" নামক ন্যায়-গ্রন্থের টীকা সর্ব্বপ্রধান। প্রোক্ত টীকার নাম "চিন্তামণি দীধিতি"। চিন্তামণি দীধিতি গ্রন্থ তাঁহার অসাধারণ চিন্তাশক্তি ও গভীর গবেষণা এবং অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তদ্ভিন্ন তিনি "ব্যুৎপত্তিবাদ", "আকাঙ্ক্ষাবাদ", "পক্ষতা", "ক্ষণভঙ্গুরবাদ" "অদ্বৈতবাদ" "অবয়ব গ্রন্থ" "কেবলব্যতিরেকী" "আখ্যাত বাদ" "ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি" "পদার্থমণ্ডল", কুসুমাঞ্জলীর টীকা, উদয়নাচার্য্যের প্রসিদ্ধ "কিরণাবলীর" টীকা, বল্লভাচার্য্য কৃত লীলাবতীর টীকা, প্রভৃতি বহু নব্য ন্যায়ের গ্রন্থ লিখেন। এই সমুদয় গ্রন্থে প্রধানতঃ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন, প্রসঙ্গত অন্যান্য দর্শন আলোচিত ও বিচারিত হইয়াছে। রঘুনাথের যশঃ সৌরভ ভারতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে মিথিলা, দ্রাবীড়, মহারাষ্ট্র, উৎকল প্রভৃতি দূরপ্রদেশ হইতে এবং বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে দলে দলে ছাত্র আসিয়া রঘুনাথের টোলে উপস্থিত হয়। রঘুনাথের সময় হইতে অদ্যাপি ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা জন্য বাঙ্গালা দেশ বিখ্যাত। শঙ্করাচার্য্যের পর রঘুনাথের ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধি পণ্ডিত ভারতে অল্পই জন্ম ধারণ করিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণির প্রণীত অনেক কাব্যরসযুক্ত কবিতা দৃষ্ট হয়। রঘুনাথ দর্শনশাস্ত্রের পূর্ব্ব-কথিত গ্রন্থাদি না লিখিলে এই সমুদয় কবিতা-পাঠক তাঁহাকে একজন কবি-শিরোমণি বলিয়া আখ্যা প্রদান করিতেন। ঐ সমুদয় ন্যায়গ্রন্থের প্রাধান্যহেতু ঐ সমুদয় কবিতা লোকের তত চিত্তাকর্ষণ করে না। রঘুনাথ শিরোমণির পর হইতে বাঙ্গালা দেশে নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে ন্যায়শাস্ত্রের বহুল প্রচার হয়। রঘুনাথের প্রধান ছাত্র মথুরানাথ তর্কবাগীশ দীধিতির টীকা লিখেন। মথুরানাথের ছাত্র প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্ত। ভবানন্দের ছাত্র ভারতবিখ্যাত গঙ্গাধর ও জগদীশ তর্কালঙ্কার। ইঁহারা নব্য ন্যায়ের ৫০খানার ঊর্দ্ধ গ্রন্থ লিখেন। এইরূপ রঘুনাথও তৎশিষ্যপ্রশিষ্যদ্বারা সর্ব্বত্র দার্শনিক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

রঘুনন্দন।

রঘুনন্দন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। জন্ম নবদ্বীপে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইনি খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সম্ভবতঃ ১৪৭৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং অনুমাণ ১৫৪৫ খৃঃ পরলোক গমন করেন। রঘুনন্দন বন্দ্যঘটী গ্রামী, শাণ্ডীল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কোন পরিচয় দেন নাই, কেবল তৎকৃত প্রত্যেক তত্ত্বের শেষে "ইতি বন্দ্যঘটীয় শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্যাত্মজ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিরচিতং" এই বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাদ্বারা এই মাত্র প্রকাশ পায় যে তিনি বন্দ্যঘটীবংশীয় হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র। তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থের নমস্কারের শ্লোকে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়াছেন। যথা, উদ্বাহতত্ত্বে, "প্রণম্য কমলাকান্তং বাগীশং জগতাং প্রভুং। উদ্বাহকর্ম্মণস্তত্ত্বং বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ"। ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে তিনি বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রে দুইটী মত দেখা যায়। প্রথম মতাবলম্বীদের মতে ভট্টনারায়ণ হইতে রঘুনন্দন বিংশতি পুরুষ। ভট্টনারায়ণ হইতে দুর্ব্বলীবন্দ্য দ্বাদশ পুরুষ। দুর্ব্বল্লীর পর বংশলতা এইরূপ ঃ—
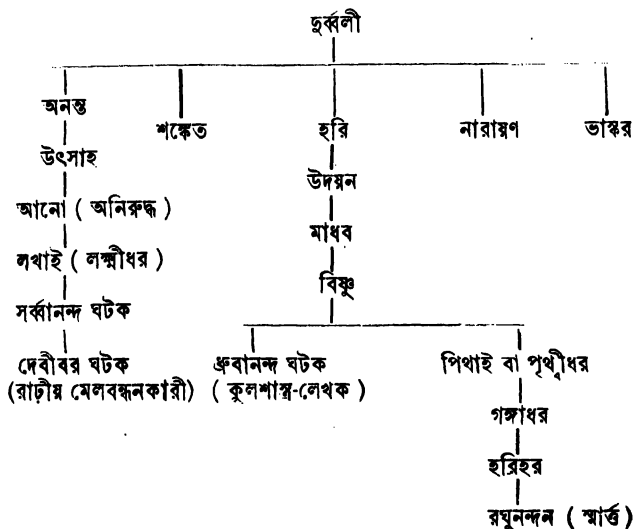
রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যদিগের এই মত। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তৎকৃত সম্বন্ধনির্ণয় নামক গ্রন্থে এই মতই সংকলন করিয়াছেন এবং তিনি প্রমাণ স্থলে নিম্নলিখিত কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুরসুত পৃথ্বী, ধ্রুব পৃথ্বীর গঙ্গাধর,
রঘু, গঙ্গাপৌত্র, স্মার্ত্ত, পিতাহরিহর॥

রূপ ও সনাতন গোস্বামী রঘুনন্দনের সমসাময়িক ব্যক্তি। সনাতন গোস্বামী তাঁহার স্বকৃত পদাবলীতে "রঘুনন্দন হরিহরজ গঙ্গাদাসপৌত্র" বলিয়া লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন হরিহরের পুত্র এবং গঙ্গাদাসের পৌত্র। 'গঙ্গাধর' স্থলে তিনি গঙ্গাদাস লিখিয়াছেন এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু দ্বিতীয় মতাবলম্বীদের মতে রঘুনন্দন বন্দ্যবংশীয় আখণ্ডলের সন্তান। আখণ্ডল ভট্টনারায়ণ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ তৎপর ষষ্ঠ পুরুষে রঘুনন্দন। এই মতেও রঘুনন্দনের পিতা হরিহর কিন্তু পিতামহের নাম ধনঞ্জয় প্রপিতামহ কেশব। অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ কুলপঞ্জিকার এই মত। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" প্রণেতাও এইমত অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু রূপ ও সনাতন গোস্বামীর কারিকা গ্রন্থ এই সম্বন্ধে বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রঘুনন্দনের সময় মুসলমান রাজপুরুষের অত্যাচারে হিন্দুর আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও সমাজ নিয়া বিষম সমস্যা উপস্থিত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত রঘুনন্দনের বংশলতা দৃষ্টে দেখা যায় দেবীবর ঘটক রঘুনন্দনের পিতামহস্থানীয় ব্যক্তি। ধ্রুবানন্দ মিশ্র দেবীবরের পিতৃস্থানীয়। ধ্রুবানন্দ ও দেবীবর প্রভৃতির কুলশাস্ত্রে দেখা যায় বড় বড় হিন্দুর ঘড়ে, ছলে, বলে, কৌশলে যবনত্বাদি দোষস্পর্শ হইতেছিল। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বংশীয় হিন্দুর ও আচারাদির হীনত্ব ঘটিতেছিল। দেবীবর দেখিলেন এই সমুদয় হীনাচার ও দোষ-দোষিত ব্যক্তিগণকে সমাজে আশ্রয় প্রদান না করিলে হিন্দু সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয়। হয় ত অনেকে হিন্দু সমাজে স্থান না পাইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন অথচ দোষিগণ মধ্যে পরস্পর বিবাদ হইয়া এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইবে। তিনি তজ্জন্যই যাহারা বিশেষ দোষী মাত্র তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অপর দোষীগণের দোষ মার্জ্জনা করিয়া বিরোধ মীমাংসাজন্য ৩৬ দলে ৩৬টী মেল করিয়া বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের সময়োচিত রক্ষা সাধন করিলেন; অন্যথা তৎকালের

অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন। বর্ত্তমান অবস্থায় মেল-বন্ধন দোষের হইলেও তৎসময়ে উহা ভালই হইয়াছিল। কিন্তু রঘুনন্দনের সময় পুনর্ব্বার সমাজের উপর মুসলমান উপদ্রব হইতেছিল * অপর দিকে হিন্দু সামাজিকগণও উচ্ছৃঙ্খল হইতেছিলেন। তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের যথার্থ অর্থের অবহেলা করিয়া অনাচারী হইয়া উঠিলেন। বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অবমাননা করিতে লাগিলেন। কয়েকজন তান্ত্রিকাচার্য্য ও বৈষ্ণবাচার্য্য ভিন্ন অনেকেই যথেচ্ছাচারী হইতে লাগিলেন। বেদ, স্মৃতি, শ্রুতির নিয়ম সমুদয় লঙ্ঘিত হইতে আরম্ভ হইল। এই সময়ে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ রক্ষার্থ কৃত-সংকল্প হইয়া সমাজের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এবং মৃত্যুর পর মৃতের সদ্গতি জন্য পুত্রাদির সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যানুষ্ঠান যাহাতে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হয় তজ্জন্য তিনি অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব রচনা করেন।

রঘুনন্দনের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে তাঁহার জীবন সময়ের প্রথম ভাগে বাঙ্গলা দেশে হিন্দুসমাজের দশা কিরূপ হইয়াছিল প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক তাহা সুন্দররূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমরা ঐ প্রসিদ্ধ কবিতার এক দেশ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হল রাজভয়
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতিপ্রাণ লয়।
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘড়ে,
ধনপ্রাণ দেয় তার জাতিনাশ করে।
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে
ঘড় দ্বার লোটে তার সেই পাশে বাঁধে।
পীরৈল্যা গ্রামেতে বাস যতেক যবন
উচ্ছিন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ
গৌরেশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ
নবদ্বীপ-বিপ্র তোমার করিবে প্রমাদ
গৌরে ব্রাহ্মণ-রাজা হবে, হেন আছে
নিশ্চিন্ত না থাকিবা প্রমাদ হবে পাছে।
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল
"নদিয়া উচ্ছিন্ন কর" রাজা আজ্ঞা দিল।

এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব তাঁহার পরম কীর্ত্তি। শাস্ত্রানুশাসন শিরোধার্য্য পূর্ব্বক সময়োচিত সমাজ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে তজ্জন্য মন্বাদি শাস্ত্রসংহিতা, পুরাণ, উপনিষদ্, তন্ত্রশাস্ত্র, বেদ, জ্যোতিষ, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রহ গ্রন্থ প্রভৃতি তন্ন তন্ন বিচার করিয়া তিনি ২৮ খানা স্মৃতির গ্রন্থ লিখেন। এই স্মৃতির গ্রন্থ লিখেন বলিয়াই তিনি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। তৎকৃত তত্ত্ব গ্রন্থাদিমতেই পরবর্ত্তী সময়ে বাঙ্গালা দেশীয় হিন্দুর ক্রিয়া কর্ম্মাদি নির্ব্বাহিত হইতেছে।

রঘুনন্দন সর্ব্বপ্রথমেই বোধ হয় "মলমাস তত্ত্ব" লিখিয়াছিলেন, কারণ মলমাস তত্ত্বে নমস্কার শ্লোকের পরই তিনি কি গ্রন্থ লিখিবেন তৎসম্বন্ধে একটী প্রতিজ্ঞা উপস্থিত করেন এই প্রতিজ্ঞাটী এইরূপ। ইহাতে ২৮ খানি তত্ত্বের নাম লিখা হইয়াছে যথা—

১ মলিম্লুচে, ২ দায়ভাগে, ৩ সংস্কারে, ৪ শুদ্ধিনির্ণয়ে,
৫ প্রায়শ্চিত্তে ৬ বিবাহেচ ৭ তিথৌ ৮ জন্মাষ্টমী ব্রতে
৯ দুর্গোৎসবে ১০ ব্যবহৃতা ১১ রেকাদশ্যাদিনির্ণয়ে
১২ ১৩ তড়াগভবনোৎসর্গে ১৪ ১৫ বৃষোৎসর্গে ১৬ ১৭ ত্রায়াব্রতে
১৮ প্রতিষ্ঠায়াং ১৯ পরীক্ষায়াং ২০ জ্যোতিষে ২১ বাস্তুযজ্ঞকে
২২ দীক্ষায়া ২৩ মাহ্নিকে ২৪ কৃত্যো ক্ষেত্রে ২৫ শ্রীপুরুষোত্তমে
২৬ সাম শ্রাদ্ধে, ২৭ যজুশ্রাদ্ধে ২৮ শূদ্রকৃত্য বিচারণে

ইত্যষ্টাবিংশতি স্থানে তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ ॥

এই ২৮ খানি গ্রন্থ লিখিতে রঘুনন্দন সংস্কৃত বহু গ্রন্থের আলোচনা ও বিচার করিয়াছেন। তিনি স্বরচিত গ্রন্থে যে সমুদায় শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত

করিয়াছেন তাহার কতকগুলির এক তালিকা আমরা নিম্নে দিলাম। যে সময়ে এদেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, নিজহস্তে লিখিয়া যখন গ্রন্থাদি পাঠ করিতে হইত, যখন এদেশে রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই সেই সময়ে গান্ধার ও কাশ্মীর হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত স্থানের গ্রন্থরাশির সংগ্রহ ও তাহার তন্ন তন্ন বিচার করা কিরূপ মনীষীর কার্য্য তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

রঘুনন্দন স্বীয় গ্রন্থে যে সমুদয় গ্রন্থের বিচার করিয়াছেন তাহার তালিকা :—

ঋক্, যজু, সাম বেদ, মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত, যাজ্ঞ্যবল্ক, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্তা, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ—প্রভৃতি বিংশতি সংহিতা, গোভিল, দেবল, মরীচি, পুলস্ত্যের সংহিতা। ভবিষ্য, ব্রহ্ম, মার্কণ্ডেয়, বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু, অগ্নি, পদ্ম, গরুড় প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণ, ছন্দোগ পরিশিষ্ট, দানকল্পতরু, রত্নাকর, সমুদ্রকর, কর্ম্মোপদেশিনী, শূলপাণির শ্রাদ্ধবিবেক, যোগীযাজ্ঞবল্ক্য, বৃদ্ধমৈথিলিশ্রাদ্ধবিবেক, কল্পতরু, পিতৃদয়িতা, পত্রপ্রদীপ, বাচস্পতিমিশ্র, আশ্বালয়ন সূত্র, শাট্টায়ন, চুণ্ডুপদ্ধতি, গাণ্ডীবপদ্ধতি, নব্য বৰ্দ্ধসার, অসিপাল, রায়মুকুট, পতপথব্রাহ্মণ, নারায়ণ উপাধ্যায়, পৈঠীনসী, অনিরুদ্ধ ভট্ট, পারস্কর, ভবদেব ভট্ট। রত্নাকর, ব্রহ্মদৈত্য ভাষ্য, যোগিনীতন্ত্র, পিতৃভক্তিতরঙ্গিণী, মহাভারত, অনিরুদ্ধ ভট্ট, ভট্টভাষ্য, আচার্য্য চূড়ামণি, আচারপ্রদীপ, শাণ্ডিল্য, শাণ্ডিল্যায়ন, কুল্লুক ভট্ট, হালায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর, ভট্টনারায়ণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ। দানকাণ্ডকল্পতরু, রাজমার্ত্তণ্ড, লঘুহারিত, সংবৎসরপ্রদীপ, সময় প্রকাশ, প্রাশ্চাত্য-নির্ণয়ামৃত, কালসর্ব্বরীয় নাগরখণ্ড, দেবীপুরাণ, শ্রাদ্ধচিন্তামণি, হরিবংশ, রুদ্রযামল, ভোজরাজ, প্রাচীন স্মৃতি, শ্রুতিবচন, বোধায়ন, রেণুকাচার্য্য, নিগমশাস্ত্র, গোতম, ভোজবলভীম, ভোজদেব, মদনপারিজাত, জাবালী, লোকাক্ষী, পরিশিষ্ট প্রকাশ, দায়ভাগ, মিতাক্ষরা, সত্যব্রত, মাধবাচার্য্য, হেমাদ্রি, ঋষ্যশৃঙ্গ, ষট্‌ত্রিংশন্মত, মৈথিল, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য গৃহ্যসূত্র, কালাদর্শ, নির্ণয়ামৃত, প্রভাস খণ্ড, জৈমিনি সূত্র, পরিশিষ্ট প্রকাশ, কুবের উপাধ্যায়, নাগরখণ্ড, ঈশানন্যায়াচার্য্য, তীর্থচিন্তামণি, সম্বন্ধবিবেক, হরিনাথ উপাধ্যায়, আদিত্য পুরাণ, ইত্যাদি।

শ্রীকামিনী কুমার ঘটক।

বল তাঁর কেমন বরণ ?

১

দেখি নাই দেখিবারে চায় এ নয়ন
তাঁর কিরূপ বরণ,
আমারে সে ভালবাসে,
সদা থাকে পাশে পাশে,
সে করে আমার তরে কতনা যতন,
নিষ্কাম আমারি তরে,
অনুক্ষণ কায করে,
করিতেছে, করিয়াছে, কত আয়োজন,
বারেক হেরিতে তাঁরে চায় এ নয়ন।

২

একবার হেরিবারে চায় এ নয়ন,
তাঁরে দেখিনি কখন,
সে আমারে সদা দেখে,
সদা রাখে চখে চখে,
তিলেক বাঁচিনা হলে যাঁর অদর্শন,
কেমন যে সেইজন
হেরিল না এ নয়ন,
মিটিল না তৃষা মোর বল সে কেমন,
বারেক হেরিতে তাঁরে চায় এ নয়ন।

৩

একবার দেখিবারে চায় এ নয়ন
তাঁর কিরূপ বরণ,
আমি তাঁরে থাকি ভুলে,
ভুলে সে না মোরে ভুলে,
মুহূর্ত্ত বাঁচি না আমি ভুলিলে যে জন,
আমার অন্তরে থাকি
সে আমারে দেয় ফাঁকি,—
আমারে দর্শন হায় না দেয় কখন,
বারেক হেরিতে তাঁরে চায় এ নয়ন।

৪

কভু নাহি দেখিলাম কেমন সেজন,
তাঁর কেমন বরণ,
মোরে এত স্নেহ যাঁর,
কেমন বরণ তাঁর,
অন্তরে সে আছে ভাবি কখন নয়ন
করি যদি উন্মীলিত,
সে অমনি অন্তর্হিত ;—
সে দয়ালু হায় মরি কঠিন এমন,
একবার হেরিবারে চায় তাঁরে এনয়ন
বল তাঁর কেমন বরণ ?

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী।

—

নারী-জীবনের উদ্দেশ্য

নারীজীবনের উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে? এবং কোন এক ব্যক্তির মীমাংসাই যে সমীচীন বা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? কেহ বলিবেন যে, ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হওয়াই নারী-জীবনের উদ্দেশ্য। কেহ বলিবেন—গৃহকর্ম্মে দক্ষতা প্রদর্শন করাই নারী-জীবনের উদ্দেশ্য। কেহ বলিবেন—নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি দ্বারা পতির মনোরঞ্জন করাই নারীজীবনের উদ্দেশ্য। কেহ বলিবেন যে, পুরুষের ন্যায় রমণীও শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বৃত্তিসকলের উৎকর্ষ সাধন করিবেন, ইহাই নারী-জীবনের উদ্দেশ্য। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত হয়। এই সমস্ত উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য করে কে? বিধাতা কি উদ্দেশ্যে নারীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবে কে?

অনেক সময়ে সহজ বস্তুর সাহায্যে কঠিন বস্তুর মীমাংসা হয়। ঐ যে সম্মুখে পুষ্পটি প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, উহার জীবনের উদ্দেশ্য কি? এ সম্বন্ধে নানাবিধ মত-ভেদ হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে, চন্দনার্চ্চিত হইয়া দেবপূজায় ব্যবহৃত হওয়াই পুষ্পজীবনের উদ্দেশ্য। কেহ বলিবেন যে, মাল্যাকারে রচিত হইয়া রমণীর কবরী কণ্ঠ প্রভৃতির শোভাবর্দ্ধনই পুষ্পের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। কেহ বলিবেন যে, সৌন্দর্য্য ও সৌগন্ধ্য বিস্তার দ্বারা মনুষ্যের নয়ন ও নাসিকার তৃপ্তি সম্পাদন করাই পুষ্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য। কিন্তু পুষ্প-সৃষ্টির উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে এই সকল মনঃকল্পিত, আরোপিত অনুমান পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বৈজ্ঞা-নিকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। পুষ্পের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, এই উদ্দেশ্যে পুষ্পের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা পুষ্পের পরাগ-কেশর, গর্ভকেশর প্রভৃতির আকার, গঠন-বিন্যাস, ক্রিয়া ইত্যাদি সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ফল প্রসবই পুষ্পজীবনের উদ্দেশ্য। ঐ যে প্রফুল্ল পুষ্পদল দেখিতেছেন, উহা আমাদের তৃপ্তির জন্য সৃষ্টি হয় নাই। উহা ফল সঞ্চারের সহায়ভূত কীট পতঙ্গের আকর্ষণের নিমিত্ত সৃষ্ট

হইয়াছে। পুষ্পের সুকুমার রূপ ও অপরিমেয় সৌন্দর্য্য মানবের ভোগ্য নহে। ঐ সমস্ত কীটপতঙ্গাদি আকর্ষণের উপায় মাত্র। দেখিতে পাইবেন যে, ফল সঞ্চারের অব্যবহিত পরেই ঐ সমস্ত পুষ্পদল শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে। যদি কেবল মনুষ্যের প্রীতির জন্যই পুষ্পের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে বিধাতা চিরদিনই তাহাদিগকে একরূপই রাখিতেন। পুষ্পের অভ্যন্তরে যে মধু সঞ্চিত থাকে, তাহারও উদ্দেশ্য কীট পতঙ্গাদিকে আকর্ষণ করা। ফলতঃ সামান্য একখানা উদ্ভিদ-বিদ্যা পুস্তক পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, ভগবান্ কেবল ফলের জন্যই পুষ্পসমূহের সৃজন করিয়াছেন।

পুষ্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য যেমন পুষ্পের আকার গঠন প্রভৃতি দ্বারাই বুঝা যায়, সেইরূপ নারীজাতির জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলেও নারীদিগের আকার, গঠন, যন্ত্রসংস্থাপন, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিতে হইবে। কবির কল্পনা, সমাজতত্ত্বজ্ঞের সমাজ উন্নতি বিষয়ক পরামর্শ বা রাজনীতিজ্ঞের কূট মন্ত্রণা এ বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না। শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাই আমাদিগকে বুঝাইতে পারেন যে, কি উদ্দেশ্যে বিধাতা নারীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে নারীর মস্তিষ্ক, ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলোচনা করিলেই স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, পুত্র প্রসব ও পুত্র প্রতিপালন করাই নারীজীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। মড্‌শলি প্রভৃতি বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা বিশেষ বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরাও বলেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"। মনু বলেন "প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ"। ফলতঃ যে রমণী পুত্র প্রসব করে নাই তাহার জীবন নিষ্ফল।

উপরিউক্ত বিষয় আলোচনা করার পূর্ব্বে স্ত্রী এবং পুরুষের গঠনগত কি কি প্রভেদ আছে, কি কি স্বতন্ত্র যন্ত্র আছে, কি কি স্বতন্ত্র ক্রিয়া আছে, এবং কি উদ্দেশ্যে ভগবান্ স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। আমরা ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত উল্লেখ করিব। যথা :—

১। স্ত্রী-পুরুষের গঠনগত সাধারণ পার্থক্য।

"স্ত্রীলোকের অস্থিসমূহ অপেক্ষাকৃত লঘু, মসৃণ, সরল, অস্থির ঊর্দ্ধাংশসমূহ অস্পষ্ট, মুখ ডিম্বাকার, কপালের উচ্চতা অনুন্নত, নিম্ন মাড়ীর অস্থি ও দন্ত ক্ষুদ্র,

চিবুক অনুন্নত, বক্ষঃস্থল গভীর, ষ্টরনাম্ (বক্ষের মধ্যের অস্থিখানকে ষ্টরনাম্ কহে) ক্ষুদ্র ও বক্র, বুকের কড়া পাতলা, পঞ্জরের অস্থি ক্ষুদ্র, মেরুদণ্ডের প্রত্যেক অস্থির আকৃতি পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর গহ্বরময়। স্ত্রীলোকের স্বর কোমল, মাথার খুলি ছোট, স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ লম্বা ও তাহাদের মাংসপেশী সুদৃঢ় (See A Text Book of Medical Jurisprudence by J. B. Lyon, C. I. E., F. C. S., F. I. G., Pages *26—27.*)

২। শরীরের প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলির ওজনের প্রভেদ।

যন্ত্রগুলির নাম।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।
মস্তিষ্ক	৪৯½ আউন্স	৪২ আউন্স
ফুস্ফুস্	৪৫ "	৩২ "
হৃৎপিণ্ড	৯½ "	৮¾ "
পাকাশয়	৪½ "	৪½ হইতে একটু ছোট।
যকৃৎ	৫০—৬০ "	৪৫—৫৫ "
প্লীহা	৫—৭ "	৫—৭ "
পেঙ্ক্রিয়াশ্	২½—৩½ "	২½—৩½ "
মূত্র যন্ত্র	৯ "	৮½ "

(See Ditto, Page 520.)

৩। মাথার খুলি। (Skull)।

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মাথার খুলি ছোট; খুলির সম্মুখের অংশ তত উচ্চ নহে। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের এই খুলির হাড়গুলি শক্ত ও ঘন। See Man and Woman, by H. Ellis Pages 78-79.)

৪। ফ্রণ্টেল সাইনাস্ অর্থাৎ কপালের উচ্চতা।

"স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা পুরুষের বৃহৎ ও উচ্চ হয়" See Gray's Anatomy, P 145)

৫। নিম্নমাড়ীর অস্থি। Lower Jaw.

"পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের এই অস্থি খানা ছোট।" (See Man and Woman, by H. Ellis, Page 93.)

৬। মুখমণ্ডলের অস্থি। Face.

স্ত্রীলোকের নিম্ন মাড়ীর অস্থিখানা ছোট, চক্ষুর কোটর পুরুষের ন্যায় তত গভীর নহে ও অধিকতর ডিম্বাকার বলিয়া মুখমণ্ডলের উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দেখা যায়। (See The Growth of the Face. "Science" 3rd July 1891.)

৭। দাঁত। Teeth.

"স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের দন্ত সকল একটু বড়। স্ত্রীলোকের ছেদন দন্ত দুইটি পুরুষ অপেক্ষা একটু বড়।" (See Ploss and Max Bartils, Das Weib, Bd I. P. 15.)

স্ত্রীলোকের জ্ঞানদন্ত পুরুষের অগ্রে উঠিয়া থাকে। "See Bull, Soe, d" Aanthropologie de Paris; See also Report of Committee of British Dental Association, Brit. Med. Jour. 21st July, 1900).

৮। চক্ষু। Eyes.

স্ত্রীলোকের চক্ষু কোটর পুরুষের ন্যায় তত গভীর নহে, ভ্রূ দেশ ও কপালও তত উন্নত নয়, এজন্যই স্ত্রীলোকের চক্ষু ভাসা ভাসা ও বড় দেখা যায়। (See Man and Woman, by H. Ellis, P. 89).

৯। বক্ষঃপ্রাচীর। Thorax

বক্ষঃপ্রাচীরের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীদেহে ইহার সাধারণ শক্তি দুর্ব্বল। বক্ষঃপ্রাচীর দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অস্থিগুলির সংলগ্ন স্থান একটু বিভিন্ন। বক্ষঃপ্রাচীরের ঊর্দ্ধাংশ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক প্রসারিত হইয়া থাকে।

2. "In the Female, the thorax differs as follows from the male.–(1). Its general capacity is less. (2). The Sternum is shorter. (3). The upper margin of the Sternum is on a

level with the lower part of the body of the third dorsal Vertibra whereas in the male it is on a level with the lower part of body of the second dorsal Vertibra. (4). The upper ribs are more moveable and so allow a greater enlargement of the upper part of the Thorax than in the male." See Gray's Anatomy, P. 213.

১০। ক্লেভিকেল্। Clavicle.

গলার নিম্নে ও বক্ষঃপ্রাচীরের উর্দ্ধে ও উভয় পার্শ্বে যে দুইখানা বক্র হাড় দেখা যায়, তাহাকে ক্লেভিকেল্ কহে। এই অস্থি দুইখানার সহিত উর্দ্ধশাখার সমস্ত অস্থির পরস্পর সম্বন্ধ আছে।

"পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উক্ত অস্থি মসৃণ, সূক্ষ্ম ও অল্প বক্র হইয়া থাকে।" (See Ditto P. 213)

১১। ষ্টারনাম। Sternum.

বুকের সম্মুখ অস্থিখানাকে ষ্টারনাম্ বলে।

"স্ত্রীলোকের এই অস্থিখানা পুরুষের অপেক্ষা ক্ষুদ্র।" See Ditto, P. 200.

১২। হিউমারাস্। Humerus.

বাহুর অস্থিখানাকে হিউমারাস্ বলে। "এই অস্থিখানার মস্তিষ্কের পরিধি স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের বেশী।"

১৩। বাহু ও হাতের নালা। Arm and Fore-arm.

ডাক্তার সার্জেণ্ট্ বলেন যে, "আমেরিকার বালিকাদের হাতের নালা ও বাহু বালক অপেক্ষা ছোট।" See Anthropologie Generale, P. 1096)

১৪। হাত এবং অঙ্গুলি। Hand and Finger.

ডাক্তার রেঙ্কি বলেন যে, "স্ত্রীলোকের হাত পুরুষ অপেক্ষা ছোট।" (See Man and Woman).

ডাক্তার ফিজেনার বলেন যে, স্ত্রীলোকের তর্জ্জনী পুরুষ অপেক্ষা একটু লম্বা কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুলি পুরুষ অপেক্ষা ছোট। (See Piitzner, Morphologische Arbeiten, Bd. I. II.)

১৫। সন্ধি।

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের সন্ধিগুলি ছোট। ইহা স্ত্রীলোকের একটি বিশেষত্ব। ("Dr. Dwight states that small size of joints is characteristic of Women." (See Boston. Med Surg. Jour. July 1894.)

১৬। মেরুদণ্ড। Spinal Column.

পুরুষের মেরুদণ্ড প্রায় ২ ফিট্ ৪ ইঞ্চি লম্বা, স্ত্রীলোকের ২ ফিট্ মাত্র। (See Gray's Anatomy, P. 177.)

স্ত্রীলোকের মেরুদণ্ডের লম্বার রিজিয়ন পুরুষ অপেক্ষা বড় হইয়াছে। (See The Lumber Section of the Vertebral Column ; Journal of Anat. and Phys., Oct. 1888.)

১৭। পঞ্জরাস্থি। Ribs.

পাঁজরার হাড়গুলি স্ত্রীলোকের একটু বক্র ও মেরুদণ্ডের সহিত সন্ধিস্থল একটু শ্লথ। (See Gray's Anatomy, P. 666)

১৮। বস্তিদেশ।

ভগবান স্ত্রীজাতির বস্তিগহ্বরের আকার এমন বিশেষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা প্রসবকার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। স্ত্রীজাতির বস্তিগহ্বরের অস্থিসকল ভারী নহে এবং তাহাতে পেশীসংলগ্ন স্থানসমূহ অস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইলিয়াস্ নামক দুই পার্শ্বের অস্থিদ্বয় অধিক বিস্তৃত হওয়ায় স্ত্রীলোকের নিতম্ব প্রস্থে বড় হয়। (See Dr Playfair's Midwifery, P. 10.)

স্ত্রীলোকের বস্তিদেশের খিলানের কোণ ৯০°।১০০° কিন্তু পুরুষের ৭০°।৭৫° ডিগ্রির অধিক নহে।

১৯। ফিমার বা উর্ব্বস্থি। Femer.

উরুর অস্থি খানাকে ফিমার বলে। স্ত্রীলোকদিগের বস্তি কোটর বিস্তৃত থাকার জন্য এই অস্থির গলদেশ প্রায় সমকোণে থাকে। এই অস্থি খানার মাথার ব্যাস পুরুষের ৪৭°।৩ ও স্ত্রীলোকের ৪১।০°. (See Gray's Anatomy, Page 257, See also Man and Woman, Page 105.)

২০। উরু। Thigh.

স্ত্রীলোকের উরু পুরুষ অপেক্ষা ছোট, কিন্তু স্ত্রীলোকের কোমরের বেড়ের মাপ পুরুষ অপেক্ষা অনেক বড়। (See Humphry, Human Skeleton.)

২১। টীবিয়া বা পায়ের নালার অস্থি। Tibia.

এ অস্থির মস্তকের ব্যাস পুরুষের ৭৮'৫ মিলি মিটর ও স্ত্রীলোকের ৬৭'৪। (See Arch ; di Psich, 1901, P 337.)

২২। পা। Foot.

স্ত্রীলোকের পায়ের মধ্য অঙ্গুলি পুরুষ অপেক্ষা ছোট ও সোজা, পাও একটু ছোট। (See Schwalli's Morphologiche Arbiten Bd. I. P. 94.)

২৩। পদের অঙ্গুলি। Toes.

স্ত্রীলোকের পায়ের অঙ্গুলি পুরুষ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ছোট, কিন্তু একটু মোটা। (See Arch : di Psich 1901.)

২৪। উদরের মাপ।

স্ত্রীলোকের নাভি হইতে পিউবিস্ পর্যান্ত দূরত্ব পুরুষ অপেক্ষা বেশী অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের উদর পুরুষ অপেক্ষা বড়। (See Delimitation of the Regions of the abdomen ; Journal of Anatomy and Physiology ; Jan, 1893.)

২৫। সেক্রাম্ বা কট্যস্থি। Secrum.

মেরুদণ্ডের নিম্নে যে অস্থি খানা আছে, তাহাকে সেক্রাম্ কহে।

"স্ত্রীলোকের সেক্রাম্ পুরুষ অপেক্ষা প্রশস্ত, কম বক্র, ইহার উর্দ্ধাংশ প্রায় সরল, নিম্ন অংশ অধিক বড় ও পশ্চাদ্দিকে বেশী ফিরান" (See Gray's Anatomy.)

২৬। মাংসপেশী।

স্ত্রীলোকের মাংসপেশী কোমল, পুরুষের ন্যায় তত দৃঢ় নহে। অস্থির সহিত তত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে না (See Ditto.)

আভ্যন্তরিক যন্ত্রের পার্থক্য।

২৭। মস্তিষ্ক বা ব্রেন্ (Brain)।

যুবাপুরুষদিগের মস্তিষ্কের ওজন ৪৯৷৷০ আউন্স (এক আউন্স অর্দ্ধ ছটাক) এবং স্ত্রীলোকের মস্তিষ্কের ওজন ৪৪ আউন্স। দুইয়ের মধ্যে ৫।৬ আউন্স বিভিন্ন হইয়া থাকে।

অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক ২৩ আউন্সের অধিক হয় না। হস্তী এবং হোয়েল ব্যতীত আর সকল জীব অপেক্ষা মানুষের মস্তিষ্ক অধিক ভারী। লস্কারের গণনা অনুসারে পুরুষের মস্তিষ্ক ১৪২৫ গ্রাম (অর্থাৎ প্রায় ৪৫ আউন্স) এবং স্ত্রীলোকের ১২৭২ গ্রাম (প্রায় ৪১ আউন্স)। কুশোঁর গণনানুসারে পুরুষের ৪৮৷৷ আউন্স এবং স্ত্রীলোকের ৪৩ আউন্স।

সেরিবেলম্ বা ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক।

পুরুষে ইহার ওজন ৫ আউন্স ৪ ড্রাম। বৃহৎ মস্তিষ্কের অনুপাতে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক পুরুষে ১—৮$\frac{৪}{৭}$ এবং স্ত্রীলোকে ১—৮$\frac{১}{৪}$।

"The average weight of the brain in the adult male is 49½ ounce, that of the female 44 ounce, the average difference between the two beings from 5 to 6 ounces." (See Gray's Anatomy, P. 607)

3. Cerebelum or little brain ;—Its average weight in the male 5 ounces 4 dr. The proportion is, in the male, as 1 to 8$\frac{4}{7}$ and in the female, as 1 to 8¼ (See Ditto P. 728.)

২৮। জগতের সর্ব্বপ্রধান ডাক্তার মহোদয়গণ এ পর্য্যন্ত স্ত্রী ও পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন পরীক্ষা করিয়া যে প্রভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পরীক্ষক মহোদয়গণের নাম		ওজন—গ্রামস্	প্রভেদ
ডাক্তার ওয়াগ্নার ...	পুরুষ	১৪১০	১৪৮
	স্ত্রীলোক	১২৬২	
ডাক্তার হাস্কি ...	পুরুষ	১৪২৪	১৫২
	স্ত্রীলোক	১২৭২	
ডাক্তার ব্রোকা ...	পুরুষ	১৩৬৫	১৫৪
	স্ত্রীলোক	১২১১	
ডাক্তার টপিনার্ড ...	পুরুষ	১৩৬০	১১০
	স্ত্রীলোক	১২৫০	
ডাক্তার বিস্কাপ্ ...	পুরুষ	১৩৬২	১৪৩
	স্ত্রীলোক	১২১৯	
ডাক্তার বয়েড্ ...	পুরুষ	১৩৫৪	১৩৩
	স্ত্রীলোক	১২২১	
ডাক্তার মনিভার ...	পুরুষ	১৩৫৩	১২৮
	স্ত্রীলোক	১২২৫	

These figures were obtained from Boyd's well-known investigations at the Marylebone Infirmary, London.

২৯। হার্ট বা হৃৎপিণ্ড। Heart.

পুরুষের ইহা ১০ হইতে ১২ আউন্স। স্ত্রীলোকের ৮ হইতে ১০ আউন্স। হৃৎপিণ্ড যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত গুরুত্বে, দীর্ঘতায় এবং ঘনত্বে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষে অধিক স্পষ্ট ও চিহ্নিত হইয়া থাকে।

"The prevalent weight in the male varies from 10 to 12 ounces, in the female from 8 to 10 ounces. The heart continues increasing in weight and also in length, breadth and thickness up to the advanced period of life; this increase is more marked in men than in women." (See Gray's Anatomy P. 806)

৩০। লাংস্ (Lungs) ফুস্‌ফুস।

পুরুষের ফুস্‌ফুস্ স্ত্রীলোক অপেক্ষা গুরুত্বে অধিক। শরীরের অনুপাতে পুরুষের ১—৩৭, স্ত্রীলোকের ১—৪৩।

"The Lungs are heavier in the male than in the female, their proportion to the body, in the former as 1 to 37, in the latter 1 to 43. (See Ditto P. 985.)

৩১। ট্রেকিয়া বা বায়ুনলী।

যদ্দ্বারা বায়ু ফুস্‌ফুসে গমন করে, তাহাকে বায়ুনলী কহে। স্ত্রী পুরুষে ইহার অনেক প্রভেদ আছে। (See Ditto P. 974)

৩২। ল্যারিংস্ বা বাগ্‌যন্ত্র।

স্ত্রীলোকের "পোমম্ এডিমাই" (টুঁটি) অধিক চর্ম্মের নিম্নে স্থিত। (See Ditto P. 966.)

স্ত্রীলোকের বাগ্‌যন্ত্রের আভ্যন্তরিক গঠন পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল হওয়ায় ইহাদের কণ্ঠস্বরেরও বিস্তর প্রভেদ হইয়াছে। স্ত্রীজাতির স্বরের গ্রাম (রাগিণী শক্তি) পুরুষ অপেক্ষা খর্ব্ব।

স্ত্রী ও পুরুষের স্বর ও উক্ত যন্ত্র-নির্ম্মাণ-কৌশল বিভিন্ন দেখা যায়। এজন্য পুরুষের স্বর গম্ভীর ও কর্কশ এবং বামাগণের স্বর কোমল ও মধুর। বালকের স্বর অনেকটা স্ত্রীজাতির অনুরূপ।

৩৩। কিড্‌নী বা মূত্রযন্ত্র (Kidney)।

পুরুষের যৌবনাবস্থায় উহার গুরুত্ব ৪½ আউন্স হইতে ৬ আউন্স এবং

স্ত্রীলোকের ৪ আউন্স হইতে ৫½ আউন্স হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মূত্রের পরিমাণ ও উপাদান প্রভৃতিরও স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ আছে। (See Ditto P. 994.)

৩৪। ব্লাডার বা মূত্রাশয় (Bladder)।

স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ইহার অবস্থানের প্রভেদ আছে। স্ত্রীলোকদের ইহার অনুলম্ব-ব্যাস অপেক্ষা অনুপ্রস্থ-ব্যাস বৃহৎ। স্ত্রীলোকের মূত্রাশয় পুরুষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র। (See Ditto P. 1008)

পুরুষের প্রস্রাবের নালী ৮ হইতে ৯ ইঞ্চি লম্বা। স্ত্রীলোকের ১½ ইঞ্চি মাত্র। (See ditto PP. 887 and 406.)

৩৬। পেরিটোনিয়ম্ বা উদরের পর্দ্দা।

এই পর্দ্দার দ্বারা উদরের মধ্যস্থ সমস্ত যন্ত্রাদি সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে এই পর্দ্দার অবস্থানের প্রভেদ আছে। জরায়ু, ডিম্বকোষ, ইউরেটার্ (যদ্দ্বারা ডিম্ব আইসে) প্রভৃতি যন্ত্রাদি উদরের মধ্যে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখার জন্য, স্ত্রীলোকের এই পর্দ্দার অবস্থানের অনেক প্রভেদ আছে (See ditto P. 902.)

৩৭। স্মল্ ইন্‌টেস্‌টাইন্ বা ক্ষুদ্র অন্ত্র।

স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে এই ক্ষুদ্র অন্ত্রের দৈর্ঘ্যের একটু প্রভেদ লক্ষিত হয়। (See ditto P. 913.)

৩৮। লার্জ্জ ইন্‌টেস্‌টাইন বা বৃহৎ অন্ত্র।
রেক্‌টাম্ বা গুহ্যদ্বার।

স্ত্রীলোকের গুহ্যদ্বার অধিক প্রশস্ত ও অল্প বক্র হইয়া থাকে। (See ditto P. 920.)

৩৯। ইউরেটার্ বা প্রস্রাব-নালী।

এই নালী দ্বারা প্রস্রাব মূত্রযন্ত্র হইতে মূত্রাশয়ে আইসে। স্ত্রীলোকের ও

পুরুষের এই নালীর অবস্থানের একটু প্রভেদ আছে। (See ditto P. 1004.)

৪০। স্ত্রীপুরুষের খাদ্যের পরিমাণ।

স্ত্রী এবং পুরুষ সমান কার্য্য করিলে তাহাদের আহার পুরুষ অপেক্ষা একদশমাংশ ন্যূন হওয়া উচিত। কিন্তু অল্প পরিশ্রমী স্ত্রীলোকদিগের এক তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ হওয়া উচিত।

ডাক্তার প্লেফেয়ার্ ও স্মিথ্ সাহেবের মতে পুরুষের ৪৩০০ গ্রেণ অঙ্গার ও ২০০ গ্রেণ নাইট্রোজেন এবং স্ত্রীলোকের ৩৯০০ গ্রেণ অঙ্গার ১৮০ গ্রেণ নাইট্রোজেন প্রয়োজনীয়।

	নাইট্রোজেন্‌যুক্ত পদার্থ,	ফ্যাট্,	কার্ব্বহাইড্রেট্।
পুরুষ	১১৮ গ্রাম	৫৬ গ্রাম	৬০০ গ্রাম
স্ত্রী	৯২ গ্রাম	৪৪ গ্রাম	৪০০ গ্রাম

৪১। উত্তাপ।

"পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর দৈহিক উত্তাপ সাধারণতঃ বেশী।"

৪২। উচ্চতা।

"স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ কিঞ্চিৎ লম্বা।"

"The male being as a rule somewhat longer than the female, (See Forensic Medicine and Medical Police by Dr. Husband., P. 546.)

৪৩। শারীরিক বল।

যুবতী স্ত্রীলোকের বল সাধারণতঃ একটি ১৫।১৬ বৎসরের বালকের সমান।

"The strength of women is considered as about equal to that of a boy from 15 to 16 years of age." (See ditto P. 411.)

৪৪। নাড়ী। (Pulse.)

প্রত্যেক মিনিটে যতবার নাড়ী স্পন্দন হয়।

বয়স	পুরুষ	স্ত্রী
সপ্তম দিবস	১২৮	১২৮
২—৭ বৎসর	৯৭	৯৮
৭—১৪ „	৮৪	৯৪
১০—২১ „	৭৬	৮২
২১—২৮ „	৭৩	৮০
২৮—৩৫ „	৭০	৭৮
৩৫—৪২ „	৬৮	৭৮
৪২—৪৯ „	৭০	৭৭
৪৯—৫৬ „	৬৭	৭৩
৫৬—৬৩ „	৬৮	৭৭
৬৩—৭৭ „	৬৭	৮১
৭৭—৮৪ ..	৭১	৮২

See Todd's Cyclopaedia of Anatomy and Physiology P. 181 and Guy's Hospital Reports, Vols. III and IV; See also Raseri, Arch. per l' Antrop.' P. 46.

৫। প্রত্যেক মিনিটে শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা।

বৎসর	পুরুষ	স্ত্রী
ভূমিষ্ঠ হইবার পর	২৩—৭	২৭—৬৮
৫ বৎসর	৩২	৩২
১৫—২০ বৎসর	১৬—২৪	১৯
২০—২৫ „	১৪—২৪	১০
২৫—৩০ „	১৪—২২	১৭
৩০—৫০ „	১১—২৩	১৯

পুরুষদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাসে উদর অধিক সঞ্চালিত হয়, কারণ পুরুষদিগের শ্বাসক্রিয়াতে উদরের মাংসপেশী সকলের অধিকতর ক্রিয়া দেখা যায়। স্ত্রীলোকের নিশ্বাস প্রশ্বাসে বক্ষঃ-প্রাচীর অধিক সঞ্চালিত হয়, কারণ স্ত্রালোকের শ্বাসক্রিয়াতে পঞ্জরাস্থির ক্রিয়া অধিক হয়। এসম্বন্ধে বিশেষভাবে পরে উল্লেখ করা হইবে।

৪৬। স্ত্রী ও পুরুষের ঔষধ ব্যবহারের ভেদ।

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক সৌকুমার্য্য অধিক বলিয়া ঔষধ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করা বিধেয়।

(See a Treatise on Meteria Medica and Therapeutics, by Lt Colonel, Ben. H. Deare, I, M. S., P. 105.)

৪৭। চর্ম্ম। Skin.

"স্ত্রীলোকের চর্ম্ম পুরুষ অপেক্ষা কোমল ও মনোরম। স্ত্রীলোকের চর্ম্মের স্পর্শশক্তি পুরুষ হইতে অত্যধিক।" (See Gray's Anatomy. P. 64 ; See also the Philip's Anatomical Model of the Female Human Body. by W. S. Farineaux, P. 5)

৪৮। মাংসপেশী ও মেদের ওজন।

	পুরুষ	স্ত্রীলোক
মাংসপেশী	৪০·৮	৩৫·৮
মেদ	১৮·২	২৮·২

(See Man and Woman, P. 41)

৪৯। থাইরড্ গ্লাণ্ড। Thyroid gland.

স্ত্রী এবং পুরুষের গলায় এই গ্রন্থির আকারের ও ক্রিয়ার বিস্তর প্রভেদ আছে। এই গ্রন্থির সহিত স্ত্রীলোকের রক্তের, স্নায়ুমণ্ডলের ও আসঙ্গলিপ্সা সম্বন্ধীয় নানা ব্যাপারের গুরুতর সম্বন্ধ রহিয়াছে। ফলতঃ এই গ্রন্থি স্ত্রীলোকের গলদেশে যেন দ্বিতীয় জরায়ু স্বরূপ। প্রথম সংসর্গের কাল হইতেই এই গ্রন্থিও বৃদ্ধিপায়। দক্ষিণ-ফ্রান্সে এখনও অনেকে স্ত্রীলোকের সতীত্বপরীক্ষার জন্য এই

গ্রন্থির মাপ লইয়া থাকেন। এই গ্রন্থি সম্বন্ধীয় বহু পীড়া স্ত্রীলোকের হইয়া থাকে।

"The thyroid gland follows closely all the variations in a woman's organism. Meckel long ago remarked that the thyroid is a repetition of the uterus in the neck. Catullus refers to the influence of the first sexual intercourse in causing swelling of the neck, and it is a very ancient custom to measure the necks of newly married women in order to acertain virginity. (See Man and Woman, P. 267)"

৫০। রক্ত। Blood.

(ক) আপেক্ষিক গুরুত্ব। Specific gravity.

সুস্থাবস্থায় পুরুষের রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৫৭ হইতে ১০৬৬, স্ত্রীলোকের ১০৫৪ হইতে ১০৬১। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৫০ হইয়া থাকে। (See Text Book of Physiology, by E. A, Schafer L. L. D., F. R S, Vol I. Page 143 ; See also Hammerschlag Ztscher, f. Klin, Med. Berlin, Bd. XX s. 444. Journ Physial, Cambridge and London. Vol VIII, P. 1.)

(খ) রক্তকণার সংখ্যা। The numbers of Corpuscles.

পুরুষ	স্ত্রীলোক
৫০,০০,০০০	৪৫,০০,০০০

(See Essentials of Physiology, by Sidney P. Bugett. M. D., P. 19)

(গ) হিমগ্লবিনের সংখ্যা। The amount Hæmoglobin.

পুরুষ	স্ত্রীলোক
১৬,৫০,০০০	২২,৩০,০০০

(See Deutsches Arch. f. Klin, Med. Leipzig. Bd. XLV. S. 75 and 256.)

(ঘ) প্লাজমা ও কারপাস্‌কলের সংখ্যা।

বিখ্যাতনামা ডাক্তার সেফিয়ার মহোদয় বলেন যে,শরীরের সমস্ত রক্তের প্রায় অর্দ্ধেক (৪৮) রক্ত কণা মাত্র থাকে। ইহা পুরুষে ৪৮ ভাগ এবং স্ত্রীলোকে ৪৩.৩ ভাগ। (See Text-Book of Physiology, by E. A. Schafer, L. L. D, F. R. S, Vol. I, Page 149)

(ঙ) স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের রক্ত কণিকার সংখ্যার প্রভেদ।

পুরুষ	স্ত্রীলোক	শিশু
৫০০০০০০	৪৫০০০০০	৬০০০০০০

(See a Text Book Pathology, by J, M, C Farland, M. D., P, 397) (ক্রমশঃ)

বিক্রমপুর রঘুরামপুরের পুষ্করিণী খননের বিবরণ

সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে মুন্সীগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত পঞ্চসার গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মহলানবীশ জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ের গণনানুযায়ী রঘুরামপুরের একটী শুষ্ক পুষ্করিণী খননে কতকগুলি দেবদেবী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে নানা সংবাদ পত্রে নানারূপ অতি-রঞ্জিত বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় কেহই প্রকৃত ইতিহাস অবগত হইতে পারেন নাই। জ্যোতিষী মহাশয় খননকার্য্যের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস আমাকে যেরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"আজ দুই বৎসরের অধিক হইল, আমি গণনা করিয়া জানিতে পারি যে প্রাচীন, প্রাচীন হিন্দু রাজধানী রামপাল অঞ্চলে রঘুরামপুর নামক পল্লীতে একটা পুরাতন বুজা দীঘির গর্ভে বহু মাটীর নীচে লোক-চক্ষুর অন্তরালে পাকা বাঁধান স্থান ((brick structure) আছে এবং তাহাতে অনেক ধাতব পদার্থ Metallic goods) নিহিত রহিয়াছে। জ্যোতিষিক গণনায় ধাতু বলিতে সোণা,

রূপা, লোহা, তামা, পিত্তল, কাঁসা, রাঙ্গ, সীস, টিন ইত্যাদিত বুঝায়ই, অধিকন্তু মণি, মাণিক্য এবং সাধারণ সাধারণ প্রস্তরও বুঝাইয়া থাকে। আমি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইয়া সরকারি খরচে আমার গণনার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার গণনায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায়, আমি বিভাগীয় কমিশনর মহোদয়কে গণনার অব্যর্থ ফল দেখিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত আহ্বান করিয়াছিলাম এবং এ কার্য্যে যে ব্যয় লাগে তাহা সম্পূর্ণ নিজে দিতে স্বীকার করিয়া, এ বিষয়ের প্রতি মহামান্য গবর্ণর বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। পরে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর নিজে স্থানটি পরীক্ষা করেন। তাহার পর সরকার বাহাদুর আমাকে নিজ ব্যয়ে ভূমি খনন করিয়া গণনার ফল পরীক্ষা করিবাব জন্য অনুমতি দেন। এই অনুমতির বলে আমি গত ১৯১২ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯১৩ সনের মার্চ্চমাস পর্য্যন্ত বহু লোক লাগাইয়া স্থানটি খনন করাইয়াছি। খনন কালে চারিমাস পর্য্যন্ত পুলিশের পাহারা বর্ত্তমান ছিল। ১৪।১৫ হাত মাটির নিম্ন হইতে যথার্থই পাকা বাঁধান স্থান এবং তাহার উপরে ধাতুনির্ম্মিত বহুসংখ্য দেবমূর্ত্তি এবং ত্রিশূল, খড়্গ, থাল, সরা, ঘট, শঙ্খ, হরিতকী ইত্যাদি বিবিধ পূজোপকরণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে।" (গভর্মেণ্ট ঢাকাতে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঐ সকল পুরাদ্রব্য পরম যত্নে রক্ষা করিতেছেন।) ভূমি খনন কালে বঙ্গীয় গভর্মেণ্টের ব্যবস্থাসচিব মাননীয় সার উইলিয়ম ডিউক, কে, সি, আই, ই, সি, এস, আই, মহোদয় ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে সঙ্গে করিয়া মুন্সীগঞ্জ থানায় আসিয়া আবিষ্কৃত জিনিষের অনেকগুলি দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাহা লাট বাহাদুরের অভিপ্রায়ানুসারে তাড়াতাড়ি ঢাকায় নেওয়াইয়াছিলেন।

খননের পূর্ব্বাভাস।

গত ১৬ই জুলাই, ১৯১৩, তারিখে স্বয়ং বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর মুন্সীগঞ্জে পদার্পণ করিয়া লোকেলবোর্ডের অভিনন্দনের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"As you may have heard, I was much interested in the valuable archaeological finds lately made with the assistance of Pundit Paresnath Mahalanabis of panchashar and in February last I went with my friend Khan

Bahadur Aulad Husain to inspect them in the Dacca Cutchery." ইহাই রঘুরাম পুরের দীঘী খননের আদ্যোপান্ত ইতিহাস।
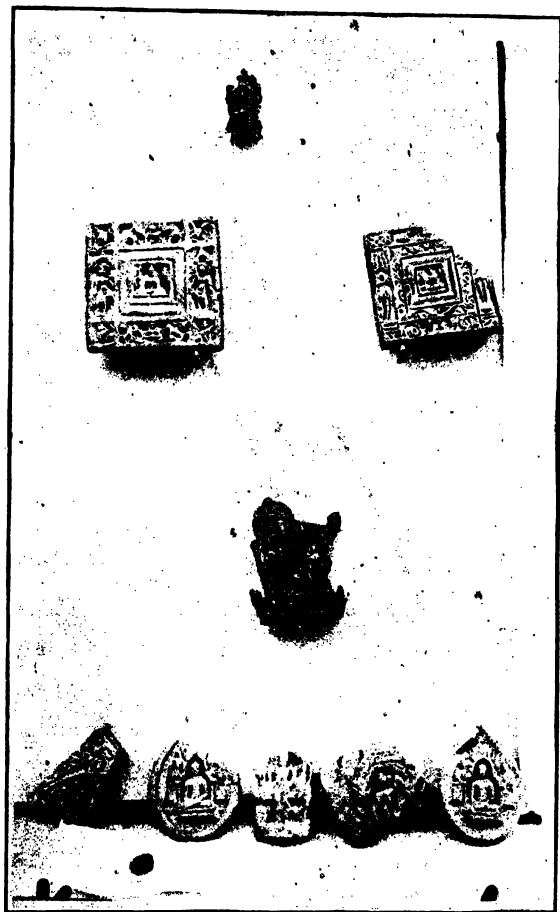
এখন রঘুরামপুরের প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিব। রঘু-রামপুর রামপালের অন্তর্ভুক্ত একটী অতি প্রাচীন স্থান। স্থানটী প্রাচীন

হইলেও নামটী প্রাচীন নহে। রঘুরামপুর এ নামটী সাড়ে তিনশত বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। এস্থানের এইরূপ নাম পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে ইহা কি নামে অভিহিত হইত তাহা খুব ভালরূপে সপ্রমাণ করা এত কালপরে সম্ভবপর না হইলেও কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে এই মাত্র। রঘুরামপুর নামোৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পারি সত্যরূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে তাহাতে কোনও বাধার কারণ নাই। বারভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠবীর চাঁদ রায়ের কেদার রায়ের অধঃপতনের পর তাহাদের মন্ত্রী রঘুরাম রায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। ইনি জমিদারি প্রাপ্তির পর রামপালের নিকটবর্ত্তী স্থানে স্বীয় রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া উহার নাম রঘুরামপুর রাখেন। 'ভাকের নামক প্রাচীন কুল-গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

'ভরদ্বাজ গোত্রে দাশ আদি সাধ্য হয়।
ক্রিয়াগুণে দোষে ভাবাভাব পরিচয়॥
ভরদ্বাজ রবিরাজা রঘুরাম রায়।
সমস্ত বিক্রমে যার রাজস্ব যোগায়॥
হিন্দু মুসলমান যুবা বালক স্থবির।
যার পদাতির ভয়ে কম্পিত শরীর॥
যার দ্বারে থানাদার বিস্তর লস্কর।
শত শত ছিল যার চাকর নফর॥
লভিল ক্রমশঃ কালে বিপুল সম্মান।
বিক্রমে সমাজপতি রঘুরাম ছিলা।
বহু ক্রিয়াগুণে বহু সম্মান লভিলা॥

রঘুরাম রায় মোগলের অনুগ্রহে একরূপ স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিতেন। তাঁহাকে রাজস্ব ব্যতীত মোগলের নিকট আর কোনওরূপ বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত না। এই রঘুরাম রায় বৈদ্যবংশসম্ভূত ভরদ্বাজ গোত্রীয় ছিলেন। রঘুরামের সহিত মোগলের দুই একবার যে সংঘর্ষ না ঘটিয়াছিল তাহা নহে। তিনি সে সকলের প্রত্যেকটিতেই জয় লাভ করেন। রঘুরাম রায়ের অধস্তন পুরুষেরা পরবর্ত্তী কালে নপাড়া নামক গ্রামে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া

পরিশেষে নপাড়ার চৌধুরীর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বজ্রযোগিনী গ্রামে অদ্যাপি ইহাঁদের পুরোহিতবংশীয়গণ বাস করিতেছেন। রঘুরাম রায়ের কীর্ত্তি-

সম্পর্কে বহু কথা প্রচলিত আছে, এখানে তাহার আলোচনার স্থান নহে। রঘুরাম রায়ের অভ্যুদয়ের কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ, কাজেই 'রঘুরাম পুরের' নামোৎপত্তি ৩০০।৩৫০ সাড়ে তিন শত বৎসরের অধিক নহে।
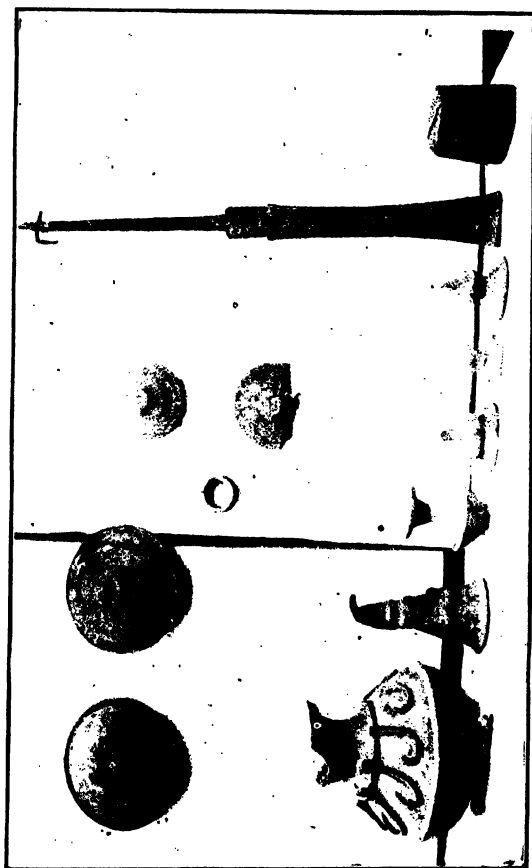
রঘুরাম রায় তাঁহার বাস-পল্লীর চতুর্দ্দিকে বহু দীঘি পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করিয়াছিলেন। সে সকলের মধ্যে কতকগুলি অদ্যাপি বিরাজমান, আর কতকগুলি ভরাট হইয়া বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মহলানবীশ জ্যোতিবিনোদ মহাশয়ের গণনার নির্দ্দেশানুসারে যে পুষ্করিণীটি খনিত হইয়াছে তাহা রঘুরাম রায়ের পরবর্ত্তী কালে খনিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ দীঘির জল সেচন করিয়া প্রায় ১৫।১৬ হাত নীচুতে ইষ্টকনির্ম্মিত খিলানের অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে ইষ্টকনির্ম্মিত অংশ বাহির হইয়াছে তাহার চতুর্দ্দিক খনন করিয়া উহা কি তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। বাঁধান অংশটির প্রশস্ততা ৮ ফুট, কিন্তু দৈর্ঘ্য অর্থাৎ মৃত্তিকাভ্যন্তরে ইহা কতদূর পর্য্যন্ত প্রোথিত রহিয়াছে তাহা এখনও অজ্ঞাত। কেহ কেহ উহাকে ঘাটুলার উপরের ছাত বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। খনন কার্য্যটা আর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই প্রকৃত সত্য বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু অর্থাভাবে আর তাহা হইল না!

যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে সে সকলের প্রত্যেকটিই আলোচনার যোগ্য। দেবদেবীর মূর্ত্তিমধ্যে সূর্য্য, গণেশ, ধ্যানীবুদ্ধ (ভূমিস্পর্শ মুদ্রা) দ্বিভুজ লোকেশ্বর এবং দশাবতারের মূর্ত্তিখোদিত প্রস্তর ফলকগুলি অতীব সুন্দর, তক্ষণ শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। আমরা এ প্রবন্ধের সহিত রঘুরামপুরের খননে প্রাপ্ত সমুদয় দ্রব্যাদিরই চিত্র প্রকাশ করিব।

(১) রঘুরামপুর স্থানটী পুরাতন কিন্তু নামটী ৩০০।৩৫০ সাড়ে তিন শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে।

(২) যে সকল দ্রব্যাদি ও দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার কতকগুলি খুবই প্রাচীন। প্রায় সহস্র বৎসরের পুরাতন হইবে। আমরা আগামী সংখ্যায় ঐ সকল দেবমূর্ত্তির চিত্রাদিসহ বিস্তারিতরূপ ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিব।

এ সংখ্যায় মাত্র দু'খানা চিত্র প্রকাশিত হইল। এই চিত্রদ্বয়ে প্রদীপের গাছা (প্রদীপাধার) মৃত্তিকানির্ম্মিত, সরা, খুন্তী, কলসী, হরিতকী, শঙ্খ, খড়্গ, ভগ্ন মূর্ত্তির উর্দ্ধভাগ ইত্যাদি রহিয়াছে।

রামকৃষ্ণ সমালোচনা *

"যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ"

রামকৃষ্ণের উক্তি।

ব্রাহ্মবন্ধু রামকৃষ্ণ

জীবজগতের কল্যাণমানসে ভগবান নরহরি রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মদিগের প্রতি যে কিরূপ অপূর্ব্ব প্রেম দেখাইয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় কি ব্রাহ্মগণ, কি রামকৃষ্ণ ভক্তগণ, কেহই তাহা চিন্তার বিষয় বলিয়া মনে করেন না। রামকৃষ্ণ জীবন-চরিত লেখকগণ বলেন তিনি যেমন শাক্ত, তেমনি বৈষ্ণব, যেমন জ্ঞানী, তেমনি প্রেমিক ছিলেন। তিনি মুসলমান, খৃষ্টান, আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই কর্ত্তাভজা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাবের সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে কোন দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এ কথা কেহ বলেন না। অপর দিকে এরূপ লঘুচেতা অনেক লোক দেখিয়াছি, যাহারা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকে যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের ঘোর বিরোধী শত্রু ছিলেন।

আমি যখন সাধু নাগমহাশয়ের সহিত ঠাকুরের দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলাম তখন পূর্ণমাত্রায় ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলাম। উহার পূর্ব্বে আমি আচার্য্যপাদ ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের দেবচরিত ও অমৃতবর্ষিণী ভাষায় বিমোহিত হইয়াছিলাম এবং সে সময় ভগবান্ রামকৃষ্ণের দর্শন লাভ না হইলে বোধ হয় এত দিনে আমি নববিধান প্রচারকদিগের দলভুক্ত হইয়া যাইতাম। কিন্তু ধন্য ঠাকুরের দয়া—তিনি নিজগুণে দয়া করিয়া, ধর্ম্মের গূঢ় রহস্যসকল তন্ন তন্ন করিয়া যে ভাবে আমার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার ভিতর এক নবীন ভাবের উদ্দীপন হইল এবং তাহাতেই আমি এ জীবনে রক্ষা পাইয়া গেলাম।

---

* (শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)

জগৎগুরু রামকৃষ্ণকে যাঁহারা ব্রাহ্মবিরোধী মনে করেন তাঁহারা তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

(১) পরমহংস দেব প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে আপনার কেন্দ্রস্থল করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে সে সময় যতগুলি ব্রাহ্মসমাজ ছিল, উৎসবের সময় তিনি সে সকল সমাজে নিয়মিত যাইতেন।

(২) ব্রাহ্মগণ দলে দলে তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে যাইত।

(৩) নববিধান সমাজের ব্রাহ্মবন্ধুগণ উৎসবের পর একদিন তাঁহার নিকট যাওয়া উৎসবের অঙ্গীয় বলিয়া মনে করিতেন।

(৪) তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যদিয়া আসিয়াছিলেন।

(৫) স্বামী বিবেকানন্দকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্য হইতে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

এবম্বিধ বহু ঘটনা স্মরণ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, তিনি ব্রাহ্ম বিরোধী ছিলেন না। ব্রাহ্মদিগের সহিত তিনি যেরূপ সাদরে আলাপ করিতেন, ব্রাহ্মদিগের হিতের জন্য তিনি যেরূপ চিন্তা করিতেন, এবং ব্রাহ্মদিগকে তিনি সতত যেরূপ উপদেশ দিতেন, সে সকল কথা স্মরণ করিলে বা শ্রবণ করিলে, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি সম্পূর্ণ ব্রাহ্মবন্ধু ছিলেন।

ঠাকুরের নিকট আসিয়া অনেক ব্রাহ্ম হিন্দু হইয়াছিলেন, এমন কি কোন কোন উপবীতত্যাগী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম পুনরায় উপবীত গ্রহণ ও হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। এজন্য অনেকে তাঁহাকে ব্রাহ্মবিরোধী মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্রাহ্মহিতৈষী ব্রাহ্মবন্ধু ছিলেন।

ভাই প্রতাপ চন্দ্রের ভ্রাতা বিপন্ন হইয়া, স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া ইহাঁর আশ্রয় লইতে আসেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে কয়েক দিন আশ্রয় দিয়া পরে বুঝাইয়া দেন যে এরূপে সব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা ভাল হয় নাই। আমি যেই দিন প্রথমে তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিতে যাই সেই দিন তিনি আমার পরিচয় লন, এবং আমি নববিধান সমাজে যাই শুনিয়া ঠাকুর অত্যন্ত সন্তোষের সহিত বলেন "বেশ! বেশ!! ও সব খুব ভাল, প্রত্যহ নির্জ্জনে ভগবানের নিকট বসা ও তাঁহার নাম গান করা খুব

ভাল"। এবং পরে আমাদিগকে পঞ্চবটীতে গিয়া ধ্যান করিতে বলেন। আমি নাগ মহাশয়ের সহিত অনেক দিন তাঁহার নিকট যাতায়াত করিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথা শুনিয়াছি, কিন্তু কোন দিন তাঁহাকে ব্রাহ্মবিরোধী বলিয়া মনে হয় নাই, বরং তিনি যে ব্রাহ্মসমাজের পরমহিতৈষী বন্ধু ছিলেন পদে পদে তাহার চিহ্ন দেখিয়াছি।

একদিন বারাসত অঞ্চলের জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া কাতরভাবে ঠাকুরকে জানাইল যে তাহার একটী উপযুক্ত শিক্ষিত পাশকরা পুত্র, শিবনাথ বাবুর দলে প্রবেশ করিয়া উপবীত ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কাতরভাবে ঠাকুরকে তাহার মত পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। ঠাকুর ছোক্‌রাটীর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, ব্রাহ্মণ জানাইল যে তাহার পুত্রের কোনও দোষ নাই সর্ব্বগুণে গুণান্বিত, ধর্ম্মপরায়ণ ও ঈশ্বর চিন্তায় রত, দোষের মধ্যে এই যে, সে এক্ষণে পৈতা ফেলিয়া হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পুত্রের মায়ায় বিমোহিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠাকুর তাহাকে মহামায়া সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া পরে বলিলেন "ধর্ম্ম লাভের জন্য, ঈশ্বর লাভের জন্য, যদি তোমার পুত্র ব্যাকুল হইয়া থাকে এবং সেই ব্যাকুলতার ভরে যদি সে কোন রকম সামাজিক পরিবর্ত্তন করিতে চায় তাহাতে দোষ কি? ক্ষতিই বা কি? এবং তাহাতে দুঃখই বা কি? এত আনন্দের কথা, প্রকৃত ঈশ্বর লক্ষ্য করে জীব যাহা করে তাহাতে দোষ নাই।" ব্রাহ্মণ তাহা শুনিতে চায় না, সে বলিল, কেন হিন্দুধর্ম্মে থাকিলে কি তাহার ঈশ্বর লাভ হবে না, আপনি তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন ও তাহাকে উপবীত ত্যাগে নিবৃত্ত করুন। ঠাকুর তাহার পুত্রকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন দিন তাহার পুত্রকে তথায় লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা তাহা আমার জানা নাই। ঠাকুর একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, সে ছেলেটীকে একবার আনিতে পারগা? আমি ব্রাহ্ম, পাছে আমি ঠাকুরকে ব্রাহ্মবিরোধী মনে করি এজন্য ঠাকুর "সে ছেলেটীকে একদিন আনিতে পারগা" বলিয়াই আমার পানে চহিয়া বলিয়াছিলেন "আমি তাহাকে কিছু বলিব না। আমি কেবল দেখিব তাহার ভাব কেমন।"

হিন্দু সমাজে অনেকের ধারণা ছিল যে ব্রাহ্মগণ শূন্যের উপাসনা করেন।

নিরাকার ঈশ্বরের ধারণাই হইতে পারে না। ইহাঁরা একবার কাঁদেন একবার গান গাহেন ও একবার চুপ করিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকেন। আবার কাঁদেন আবার গান গাহেন আবার চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। শেষ একজনের উপর "ভর" হয় ও সে খুব বক্তৃতা করিতে থাকে। বৃদ্ধ ও হিন্দু সাধকগণ উপহাস করিয়া বলিতেন হ্যাঁগা তুমি ব্রাহ্ম হয়েছ, তা তোমার বিষ্ঠা চন্দনে একজ্ঞান হয়েছে ? ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে সে কালে অনেকেরই এইরূপ বিশ্বাস ও ধারণা ছিল। কিন্তু পরমহংসদেবই সর্ব্বপ্রথম উচ্চরবে ঘোষণা করেন যে "না, এখানেও সেই এক সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মেরই উপাসনা হইয়া থাকে। তিনি প্রত্যহই আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম করিতেন। ব্রহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াই তিনি 'ওঃ এখানে শত শত লোক ব্রহ্মের পূজা করিয়া থাকেন' বলিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। কোন কোন ব্রাহ্মকে বলেছিলেন তোমাদের পথ ভক্তিপথ। এ খুব ভাল। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সত্য ধর্ম্ম এবং এভাবে ঈশ্বরকে ডাকিলেও যে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে একথা বলিতে তিনি কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। অপরদিকে ব্রাহ্মদিগের দোষ ও ভুল বিশ্বাস সকল স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতে তিনি কখন ভীত হইতেন না। একদিন একটি হিন্দুর নিকট কোন কোন হিন্দু ভাবের প্রশংসা করিতেছিলেন। সে সময় সেস্থলে একটি প্রাচীন ব্রাহ্মভক্তও বসিয়াছিলেন। তিনি সেই সকল কথা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন তবে আমাদের গতি কি হইবে। পরমহংসদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "না না তোমাদেরও গতি হইবে, তোমরা যাঁহার উপাসনা কর তিনিই তোমাদের গতি করিয়া দিবেন"।

ব্রাহ্মটী আবার বলিলেন "যদি আমরা ভুল পথ বা বিপথে যাইয়া পড়ি" ? পরমহংসদেব বলিলেন, "বিপথে যাইয়া পড়িলে তোমরা যাঁহাকে ডাক তিনিই তোমাদের সুপথে লইয়া আসিবেন। বাপু পথে মতে কিছু হয় না, হয় কেবল তাঁর দয়াতে (ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্) যে একান্ত মনে তাঁহাকে ডাকে তিনি তাঁহার নিকট প্রকাশিত হন।" আর একদিন অপর একটি ব্রাহ্মকেও এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। ভক্তটী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে "সরল প্রাণে ডাক্‌লে পরে থাকতে পারে কৈ" এই গানটি গাহিলেন। বিদায় কালে পরমহংসদেব

বলিলেন "কেবল ব্যাকুলতা ব্যাকুলতা, ব্যতীত কেহ তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।"

হিন্দু ব্রাহ্ম খৃষ্টান বলিয়া প্রভেদ নাই, ব্যাকুল ভাবে যে তাঁহাকে ডাকিবে সে তাঁহাকে পাইবে। ভগবান রামকৃষ্ণ বিশেষ ভাবে এই বাক্যটী প্রচার করিতেন। "যে তাঁহাকে চায় সেই পায়", কিসে ধন লাভ হইবে, কিসে সাংসারিক উন্নতি হইবে, কিসে লোকলজ্জা হইতে রক্ষা হইবে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে লোক সাত ঘটী জল খায়। কিন্তু কিসে ঈশ্বর লাভ হইবে, পরমার্থ লাভ হইবে কয়জন তাহা ভাবে! তাঁহার নিকট হিন্দু ব্রাহ্ম বলিয়া কোন ভেদ ছিল না, ভগবান রামকৃষ্ণ সকলকেই সরলভাবে উপদেশ দিতেন, ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে ডাক তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তিনি বলিতেন "যে চায় সেই পায়"।

নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার সফলতা সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, 'নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। বিষয়বুদ্ধির লেশ থাক্‌লে হবে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় যত আছে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সমস্ত ত্যাগ হলে, মনের লয় হলে তবে অনুভবে বোধে বোধ হয়। আর অস্তিত্ব মাত্র জানা যায়।' ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি কৃপা করিয়াই ভগবান্ রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ভুল ভ্রান্তি দেখাইয়া দিতেন। যাঁহারা সরল প্রাণে সেই সকল ভুলকে ভুল বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা এ জীবনে ধন্য হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ অনেকেই সেই সময় তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যাঁহারা পারিয়াছিলেন তাঁহারাও প্রকাশ্যে তাহা স্বীকার না করিয়া কলে কৌশলে তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আর যে সকল ব্রাহ্মকে তিনি "হীনবুদ্ধি" ব্রাহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাঁহারা তাঁহার উচ্চ আদর্শ, উচ্চভাব, ও পুণ্যব্রত ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার উপর বিরক্ত হইতে লাগিলেন, নানা ভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সময়ে সময়ে ঠাকুরের প্রতি দোষারোপ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না।

ব্রাহ্মসমাজের ভিতর সে সময় এরূপ অনেক লোক দেখিয়াছিলাম যাঁহারা আপনাদের পরিচিত লোককে পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতেছে শুনিলে বিমর্ষ হইতেন। এবং সাধ্যমত সেকার্য্য হইতে বিরত করাইবার চেষ্টা করি-তেন। ভূতপূর্ব্ব কলিকাতা পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কালীনাথ বসু মহাশয়

একদিন কমল কুটীরে বসিয়া আছেন, কোন লোক পরমহংসদেবের নিকট গিয়াছেন শুনিয়া বলিয়াছিলেন "তোমাদের ঐ কেমন ধারা একবার নববিধান একবার পরমহংস"। পরমহংসদেবের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, একাগ্রমনে বহুদিন চিন্তা করিতে করিতে বিলাতেও অনেক পণ্ডিতের ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি কথাও বোধ হয় ঐরূপ ক্ষেত্রেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। কেশব বাবু বলেছিলেন, ওর কাছে লোক যায় কেন? কোনদিন কুটুস্ করে কামড়ে দেবে, আর পালিয়ে আস্তে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন পরমহংসদেবকে "নাট করিতে নাই উহাকে কাঁচের আলমারির মধ্যে যত্নে রেখে দেখতে হয়"। ব্রাহ্মগণ কিন্তু সে কথা বিপরীতভাবে অর্থ করিলেন। সকলেই বুঝিলেন কেশব বাবু বলিতেছেন, পরমহংসদেবের নিকট অধিক যাইতে নাই !!! কিন্তু কেশব বাবুর সে ভাব ছিল না, পরমহংসদেব নিজেই তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। "ওর হীন বুদ্ধি নাই, সকলকেই বলে ওখানে গিয়ে মনের সন্দেহ ভঞ্জন করিও"। শ্রীম

বিক্রমপুরের "লুরাইতলী"

বাল্যাবধিই পথিপার্শ্বস্থ এক অশ্বত্থবৃক্ষমূলে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক 'লুরা' সংস্থাপিত হইতে দেখিয়া আসিতেছি। 'লুরা' কথাটী অনেকের নিকটই নূতন বোধ হইতে পারে, তজ্জন্য প্রথমে 'লুরা' সম্বন্ধে আভাস দেওয়া সঙ্গত। বিচালির দ্বারা নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছ মাত্রকেই "লুরা' বলে এবং যে বৃক্ষতলে উহা নিক্ষেপ করা হয় উক্তস্থানটীই 'লুরাইতলী' নামে অভিহিত হয়। পথিকেরা উক্তস্থান দিয়া যাতায়াতকালে পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র হইতে খড় সংগ্রহ করিয়া লুরা প্রস্তুত করে এবং শ্রদ্ধাসহকারে ঐ গুলি নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে নিক্ষেপ করতঃ করযোড়ে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করে। সময়ে সময়ে লুরার পরিবর্ত্তে শুষ্ক মৃত্তিকাখণ্ড প্রদান করিতেও দেখা যায়; কেহ কেহ উক্ত বৃক্ষে তেল সিন্দুরাদিও দিয়া থাকে। কেন, কি উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয় এবং কত কালাবধি

এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে তাহা নির্দ্দেশ করিবার কোনও সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার ভিতর যে কোনও মহান্ উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা নিঃসন্দেহ। কৌতুহলপরবশ হইয়া উক্ত বৃক্ষসম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে এ পর্য্যন্ত এক বিক্রমপুরের মধ্যেই নয়টি লুরাইতলীর সন্ধান পাইয়াছি; ভালরূপ অনুসন্ধান করিলে হয়ত আরও বহু লুরাইতলীর সন্ধান এক বিক্রমপুর হইতেই পাওয়া যাইতে পারে।

সকলস্থানের বৃক্ষগুলি এক জাতীয় নহে, স্থলভেদে ইহার প্রভেদ দেখা যায়। যে কয়টী বৃক্ষ আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে, সেগুলি প্রায় সমসাময়িক বলিয়াই অনুমিত হয় সত্য কিন্তু উক্ত বৃক্ষাদি সম্বন্ধে কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ বা প্রবাদ পাওয়া যায় না বলিয়া, অধিকন্তু আমি স্বয়ং উদ্ভিদতত্ত্বে অনভিজ্ঞ বিধায় উক্ত বৃক্ষাদির বয়স নির্ণয় করা আমি সমীচীন বোধ করিলাম না, তবু কৌতূহল প্রযুক্ত যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহাই এখানে প্রকাশ করিলাম।

বিক্রমপুরের যে যে গ্রামে লুরাইতলীর বৃক্ষ আছে এখানে তাহার একটী তালিকা দিলাম :—

১। লুরাইতলীঃ—রাউৎভোগ গ্রামের দক্ষিণ ও মাল্‌দা কালীবাড়ীর উত্তরস্থিত মাঠের মধ্যস্থলে এইটী সগর্ব্বে দণ্ডায়মান; ইহা একটী বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষ, বেতাদি লতা গুল্মে সমাচ্ছন্ন একটী ক্ষুদ্রায়তন ভরাট পুকুরের পূর্ব্ব পাড়ে অবস্থিত। এই বৃক্ষতলে প্রচুর লুরা সংস্থাপিত হয় এবং হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বালকেরা বৎসরে ২।৩ বার করিয়া উক্ত লুরাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দেওয়ায় পূর্ব্বাভিমুখীন একটী বৃহৎ স্থূল শাখা কক্ষচ্যুত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে। প্রতিবৎসর দাহ্যমান অনলোৎপীড়নে বৃক্ষটী এরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে হয়ত সামান্য কারণেই উহা শীঘ্র ভূশয্যা গ্রহণ করিয়া কালবশে লোকস্মৃতির অন্তরালে যাইবে।

২। টঙ্গিবাড়ীর অল্প উত্তরে অবস্থিত সুবিস্তীর্ণ মেদিনীমণ্ডল দীঘির পশ্চিম পাড়ে একটী লুরাইতলী পথিপার্শ্বে বিদ্যমান। এইটীও একটী অশ্বথ বৃক্ষ।

৩। লুরাইতলী—মুন্সীগঞ্জের দক্ষিণে কেওয়ার গ্রামে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার প্রায় পাশেই উহা বিরাজমান। ইহা একটী বটবৃক্ষ।

৪। পুবধাত্তা গ্রামে লুরাইতলী ইহা একটী হিজল গাছ।

৫। কুমারভোগ লুরাইতলী ”

৬। আলামপুর লুরাইতলী ইহা একটী হিজল গাছ।

৭। বেজগাঁও লুরাইতলী „

৮। সিদ্ধেশ্বরী লুরাইতলী অশ্বত্থ গাছ।

৯। শ্রীনগরের প্রায় আড়াই মাইল পূর্ব্বে লুরাইতলী—ইহা একটী কদম্ব-গাছ; পুরাতন গাছটী লোপ পাওয়ায় বর্ত্তমানে তথায় একটী নূতন কদম্ববৃক্ষ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

বিক্রমপুরের বহির্দ্দেশেও লুরাইতলীর বৃত্তান্ত পাওয়া যায়; দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে দুইটীর বিবরণ দেওয়া গেল:—

(১) পাটজোয়ারের অধীন নিশানবাড়ী গ্রামে লুরাইতলী—১টী বট বৃক্ষ।

(২) কুমিল্লা জিলার প্রসিদ্ধ মেহার কালীবাড়ীর কিছু পশ্চিমে একটা লুরাইতলীর সংবাদ পাইয়াছি।

অত্রপ্রবন্ধে 'লুরা' শব্দে চলিত উচ্চারণ হইতে 'র' ব্যবহার করিয়াছি কিন্তু 'ড়' ব্যবহার করিলে দেখা যায় 'লুড়ী' শব্দের অর্থ উপলখণ্ড। এখন কথা এই যে উক্ত উপলখণ্ডের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে প্রচলিত 'মৃত্তিকাখণ্ড' দেয় না ত?

কৃষকদের মুখে 'লোরা' শব্দ বলিতে শুনা যায়; কৃষকেরা ধান কাটিয়া আনিলে পর ক্ষেত্রে যে সব ধান্য অকর্ত্তিত থাকিয়া যায় সেই ধান্য সংগ্রহের নাম 'লোরন' আর উক্ত সংগৃহীত ধান্যকে 'লোরা ধান' বলে। নিম্নশ্রেণীস্থ গরীব বিধবাদিগকেই উক্ত ধান সংগ্রহ করিতে দেখা যায়। পূর্ব্বে হয়ত এই "লোরা ধান" উক্ত বৃক্ষমূলে সংস্থাপিত করা হইত বলিয়া উক্ত বৃক্ষাদিসংশ্লিষ্ট স্থানকে লুরাইতলী বলে না ত?

অবশ্য কোনও দেবকার্য্যোদ্দেশ্যেই উক্ত বৃক্ষমূলে ক্ষেত্রস্থ লোরাধান দেওয়া হইত। কেহ কেহ বলেন পরবর্ত্তী বর্ষে লক্ষ্মীর কৃপায় ধনে জনে বৃদ্ধি পাইবার আকাঙ্ক্ষায় লোকে ক্ষেত্রহইতে ধান 'লুরিয়া' লক্ষ্মীর উদ্দেশে উক্ত বৃক্ষমূলে রাখিয়া যাইত কিন্তু অতঃপর তদ্দ্বারা কি হইত তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে এ ধান্যের অধিকারী ছিল কে? দেখা যায়, মুনিদের উঞ্ছবৃত্তি ছিল এবং তদনুসারে তাহারাই একমাত্র শুভ কার্য্যার্থে এই 'লোরাধান' পাইতেন; সেকালে উক্ত ধান্যাদির সাহায্যেই তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্যাদি

নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারিত। এখন আর সে দিন নাই, কালের অপ্রতিহত গতিপ্রভাবে সবই চলিয়া যাইতেছে কাজেই 'লোরাধানের' পরিবর্ত্তে সহজলভ্য 'লুরা' বা মৃত্তিকাখণ্ড অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে।

আমার আনুমানিক দুইটী সিদ্ধান্ত :—

(১) এই বিক্রমপুরের নানা স্থানে মৃত্তিকাগর্ভে প্রস্তরনির্ম্মিত সূর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে, এখানে যে সূর্য্যোপাসক সম্প্রদায়ের মন্দিরাদি ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তমঃহন্তা আলোকদাতা সূর্য্যদেবের মন্দিরের পাশদিয়া যাইতে উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দ তদুদ্দেশে প্রণাম করিয়া ইচ্ছানুসারে যাহা কিছু তথায় দিয়া যাইত।

(২) বিক্রমপুরের বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধমঠের নিকট দিয়া যাতায়াত কালে উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী পথিকমাত্রই তত্রস্থ সজ্জিত প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া স্বস্ব অভিপ্রায়ানুসারে তথায় যাহা কিছু দিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত।

বর্ত্তমানে এস্থান হইতে সূর্য্যোপাসক সম্প্রদায়ের ও বৌদ্ধধর্ম্মের সম্যক্ বিলোপ ঘটায় এবং কালপ্রভাবে তৎকালীন সূর্য্যের মন্দির বা বৌদ্ধমন্দিরাদি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় অতীত স্মৃতি সংরক্ষণকল্পে নিদর্শন স্বরূপ হয়ত উক্ত স্থলে বর্ত্তমানে দৃষ্ট বৃক্ষাদি প্রোথিত করা হইয়াছে এবং পূর্ব্ব প্রদান-প্রথানুযায়ী সকলেই আজপর্য্যন্তও সহজলভ্য 'লুরা' ও অন্যান্য মানত প্রদান করিয়া যাইতেছে।

সুযোগ্য তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির নয়নসমক্ষে এই 'লুরাইতলীর' ব্যাপারটী উপস্থাপিত করাই আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যদি কেহ আমার এই কাল্পনিক মন্তব্যের উপর দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক উপেক্ষা না করিয়া এসম্বন্ধে গবেষণা-পূর্ব্বক প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে পারেন তবে হয়ত ঐতিহাসিক তত্ত্বের লুপ্ত এক অঙ্ক উদঘাটিত হইতে পারে।

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

ঋণী

শত ঋণে আমি সখি ! ঋণী তব ঠাঁই,
সে ঋণ শুধিতে পারি নাহিকো ক্ষমতা ।
কত প্রেম, কত প্রীতি, নিতি নিতি পাই,
কত না আমার তরে মর্ম্ম-কাতরতা ।

মনে পড়ে কত নিশি বিনিদ্র নয়নে,
ব্যাধি-নিপীড়িত মোরে সেবিয়াছ হায় !
দর দর অশ্রুধারা নয়নের কোণে,
মলিন কমল মুখ শত বেদনায় !

প্রবাসে যখন যাই, শুধু বার বার,
দু'ছত্র লিখিতে কভু ভুল না দাসীরে,
এ মিনতি ম্লানমুখে মধুর ঝঙ্কার,
হৃদয়-নৈবেদ্য তব দিয়েছে আমারে ।

হে নারি ! তোমার এই আত্ম-বলিদান,
হিন্দু-গৃহে সাজায়েছে নন্দন-বাগান ।

শ্রীযোগানন্দ গোস্বামী ।
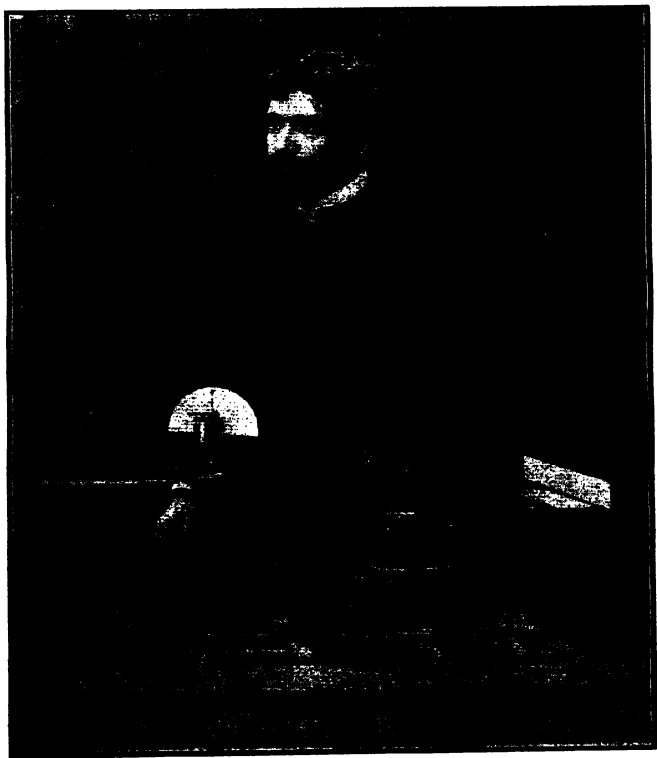
বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, সি, আই, ই,

বিক্রমপুর

২য় বর্ষ	শ্রাবণ ও ভাদ্র ; ১৩২১	৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা

বিক্রমপুরের রাস্তাঘাট

বিক্রমপুরের ন্যায় প্রাচীন স্থান বঙ্গদেশে অতি অল্পই আছে, কিন্তু নিম্নভূমি বলিয়া রাস্তাঘাটগুলি তেমন উচ্চ এবং যাতায়াতের সুবিধাজনক নহে। যেবার অতিরিক্ত বর্ষা হয় সেবার “মোহন লীলায় ঘরবাড়ী সব সলিলে ভাসে।” সমস্ত বিক্রমপুরের মধ্যে বজ্রযোগিনী, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রামের দিকটা অর্থাৎ রামপাল ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহ সকলের চেয়ে উঁচু। রামপালকেত একটি ছোট খাট টিলা বলিলেও চলে। কিন্তু প্রবল বর্ষা যেবার হয় সেবার ঐ সমুদয় গ্রামের বাড়ীর উপর পর্য্যন্ত জল উঠে। ঠিক মনে হইতেছে না—বোধ হয় ১৩০০ কি ১৩০১ সনে এমন বর্ষা হইয়াছিল যে আমাদের উঠানের উপর প্রায় ২॥ হাত জল হইয়াছিল। ঘরে ঘরে যাতায়াত করিবার জন্য তক্তা দিয়া সারা বাড়ীময় সাঁকো বাধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শিশুসুলভ আনন্দে সেই পিচ্ছিল তক্তার উপর দিয়া ছুটাছুটি করিতে যাইয়া আছাড় পড়িয়া মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল বলিয়া সেই জলপ্লাবিত ঘরবাড়ীর দৃশ্য এখনো পরিষ্কার মনে আছে। দিনাজপুর রঙ্গপুর অঞ্চলে যেমন প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই অন্ততঃ এক খানা গরুর গাড়ী আছে, বিক্রমপুরেও তেমনি প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই এক এক খানা করিয়া

নৌকা থাকে। বৎসরের প্রায় ছয় মাস তাহাই বিক্রমপুরের রাস্তাঘাট। কবি গর্ব্বভরে বলিয়াছেন,

Britannia needs no bulwarks
No towers along the steep
Her march is over the mountain waves
Her home is on the deep.

আমরা বিক্রমপুরবাসীরাও অম্লানবদনে ঐরকমই একটা কিছু বলিয়া ফেলিতে পারি। কারণ বিক্রমপুরে লক্ষ্মীসরস্বতীর বরপুত্রের অভাব না থাকিলেও "স্বীকার করিতেই হইবে" যে বিক্রমপুরের রাস্তাঘাটের অবস্থা বড় সন্তোষজনক নহে। এজন্য অনেকের পক্ষে সন্দিহান হওয়া অসম্ভব নহে যে চন্দ্র-বর্ম্ম-সেনরাজগণের তাম্রশাসন গুলা সমস্ত জাল, এমন সৃষ্টিছাড়া স্থানে তাঁহারা কখনই জয়স্কন্ধাবার স্থাপিত করিতে আসেন নাই।

কিন্তু চন্দ্র-বর্ম্ম-সেনরাজগণের দোষ বিশেষ নাই। কোন্ শুভক্ষণে কোন্ অনতি-পরিজ্ঞাত-পরিচয় বিক্রমাদিত্যের শুভদৃষ্টি এই ইছামতী-মেঘনা-পদ্মা-বেষ্টিত সুন্দর ভূমিখণ্ডটুকুর উপর পড়িয়াছিল—ইতিহাস তাহার সন তারিখ মনে রাখে নাই। কিন্তু তিনি এই ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডটুকুকে যে গৌরবের আসনে উন্নমিত করিয়া গিয়াছিলেন—চন্দ্র-বর্ম্ম-সেনরাজগণের আমলে তাহার গৌরব বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। তাঁহারা রাজধানী রামপালের সন্নিহিত উচ্চ ভূমি-খণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সত্য,—কিন্তু চারিদিকের জলময় নিম্ন ভূভাগের উন্নতিবিধানে তাঁহাদের দৃষ্টির বিরাম ছিল না। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে বিক্রমপুর মহাসমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হইয়াছিল—দিক্‌দিগন্তর হইতে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বণিক ইত্যাদি জাতিভুক্ত জনসমূহ আসিয়া বিক্রমপুরে আবাস স্থাপন করিয়াছিল। যাতায়াত করিবার জন্য অনেক জল-প্রণালী ও রাস্তা তৈয়ার হইয়াছিল। তাহাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও সমস্ত বিক্রমপুর জুড়িয়া আছে। সেগুলি কোন্ আমলের সেই বিষয়ে সমসাময়িক প্রমাণ বড় বেশী কিছু নাই, কিন্তু নিপুণ পর্য্যবেক্ষণকারীর নিকট তাহারা হিন্দুরাজগণের গুণগাথা গাহিয়া উঠে।

বিক্রমপুরে দেউলগুলির অবস্থান বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের যোগ্য। সমুন্নত ভূমির উপর এই প্রাচীন দেবালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জলাভূমি হইতে

মাটি তুলিয়া স্তূপীকৃত করিয়া বর্ষার সর্ব্বোচ্চ জলরেখার সমতল হইতেও এই মাটির স্তূপগুলি অনেক উচ্চ করা হইত। এ কাজ এত ব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য যে রাজগণ ও সবিশেষ ধনী ব্যক্তিগণ ভিন্ন এই কার্য্যে অন্য কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন বলিয়া মনে হইতেছে না। দুই তিন বর্ষা ও বৃষ্টিধারায় এই মাটি বসিয়া কঠিন হইলে তাহার উপর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইত। দেবালয়কে কেন্দ্র করিয়া এক একটি নানাজাতি সমন্বিত ছোট খাট উপনিবেশ স্থাপিত হইত এবং তাহারই চারিদিকে গ্রাম গঠিত হইয়া উঠিত। এইরূপে সমস্ত বিক্রমপুরময় দেউল ও গ্রাম গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে।

এই দেউল ও গ্রামগুলির মধ্যে যাতায়াত করিবার সুবিধার জন্য অনেকগুলি খাল ও রাস্তা তৈয়ার হইয়াছিল। উত্তর বিক্রমপুরে * প্রধান কৃত্রিম জলপ্রণালী তিনটি—মিরকাদিমের খাল, তালতলার খাল ও শ্রীনগরের খাল। স্বাভাবিক জলপ্রণালীও তিনটি, যথা—সেরাজদিঘীর নীচে লুপ্তাবশিষ্ট ইচ্ছামতী নদী, লোহজং ও বহর সংযোজক ধানকুনিয়ার খাল, এবং বিক্রমপুরের পূর্ব্বাংশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদ। ইহা ছাড়া অসংখ্য ছোট ছোট খাল সমস্ত বিক্রমপুর ছাইয়া আছে। এই খালগুলি খনন করিয়া দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইত। প্রথম—ইহাতে সমস্ত জলাভূমি শুষ্ক হইয়া উঠিত কারণ যে জল অগভীরভাবে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত দেশ ডুবাইয়া রাখিত তাহা সন্নিহিত ভূমি হইতে নামিয়া গভীর খাল দিয়া প্রবাহিত হইয়া নদীতে চলিয়া যাইত। দ্বিতীয়তঃ যতায়াতের সুবিধা হইত।

হিন্দু আমলের প্রায় সমস্তগুলি খালই এখনো উন্মুক্ত আছে কিন্তু রাস্তাগুলি প্রায়শঃই অদৃশ্য হইয়াছে। নেহাৎ জোর করিয়া না আটকাইলে বর্ষার জলপ্রবাহ স্বভাবতঃই প্রত্যেক বৎসর প্রত্যেক খাল দিয়া প্রবাহিত হইয়া সেগুলিকে সজীব রাখে। কিন্তু উন্নত রাস্তাগুলি দুই চারি বৎসরের অনাদরেই বৃষ্টিধারায় এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে ক্ষয়িত হইতে থাকে এবং অবশেষে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। আমরা বিক্রমপুরে এরূপ অনেক লুপ্ত রাস্তার সন্ধান পাইয়াছি—ক্রমে ক্রমে তাহাদের পরিচয় প্রদান করিব ও তাহাদের বয়স

---

* দক্ষিণ বিক্রমপুরের আমি কোন অংশই বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা পাই নাই—বর্ত্তমান প্রবন্ধে উত্তর বিক্রমপুরের বিষয়ই আলোচিত হইবে। লেখক।

নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের আগামী বারের আলোচ্য—বিক্রমপুরের জলপ্রণালী। পরের আলোচ্য -বিক্রমপুরের আধুনিক ও প্রাচীন রাস্তা—এবং সর্ব্বশেষ বিক্রমপুরের প্রাচীন বন্দর ও ঘাট। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

নারী-জীবনের উদ্দেশ্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(চ) রক্তের উপাদান।

রক্তের উপাদান।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।
রক্তকণা	৫১৩·০০	৩৬৯·২০
হিমগ্লোবিন্ এবং গ্লবিউল্স্ ...	১৫৯·৬০	১২০·১০
ধাতব লবণ	৩·৭০	৩·৫৫
প্লাজমা	৪৮৬·৯০	৬০৩·৮০
জল	৪৩৯·০০	৫৫২·০০
ফাইব্রিণ	৩·৯০	১·৯১
এলবিউমেন এবং অন্যান্য পদার্থ	৩৯·৯০	৪৪·৭৯
লবণ	৪·১৪	৫·০৭

৫১। স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের আভ্যন্তরিক উত্তাপের প্রভেদ।

	প্রাতঃকাল	দ্বিপ্রহর	অপরাহ্ণ।
নবজাত শিশু	৩৭·৪১	৩৭·৮০	৩৭·৬১
বালক বালিকা	৩৭·৩৭	৩৮·০৭	৩৭·১২
পুরুষ	৩৭·০ (প্রায় ৯৮·৪ ফাঃ হিঃ)	৩৭·২৫	৩৬·৬০
স্ত্রী	৩৭·২২	৩৭·৫৫	৩৭·১০

See Schafer's Text-Book of Physiology, Page 1043

৫২। স্পর্শবোধ। Touch.

স্ত্রীলোকের স্পর্শ বোধ অনুভব করার শক্তি পুরুষ অপেক্ষা প্রবল। See Galton, "The Relative sensitivity of Men and Women's Nature, 10th May, 1894.

৫৩। বেদনা অনুভব করার শক্তি.। Sensibility of pain.

পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণের বেদনার যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি অনেক বেশী। ইহা ভিন্ন স্ত্রীলোকের আত্মত্যাগের শক্তিও পুরুষ অপেক্ষা প্রবল। (See Sergi, "Sensibilita Femmenile", L'Anomals, Oct. 1891 ; See also Dr. H. Campbell's Nervous Organisation.

৫৪। ঘ্রাণশক্তি। Smell.

স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। (See "L'Olfatoo nei criminali" Archivio di Psichiatria Vol. IX. Fasc. 5.)

৫৫। আস্বাদনশক্তি। Taste.

রমণীগণের অপেক্ষা পুরুষের আস্বাদন শক্তি প্রবল। (See Man and Woman, P. 143)

৫৬। শ্রবণশক্তি। Hearing.

রমণীগণের শ্রবণশক্তি পুরুষ অপেক্ষা প্রবল। "The hearing of the women was decidedly more acute than that of the man." (See "Studies, etc." Amer. Journal Psych. April 1892, Pp. 422. 423)

৫৭। দৃষ্টিশক্তি। Sight.

স্ত্রীলোকের নিকট-দৃষ্টিশক্তি পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী; কিন্তু দূঢ়দৃষ্টি পুরুষের অধিক। (See Man and Woman, P. 151)

৪৮। স্ত্রী ও পুরুষের শারীরিক শক্তির প্রভেদ।

রমণীগণের শারীরিক শক্তি পুরুষ অপেক্ষা এক তৃতীয় কম। পুরুষ তাহার শরীরের ওজনের দ্বিগুণ দ্রব্য বহন করিতে পারে, স্ত্রীলোক তাহার শরীরের ওজনের অৰ্দ্ধেক ওজন দ্রব্য বহন করিতে সমর্থা হইয়া থাকে। পুরুষ ১২০ হইতে ১৩০ গজ দূরে বল নিক্ষেপ করিতে পারে; কিন্তু রমণীরা ৭০

হইতে ১০০ গজের অধিক দূরে বল নিক্ষেপ করিতে পারে না। ফলতঃ শারীরিক শক্তি ও দ্রুত গমনে, রমণীরা পুরুষ অপেক্ষা অনেক হীন। (See Ditto Pp. 144 to 151)

৫৯। হস্তাক্ষর। Hand-writing.

স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর পুরুষ অপেক্ষা বড় হইয়া থাকে। অল্প লেখা হইলে রমণীরা পুরুষ অপেক্ষা তাড়াতাড়ি লিখিতে পারে; কিন্তু অধিক সময় লিখিতে হইলে পুরুষ যেরূপ দ্রুত ও যত অধিক এবং যেরূপ বিনা ক্লেশে লিখিতে পারে, রমণীরা তাহা পারে না। (See A. Dichl, Psychologische Arbeiten, Vol. 3. 1889 P. 37)

৬০। হস্তনির্ম্মিত কার্য্যে দক্ষতা।

হস্তনির্ম্মিত সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে রমণীরা পুরুষ অপেক্ষা হীন।

(See Carl Vogt, Revue d' Anthropologic, quoted in Ploss, Das Weib, Band 1, P. 34.)

৬১। ইন্দ্রিয়গণের ধারণাশক্তি।

ডাক্তার গিলবার্ট বলেন, "সকল যুগেই দেখা গিয়াছে যে বালকগণ বালিকাগণ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে ভ্রমশূন্য। (See Gilbert Studies from the Yale Psych. Lab ; See also Jowa Univ. Studies in Psych, 1897.)

ডাক্তার ফ্রেঞ্জ ও হাস্টন মহোদয়গণ বলেন, বালকেরা বালিকাদিগের অপেক্ষা সময়, দূরত্ব, অনুপাত, পরিমাপ ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়েই অনেকটা ভ্রমশূন্য। (See Franz and Houston, "The accuracy of Observation and Recollection in School Children." Psych. Rev., Sep. 1896.)

৬২। বুদ্ধিশক্তি।

পুরুষের চিন্তাশীলতা ও চিন্তাপ্রণালী অতি সুগভীর ও সুবিবেচিত। স্ত্রীলোকেরা সাধারণ বিষয় তাড়াতাড়ি ধারণা করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাদের চিন্তাপ্রণালী পুরুষের ন্যায় তত সুগভীর নহে। তবে স্ত্রীলোকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বা হঠাৎ বুদ্ধি পুরুষ হইতে তীক্ষ্ণ। সকলেই জানেন যে, সন্তানের বা পতির

অথবা প্রণয়ী ব্যক্তির কোন বিপদ হইলে রমণীরা হঠাৎ একটা উপায় স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

"The masculine method of thought is massive and deliberate, while the feminine method is quick to perceive and nimble to act. * * Whenever a man and a woman are found under compromising circumstances it is nearly always the women who with ready wit audaciously retrieves the situation. Every one is acquainted with instances from life or from history of women whose quick and cunning ruses have saved lover or husband or child." (See Man and Woman by H. Ellis, P. 196).

৬৩। অকালে বুদ্ধির বিকাশ।

রমণীগণের পুরুষ অপেক্ষা অকালেই বুদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে। এজন্য বালিকাদিগকে বাল্যকালে বালকদিগের অপেক্ষা একটু বেশী চতুর চালাক দেখা যায়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে রমণীরা পুরুষের ন্যায় গভীর বুদ্ধিশক্তির পরিচয় দিতে পারেন না। (See Revue Scientifique, 1881, P 308. See also Rev. Sper. di Fren., Vol. XXIX., P. 446; Pedagogical Seminary, Oct. 1896)

ডাক্তার রিকার্ডি বলেন যে, স্ত্রীলোকেরা সামাজিকতায়, সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে, গৃহকার্য্যে ও প্রাচীন রীতিনীতিতে সুদৃঢ় অনুরাগ দেখা যায়। (See Riccardi Antropologia e Pedagogia, Part I., PP. 121-161)

৬৪। ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে দক্ষতা।

মিঃ ডাল্‌নী বহু বড় বড় ব্যবসায়ীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছেন যে, "স্ত্রীলোকেরা সাধারণ শিল্প বাণিজ্যে পুরুষ অপেক্ষা একটু পরিশ্রমী সত্য, কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা তাহারা বুদ্ধিশক্তিহীন ও কঠিন পরিশ্রম করিতে পারে না।" (See Revue Scientifique, 1881 P. 307)

মিঃ সিড্‌নি ওয়েব মহোদয় বলিয়াছেন,--"দৈনিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের উপর আর কোন কার্য্যের ভার রমণীদের উপর প্রদান করিতে বিশ্বাস করা যায় না।"

"It has been found impossible to entrust them with more than routine work.

See S. Webb. "Alleged Differences in the Wages paid to Men and to Women for Similar work," Economic Journal, 1891, P. 635.

সংসারের সাধারণ কার্য্যগুলি রমণীরা পুরুষের ন্যায় তাড়াতাড়ি ও ভ্রমশূন্য হইয়া করিতে পারে, কিন্তু গুরুতর ও কঠিন কার্য্যের ভার রমণীদের উপরে পতিত হইলে, তাঁহারা পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইতে পারেন না। কারণ রমণীদের শারীরিক শক্তি পুরুষ অপেক্ষা অনেক অল্প। ফলতঃ মাতৃত্ব-বিকাশের জন্য রমণীদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি বা বৃত্তিগুলি পুরুষ অপেক্ষা সতেজ ; কিন্তু পুরুষোচিত কোন কার্য্যেই রমণীরা পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন না।

"As a rule they do their work with intelligence and accuracy, and under ordinary conditions they probably do it almost as quickly ; but at times of pressure they are not able to maintain a competition with men at the heavier kinds of work, * * * owing to a lack of staying power". (See Man and woman, P. 205।

রমণীরা অন্যের উপরে আধিপত্য করিতে পারেন না ; কোন গুরুতর কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা করিতে অক্ষম। বলা বাহুল্য, উপরি উক্ত নানা কারণে আজ-কাল পৃথিবীর অধিকাংশ গবর্ণমেণ্টই স্ত্রীলোকদিগকে ডাক, টেলিগ্রাম ও কেরাণী বিভাগে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন না এবং স্ত্রীলোকদিগকে নিযুক্ত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন।

"Mr. C. H. Garland, Secretary of the Postal Telegraph clerk's Association in a paper on "Women as Telegraphists" in the Economic Journal, June 1901—finds that in 35 of the 47 Administrations of the Postal Union women are employed or have been employed as telegraphists. Belgium no longer

receives women into the telegraph service, and female telegraphists are a moribund class in Germany. The Austrian Administration finds that they are not satisfactory in the higher grades, not having sufficient energy to obtain authority over other persons. In France, as in England, it is found that in replacing a male by a female staff the number must be considerably increased and sick leave is much greater in the case of women. Germany in its opinion, and in the meanwhile no more are being admitted into the service. Belgium has come to the conclusion that,—as they could not work at high pressure or meet sudden emergencies, and were frequently ill."

৬৫। অবিমিশ্র জ্ঞান। Abstract thought.

সত্য সম্বন্ধে স্ত্রীলোক যেরূপ দেখে তাহাই গ্রহণ করে; কিন্তু পুরুষেরা নিত্য নূতন সত্য উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করে। স্ত্রীলোক প্রায় সকল বিষয়েই বালকের মত। (See Children's Leis, Am : Journal of Psychology, January 1890)

৬৬। ধর্ম্মতত্ত্ব আবিষ্কার।

এই পৃথিবীতে প্রায় ৬০০ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে কেবল ৭টি স্ত্রীলোকের দ্বারা স্থাপিত। ইহা দ্বারা ইহাই পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় যে, স্ত্রীলোক ধর্ম্মভাবগুলি যেমন সহজে ধারণা করিতে পারে, সেইরূপ নূতন কোন ধর্ম্মতত্ত্ব তাহাদের আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা নাই। (See Man and Woman, by H. Ellis, P. 215)

৬৭। শিল্পজ্ঞান।

কি চিত্রবিদ্যা, কি সঙ্গীত বিদ্যা, কি ভাস্কর বিদ্যায় কোন বিষয়েই স্ত্রীলোক পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। (See Ditto, p 366.)

স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই গানবাদ্য করেন সত্য, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোক

নূতন কোন বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। (See "Nature" 13th Oct. 1892 ib, Woman's Place in Primitive culture, ch. viii.)

৬৮। সাহিত্য জ্ঞান।

সাহিত্য ৪ অংশে বিভক্ত। মনোবিজ্ঞান, যোগতত্ত্ব, কবিত্ব ও কল্পনা।

মনোবিজ্ঞানে পুরুষেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। এমন কি তৃতীয় শ্রেণীর লেখিকাও স্ত্রীলোকের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। (The art of metaphysics belongs almost exclusively to men. Even in the third rank of metaphysicians the names of no women can yet be very clearly discerned ") (See Man and Woman, Pp. 369-370)

যে যোগতত্ত্ব ধর্ম্মের মূল, সেই যোগতত্ত্বে স্ত্রীলোকদের বিশেষ অধিকার এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। (See Ditto)

কবিত্বেও রমণীরা পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। এমন কি স্ত্রী কবি অতি অল্পই দৃষ্ট হয়, যাহাদের কবিত্বের ভাষা, ভাব, গভীরতা ও চিন্তাশীলতার প্রখরতা পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

"Strong poetic art, which involves at once both a high degree of audacity and brooding deliberation, is very rare in women " "We have a Sappho and a Christina Rossetti—one representative of each of the great poetic nations of Europe—but it is difficult to find women poets who show in any noteworthy degree the qualities of imagination, style and architectonic power which go to the making of great poetry". (See Man and Woman, P. 370)

৬৯। সাহিত্যসেবীদের সংখ্যা।

মোটের উপর সাহিত্য জগতে সর্ব্ববিষয়ে পুরুষেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এ পর্য্যন্ত ইউরোপে ৪৫০০ লেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শতকরা ৪'১ জন মাত্র স্ত্রীলোক। বিখ্যাতনামা গ্রন্থকার হেভ্‌লক ইলিস্ মহোদয় লিখিয়াছেন :— "ব্রীটীশ জাতিদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত সকল বিভাগে ১০৩০ জন প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শতকরা ৫'৩ জন স্ত্রীলোক।

'As regards literature—among over 4500 writers only 4·1 per cent. were women'. (See Man and Woman P. 375)

৭০। মানসিক উত্তেজনা।

স্ত্রীলোকের স্নায়ুমণ্ডলের গঠন-প্রণালী পুরুষ হইতে অনেক বিভিন্ন। অতি সামান্য কারণেই স্ত্রীলোকের স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া উত্তেজিত হইয়া থাকে। এই কারণে স্ত্রীলোক স্নায়ুমণ্ডলের নানা পীড়ায় অধিকতর আক্রান্ত হইয়া থাকেন।

স্ত্রীলোকের মানসিক সামান্য একটু উত্তেজনা হইলেই স্তন্যদুগ্ধ বিষাক্ত হইয়া যায়। একটু সামান্য ক্রোধ হইলে বা কোন প্রকার শোক, তাপ, ভয়, ত্রাস ইত্যাদি কারণেই মাতৃদুগ্ধ বিকৃত বা বিষাক্ত হইয়া থাকে।

* " There is even evidence that the mammary secretion may actually be poisonous character under the influence of mental excitement". (See Dr. Chavassi's Advice to a mother.)

"There is no secretion of the human body that exhibits so quickly the injurious influence of the depressing emotions as that of the breast". (See Hints to Mothers and Maternal Management of Children by Dr. Bull, M. D. Pp. 234 & 32)

৭১। জন্ম-মৃত্যু তালিকা।

আজ কাল জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। যদিও পুংসন্তান অধিক জন্মগ্রহণ করে, তথাপি স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অত্যধিক।

স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ার কারণ এই যে, জন্মের সময় হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পুংসন্তানের মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। বালিকা শিশু অপেক্ষা বালক শিশুর মৃত্যু সংখ্যা অত্যধিক। পুং শিশুর মস্তিষ্কের খুলি (Skull) বালিকা অপেক্ষা একটু বড় বলিয়াই অনেক পুং শিশু প্রসবের সময় বা পরে মারা পড়ে। দাঁত উঠার সময় পুংসন্তানই অধিক মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। একমাত্র ১৬ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা একটু বেশী, কিন্তু জন্ম হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক দীর্ঘজীবিনী, নিরোগী ও বলিষ্ঠা হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের জীবনী শক্তি পুরুষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। (See Man and Wooman, PP. 428 to 439.)

১২। জননেন্দ্রিয়।

ইহা স্ত্রী এবং পুরুষে সম্পূর্ণরূপেই বিভিন্ন। পুরুষের জননেন্দ্রিয় যথা,—

পুং—বাহ্য-জননেন্দ্রিয় ও অণ্ডকোষ।

স্ত্রীর যথা,—বাহ্য-জননেন্দ্রিয়, জরায়ু, ফেলোপীয়ান্ টিউব (যে নালী দ্বারা ডিম্বকোষ হইতে জরায়ুতে ডিম্ব আইসে), ডিম্বকোষ ও ইহাদের আনুষঙ্গিক স্তন ইত্যাদি।

ইহাদের ক্রিয়াও সম্পূর্ণরূপে পৃথক। এক জরায়ুতে প্রতিমাসে ও গর্ভাবস্থায় যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহাদের সঙ্গে পুরুষের কোন যন্ত্রের ক্রিয়ার তুলনা করা যায় না।

১৩। ঋতু।

প্রতিমাসে জরায়ুর ভিতরের পুরাতন ঝিল্লি (পর্দা) পতিত হইয়া থাকে ও নূতন ঝিল্লি উৎপন্ন হয়। এই ঝিল্লি ছিন্ন হইলে যে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে "ঋতু" বলে। গাছের পাতা যেমন বৎসর বৎসর নূতন জন্মে, এই ঝিল্লিও তেমনি (গর্ভসঞ্চারের জন্য) মাসে মাসে নূতন করিয়া গঠিত হয়। গর্ভ হইলেও স্তন্যদানের সময় ঋতু বন্ধ থাকে। এই সময়ে ঐ সকল যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ থাকায় স্তনের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। (See Dr. Playfair's Midwifery Page 66.)

স্ত্রী পুরুষের ঈশ্বরের নির্ম্মাণের পার্থক্য মোটামোটি উপরে উদ্ধৃত করা হইল। পুরুষ হইতে রমণীগণের দেহের সমস্ত গঠন, সমস্ত ক্রিয়া, সমস্ত শক্তি, এমন কি রমণীগণের প্রত্যেক পরমাণুটি ভগবান পুরুষ হইতে প্রভেদ করিয়াছেন কেন, তাহাই আমরা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। বলা বাহুল্য, একমাত্র মাতৃত্ব বিকাশের জন্যই ভগবান রমণীগণকে পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন।

১। অস্থি। Bones.

স্ত্রীলোকের অস্থিগুলি পুরুষ অপেক্ষা লঘু, মসৃণ, সরল ও মাংসপেশী-সংলগ্ন স্থানগুলি তত স্পষ্ট নহে। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের পাজরার হাড় ও বস্তিদেশের হাড়ের গঠন প্রণালী পুরুষ হইতে অনেক বিভিন্ন। এ প্রভেদের কারণ কি? একমাত্র সন্তান উৎপাদন, গর্ভধারণ এবং প্রসবের সুবিধার জন্যই রমণীগণের অস্থিগুলি পুরুষ হইতে ভিন্ন হইয়াছে। বস্তিদেশের হাড়গুলি যদি ভগবান পুরুষের ন্যায় সৃষ্টি করিতেন, তবে কিছুতেই রমণীগণের প্রসব হইতে পারিত না। বস্তি-

দেশের দেহের হাড়ের গঠনপ্রণালী এবং মুখের মাপই যে কেবল পুরুষ হইতে প্রভেদ করিয়াছেন তাহা নহে ; গর্ভাবস্থায় এই বস্তিদেশের সন্ধি সমূহের মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন্ সংঘটিত হয়, তদ্দ্বারা সন্ধিসঞ্চালনের সুবিধা হয়। সন্ধির ও উপস্থিসকল স্ফীত ও কোমল হয় এবং দুই খণ্ড উপস্থি সংযোগস্থলে যে মাস্তক ঝিল্লি থাকে, তাহা পরিবর্ত্তিত ও তরল পদার্থ পূর্ণ হয়। (See Dr. Playfair's Midwifery, Page 9.)

এইরূপে স্ত্রীলোকের শরীরের প্রত্যেকখানি অস্থিতে একমাত্র মাতৃত্ব বিকাশের সহায়তার জন্যই ভগবান্ পুরুষ হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন।

২। মাংসপেশী। Muscle.

স্ত্রীলোকের মাংসপেশী কোমল হয়, অস্থির সহিত তত কঠিনভাবে সংলগ্ন থাকে না ; ইহার কারণ এই যে স্ত্রীলোকের যদি পুরুষের ন্যায় মাংসপেশী শক্ত থাকিত, তাহা হইলে সহজে প্রসব হইতে পারিত না। কেহ কেহ বলেন যে, স্ত্রীলোকে পুরুষের ন্যায় রীতিমত ব্যায়াম করেন না বলিয়াই তাঁহাদের মাংসপেশী কোমল, শারীরিক শক্তি পুরুষ হইতে অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে আমেরিকার সুবিখ্যাত লেখক ডাক্তার জি, জে, ইঞ্জিলম্যান্ মহোদয় তথাকার একখানি পত্রিকায় লিখিয়াছেন :—"স্ত্রীলোকের পুরুষের ন্যায় শারীরিক ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য নহে ; শক্তিশালিনী রমণীদের নানা জরায়ুর পীড়া জন্মে ও মাতৃত্ব-বিকাশের সম্পূর্ণ বাধা জন্মাইয়া থাকে।"

Dr. G. J. Engelmann, "The American Girl of to-day". Trans. Am. Gynecol. Soc, 1900, writes :—"At the same time it is very important to remember that the inferior strength and muscular development of women, as compared to man, is in relation to her inferior size and to various fundamental and organic characteristics. * * I have noticed that well developed muscular and athletic women sometimes show a very marked degree of uterine, as well as vesical, inertia in child birth. * * It would certainly seem that excessive development of muscular system is unfavourable to maternity."

৩। শ্বাসপ্রশ্বাস। Resperation.

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে পুরুষের শ্বাস প্রশ্বাসে উদরের মাংসপেশীর ক্রিয়া অধিক দেখা যায় ও স্ত্রীলোকের বুকের মাংসপেশীর ক্রিয়া অধিক হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, গার্ভাবস্থায় রমণীদের উদরের মাংসপেশীর ক্রিয়া ভালরূপ হইতে পারে না, এই জন্যই দয়াময় ঈশ্বর রমণীদের বুকের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহার জন্যই স্ত্রীলোকদের পাঁজরার হাড়ের সঙ্গে মেরুদণ্ডের সন্ধিস্থান, বুকের হাড় ইত্যাদির এত পরিবর্ত্তন করিয়া রাখিয়াছেন।

"Jonathan Hutchinson studied the matter carefully, and came to the conclusion that the difference of breathing was not due to the restraints of clothing. He argued that it was a natural adaptation to the child bearing function in women." (See Todd and Bowman, Cyclopædia of Anat. and Phys., Art. "Thorax.")

৪। স্ত্রীলোকের দীর্ঘজীবনের কারণ।

রমণীরা স্বহস্তে তাঁহাদের সন্তান পালন করিলে তাঁহারা সুস্থকায়া, বলিষ্ঠা, নিরোগী ও দীর্ঘজীবিনী হইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, "মাতা স্বহস্তে সন্তান লালন পালন করিলে সন্তানের পক্ষে যেরূপ উপকার হয়, মাতার স্বাস্থ্যের পক্ষেও তদ্রূপ উপকার হইয়া থাকে। শিশু জন্মিবার পর একমাস কাল প্রসূতির রোগ আক্রমণ নিবারণ কিংবা উহার সম্ভাবনার হ্রাস করিবার ইহা (সন্তান-লালন-পালন) একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। সন্তান-লালন-পালন সময়ে মাতার স্বাস্থ্য যেরূপ উন্নত থাকে, মাতা যেরূপ বলিষ্ঠা ও অরোগিণী থাকেন, তাঁহার জীবনের অন্য সময়ে সেরূপ ঘটনা প্রায় দেখা যায় না। অনেক ক্ষীণাঙ্গী ও অসুস্থা রমণীও এই সময়ে (সন্তান-লালন-পালন-সময়ে) বলিষ্ঠা হইয়া থাকেন।"

"Nursing would also seem to be as beneficial to the system of the healthy woman as to her child. In the lying-in month it undoubtedly is the means of preventing or diminishing the

tendency to disease. During the whole period of nursing it contributes greatly to preserve and promote the mother's health ; for no period of the woman's life, generally speaking, is so healthy as this, and many a woman who has previously been delicate will become robust and strong at this time." (See the Maternal Management of Children by Dr. Thomas Bull M. D. Page 14.)

৫। মস্তিষ্ক। Brain.

স্ত্রী এবং পুরুষের মস্তিষ্কের ওজনের প্রভেদ ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন ৫।৬ আং অধিক কেন এবং গঠনেরও প্রভেদ আছে কেন, তাহাই আমরা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ মস্তিষ্ককে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ফ্রণ্টেল বা সম্মুখ ভাগ, পেরাইটেল বা পার্শ্বভাগ ও অক্সিপিটেল বা পশ্চাদ্ভাগ। মস্তিষ্কের ঠিক কোন্ স্থান কোন্ বৃত্তির কেন্দ্রস্থল, তাহা এখনও পণ্ডিতগণ সম্যকরূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তবে অধিকাংশ মনস্বী বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন যে, মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগ মনস্বিতা বা উন্নত প্রতিভার কেন্দ্রস্থল ; সম্মুখ ও পার্শ্বভাগ দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা, কোমলতা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, অপত্যস্নেহ, প্রেম ইত্যাদি বৃত্তিগুলির কেন্দ্রস্থল এবং পশ্চাদ্ভাগ পাশবিক বৃত্তিগুলির কেন্দ্রস্থল। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, পুরুষের মনস্বিতা-লাভের বৃত্তিগুলি অধিকতর উন্নত এবং এই জন্যই পুরুষের মাথার খুলির (Skull) সম্মুখভাগ বা কপালের উচ্চতা, ভ্রূদেশ প্রভৃতি স্ত্রীলোক অপেক্ষা উন্নত হইয়া থাকে। ফলতঃ পুরুষের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি যেমন রমণীদের অপেক্ষা সমধিক উন্নত, সেইরূপ স্ত্রীলোকের হৃদয় অর্থাৎ দয়া, মায়া, স্নেহ, ভাল-বাসা ইত্যাদি বৃত্তিগুলি পুরুষ অপেক্ষা সমধিক উন্নত, কোমল ও সুন্দর। বলা বাহুল্য, একমাত্র মাতৃত্ব-বিকাশের জন্যই ভগবান্ রমণীদের ঐ সকল বৃত্তি পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর কোমল ও উন্নত করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহারও মধ্যে শারীরিক ও মানসিক সমস্ত বৃত্তি সমভাবে প্রদান করেন নাই। তিনি পুরুষের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ও রমণীদের হৃদয় অর্থাৎ দয়া মায়া

প্রভৃতি বৃত্তিগুলি সমধিক উন্নত করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রী ও পুরুষ একত্র মিলিত না হইলে "একটি সম্পূর্ণ মানুষ" হয় না।

পুরুষ উন্নত ধর্ম্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন, জগতের অতি দুরূহ বিষয়গুলি আয়ত্ত করিবেন এবং সমাজের সর্ব্বপ্রকার কঠোর কার্য্যগুলি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবেন এইজন্যই ভগবান্ পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন ও সংস্থান বিধান বৃত্তিগুলিও অপেক্ষাকৃত উন্নত করিয়াছেন এবং পুরুষ গভীর চিন্তা করিলে যাহাতে পুং জননেন্দ্রিয়ের কোন প্রকার ক্ষয় বা বিকৃতি না হয়, সেজন্য ঐ পুং জননেন্দ্রিয় মস্তিষ্ক হইতে অতি সুদূর স্থানে রক্ষা করিয়াছেন। মাতৃত্ব-বিকাশের বৃত্তিগুলি উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে রমণীগণের পক্ষে পুরুষের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক গভীর চিন্তার প্রয়োজন হয় না। কারণ ঐ গুলি সমস্তই ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক বৃত্তি। একটু সামান্য ঘসিয়া মাজিয়া লইলেই এই বৃত্তিগুলি চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ। কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা রমণীদের মাতৃত্ব-বিকাশের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। রমণীরা পুরুষের ন্যায় কঠোর মানসিক চিন্তা করিলে বা কোনপ্রকারে মানসিক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইলেই তাঁহাদের স্তন্য দুগ্ধ বিষাক্ত বা বিকৃত হইয়া যায় এবং জরায়ুর ক্রিয়া প্রভৃতিও বিকৃত হয়। এ সম্বন্ধে জগতের বহু মনস্বী পণ্ডিত বহু তথ্যই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এই বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

Brain—General Functions. "The cerebral cortex is the seat of the intellectual function, of intelligent sensation, or consciousness of ideation, of volition, and of memory. (See Text Book of Physiology by E A. Schafer L. L. D. F. R. S. Vol. II. Page 697.)

"It has often been supposed that the frontal lobe is the special seat of the intellectual faculties ; chiefly on the ground that this lobe—at least the non-excitable anterior part (pre-frontal) -is much more developed in man than in the lower animals." (See Ditto Page 772)

"For there can be no doubt that the intellectual powers of women are inferior to those of men. (See Dr. Carpenter's Physiology, Page 1043.)

* "In regard to the inferior development of her intellectual power and to the predominence of the instinctive women must be considered as ranking below men. But in the superior purity and elevation of her feelings, she is as highly raised above him." (See Ditto. P. 1044)

"Dr. Burdach considered that men—are distinguished from women by the development of their frontal lobes; Dr. Huschke, came to the conclusion that women is a *homo parietalis*, while man is a *homo frontalis*." (See Man and Woman by H. Ellis Page 114.)

"The thought that we call abstract has its foundation in the organic and emotional character of the individual. Abstract thought in women seems usually, on the whole, to be marked by a certain docility and receptiness.

* * This is allied with woman's Suggestibility, and it seems to have to some extent an organic basis, so that while the culture of the more abstract powers of thought may make it impossible to obey this instinct, there is still a struggle ; or else the more purely rational method is attained—and often distorted in the attaining by the complete suppression of the other elements." (See Ditto P. 210.)

৬। মাতৃরক্ত ও মাতৃদুগ্ধ।

স্ত্রী এবং পুরুষের রক্তের উপাদানের প্রভেদ ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। রক্তের উপাদানের এইরূপ প্রভেদের কারণ কি? একমাত্র মাতৃত্ব-বিকাশের জন্যই ভগবান্ রমণীগণের রক্তের উপাদান ভেদ করিয়াছেন। এই রক্তের ও মাতৃ-দুগ্ধের

পরিবর্ত্তনের কথা আলোচনা করিলে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে হয় এবং ভগবানের চরণে শত সহস্র বার মস্তক অবনত না করিয়া থাকা যায় না। গর্ভস্থ ভ্রূণের দেহ পোষণের জন্য ভগবান্ জননীর রক্তের নানা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে প্রকার রক্ত দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণ অতি উত্তমরূপে পরিপুষ্ট হইতে পারে, ভগবান ঠিক সেইরূপ রক্তই মাতার শরীরে প্রদান করিয়া থাকেন। ভ্রূণের ও শিশুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতার রক্তের ও স্তন্যদুগ্ধে নানা পরিবর্ত্তন (ভ্রূণ ও শিশুর পুষ্টিসাধন জন্য যাহা আবশ্যক) হইয়া থাকে।

৭। শ্রবণশক্তি। Hearing.

পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণের শ্রবণ-শক্তি অপেক্ষাকৃত প্রখর। শিশু একটু ক্রন্দন করিলেই যেন মাতা তাহা শুনিতে পান, এই জন্যই রমণীগণের শ্রবণ শক্তি প্রখর হইয়াছে।

৮। দৃষ্টি শক্তি। Sight.

জননী সন্তানকে সর্ব্বদা চখে চখে যেন রাখিতে পারেন, এই জন্যই রমণী-গণের নিকটদৃষ্টি পুরুষ অপেক্ষা প্রবল।

৯। স্পর্শ শক্তি। Touch.

সন্তান জননীর শরীর স্পর্শ করিবা মাত্রই যেন তিনি জানিতে পারেন, এজন্য এবং আরও নানা কারণে (তাহাও মাতৃত্ব-বিকাশের জন্যই) ভগবান্ রমণী-গণের স্পর্শ শক্তি প্রবল করিয়া দিয়াছেন।

১০। কণ্ঠস্বর। Voice.

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর, ভগবান কোমল করিয়া দিয়াছেন। সন্তানকে পালন করিতে হইলে, স্বরটিও কোমল থাকা একান্ত আবশ্যক। কারণ কর্কশভাষিণী রমণীগণ সুচারুরূপে সন্তান পালন করিতে সমর্থ নহে।

১১। সেবা।

সন্তানের বা রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিবার ক্ষমতা পুরুষ অপেক্ষা রমণী-গণের অত্যন্ত অধিক। ভগবান্ এই বিষয়েও রমণীদিগকে বিশেষ অধিকার বা শক্তি প্রদান করিয়াছেন। পুরুষগণ কিছুকাল সন্তান বা রোগীর সেবা করিলে তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু রমণীগণ দীর্ঘকাল সন্তানের বা রোগীর

সেবা করিলে, অনিদ্রা অনাহার ইত্যাদি কারণ থাকিলেও তাহাদের স্বাস্থ্যের কোন অনিষ্ট হয় না, বরং সুস্থ থাকেন।

Professor Sergi—Points out that men who nurse their relatives rapidly lose flesh and health, while women even mothers, often retain their good health, humour and appetite" (See Sergi "Sensibilita Femmenile." L' Anomalo, Oct. 1891.)

অতএব দেখা যাইতেছে—ভগবান্ রমণীগণের দেহের সমস্ত গঠন—সমস্ত বৃত্তি বা ক্রিয়া—সমস্ত বিধান—এমন কি **রমণীদেহের প্রত্যেক পরমাণুই একমাত্র মাতৃত্ব-বিকাশের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।**

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পণ্ডিতপ্রবর ৺জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ

জগদ্বন্ধু বিক্রমপুরের পণ্ডিতরত্ন। স্বভাব কবি ও ওজস্বী বাগ্মীরূপেও তিনি স্বদেশ এবং বিদেশে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বাসভূমি পুরাপারা গ্রামে। পুরাপারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অত্যন্ত রমণীয় স্থান না হইলেও, ছোট ছোট পুকুর, বাঁশবনের ঝাড়, স্থানে স্থানে প্রাচীন ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ ও ভগ্ন মন্দির, এবং আম্র কানন প্রভৃতি পল্লীর বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্য্যে শোভমান; কিন্তু, সর্ব্বোপরি ইহার প্রধান গৌরব, ইহা বঙ্গদেশের প্রধান পণ্ডিতগণের প্রসবিত্রী। বঙ্গের দ্বিতীয় রঘুনন্দন কালীকান্ত শিরোমণি, বিখ্যাত স্মার্ত্ত দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি এই গ্রামের উর্ব্বর ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া এই গ্রামেরই শ্যামল স্নিগ্ধ বক্ষে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের জন্মলাভে পুরাপারা ধন্য, বিক্রমপুর গৌরবান্বিত। এই সকল স্বনামধন্য পণ্ডিতবৃন্দ, তাঁহাদের অগণ্য শিষ্যবৃন্দ লইয়া যখন আপন আপন চতুষ্পাঠীসমূহে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইতেন তখন যে কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই গ্রামের শিক্ষার সঙ্গে যাঁহাদের ছাত্র জীবনের স্মৃতি বিজড়িত

তাঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণি, পণ্ডিতপ্রবর ত্রিলোচন বিদ্যালঙ্কার, কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম, অভয়াচরণ বিদ্যারত্ন এবং বৈদ্যকুলতিলক মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারিকানাথ সেন, প্রসিদ্ধ কবিরাজ পঞ্চানন রায়, কৈলাসচন্দ্র সেন, হরচরণ কবিরাজ (রাণীস্বর্ণময়ীর কবিরাজ) এবং পণ্ডিত হরসুন্দর তর্করত্ন, জগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম, অদ্বৈতচন্দ্র ও রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি স্বনামপ্রসিদ্ধ পুরুষগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, কাটিহারী এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বহু ছাত্র এই গ্রামখানিকে অধ্যয়নের কলরবে মুখরিত করিতেন। সকলের নাম উল্লেখ করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। জগদ্বন্ধু ১৭৫৮ শকাব্দে ৯ই শ্রাবণ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গৌরীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, সরস্বতী দেবী প্রসন্না হইলেও ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী লক্ষ্মী দেবী তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন নাই। সুতরাং অর্থের অসচ্ছলতায় পুত্র পরিবারাদি লইয়া তাঁহাকে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

গৌরীশঙ্কর ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য অধ্যাপকগণ তাঁহাকে গৌরবজনক "চক্রবর্ত্তী" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের বিখ্যাত বৈয়াকরণ পণ্ডিতগণ যে চক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করিতেন কিঙ্কর চক্রবর্ত্তীর "চক্রবর্ত্তী" উপাধিই তাহার প্রমাণ। কিঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ব্যাকরণ শাস্ত্রে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মুখে এখনও অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

"শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ
লোকনাথঃ স্বয়ং হরি ঃ—
দ্বয়োর্ব্বিবাদয়োর্মধ্যে
কিঙ্করঃ কিং করিষ্যতি ?

এই প্রবচনটী কিঙ্করের স্বমুখোচ্চারিত। ইহা দ্বারাই, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় মিলে। কারণ স্বয়ং শঙ্করতুল্য শঙ্কর, এবং হরির তুল্য লোকনাথ পণ্ডিতদ্বয়ের শাস্ত্রীয় বিবাদেও তিনি মধ্যস্থ বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

যাক, গৌরীশঙ্করকে অধিক দিন আর সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা সহিতে হইল না। জগদ্বন্ধুর বয়স যখন পাঁচ কি ছয় বৎসর মাত্র তখন তিনি স্বকীয় পরিবার পরিজনকে শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া উর্দ্ধতম লোকে প্রস্থান করেন।

গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর পরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী অতি কষ্টে দিনাতিপাত করেন কিন্তু তথাপি পুত্র জগদ্বন্ধুর শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে ভুলিলেন না। গ্রামের বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ২।৩ বৎসর এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া জগদ্বন্ধু, আপন জ্ঞাতি খুল্লতাত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। জগদ্বন্ধুর প্রতিভা, বুদ্ধি ও প্রখর মেধা শক্তির পরিচয় পাইয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও তাঁহাকে যত্নের সহিত বিদ্যাদান করিতে আরম্ভ করেন। এই স্থলে ৪।৫ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া জগদ্বন্ধু কলাপ ব্যাকরণের মূল, টীকা, পঞ্জী কবিরাজ বিলেশ্বর প্রভৃতির কঠিন কঠিন স্থানগুলি, এবং পরিশিষ্টের দুরূহ বিষয়গুলি সবিশেষ আয়ত্ত করিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিচার বিতর্কে জগদ্বন্ধুর প্রথম হইতেই বিশেষ ক্ষমতা দেখা গিয়াছিল, তিনি কোন ছাত্রের সঙ্গেই বিচারে পরাস্ত হইতেন না।

জগদ্বন্ধুর অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অধ্যাপক নন্দকুমার বলিয়াছিলেন "কালে জগদ্বন্ধুই আমাদের বংশের পাণ্ডিত্য গৌবর রক্ষা করিবে।" সুখের বিষয় বৃদ্ধ পণ্ডিতের সেই ভবিষ্যবাণী নিষ্ফল হয় নাই।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপনান্তে, জগদ্বন্ধু পয়সাগাঁর বিখ্যাত বৈয়াকরণকেশরী পিতাম্বর বিদ্যাভূষণের নিকট গমন করেন, সেখানে কাব্য অলঙ্কার ও পদার্থ পড়িয়া অধীত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিদ্যাভূষণের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন কালেই জগদ্বন্ধুর কবিত্ব শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। স্বভাব কবি জগদ্বন্ধু অল্প সময়ের মধ্যে এত দ্রুত সুখশ্রুত ও মধুর কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিলেন, যে তখন হইতেই তাঁহাকে সকলে কবি বলিয়া সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করে। জগদ্বন্ধু বাঙ্গলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই কবিতা রচনা করিতেন। চতুষ্পাঠীর সহাধ্যায়ীরা তাঁহাকে, গ্রামের প্রান্ত ভাগে, কোন বড় দীঘির ধারে লইয়া

গিয়া তাঁহার স্বেচ্ছারচিত কবিতা শ্রবণ করিত। তাঁহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে অনেকেই জগদ্বন্ধুর ভক্ত ছিল, কিন্তু কেহ কেহ, তাঁহার অপরূপ শক্তি দর্শনে মনে মনে ঈর্ষান্বিতও ছিল। জগদ্বন্ধুর কবিতার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা বড়ই প্রীতিপ্রদ, তিনি বহু কবিতায়, ধান্যশীর্ষমণ্ডিত সুন্দর মাঠে তরল সোণার ঢেউ প্রবাহিত করিতেন, শ্যামল বৃক্ষরাজির ছায়াতলে মাতৃস্নেহের তুলনা দিতেন। কুমুদ কহ্লার শোভিত সরোবরে, ভ্রমরকুলের বিবাহ সভা বর্ণনা করিতেন। নদনদীর প্রবাহে প্রেমের গীতি কল্পনা করিতেন। এ ছাড়া, পাহাড় পর্ব্বত, ঝরণা, হাসিখেলা, আনন্দ এবং মানবজাতির মনের বিভিন্ন তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া সংস্কৃত ভাষাতে অতি সুন্দর মালা রচনা করিতেন।

কবিত্ব শক্তি বিকাশের সঙ্গে তাঁহার একটী ভগবদ্দত্ত ক্ষমতারও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল,—এই ক্ষমতা বা গুণ তাঁহার বাগ্মিতা। জগদ্বন্ধু, একদিকে যেমন কবিত্ব শক্তির স্ফূর্ত্তি সাধন করিলেন, অন্যদিকে ধর্ম্ম, কাব্য ও সমাজ সম্বন্ধীয় বক্তৃতার অভ্যাস করিতে লাগিলেন। চতুষ্পাঠীর সহাধ্যায়ীদের মধ্যে তিনি প্রতিপদ ও অষ্টমী প্রভৃতি অনধ্যায় তিথিতে বক্তৃতা করিতেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপনান্তে তিনি তর্কবাগীশ উপাধি গ্রহণ করেন, এবং আপন গ্রামে বৃদ্ধ খুল্লতাত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অন্যূন দুই বৎসর কাল নানা দেশীয় প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্রদিগকে সাহিত্য অলঙ্কার ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে অধ্যাপনা করিয়া, জগদ্বন্ধু একজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হন। এ সময় নানা দিক হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ পত্র আসিতে আরম্ভ হয়। একবার তিনি রঙ্গপুরান্তর্গত কাকিনার এক পণ্ডিত সভায় কবিত্ব ও বাগ্মিতা শক্তির বিশেষ পরিচয় দেওয়ায়, কাকিনাধিপতি শম্ভুরঞ্জন রায় তাঁহাকে রাজপণ্ডিতের পদে বরণ করিবার অভিলাষ করেন। জগদ্বন্ধু এ সম্মানকে তাঁহার প্রতিভা বিকাশের সহায় বিবেচনা করিয়া সে পদ গ্রহণে আনন্দের সহিত স্বীকৃত হন। এই স্থানে উচ্চ বেতনে তিনি অনেক দিন যশের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। রাজা শম্ভুরঞ্জন, রাজা মহিমারঞ্জনের পিতা। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সুকবি জগদ্বন্ধু প্রতিদিন রাজসভায় নানা ছন্দোবন্ধে একশত আটটী করিয়া নূতন কবিতা রচনা করিয়া

রাজাকে শুনাইতেন। এবং সময় সময় রাজার ইচ্ছানুরূপ বিষয় সমূহে উপস্থিত মত কবিতা রচনা করিয়াও রাজাকে শুনাইতে হইত। এইরূপ নিত্য নূতন বিবিধ ছন্দে নানা বিষয়ে শ্লোকাদি রচনা করিয়া কবি জগদ্বন্ধু অতি অল্পকাল মধ্যেই রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, তিনি একজন সভাসদের মধ্যে গণ্য হইলেন। ক্রমে ক্রমে নানা দেশেও তাঁহার কবিত্বের এবং পাণ্ডিত্যের খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়িল।

রাজা শম্ভুরঞ্জনের অনুরোধে তিনি সংস্কৃত শ্লোকাকারে আরব্য ও পারস্য উপন্যাসের অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত এ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া রাজার বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। এই উপন্যাস দ্বয়ের নাম হয় আরব্য ও পারস্য শর্ব্বরী। "বিক্রমভারত" তাঁহার অন্যতম প্রকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বহু নৃপতির ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়া সংস্কৃত ভাষার নানা ছন্দে রচিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি মহাকবি কালিদাসের অমৃতনিস্যন্দিনী কবিতার অনুকরণে লিখিত। রাজাদিগের বিচিত্র বর্ণনায় স্বতঃই রঘুবংশের কথা মনে পড়ে। কাকিনায় অবস্থান কালীন তিনি আর একখানি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম "রঞ্জন-চরিতং মহাকাব্যম্"; এই কাব্যখানিতে কাকিনার রাজবংশের নৃপতিদের বংশগৌরব, চরিত্র, নগর, প্রাসাদ, পথ প্রান্তর, মনোরম ও উজ্জ্বল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কালিদাসের মেঘদূত, রঘু, কুমার, এবং মাঘ ভারবি প্রভৃতির ভাষা, ছন্দ ও ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবি জগদ্বন্ধু বিশেষ যত্ন সহকারে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পণ্ডিত জগদ্বন্ধুর—দুই তিন বৎসর কাকিনায় অবস্থানের পর রাজা শম্ভুরঞ্জন ৺কাশীধামে গমন করেন। কাশী গমনের পূর্ব্বে তিনি তর্কবাগীশ মহাশয়কে তাঁহার গুণের সম্মানার্থ কিছু ব্রহ্মোত্তর ভূমি ও কিছু বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া যান। তর্কবাগীশ মহাশয়, নানা অসুবিধার জন্য ব্রহ্মোত্তর ভূমি গ্রহণ না করিয়া বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণই কিছু বৃদ্ধি করিয়া লন। জগদ্বন্ধুর জীবিত কাল পর্য্যন্ত, এই বৃত্তি তিনি ভোগ করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাঁহার প্রথম পুত্র সুপণ্ডিত ও কবি শ্রীযুক্ত রুহিণীকান্ত বিদ্যা-ভূষণ মহাশয় সেই বৃত্তির কিয়দংশ লাভ করিয়া থাকেন। কাকিনার কার্য্য

হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি পুরাপারা নিজগ্রামে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। এসময় বরিশাল জিলা স্কুলে তিনি প্রধান পণ্ডিতের আসন গ্রহণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া চাকুরী গ্রহণে সম্মত হন নাই। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে নানা দেশীয় ছাত্রগণ আশ্রয় পাইত, তিনি উৎসাহের সহিত সকলকেই বিদ্যাদান করিতেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া বহু স্থানে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গমন করিতে হইত, তিনি বিচার বিতর্কে বহু পণ্ডিতকে সভায় পরাস্ত করিয়া চিরদিন আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অধিকাংশ সভাতেই তিনি সংস্কৃত শ্লোক সমূহ দ্বারা সমাগত পণ্ডিতবর্গ ও সম্ভ্রান্ত ও সজ্জন ব্যক্তিদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিতেন। তিনি মিষ্ট ও প্রিয়ভাষী বলিয়া সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিতেন। তাঁহার সহযোগী পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার লোকরঞ্জনের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্য হইত। নানা সভায় ৩২ ঘর পূরণ, সমস্যা পূরণ এবং হেঁয়ালী কবিতা প্রভৃতির দ্বারা সকলের প্রাণেই তিনি আনন্দ দান করিতেন। তাঁহার প্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অনেক পরিচয় বর্ত্তমান ছিল, তিনি এমন সুরসিক ছিলেন যে তাঁহার আমোদজনক ও রহস্য-পূর্ণ কথায় সভাস্থ লোকের হাসিতে হাসিতে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিত এবং সভাতে এক মহা হৈচৈ পড়িয়া যাইত। একবার পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌমের ছাত্র প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অভয়াচরণ বিদ্যারত্ন মুক্তাগাছা রাজবাড়ীতে জগদ্বন্ধু তর্ক-বাগীশ মহাশয়ের নিকট একটি দুরূহ ফক্কিকা মীমাংসার জন্য উপস্থাপিত করেন। জগদ্বন্ধু এমন এক উত্তর দেন যে অভয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহাতে আর কোন দোষই দিতে পারেন না। অথচ ইহা বলিতেও ছাড়েন না যে সমুচিত উত্তর হয় নাই, ইহাতে তর্কবাগীশ মহাশয় হাত নাড়া চাড়া দিয়া রগড় করিয়া বলেন, "দেখুন বিদ্যারত্ন মহাশয়, আপনি যদি আমার উত্তর গ্রহণ না করেন তবে আপনাকে আমি এই উত্তর গিলাইয়া দিব"। এই উক্তি শুনিয়া রাজা জগৎকিশোর বাবু সহ সভাস্থ লোক একেবারে হাসিতে হাসিতে অস্থির হন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সমস্যার পূরণ করিতেন কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাতেও সমস্যা পূরণে কম কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাই। একবার মুর্শিদা-বাদের বদান্য ও দানশীলা রাণী স্বর্ণময়ীর এক পণ্ডিতসভায় "কাকেতে

ঠোকরাইয়া খাইল দোলমঞ্চের চূড়” এই সমস্যা পূরণ করিতে বলায় প্রত্যুৎপন্নমতি জগদ্বন্ধু সে সভাতে বসিয়া

"লেখ্য পদ্মে পদ্ম ভ্রমে পড়ে যথা অলি
আবিরেতে রক্তভ্রম করে কাকাবলী
আর্দ্রভূমে লগ্ন হেরে আবিরের গুড়
কাকেতে ঠোকরাইয়া খাইল দোলমঞ্চের চূড়"

এইরূপ কবিতা লিখিয়া সমস্যা পূরণ করেন।

আর একবার সিরাজগঞ্জ হীরালাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায়, চামিচা দ্বারা পান করিতে দেখিয়া চামিচার নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা করেন।

"স্বচ্ছিলা রৌপ্যজা রম্যা রমণী রসনোপমা
রসনায়া রসাস্বাদে চামিচা সুখদায়িনী"

তিনি সঙ্গীত রচনায়ও নিপুণ ছিলেন, তাঁহার সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় রচিত সঙ্গীত ভগবানের উদ্দেশ্যে গীত। তাঁহার রচিত কৃষ্ণলীলা অতি উত্তম সঙ্গীত গ্রন্থ। তিনি কাব্য-চন্দ্রিকা ও সাহিত্য-দর্পণের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, অমরার্থ-চন্দ্রিকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত টীকার বিশদ ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। উপাসনা উল্লাসিনী নামক একখানা গ্রন্থ লিখিয়া তিনি সেরপুরের জমিদার হরকিশোর লস্কর চৌধুরীকে দান করেন। এই গ্রন্থখানি উপাসনার বহুল তথ্যে পরিপূর্ণ। অম্বষ্ঠ বৈদ্যজাতির উপনয়ন গ্রহণ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিয়া তিনি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দেশ বিদেশের বহু সভার জন্য বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলগুলি যত্নপুর্ব্বক নিজের কাছে রাখেন নাই। তিনি সাহিত্য-সেবায় সততই আনন্দলাভ করিতেন। বহু সাহিত্য-সেবীর সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। সাহিত্যসম্রাট্ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মান্যবর শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র রায় প্রমুখ কৃতী ও সজ্জনদিগের সহিত তাঁহার অপরিমেয় বন্ধুত্ব ছিল, জগদ্বন্ধু তাঁহাদের সকলের নিকট হইতেই বিশেষ সমাদর লাভ করিতেন। ঢাকা আসিলে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়—অথবা মহামহোপাধ্যায় প্রসন্ন পণ্ডিত মহাশয়ের পার্শ্বে নানাবিধ আলাপ আলোচনায় সময় কর্ত্তন করিতে প্রীতিলাভ করিতেন। ঢাকা সারস্বত সমাজের উন্নতি ও পরিচালন কল্পেও পণ্ডিত

জগদ্বন্ধুর কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই। অন্যতম সম্পাদক এবং সহকারী সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি উক্ত সভার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাওয়ালরাজের মন্ত্রিত্বের আসনে যখন উপবিষ্ট ছিলেন তখন সেখানে তিনি একটী সাহিত্য-সমালোচনী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। দরিদ্র গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থসমূহ প্রচার ও মুদ্রণের ব্যয়াদি ঐ সময় এই সভা হইতে অনেক সময় প্রদত্ত হইত। জগদ্বন্ধুর কাব্য-চন্দ্রিকা টীকা সহিত এই সভার অধীনে মুদ্রিত হয়। জগদ্বন্ধু, গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, 'বিদ্যাসাগর কালীপ্রসন্নের অনুরোধে সরল সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রন্থের সুখবোধ্য টীকা প্রণয়নে আমি উদ্যোগী হইয়াছি, এবং তাহারই ইচ্ছায় তাহার উপরেই মুদ্রণের ভার অর্পণ করিতেছি।' কালীপ্রসন্ন সাহিত্যের উন্নতি বিধানার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন এবং অনেককেই তিনি সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করিতেন।

পণ্ডিতা রমাবাই যখন এদেশে আগমন করিয়াছিলেন তখন জগদ্বন্ধু রমাবাইর সহিত সংস্কৃত শাস্ত্রে বহুবিধ আলাপ করিতেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সমস্যা পূরণ করিতেন। রমাবাই জগদ্বন্ধুর অদ্ভুত কবিত্ব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

জগদ্বন্ধু প্রায় ৭২।৭৩ বৎসর বয়সে জীবনলীলা শেষ করেন। জীবনের শেষভাগে তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখিতে বেশ বলিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু বড় কালো ছিলেন। তাঁহার দুই হাতেরই তিনটী অঙ্গুলী জোড়া ছিল। তাঁহার পুত্র কন্যাগণের মধ্যেও অনেকেরই ঐরূপ অঙ্গুলী জোড়া হইয়াছিল। জগদ্বন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র হেরম্বনাথ, বিলাত গমন করিয়াছিলেন; বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এখন তিনি ঢাকাতে ডাক্তারী ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছেন। জগদ্বন্ধুর অমায়িক প্রকৃতি দ্বারা তাঁহার শিষ্যবর্গও সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু একদিকে যেমন তাঁহাকে ভক্তি করিত, অপর দিকে তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। কারণ অন্যায়ের প্রতি তিনি যম-দণ্ড স্বরূপ ছিলেন। আমরা তাঁহার জীবনের শেষ বয়সে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার বহুবিধ গুণাবলী দর্শন করিয়াছি ও ভক্তিতে আপ্লুত হইয়াছি। জগদ্বন্ধুর অনেকগুলি স্বরচিত গ্রন্থ

অপ্রকাশিত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত রুহিণীকান্ত বিদ্যাভূষণ সেই গ্রন্থগুলি মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ্যে প্রচারের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের সহায় হইবেন। জগদ্বন্ধুর গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া আজ আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

পল্লীকথা (২)

জল

স্ত্রীলোকেরাই যে কেবল পুষ্করিণীর জল দূষিত করেন তাহাই নহে, পল্লীর পুরুষগণও নানারূপে দীঘি পুষ্করিণীর জল দূষিত করিয়া থাকেন। যেমন পুকুরের জলে নৌকা ডুবান, বাঁশ ভিজান, মাছধরা, মুখধোয়া, আবর্জ্জনা নিক্ষেপ ইত্যাদি। নির্ম্মল জল টলমল করিতেছে, তীরে নানা জাতীয় বৃক্ষশ্রেণী অন্ধকার করিয়া নাই এরূপ দীঘি পুষ্করিণী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। জলের অপর নাম জীবন, জীবন প্রকৃতই জীবন। জল ব্যতীত মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে না। পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রত্যেকের পক্ষেই জলের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। আমাদের দেহে জলের ভাগই বেশী। এক জন মানুষের দৈহিক ওজন যদি একমণ পঁয়ত্রিশ সের হয়, তবে তাহার শরীরের জলীয় অংশের ওজনই প্রায় একমণ ষোলসের হইবে।

জলের কথা।

আমাদের ভুক্ত দ্রব্যাদি সর্ব্বাগ্রে পাকস্থলীতে নীত হয়, সেখান হইতে কতক অংশ শোণিত গঠনে সহায়তা করে, বক্রী অংশ সমূহ মল ও মূত্রের আকারে দেহ হইতে নির্গত হয়। আমরা যে জল পান করি তাহা দেহের প্রতি শিরায় উপশিরায় ধাবিত হইয়া শোণিত পরিচালনে সহায়তা করে, ঐ সকল শিরাসমূহের মধ্যে অনেকগুলি কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম। কাজেই শরীরকে নীরোগ করিতে হইলে জলের বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। জল দূষিত হইলে স্বাস্থ্যের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আমরা নদী কিম্বা পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া স্নান করিলে অত্যন্ত আরাম অনুভব করিয়া থাকি, উহার মূল কারণ

পরিষ্কৃত জলে স্নান করিলে শরীরের ময়লা ইত্যাদি ধৌত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ সুপরিষ্কৃত হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে পানীয় এবং অন্যান্য ব্যবহার্য্য জল ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে পারি (১) বৃষ্টির জল, (২) নদ, নদী, হ্রদ, বিল ইত্যাদি, (৩) দীঘী পুষ্করিণী, (৪) কূপ ও ইন্দারা। বৃষ্টির জলই সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ জল। যখন বৃষ্টিধারা পতিত হয় তখন উহা অত্যন্ত পরিষ্কার থাকে। ঐরূপ জল গৃহের ছাদের উপর পাত্রাদি রক্ষা করিয়া যত্নে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ঐরূপ ভাবে উহা সংগৃহীত না হইলে পরিশুদ্ধ থাকে না, কারণ মৃত্তিকাতে পতিত হইলে নানারূপ দূষিত পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া বৃষ্টিজলের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হইয়া যায়।

২। আমরা সাধারণতঃ নদ নদী এবং দীঘি পুষ্করিণী ও বিল খাল ইত্যাদি হইতে জল সংগ্রহ করিয়া থাকি। নদীর জল স্রোতজল বলিয়া উহা শীতল এবং পানের পক্ষে সবিশেষ উপযুক্ত। বর্ষার সময়ে কিংবা অত্যধিক বারি-পাতে নদীর জল কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়ে। বস্ত্রাদি প্রক্ষালন, গরু ইত্যাদির স্নান, এবং তীরে মলমূত্র ত্যাগের দরুণ নদীর জল দূষিত হয়। তারপর যখন ওলাউঠা বসন্ত ইত্যাদি রোগের অত্যধিক প্রাদুর্ভাব হয় তখন ঐ সকল রোগে মৃত ব্যক্তি-গণের দেহ স্থানে স্থানে নদীর জলে ফেলিয়া দেওয়ায় ও শবদেহ তীরে দগ্ধ করিয়া শবের বস্ত্রাদি জলে নিক্ষেপ করায় নদীর জল বিশেষরূপে দূষিত হইয়া পড়ে।

নদ, নদী, দীঘি পুষ্করিণীর জলও পানীয় রূপে ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রয়োজন। আমরা ফিট্‌কিরি, নির্ম্মলি ইত্যাদির দ্বারা সাধারণতঃ জল পরিষ্কার করিয়া থাকি। জল গরম করিয়া ফুটাইয়া লওয়াই জলের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উপায়। ফিলটার প্রস্তুত করাও কঠিন নহে। জলের বিশুদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে অনায়াসেই ওলাউঠা, বসন্ত, রক্তামাশয় প্রভৃতি কতকগুলি দুরারোগ্য রোগের হস্ত হইতে অতি সহজে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।

পল্লীগ্রামের দীঘি পুষ্করিণী গুলির শোচনীয় অবস্থা অবর্ণনীয়। কোনটির সারা দেহ পানায় ঢাকা, কোনটিতে 'ভিট' বাসা করিয়াছে, আর চারি পারে বেতের ঝোঁপ, বাঁশগাছ, হিজল গাছ, আমগাছের শাখা প্রশাখা দৃঢ়রূপে অন্ধকারের সৃজন করিয়াছে। গৃহ লক্ষ্মীগণ ঘাট পাতিয়া চারিখানা বংশদণ্ডের

দ্বারায় একটু স্থানের চারিদিকের পানা সরাইয়া ('তাওয়া' করিয়া) সেই জলের দ্বারাই আবশ্যকীয় কর্য্যাদি নিস্পন্ন করেন। আবার এরূপও দেখা যায় প্রসিদ্ধ গ্রাম, বৃহৎ দীর্ঘিকা, চারি পারে সঙ্গতিশালী ভদ্রমহোদয়গণের বাস, তথাপি সে সরোবরের জল ভাঙ্গপড়া, পানায় ভরা। ম্যালেরিয়া ওলাউঠার বীজ উহা হইতে স্বতঃই উত্থিত হইতেছে। তথাপি ঐ পুষ্করিণীর সংস্কার হইতেছে না! কেন হইতেছে না? তাহার মূল ইতিহাস দলাদলি, সরিকি কলহ। সরিকি কলহ ও দলাদলির গোলযোগে আমাদের দেশের বহু সৎকার্য্য মুকুলেই ঝরিয়া যায়। নিজ জীবন অপেক্ষা সংসারে প্রিয়তম কিছুই নাই। ধন বল, মান বল, যশ বল, সমুদয়ই পৃথিবীতে নিরাপদে দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় করিতে পারিলে তবে সম্পন্ন হইতে পারে নচেৎ নহে। একথা যে দেশের বা পল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ না বোঝেন তাহা নহে, তবে স্বার্থের আকর্ষণে সকলেই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া প্রকৃত কর্ম্ম পথ হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়েন।

পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ এ কয় মাসে ওলাউঠা এবং রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। সে সময়ে বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জল শুকাইতে থাকায় পল্লীর আবর্জ্জনা সমূহ খাল বিল ইত্যাদির দ্বারা নির্গত হইতে থাকে, জলের দুর্গন্ধে এবং উহার বিশ্রী রঙ্গে প্রাণ তিষ্ঠান দায় হয়। আর ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখ মাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময় সূর্য্যের প্রখর কিরণ পাতে যখন চারিদিকের পুষ্করিণী ও দীঘী ইত্যাদির জল শুকাইতে থাকে তখন পল্লীবাসিগণের যে ভয়ানক অবস্থা হয় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। ওলাউঠা রোগের উৎপত্তির হেতু কি? তাহা অদ্যাপিও প্রহেলিকাবৎ, কিন্তু বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করিলে যে উহার হস্ত হইতে কতকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়, যে সকল সহরে জলের কল আছে, সে সকল স্থানে যে পূর্ব্বাপেক্ষা কলেরার প্রকোপ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতেই উহা বুঝিতে পারা যায়। ওলাউঠার সময় নিম্নলিখিত রূপ উপায় অবলম্বন করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

১। নির্ম্মল জলের ব্যবস্থা।

২। জল ও দুগ্ধ উষ্ণ করিয়া পান করা।

৩। বিশুদ্ধ আহার সামগ্রী।

৪। অল্পাহার।

৫। মল মূত্রাদি পরিষ্কারের ব্যবস্থা।

৬। পরিষ্কার বস্ত্র।

৭। কাঁচা ফল, বা যে কোন অর্দ্ধপক্ক বা অর্দ্ধদগ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ না করা।

৮। সৎচিন্তা দ্বারা মন প্রফুল্ল করা।

৯। কলেরা রোগীকে পৃথক্ করিয়া রাখা।

১০। রোগীর সংস্রবে আসিলে বস্ত্রাদি বিশুদ্ধ করা।

১১। মক্ষিকা যাহাতে খাদ্যে উপবিষ্ট জীবাণু দ্বারা উহাকে দূষিত না করে তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া।

১২। গৃহের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান পরিষ্কার রাখা ও গন্ধকাদি জ্বালাইয়া বায়ুর নির্ম্মলতা রক্ষা করা।

১৩। কলেরা রোগীর মল যেখানে সেখানে নিক্ষেপ না করিয়া উহাকে অগ্নি দ্বারা ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতে পারিলে সংক্রামতা অনায়াসে নিবারণ করা যায়।

কলেরার সময়ে নিয়মিত ভাবে জল ফুটাইয়া উহা ছাঁকিয়া লইয়া কিছু নির্ম্মলি অথবা ফট্‌কিরি দিয়া ব্যবহার করা উচিত। জলের সাহায্যে অনেক সময়ে কলেরা সংক্রামক ভাবে দেখা দিয়া থাকে। যাঁহাদিগের ফিল্টারের বন্দোবস্ত নাই, তাঁহারা এই উপায়ে জল বিশুদ্ধ করিয়া লইবেন। লেবুর রসও সর্ব্ব প্রকার রোগের বীজাণু ধ্বংস করে। জলে কিছু লেবুর রস নিক্ষেপ করিলে উহাতে সকল প্রকার জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই সকল বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলে কলেরার আক্রমণ হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।*

ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের সময় যাঁহারা পল্লী গ্রামে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন গ্রামে কি দারুণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। সে সময়ে প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে করুণ ক্রন্দন, নারীকুলের হাহাকার ধ্বনি, দ্বিপ্রহর রজনীর স্তব্ধ গভীরতার মাঝ খানে হরিবোল হরিবোল রবে প্রাণ শিহরিয়া উঠে!

---

* সঞ্জীবনী

শিক্ষা এবং সহযোগিতার অভাবই এইরূপ দুরবস্থার কারণ। কোনও জাতির জন্মগত কুসংস্কার সহজে দূর হইতে চাহে না। একথাটা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। একবার লেখকের বাস পল্লীতে কলেরা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, প্রত্যহই দু'চার জন করিয়া লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। আতঙ্কে গ্রামবাসী অস্থির। গ্রাম্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবু গ্রামবাসী সকলকেই খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে সতর্ক হইতে বলিলেন, এবং প্রত্যেককেই জল খুব ভাল করিয়া গরম করিয়া ফুটাইয়া পরে পান করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। অনেকে অন্ততঃ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ তাঁহার কথা শুনিল, কেহবা বিদ্রূপ করিল। দু'একজন প্রাচীন ব্যক্তি বলিলেন জল গরম করিয়া পান করিলেই যদি মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যাইত তাহা হইলে আর ভয় ছিল কি ? ওসব বাজে কথা ! এরূপ কুসংস্কার পল্লীবাসী পুরুষ ও রমণীর শতকরা নিরানব্বই জনের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় !

আমাদের বিবেচনায় কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিগুলি পল্লীগ্রামে বিস্তার লাভের সময় উহার প্রতিষেধ ক্ষেত্রে শুধু গ্রাম্য হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের উপদেশ দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে, উপদেশানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইল কি না তৎপ্রতি মনোযোগী হওয়াও তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

শিক্ষার অভাবই রোগ-বিস্তারের কারণ।

শিক্ষিত যাঁহারা, তাঁহারা শিক্ষার প্রভাবেই হউক কিংবা পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়াই হউক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মোটামুটি নিয়মগুলি পালন করিয়া থাকেন এবং নিজ নিজ পরিবার পরিজন মধ্যেও প্রচলনের জন্য চেষ্টিত থাকেন কিন্তু দেশের নিম্ন ও অশিক্ষিত শ্রেণীর লোকগণের শিক্ষা ও সদুপদেশ দেওয়ার প্রতি কে লক্ষ্য রাখেন ? অশিক্ষিত জনসাধারণও যাহাতে স্বাস্থ্য বিষয়ের মেটামুটি নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে শিখিতে পারে তজ্জন্য আমাদের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ বিবিধ সংক্রামক ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা নাই, উহাতে মৃত্যু আমাদের অনিবার্য্য।

আমাদের মনে হয় কোনও গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে কলেরা প্রভৃতি দেখা দিলে তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসিগণ যদি পূর্ব্ব হইতেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন তাহা হইলে বিপদের হস্ত হইতে কতকটা রক্ষা পাওয়া যায়। ঐ সময়ে গ্রাম্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, আমরা আশা করি জীবন

রক্ষার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই সামান্য আয়াসসাধ্য কার্য্য টুকু করিতে অগ্রসর হইবেন।

(ক) গ্রামের ছোট বড় সকলে মিলিত হইয়া একটী সভা আহ্বান করিবেন।

(খ) সভায় সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক উপায়গুলি প্রতিপালনের জন্য কি নিম্ন শ্রেণী কি ভদ্র শ্রেণী প্রত্যেক শ্রেণীর লোককে উপদেশ দিবেন।

(গ) ঐরূপ আদেশ বা উপদেশ যে গ্রামবাসী অবহেলা করিবে তাহার প্রতি সামাজিক দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিবেন।

(ঘ) গ্রাম্য মাতব্বরগণ প্রতিদিন অবসর মত গ্রাম পর্য্যটন করিয়া গ্রাম্য অবস্থা পরিদর্শন ও উপদিষ্ট কার্য্যাদির পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

আমাদের উপনিষদকার বলিয়াছেন :—

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান নিবোধত,' একথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। আমাদের স্বাস্থ্য-সুখ আমরা নিজে রক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ না হইলে, সচেষ্ট না হইলে আর কে হইবে? সেদিন একখানা ইংরেজী কাগজে পড়িয়া ছিলাম "Today man is learning how to protect himself against microbes, a day will come when in Berlin,London and in Paris to which we may surely add Calcutta, a man will not die of diphtheria, of typhoid fever, of scarlet fever, of cholera or tuberculosis, any more than he does in these cities to-day from venon of snakes or the teeth of wolves?" কি সাহসের বাণী! আর আমরা কেমন করিয়া আত্ম-রক্ষা করিতে হয় সে কথা পরিবার পরিজন ও পল্লীবাসীকে শিখাইব না, শুধু নিয়তি, শুধু অদৃষ্টের দোহাই দিয়াই মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইব। তাহা কেন হইবে? প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি যদি নিজ নিজ পরিবার মধ্যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের স্থূলতত্ত্বগুলি কার্য্যতঃ নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুফল লাভ করা যায়। কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তাহা নিষ্পন্ন হয় না। ইহাই দুঃখের কথা।

(ক্রমশঃ)

যাচ্ঞা

বিধি জিজ্ঞাসিল নরে, "কি প্রার্থনা তব ?"
"দুঃখ হ'তে দেহ মুক্তি !" "তথাস্তু" কহিয়া
বিধাতা চলিল সঙ্গে দুঃখেরে লইয়া,
সাথে তার গেল সুখ বিশ্বের বৈভব।
চীৎকারিয়া কহে নর, "সুখ যাও কোথা
বিধাতা তোমায় দান দেছেন আমারে,"
"পুষ্প রূপে ফুটি আমি দুঃখতরু পরে,
সুখ কহে তারে ছাড়ি মোরে চাও বৃথা !"

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

বিক্রমপুর সম্মিলনী

১৩২০

প্রথম অধিবেশন

২৩শে ফাল্গুন, শনিবার।

কলিকাতাস্থ বিক্রমপুরবাসী কতিপয় ভদ্রলোক গত ফেব্রুয়ারি মাসে ১২ নং কলেজস্কোয়ার ষ্টুডেন্টস্ হল গৃহে সমবেত হইয়া বিক্রমপুর সম্মিলনীকে পুনরুজ্জীবিত করা উচিত কিনা এবং তাহা করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করেন। স্থির হয় যে এই উদ্দেশ্যে আগামী ৭ই মার্চ্চ ১৯১৪ অর্থাৎ ২৩শে ফাল্গুন ১৩২০, কলিকাতাস্থ বিক্রমপুরবাসী

ও বিক্রমপুরের হিতাকাঙ্ক্ষীগণের এক সাধারণ সভা আহুত হওয়া উচিত। তদনুসারে শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ নাগ ও শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণ এক পত্র দ্বারা ঐ তারিখে এক সভা আহ্বান করেন। সংবাদপত্রে ও হ্যাণ্ডবিল দ্বারা ঐ সংবাদ প্রচারিত হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় পূর্ব্বোক্ত গৃহে ঐ সভার অধিবেশন হয়। সভায় বিক্রমপুরবাসী সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ গণ্যমান্য ভদ্রলোক এবং বহুসংখ্যক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। সভায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও রায় জ্ঞানকী নাথ রায় বাহাদুরের সমর্থন মতে এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন এবং সভার কার্য্যের সহিত তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং বলেন যে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মাতৃভূমি বিক্রমপুরের হিতসাধনার্থ তিনি কার্য্যতঃ ও পরামর্শ দ্বারা যথাশক্তি যত্ন করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি বিক্রমপুরবাসী ব্যক্তিমাত্রকেই এই সভার উদ্দেশ্য সাধন জন্য নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যত্ন করিতে ঐকান্তিক অনুরোধ করেন, তৎপর নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি পর্য্যায়ক্রমে আলোচিত হইয়া সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব—

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনার্থ বিক্রমপুরের অধিবাসী এবং হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-গণ দ্বারা "বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা" পুনঃ স্থাপিত হউক।

উদ্দেশ্য যথা—

(১) গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান।

(ক) উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা।

(খ) জল নিকাশের ব্যবস্থা

(গ) গ্রামে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা

(২) রাস্তা ঘাট খাল ইত্যাদির উন্নতি বিধান।

(৩) শিক্ষা—

(ক) অন্তঃপুর মহিলাদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত

(খ) বালিকাদিগের শিক্ষা বিধান

(গ) নিম্ন শিক্ষার বিস্তার

(৪) শিল্প ও ব্যবসায়ের বিস্তার ও উন্নতি সাধনে বিক্রমপুরবাসীদিগকে প্রণোদিত করা।

(৫) বিক্রমপুরবাসীদিগের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধন এবং তাহাদিগের সাধারণ হিতকল্পে যে সকল কার্য্য আবশ্যক এবং সুসাধ্য বিবেচিত হয়, তৎসমুদয় সম্পাদনে চেষ্টা করা। কিন্তু ধর্ম্ম ও রাজনীতিসম্বন্ধে কোন আলোচনা হইতে পারিবেনা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ নাগ বি এ

সমর্থক— „ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ

দ্বিতীয় প্রস্তাব—

উপরিলিখিত উদ্দেশ্য সাধন করিতে সভা যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন, এবং প্রয়োজনানুসারে গভর্মেণ্ট ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও লোকালবোর্ড ও অন্যান্য রাজ-কর্ম্মচারীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

প্রস্তাবক—ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কৃতান্তকুমার বসু এম এ বি এল

তৃতীয় প্রস্তাব—

এই সভা সহরে মহকুমায় এবং গ্রামে শাখা সভা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন এম এ বি এল

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু

„ অবনীকান্ত সেন

চতুর্থ প্রস্তাব—

শ্রীযুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহোদয় বিক্রমপুর সম্মিলনীর সভাপতি মনোনীত হউন্।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস বার-এট্‌ল

সমর্থক— পরেশনাথ সেন বি এ

পঞ্চম প্রস্তাব—

(ক) নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এই সভার প্রতিনিধি সভাপতি পদে মনোনীত হউন্।

ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু
রায় বাহাদুর জানকীনাথ রায়
ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্রলাল রায়
শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত

(খ) শ্রীযুক্ত বাবু মুরলীধর রায় মহাশয় এই সভার কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনীত হউন্।

(গ) শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন মহাশয় আপাততঃ এই সভার সম্পাদক পদে মনোনীত হউন্।

প্রস্তাবক— শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন এম এ
সমর্থক— শ্রীযুক্ত করুণাকুমার সেন

ষষ্ঠ প্রস্তাব— (প্রস্তাবক সভাপতি ১।)

এই সভার নিয়মাবলী গঠন জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণ দ্বারা একটী কমিটি গঠিত হউক। আগামী সাধারণ সভার অধিবেশনের দিনে এই কমিটি খসরা নিয়মাবলী উক্ত সভায় উপস্থিত করিবেন।

(১) সভাপতি
(২) শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস বারএট্‌ল
(৩) ,, রজতনাথ রায়
(৪) ,, সত্যানন্দ বসু এম এ বি এল
(৫) ,, হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বি এল
(৬) ,, বিমলানন্দ নাগ বি এ
(৭) সঃ সম্পাদক

সপ্তম প্রস্তাব—

আগামী ২১ মার্চ্চ ৫ ঘটিকার সময় ১।২ নং কলেজস্কোয়ার ষ্টুডেন্ট্‌স্ হলে বিক্রমপুর সম্মিলনীর দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন হইবেক।

প্রস্তাবক—সভাপতি।—

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত মহাশয় অসুস্থতাবশতঃ সভায় উপস্থিত থাকিতে না পারায় আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া সভার কার্য্যের সহিত সহানুভূতি জানাইয়া যে একখানা পত্র পাঠাইয়াছিলেন অতঃপর সভাপতি মহাশয় সেই পত্রের বিষয় উল্লেখ করিলেন।

অষ্টম প্রস্তাব—

এই সভার সভাপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায়

অনুমোদক ,, বিমলানন্দ নাগ বি এ

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে সভা ভঙ্গ হইল।

সংস্কৃত শাস্ত্রে বাঙ্গালী (৩)

ভবদেব ভট্ট ও বাচস্পতি মিশ্র

১। খৃঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভবদেব ভট্ট ও বাচস্পতি মিশ্র জীবিত ছিলেন এবং ইহাঁরা উভয়ে বিক্রম-পুরে মহারাজাধিরাজ হরি বর্ম্মার সভা অলঙ্কার করিয়াছিলেন। ভবদেব ভট্টের প্রণীত ও সংগৃহীত "ভবদেব" নামক পদ্ধতি গ্রন্থ বাঙ্গলার সাম-বেদী ব্রাহ্মণের ঘরে ঘরে এখনও অধীত ও পঠিত হইতেছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের সমস্ত সামবেদী ব্রাহ্মণের ক্রিয়া কলাপ "ভবদেব" অনুসারে নিষ্পন্ন হইয়া

থাকে। বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণ মণ্ডলী "ভবদেব" সহিত সুপরিচিত, অন্ততঃ পৌরহিত্য ব্যবসায়ী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের ঘরে ভবদেবের রচিত "ভবদেব" নামক পদ্ধতি গ্রন্থ নাই এমন ব্রাহ্মণ অতি বিরল। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র কেবল বঙ্গদেশে যে সু-পরিচিত এমন নহে; কি ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশ, কি জার্ম্মণী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য সুসভ্য দেশ যেখানে হিন্দু দর্শন পঠিত ও আলোচিত হয় সে স্থানেই বাচস্পতি মিশ্র সুপরিচিত ও সম্মানিত। উভয়েই দীর্ঘায়ু শত বর্ষ জীবিত ছিলেন। উভয়েই রাজমন্ত্রী এবং বঙ্গ-সভাসদ ছিলেন। ভবদেব ভট্ট রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলের তিলক। বাচস্পতি মিশ্র বৈদিক-কুল সম্ভূত ছিলেন।

মহারাজ আদিশূরের আনীত পঞ্চ গোত্রিয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে বেদগর্ভ অন্যতম। ইনি সায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। বেদগর্ভের সন্তানদিগের মধ্যে বশিষ্ঠ "সিদ্ধল" গ্রাম-বাসী ছিলেন। এই বশিষ্ঠের বংশে "ভবদেব ভট্ট" জন্মগ্রহণ করেন। ভবদেব ভট্ট নিজ গ্রন্থে নিজের কোন বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন নাই। তৎপ্রণীত "ভবদেব" গ্রন্থে তিনি যে উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি গৃহ্য সূত্রাদির ব্যাখ্যা করিয়া বৈদিক নিয়মানুযায়ী ক্রিয়া কলাপের পদ্ধতি লিখিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। যিনি রণক্ষেত্রে বীরশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম-জ্ঞানে পরমজ্ঞানী, মন্ত্রী-সভায় সচিব-শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিত-সভায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য তিনি কেন নিজ হস্তে হিন্দুর বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের গ্রন্থ লিখিতে এত যত্নবান হইলেন এই কথার বিচার করিতে যাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আদিশূরনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান সন্ততিগণ ৭।৮ পুরুষ মধ্যেই বৈদিকক্রিয়া কলাপে কতক পরিমাণে আস্থাহীন হইয়া আসিতেছিলেন বলিয়াই ভবদেবের ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তি আবার বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ঐ রূপ পদ্ধতি গ্রন্থ লিখিয়া থাকিবেন।

ভবদেব ও বাচস্পতি মিশ্র পরস্পর মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। আজীবন এই অকৃত্রিম বন্ধুতায় কোনরূপ কালিমা স্পর্শ করে নাই। ভবদেব হইতে বাচস্পতি মিশ্র অনেক বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন, তথাপি এই দুইটী প্রতিভার পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি পরস্পর পরস্পরকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ওড়িষ্যার বিন্দু-সরোবরের তীরে সুপ্রসিদ্ধ অনন্ত বাসুদেবের মন্দির অবস্থিত আছে। ঐ অনন্ত বাসুদেব বিগ্রহের ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ভবদেব ভট্ট কর্ত্তৃক হইয়াছিল। উক্ত

মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বাচস্পতি মিশ্র যে "ভবদেব ভট্ট কুল প্রশস্তি" রচনা করেন ঐ কুল প্রশস্তিতে ভবদেব ভট্টের সংক্ষেপ জীবনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত কুল প্রশস্তি অবলম্বনে অতি সংক্ষেপে ভবদেব ভট্টের জীবনী লিখিত হইল। ভবদেব ভট্টের বা বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থ সমূহের আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব বলিয়া আমরা তদ্দিগের প্রণীত কোন গ্রন্থের আলোচনা করিলাম না। *

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বেদগর্ভের বশিষ্ট নামক সন্তান স্বীয় বাসস্থান জন্য সিদ্ধল গ্রাম উৎসর্গ প্রাপ্ত হন। এই সিদ্ধল গ্রাম রাঢ় দেশে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের মতে এই গ্রাম হুগ্‌লী জিলার অন্তর্গত বর্ত্তমান সিদ্ধলা গ্রামে। কথিত বশিষ্টের বংশে ভবদেবের জন্ম হয়। ভবদেবের পিতার নাম গোবর্দ্ধন, মাতার নাম সংযতা। সংযতা বন্দ্যঘটীয় বংশীয়া কন্যা। দেখা যায় যে রাঢ়ীয় কুলীন শ্রোত্রিয়ের বিভাগ তখনও হয় নাই। তখন সকলেই কুলীন ছিলেন। অন্যথা সিদ্ধল বংশীয় শ্রোত্রিয়গণের সহিত বন্দ্যঘটীয় বংশের কুলীন কন্যার বিবাহ অসম্ভব হয়। সুতরাং বল্লালসেনের কৌলীন্য প্রথা সৃষ্টির পূর্ব্বে ভবদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ভবদেবের পিতা পণ্ডিত, ধীর, বাগ্মী ও পরম তত্ত্বানুসন্ধায়ী ছিলেন। ভবদেবের পিতামহের নাম আদিদেব, তৎপিতা বুধ এবং তৎপিতা অত্যঙ্গ। ভবদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মহাদেব এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম অট্টহাস। ভবদেব গৌরাধিপ হরিবর্ম্মার নিকট হইতে "শ্রীহস্তিনী" নামক গ্রাম প্রাপ্ত হন। তথায়ই তিনি ও তাঁহার পরবর্ত্তীগণ বাস করিয়াছিলেন। সিদ্ধলগ্রামে তাঁহার জ্ঞাতিগণ বাস করিতেন। তিনি সিদ্ধল গ্রাম ছাড়িয়া নিজ ব্রহ্মোত্তর হস্তিনী গ্রামে বসতি করেন কিন্তু কর্ম্ম স্থান বিক্রম পুরেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। একদিন বিক্রমপুরে বসিয়া ভবদেব ভট্ট, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি মন্ত্রিগণ সমস্ত গৌড়রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

ভবদেব ভট্ট হরিবর্ম্মদেব ও তৎপুত্রের রাজত্ব সময়ে মন্ত্রী ছিলেন। ভবদেব অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং বৈভবান্বিত অর্থশালী মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি তন্ত্র, সিদ্ধান্ত, গণিত প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। ইনি

* ঐ কুল প্রশস্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য।

নূতন হোরা শাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার করেন। স্মৃতি শাস্ত্রের প্রবন্ধ লিখিয়া স্মার্ত্ত-ক্রিয়া সমূহের সুবিধা করিয়া দেন। "দত্তক তিলক" নামে ভবদেব ভট্টের রচিত একখানা স্মৃতিগ্রন্থ আছে। ভবদেব কুমারিল ভট্ট কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত মীমাংসা দর্শন অবলম্বনে মীমাংসা দর্শন সম্বন্ধে নিবন্ধ রচনা করেন। সমস্ত সাম বেদ, ইনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অস্ত্রবিদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যায় ভবদেব বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার অন্য নাম বা উপাধি "বালবলভীভুজঙ্গ"। ইনি রাঢ়দেশে জলশূন্য পথিপার্শ্বে, সীমান্ত স্থানে, গ্রামের উপকণ্ঠে নিজ ব্যয়ে অনেক জলাশয় প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি দেবালয় স্থাপন এবং দেবালয়ের স্থাপত্য কার্য্যের উন্নতি ও শোভার জন্য বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ফল ও পুষ্পোদ্যান প্রতিষ্ঠায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া তিনি যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে ভালবাসিতেন। রথাঙ্গ প্রভৃতি নামধেয় তাঁহার আটটী পুত্র ছিল।

বাচস্পতি মিশ্র বৈদিক শ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। বাচস্পতি মিশ্র কোটালী পাড়া বৈদিক শ্রেণীর সমাজের ব্রাহ্মণ, কোটালী পাড়াতে তাঁহার বাসস্থান ছিল। পূর্ব্বকালে বিক্রমপুরের বিস্তৃতি বহুদূর ব্যাপী ছিল। কালক্রমে পদ্মার স্রোত-বেগে এবং রাজবিভাগানুসারে ও রাজ-বিপ্লবে বিক্রমপুরের আকার অনেক ক্ষুদ্র হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে কোটালীপাড়া বিক্রমপুরের একাংশ ছিল সুতরাং বাচস্পতি মিশ্র বিক্রমপুরবাসী ছিলেন। বৈষ্ণব ও যশোধর মিশ্র যখন বিক্রমপুরে রাজা হরি বর্ম্ম দেবের সভায় উপস্থিত হন তথায় তাঁহার সহিত বাচস্পতি মিশ্রের সাক্ষাৎ হয়। তিনি তৎকালে রাজসভাসদ ছিলেন। যশোধরের বংশধর এখনও বিক্রমপুরস্থ চাচরতলা গ্রামের নিকটবর্ত্তী বৈদিক প্রধান ধলছত্র গ্রামে বাস করিতেছেন। ধলছত্র গ্রাম চাচরতলা গ্রামের উপকণ্ঠে। অনেকে অনুমান করেন বাচস্পতি মিশ্র অন্ততঃ কিয়ৎকাল ধলছত্রবাসী ছিলেন।

বাচস্পতি মিশ্র ষড়দর্শনের বিশদ টীকা লিখিয়াছেন। ন্যায় সূচী নিবন্ধ প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের বহু নিবন্ধ এই বাচস্পতি মিশ্রের লিখিত। অধুনা ষড়দর্শন পাঠার্থীগণ অনেকেই বাচস্পতিমিশ্রের টীকা পাঠ করেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণ মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের বেদান্ত দর্শনের "শারীরক ভাষ্য" ও রামানুজের "শ্রীভাষ্য", উদ্যোতকরের "ন্যায়বর্ত্তিক," গৌরপদাচার্য্যের 'সাংখ্যকারিকার টীকা'

প্রশস্ত পাদাচার্য্যের "পদার্থ ধর্ম্ম সংগ্রহ" নাম্নী বৈশেষিকের ভাষ্য, শবর স্বামীর "মীমাংসা ভাষ্য" প্রভৃতি টীকা গ্রন্থ অতি বিশদ ও অতুলনীয় কিন্তু বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় সমস্ত দর্শনের সর্ব্বাঙ্গীন টীকা আর কেহ লিখেন নাই। বাচস্পতি মিশ্রের শারীরক ভাষ্যের "ভামতী", "ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য" নাম্নী ন্যায়ের টীকা, "সাঙ্খ্যতত্ত্ব কৌমুদী" নাম্নী সাঙ্খ্যকারিকার টীকা, "ন্যায় ভাষ্য" নাম্নী ন্যায় শাস্ত্রের টীকা, পাতঞ্জল দর্শনের "তত্ত্ব বৈশারদী" নাম্নী টীকা প্রভৃতি ষড়-দর্শনের বহু গ্রন্থের বহু টীকা বাস্তবিকই বিশেষ আদরের সামগ্রী। প্রফেসার মেকডনেল বলেন—

There are two excellent commentaries on the Sankhya karika, the one composed about 700 A. D. by Gouda pada (গৌড়পাদ), and the other soon after 1100 A. D. by Vachaspati Micra (বাচস্পতি মিশ্র)। প্রসিদ্ধ দার্শনিক মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কা-লঙ্কার মহাশয় বাচস্পতি মিশ্র ও তল্লিখিত "ভামতী" নাম্নী টীকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী নাম্নী টীকা অতীব উপাদেয়। এই টীকা নাতিবিস্তৃত, প্রগাঢ় ও সারগর্ভ। বাচস্পতি মিশ্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অত্যাশ্চর্য্য লিপিচাতুর্য্য প্রখ্যাত, তদ্বিষয়ে বাক্যব্যয় অনাবশ্যক।"

বাচস্পতি মিশ্র রাজা হরিবর্ম্মা দেবের অন্যতম মন্ত্রী এবং হরিবর্ম্মার পুত্রের রাজত্ব কালেও মন্ত্রীত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গুরুতর রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া বাচস্পতি মিশ্র দর্শন ও স্মৃতি শাস্ত্রের যেরূপ গভীর গবেষণা করিয়াছেন এবং তৎ সম্বন্ধে যে গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে বর্ত্তমান বাঙ্গালীর হৃদয় আনন্দে ও আশায় উৎফুল্ল হয় সন্দেহ নাই।

শ্রীকামিনীকুমার ঘটক।

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ

পাঐলদিয়া

শুধু বিক্রমপুরে কেন—সমগ্র বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের নিকটই "পাঐলদিয়া" বিক্রমপুর কায়স্থ কুলীন সমাজের অন্যতম শীর্ষস্থান বলিয়া সুপরিচিত। ইহা ঢাকা হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে 'ধলেশ্বরী'র পশ্চিম এবং 'ইচ্ছামতী'র দক্ষিণ ও পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। রাজা রাজবল্লভের বিখ্যাত "তালতলার খাল" ইহার পূর্ব্বপ্রান্তে ধলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

গ্রাম্য বিবরণ।

এই অভিনব অদ্ভুত নামের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান-যোগ্য; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই উহার কোন সঙ্গত কারণ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন দলিলাদিতেও ইহার নাম "পাওলদিয়া" দেখা যায়।

এ গ্রামের ঘোষবংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী। ইহাঁদেরই সমবায়ে বিক্রমপুরের "সাড়ে তিন ঘর" কায়স্থ কুলীন সমাজ গঠিত। এখানে সমাজ সম্বন্ধে একটু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বিক্রমপুরের সর্ব্বত্রই প্রায় ব্রাহ্মণগণ সমাজ-পতি; কিন্তু পাঐলদিয়ার ঘোষবংশ ও মালখাঁনগরের বসু-বংশই তাহাদের স্ব স্ব সমাজপতি। ইহা হইতেই বিক্রমপুর কায়স্থ কুলীন মহাশয়দিগের সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি অনুমিত হইতে পারে।

কাণ্যকুব্জাগত কায়স্থ শিরোমণি মহাত্মা মকরন্দ ঘোষ হইতে পঞ্চদশ পুরুষ রামচন্দ্র ঘোষই বর্ত্তমান পাঐলদিয়া ঘোষ-বংশের আদি পুরুষ। ইনি ঠিক্ কোন্ সনে পাঐলদিয়া আগমন করেন তাহা জানা যায় না, কিন্তু ইনি যে বাং ১০৮৭ সালের কিছুকাল পরে ঢাকার তদানীন্তন নবাব সরকারে কার্য্য-গ্রহণান্তর শুভ্র-সলিলা "ধলেশ্বরী" ও "ইচ্ছামতী" পরিবেষ্টিতা "পাঐলদিয়া"র নিস্তব্ধ প্রান্তরে সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বা স্বাস্থ্য গৌরবে সমাকৃষ্ট হইয়া এখানে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। রামচন্দ্র ঘোষঠাকুর মহাশয় আসিবার পূর্ব্বে বোধ হয় এখানে কোন বিশিষ্ট ভদ্র পল্লী ছিল না, তিনিই প্রথমে এখানে বাসস্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক বহু কুলীন ও

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ স্থাপিত করতঃ পাঐলদিয়া-সমাজ গঠিত করেন। গ্রামের রাস্তা ঘাটেরও তিনি যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। এখনও গ্রামে নবাবি আমলের বড় বড় দুইটি রাস্তার চিহ্ন দেখা যায়, এ রাস্তাগুলি ৫০।৬০ হাত প্রশস্ত ছিল ও 'দরজা' নামে অভিহিত হইত। প্রবাদ শুনা যায় যে এ সকল 'দরজা' নবাবের ফৌজ যাতায়াতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও এ সকল দরজার প্রশস্ততা প্রায় ৩০।৩৫ হাত দেখা যাইত, কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বুভুক্ষু কৃষককুলের অনুগ্রহে দরজার অধিকাংশ শস্যক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ২০ হইতে স্থানে স্থানে ৪।৫ হাত সংকীর্ণতা লাভ করিয়াছে।

প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির দিবস হইতে ক্রমাগত ৩ দিন এখানে দুইটি 'গলইয়া'র মেলা হয়। গ্রামটী প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত, পূর্ব্বভাগে যে মেলা হয় তাহা মেলা স্থাপয়িতার নামানুযায়ী "লক্ষ্মী ঘোষের মেলা" বলিয়া পরিচিত। পশ্চিম ভাগের মেলাটি "সুবচনীর মেলা" বলিয়া অভিহিত হয়। এখানে একটি অতি প্রাচীন বটগাছ আছে, ইহাকে সর্ব্বসাধারণ "সুবচনী" বলিয়া বলে ও অনেকে এই গাছটিকে তেল সিন্দূর দিয়া পূজাও করিয়া থাকে।

মেলা।

ইহা হইতেই এই স্থানটির নাম "সুবচনীতলা" ও মেলার নাম "সুবচনীর মেলা" হইয়াছে। এই সকল মেলা হইতে গ্রামবাসিগণ এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী ধনিয়া, সরিষা প্রভৃতি মসলা সংগ্রহ করিয়া রাখে। এ সকল মেলা-উপলক্ষে নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। 'কবি' বা 'জারি' গান ব্যতীত নানাবিধ হাস্যোদ্দীপক সাজসজ্জা এবং "বাইদার গান" নিম্নশ্রেণীস্থ গৃহস্থগণের অতীব প্রিয় বলিয়া বোধ হয়।

এই গ্রামে একটী পোষ্টাফিস, একটি মাইনর স্কুল, দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (এখানে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্যও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে) ও মুসলমান

মক্তব, বিদ্যালয় ইত্যাদি।

বালকগণের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র মক্তব আছে। শেষোক্ত মক্তবটিতে ইংরেজী, বাঙ্গালা, পারশী এ তিনটি ভাষাই সামান্য ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মালখাঁনগরের স্কুল কেবল মাত্র এক মাইল ব্যবধান বলিয়া এখানে কোন স্বতন্ত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা নাই। নিম্নশ্রেণীস্থ

দরিদ্র মুসলমানগণও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা একটু একটু উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের মক্তবে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে।

এ গ্রামে তিনটি মঠ আছে। ইহাদের সকলটিই আধুনিক, কোনটিই ৫০ ৬০ বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। এখানে একটি প্রসিদ্ধ আক্রা বা (আশ্রম) আছে। আক্রাতে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ স্থাপিত, দৈনিক পূজা হয়, এবং পর্ব্বোপলক্ষে অনেক লোকের সমাগম হয়।

মঠ, মন্দির, দেবমূর্ত্তি।

৺রামকানাই ঘোষঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে ১টী "নাককাটা বাসুদেবের" প্রস্তর মূর্ত্তি দেখা যায়, উহা প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বহির্ব্বাটীর দীর্ঘিকা খনন কালে পাওয়া গিয়াছিল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীচন্দ্র ঘোষ ঠাকুর মহাশয়ের শতবর্ষ বয়োধিকা মাতা ঠাকুরাণীর প্রমুখাৎ অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার দিদি শ্বাশুড়ী, ৺গদাধর ঘোষ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী, পুণ্যশ্লোকা সতী "অভয়া" দেবী তাঁহার পতির সহিত আনুমানিক বাঙ্গালা ১১৫৭ সালে (ইংং ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে) সহমৃতা হন। তিনি আরও বলেন যে তাঁহার ধাই শ্বাশুড়ী প্রচলিত প্রথানুযায়ী সতীর শ্মশানোপরি 'বটাশ্বত্থ বিবাহ' প্রদান করতঃ সতীর সম্মাননা করেন। সেই 'বটাশ্বত্থ' দম্পতীও প্রায় দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত নীরব ভক্তিভরে সগৌরবে উন্নত মস্তকে 'সতী'র গৌরব গাঁথা দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত করিয়া অবশেষে বিগত বাং ১৩০০ সনে সর্ব্ববিধ্বংসী কালের করাল কবলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে। তাহার পর সেই স্থানের চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। তবে সেই বটাশ্বত্থ বিটপীতলে সতী 'অভয়া'র উদ্দেশ্যে ভক্তি নম্র হৃদয়ে গ্রাম্য সতীগণ এতকালাবধি পূজা প্রদান করিতেন বলিয়া সেই স্থানটি বহু দিন যাবত "কুলাই তলা" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

গ্রামটি নদীতীরবর্ত্তী বলিয়া কলিকাতা, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা। এখান হইতে প্রত্যহ দুইবার ষ্টীমারে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ যাওয়া যায়। গ্রামটি বৃহৎ না হইলেও এখানে শিক্ষিতের সংখ্যা যথেষ্ট। বর্ত্তমানে এই গ্রামে দুইজন "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে

একজন ঢাকার নবাব পরিবারের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ ঠাকুর বাহাদুর, অপর কুমিল্লার সুবিখ্যাত গভর্মেণ্টের উকিল বর্ত্তমানে ঢাকার রায় শ্রীযুক্ত শশাঙ্ককুমার ঘোষ ঠাকুর বাহাদুর। "মোহন বাগানে"র বিখ্যাত ফুটবল ক্রীড়ক শ্রীমান্ অভিলাষ ও 'ঢাকা'র বিখ্যাত ফুটবল-ক্রীড়ক বিরাজ-মোহন এই গ্রামের অধিবাসী। *

প্রহেলিকা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একদিন, চন্দ্রনাথ বাবু ভবানী মাষ্টারকে স্বগৃহে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, মহাশয়! আমার ছেলেটী বড়ই দুষ্ট। ওর উপর একটু বিশেষ নজর রাখিবেন।

নন্দী যেন শিবের আজ্ঞা পাইল। তৎপর দিবস ক্লাসে পদার্পণ করিয়াই মাষ্টার হুকুম জারি করিলেন, দেখ্ বিজয়! স্কুলে এসেতো তুই খেলতে পারবিই নে, বাসায়ও তোর খেলা বন্ধ। তোকে সারাদিনই লেখা পড়া কত্তে হবে।

বেলা একটু পড়িয়া আসিতেই, বাসার কাছে মাঠের ভিতর, পাড়ার সব ছেলেরা খেলায় মাতিয়া যাইত। মাষ্টারের কঠোর আজ্ঞা সত্ত্বেও বিজয় সে সময় পড়িত না, পড়িতে তাহার ইচ্ছা করিত না। ছেলেরা যেখানে খেলিত, সে সেখানে যাইয়া বসিয়া বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিত। জীবনটা তাহার কাছে বড়ই দুঃখময় বোধ হইতে লাগিল। সদাপ্রফুল্ল বিজয়ের মুখখানি শুকাইতে লাগিল।

---

* এই গ্রাম্য বিবরণটী সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার জন্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বিক্রমপুরের অন্যান্য গ্রামবাসিগণ এইরূপ ভাবে নিজ নিজ গ্রামের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিব। এখন হইতে প্রতি সংখ্যায়ই উত্তর ও দক্ষিণ উভয় বিক্রমপুরের কোন না কোন গ্রামের বিবরণ প্রকাশিত হইবে। বিঃ সঃ।

মাঝে মাঝে, এক একদিন কোন একটী বালক খেলিতে খেলিতে আসিয়া বলিত, আয় না বিজয়, খেলি।

বিজয় তদুত্তরে বলিত, না ভাই! মাষ্টার মারবে।

বালক। মাষ্টার কি এখানে দেখতে আসবে? আয় না খেলি।

বিজয়ের খেলিবার বড়ই ইচ্ছা করিতেছিল। কোন্ বালকের না করে? সে ভাবিল, তাইতো খেলিনা, কেইবা দেখ্‌বে?

সে খেলায় যোগ দিল। কতক্ষণ 'পরে খেলা যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিল রাস্তার উপর যমাবতার মাষ্টার দণ্ডায়মান! তিনি সন্ধ্যাকালে সে রাস্তা দিয়া মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইতেন।

আর খেলা হইল না। ভয়ে জড় সড় হইয়া, চিত্রার্পিতের ন্যায় কিয়ৎকাল সে স্থানে দাঁড়াইয়া বালক গৃহে চলিয়া গেল!

তৎপর দিবস ক্লাসে আসিয়াই বজ্র-গম্ভীর স্বরে মাষ্টার হাঁকিলেন, বিজয়!

কাঁপিতে কাঁপিতে বিজয় তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

"কি, আমার কথার অবাধ্যতা। এতদূর আস্পর্দ্ধা!"—কাণটী ধরিয়া মাষ্টার তাহাকে কাছে আনিয়া সজোরে তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কোমলকায় বালক চীৎকার করিয়া গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

এ দৃশ্যের অভিনয় প্রায়ই হইত। সমপাঠিগণ সকলেই বিজয়ের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিত কিন্তু কেহই তাহাকে মাষ্টারের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। সকলেই যে তাহার তাড়নায় অস্থির!

অবশেষে, যখন দেখিল পাঠ শিখিলেও প্রহৃত হইতে হয়, না হইলেও হয়, তখন বিজয় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, কিছুতেই আর পড়িব না, যা থাকে কপালে।

এদিকে, মাষ্টারও 'দুঃশাসন' চালাইতে লাগিলেন অবিরাম। ভয়ে, বিজয় একদিন বাটীর চাকরদের ঘরে লুকাইয়া রহিল, স্কুলে আর সেদিন গেল না।

মাষ্টার সন্ধ্যার সময়, তাহাদের গৃহে আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন,

বিজয়ের কোনও ব্যারাম হয় নাই। তৎপরে চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি তাহার অনুপস্থিতির বিষয় বলিয়া দিলেন। রাগান্বিত হইয়া, তিনি অতি নির্দ্দয়ভাবে পুত্রকে প্রহার করিলেন।

নিরুপায় বালক তখন ভাবিতে লাগিল, হায়! কোথায় যাই এখন, কি করি!

যেমন দেশের শিক্ষক, তেমন দেশের পিতা ও অভিভাবক। প্রহার ছাড়া অন্য কোন উপায়ে যে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ করা যাইতে পারে, তাহা তাহাদের অজ্ঞাত। শত শত বেত্রাঘাত দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয় না, কেবলমাত্র গুটিকতক মিষ্টি কথার সাহায্যে, সোণার চাঁদ শিশুদ্বারা যে সে কাজ সম্পন্ন করিয়া লওয়া যায়, তাহা তাহারা জানে না। হায়! কবে জানিবে, কবে তাহাদের দায়িত্ব তাহারা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে, কবে দেশে প্রকৃত শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে, কবে আমাদের বালকবালিকাগণ মানুষ হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিবে।

ভর্ত্তি হইবার দিন আনন্দের সহিত যে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার পরেও তাহার সহিত বিজয়ের ক্লাসে, গৃহে এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে দেখা হইয়াছে কিন্তু বিশেষ মিশামিশি ভাবে আলাপ পরিচয় হয় নাই। ভবানী মাষ্টারের কল্যাণে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্টতর সম্মিলনের সুযোগ উপস্থিত হইল।

একদিন আনন্দ পাঠ শিখিয়া ক্লাসে যায় নাই। প্রহারে জর্জ্জরিত হইতে হইতে সে প্রায় ক্লাসের লাষ্টের কাছে যাইয়া উপস্থিত। সেখানে বিজয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সে ইহার পূর্ব্ব হইতেই লেখাপড়া একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহার শরীরটাও প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ঘণ্টার পরিবর্ত্তন হইলে, মাষ্টার ছাত্রদের ট্রেনস্‌লেসেন দেখিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দুই সমপাঠীর মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে চুপে চুপে আলাপ চলিতে লাগিল।

বিজয় বলিল, ভাই! মাষ্টারকে মারবার কোনও উপায় বল্‌তে পার। বেটার জ্বালায় অস্থির হলেম। ক্লাসে মাষ্টার, বাড়ীতে বাবা, আমি যে গেলাম।

ভয়বিহ্বলদৃষ্টিতে মাষ্টারের দিকে চাহিতে চাহিতে আনন্দ বলিল, ভাই! ওকথা মুখে এনো না। টের পেলে সর্ব্বনাশ কর্‌বে। ঐ দেখ, আমাদের দিকেই তাকাচ্ছে।

সেদিন প্রহার-ক্লিষ্ট হইয়া উভয়ের দুঃখভারাক্রান্তহৃদয় উভয়ের দিকে নত হইয়া পড়িয়াছিল।

হঠাৎ বিজয় বলিয়া উঠিল, ভাই ! আমরা যেন দুই বন্ধু।

আনন্দ উত্তর করিল, আচ্ছা।

একটী কথায় জন্মের মত একে অন্যের বন্ধু হইয়া গেল।

বিজয় বলিল, বন্ধুত হ'লেম। এখন বন্ধুতার চিহ্ন স্বরূপ তোমায় কিছু দেওয়া উচিত। তখন তাহারা ষষ্ঠ শ্রেণীর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে সে আনন্দকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, Friend ! what do you want ?

আনন্দ দেখিল বিজয়ের হাতে একটা লাল Swan Pencil চক্ চক্ করিতেছে। মাথা গুঁজিয়া সে বলিল, Pencil।

এবার আনন্দের পালা। সে বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিল, Friend ! what do you want ?

সে উত্তর করিল Pencil।

আনন্দ তাহার নিজের পেনসিলটি তাহাকে দিল।

ঘটনাটী বড়ই সামান্য। কিন্তু হাসিও না, প্রিয় পাঠক পাঠিকা ! সে মুহূর্ত্তে, ঐ পেনসিল দুটীর বিনিময়ে, সরল শিশুদুটীর প্রাণে যে আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল, বোধ হয় এ জীবনে তেমন আনন্দ তাহারা অনেক দিন উপভোগ করে নাই।

পরদিন হইতে দুইজনের মিলা মিশাটা বেশী চলিতে লাগিল। উভয়ে সকাল সকাল স্কুলে আসিয়া মার্‌বেল খেলিতে লাগিল। স্কুলের নিকটস্থ রাস্তার ধারের গাছের কুল পাড়িয়া খাইতে লাগিল। বালকের প্রাণ, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে একটির সহিত অন্যটি মিশিয়া গেল, তাহা উভয়ের কেহই বুঝিতে পারিল না।

* * * *

ইহার কয়েক বৎসর পর, একদিন এমন একটী ঘটনা ঘটিল, যে তাহা আনন্দকে বিজয়ের চক্ষে দেবতার স্থানে অধিষ্ঠিত করিয়া, তাহার প্রাণটীকে ভালবাসায় ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত করিয়া ফেলিল।

তখন তাহারা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে। পঞ্চম শ্রেণীতে উঠিবার

পর হইতে, তাহারা ভবানী মাষ্টারের হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছিল। তৃতীয় শ্রেণীতে তিনি আসিয়া আবার দেখা দিলেন।

আবার বিজয়ের উপর, পূর্ব্বের ন্যায় হুকুম জারি হইল, বিজয়! তুই খেল্‌তে পারবি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে আজ্ঞা পালন করিয়া চলা বিজয়ের পক্ষে দুষ্কর ছিল। তাঁহার স্ফূর্ত্তিভরা প্রাণটী তাহাকে স্কুলের পর একাকী গৃহকোণে বসিয়া থাকিতে দিত না।

যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন ভবানী মাষ্টার ক্লাসে আসিয়াই, বিজয়ের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে তাহার চেয়ারের কাছে আনিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, বল্, আর খেল্‌বি?

বিজয় মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, না, আর খেলবনা পায় পড়ি সার! আর খেল্‌ব না।

মাষ্টার। তুই তো কত দিনই এমন প্রতিজ্ঞা কল্লি। আজ এমন শিক্ষা দিব, যেন এ জন্মে আর না খেলিস্।

এই বলিয়া তিনি "দুঃশাসন" বাহির করিলেন। ছাত্রগণ তাহার তন্মুহূর্ত্তের রোষকষায়িত লোচন, তাহার ক্রোধকম্পমান পৈশাচিক মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

গম্ভীর স্বরে বিজয়কে উদ্দেশ করিয়া মাষ্টার হাঁকিলেন, খোল্, পিরাণ্ খোল্।

বিজয়। "পায়ে পড়ি সার! পায়ে পড়ি, আর খেল্‌বনা" বলিতে বলিতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেহ হইতে পিরাণ খুলিল।

তখন মাষ্টার ছাত্রগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আয় তো তোরা দুজন, ধর তো ওর হাত দুটো।

প্রথমতঃ, কেহই উঠিলনা। কিন্তু যখন গোপাল ও নবীন নামক দুইটী বালকের দিকে লক্ষ্য করিয়া মাষ্টার তারস্বরে হাঁকিলেন, 'আয় তো তোরা দুজন,' তখন উপায়ন্তর না দেখিয়া একজন যাইয়া বিজয়ের দক্ষিণ হস্ত আর একজন বাম হস্ত ধরিল। তাহাদের দুইজনের মাঝে দাঁড়াইয়া কোমলকায় বালক ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ও তাহার বড় বড় উজ্জ্বল নয়ন দ্বয় জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

ক্লাস তখন নিস্তব্ধ। এমন নিস্তব্ধ, যে একটী সূচির পতন হইলেও অনুভব

করা যায়। ভীতিগ্রস্ত বালকসমূহ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া বিস্ফারিত লোচনে সে দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

তখন, ধীরে ধীরে 'দুঃশাসনকে' তুলিয়া, বামহস্তে মুষ্টির ভিতর দিয়া টানিয়া আনিয়া, মাষ্টার সজোরে বিজয়ের পৃষ্ঠের উপর প্রহার করিতে লাগিলেন। বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া নিরীহ বালক চীৎকার করিতে লাগিল।

ক্লাসের এক কোণে বসিয়া একটী বালক সে দৃশ্য দেখিতেছিল, আর তাহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিতেছিল। এক—দুই—তিন করিয়া যখন দশ বার বার বেত্রাঘাত হইয়া গিয়াছে, এবং বিজয় যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তখন যেন সে আর থাকিতে পারিল না।

মাষ্টার আর একবার 'দুঃশাসনকে' তুলিয়াছেন, এমন সময় সে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহা ধরিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, মাষ্টার মহাশয়! ও'কে মার্‌বেন না, ও'কে মার্‌বেন না। মার্‌তে হয়, ও'র বদলে আমাকে মারুন।

আজ বিশ বৎসর যাবৎ ভবানী মাষ্টার মাষ্টারী করিতেছেন। কিন্তু, তাহার মুখের উপর, এমন কথা বলিতে কোনও বালক কখনও সাহস পায় নাই। তিনি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কি বলিস্ আনন্দ! আয় তোকেই শিক্ষা দিচ্ছি।

তাহার সমস্ত রাগ আনন্দের উপর যাইয়া পড়িল। তখন তিনি বিজয়কে ছাড়িয়া, তাহার পৃষ্ঠের উপর নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। তাহার চক্ষু গড়াইয়া জল পড়িতে লাগিল, কিন্তু সে একবারও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিল না। মাষ্টার রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিলেন এবং যখন পূর্ব্বেরই অর্দ্ধভগ্ন বেত্রখানা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল, তখন দ্রুত গতিতে ক্লাস পরিত্যাগ করিয়া হেডমাষ্টারের কক্ষের দিকে চলিয়া গেলেন।

সেই দিনটী বিজয়ের জীবনের একটী স্মরণীয় দিন। সে তখনও বালক। তথাপি, আনন্দ যে তাহা অপেক্ষা হৃদয়-মহত্ত্বে কত ঊর্দ্ধে অধিষ্ঠিত, তাহা যেন সে সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার মত যাহারা ভালবাসিতে জানে, তাহারাই প্রকৃত মানুষ। তাহার মত প্রাণটি পাইবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

* * * * * *

উভয়েই দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পাইল। দুইজনেই তখন দুইজনার

ভালবাসায় বিভোর। ক্লাসে উভয়ে একত্র পাশাপাশি উপবেশন করিত। ছুটীর পর, একের সহিত অন্যের সাক্ষাৎ হইত। তখন দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া কখনও বা নদীতীরে, কখনও বা নগরের প্রান্তবর্ত্তী বিজন প্রান্তরে ভ্রমণ করিত।

ভালবাসার প্রকৃতিই এইরূপ। সে চিরকালই লোক গঞ্জনা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে চায়। সে ত্রিদিবের ফুল, নির্জ্জনতার ভিতরই পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠে।

ততদিনে, তাহাদের মধ্যে আত্মপর ভেদবুদ্ধি লোপ হইয়া গিয়াছে। সংসারের চক্ষে যে তাহারা ভিন্ন,—একথা ভাবিতেও যেন প্রাণে ব্যথা পায়।

মাঝে মাঝে, তাহারা কল্পনার সাহায্যে ভবিষ্য জীবনের সুখ-মন্দির গড়িত। সে সব সময়, বিজয় বলিত, ভাই! বড় হলে আমরা যা রোজগার করব, তা দুজনার হবে। আমরা চিরকাল একত্র থাক্‌ব। কি বল, আনন্দ!

আনন্দ স্মিতবদনে সম্মতি প্রকাশ করিত।

এমন ভাবে, মাস ছয় সাতেক চলিয়া গেল। যেখানে ভালবাসা, সেখানেই মান, সেখানেই সন্দেহ, সেখানেই বিরহ।

কি যেন কি কারণে বিজয়ের মনে হইল,যে আনন্দ আর তাহাকে ভালবাসে না

কি যেন কি কারণে আনন্দের মনে হইল, যে তাহার প্রতি বিজয়ের আর তেমন অনুরাগ নাই।

বিজয় পূর্ব্বের বেঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া ক্লাসের অন্য স্থানে বসিতে লাগিল। আনন্দও পূর্ব্বের বেঞ্চ ত্যাগ করিল। নদীতটে একত্র ভ্রমণও বন্ধ হইয়া গেল। উভয়েরই জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিল। অথচ, কেহ কাহারও সঙ্গে কথাটী পর্য্যন্ত বলে না।

বিজয় এখন একাই বেড়ায়। দুই এক দিন দূর হইতে চাহিয়া দেখিত, অপর দিক্ হইতে আনন্দ আসিতেছে। অতদূর হইতে অপরে চিনিতে পারিতনা, কিন্তু তাহাদের উভয়ের উভয়কে চিনিতে কষ্ট হইতনা। ভালবাসা যে দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ করে! যখন দুজনার দেখা হইত, তখন বিজয় বলিত, "কি হে, কোথায় যাচ্ছ?" আনন্দ মুখ নত করিয়া উত্তর করিত, "এই তো, এ দিকে।" তার পর, কি যেন কেমন করিয়া, দুই জনের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়া যাইত, তাহার

আর শেষ নাই। ক্রমে, বেলা পড়িয়া আসিত, লোক সকল যে যাহার গৃহে চলিয়া যাইত, রজনী গভীর হইয়া আসিত, তথনও বন্ধুদ্বয় একে অন্যের হাত ধরিয়া কত কি আলাপ করিতেছে।

এমন দিনের সংখ্যা এখন কম হইয়া আসিয়াছিল। তাই, মধুরতায় তাহারা দিন দিনই অধিকতর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

অনেক দিন উভয়ের কথাবার্ত্তা হয় নাই। ইতিমধ্যে একদিন ভীতিবিহ্বলনেত্রে আনন্দ দেখিতে পাইল, বিজয় ক্লাসে যে স্থানে উপবেশন করিত, সে স্থান শূন্য। কাহারও নিকট তাহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিতেও কেমন যেন লজ্জায় তাহার জিহ্বা জড়াইয়া আসিতে লাগিল। সে রজনীতে তাহার নিদ্রা হইল না। তাহার পর দিবস, প্রাতে উঠিয়া সে বিজয়ের বাড়ীর পাশে সংবাদের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে, তাহাদের ভৃত্যের মুখে জানিতে পারিল তাহার পীড়া—বিষম জ্বর।

কেমন কষ্টের ভিতর দিয়া যে ক্লাসে আনন্দের সে দিনটা চলিয়া গেল, তাহা বলিবার নহে।

তখনও সন্ধ্যা হইয়া আসে নাই। বিজয় শয্যায় পড়িয়া পীড়ার যাতনায় ছট্ফট্ করিতেছে। মাঝে মাঝে, ডাক্তার কেদার বাবু দেখিয়া যাইতেছেন। সমপাঠিগণের মধ্যেও জনকয়েক এইমাত্র দেখিয়া গেল। তন্দ্রাবশে সে কিয়ৎকালের জন্য চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছে। এমন সময়, কাহার মৃদুকরস্পর্শ তাহার কপালে ও হস্তোপরি সে অনুভব করিল। তাহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয় উন্মীলিত হইয়া গেল। দেখিল, সম্মুখে আনন্দ। "এসেছ! বস", বলিয়া সে চুপ করিল। আনন্দ ধীরে ধীরে গায় হাত বুলাইতে লাগিল। তখন হইতে আর তাহার চীৎকার নাই—পীড়ার প্রকোপ যেন চলিয়া গিয়াছে। সে রুগ্ন শয্যা যেন তাহার কাছে সুখশয্যায় পরিণত হইল।

কয়েক দিবস মধ্যে সে রোগ-মুক্ত হইল। আরোগ্যান্তে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আহা! এমন জ্বর আমার আবার কবে হ'বে?

উপরোক্ত ঘটনার মাস দুই পরে বৈকালে বিজয় একাকী নদীতীরে বেড়াইতেছে, এমন সময় তাহাদের সমপাঠী বনমালী ডাকিয়া বলিল, বিজয়! শোননি, দালান হ'তে পড়ে যে আনন্দের মাথা ফেটে গেছে।

"কি বল্লে" বলিয়া, ক্ষণকাল নিঃশ্বাস-বদ্ধ অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া বালক ঊর্দ্ধশ্বাসে বন্ধুবরের গৃহের উদ্দেশে দৌড়াইল। রাস্তায় দুই একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে, কি হয়েছে, দৌড়াচ্ছ কেন?' কিন্তু তাহার মুখে কোনও উত্তর নাই। সে এক দৌড়ে যাইয়া আনন্দের গৃহে উপস্থিত। দেখিল, সে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বিছানায় শুইয়া আছে। মাঝে মাঝে তন্দ্রাবশে তাহার নাম করিতেছে। সে তাহার মাথার কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অনেক দিন পর আনন্দ আরোগ্য লাভ করিল।

দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে উভয়ে প্রথম শ্রেণীতে উঠিল। কেমন করিয়া দুইজনেরই অজানিত ভাবে, পূর্ব্বের সে সন্দেহ-মান-বিরহ-বিজড়িত ভাব চলিয়া গেল, পূর্ব্বের অবস্থা আসিয়া আবার দেখা দিল। একজন আর একজনের ভালবাসায় স্নাত ও পুষ্ট হইয়া আনন্দে পাঠে পূর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত মনোনিবেশ করিল।

প্রিয় পাঠক! কৈশোরে পাঠাবস্থায় কোনও সমবয়স্ক সমপাঠীকে ভালবাসিয়াছ কি? স্বার্থ-লেশশূন্য, পূর্ণ-আত্মবিস্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ ভালবাসার তুলনা জগতে নাই। এমন কি, সন্তানের প্রতি মাতার, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসাও ইহার তুলনায় পার্থিব বলিয়া মনে হয়। যদি ভাগ্যগুণে, জীবনের বসন্তপ্রারম্ভে কাহাকেও এভাবে ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলেই বুঝিবে বিজয় ও আনন্দ উভয়ে একে অন্যের কি ছিল।

*　　*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*　　*

এখানে আনন্দ মোহনের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

হাটখালির নিকটবর্ত্তী নবগ্রামে এক ঘর ভদ্রলোক বাস করিতেন। তাহাদের এক সময় অবস্থা খুব ভাল ছিল। 'নবগ্রামের বাবু' বলিয়া তাহারা চারিদিকে সুপরিচিত ছিলেন। সমাজে তাহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। দাসদাসী, লোকজনে, বাড়ীঘর পূর্ণ ছিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় পরিবারের কর্ত্তা নীলমাধব বাবুর ভাগ্যশশী অতিদ্রুতগতিতে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতেছিল। কিন্তু, তথাপি

তাহার মহৎ চরিত্রের জন্য, লোকে তখনও তাহাকে সবিশেষ ভক্তি ও মান্য করিত।

কেমন করিয়া, কি কারণে যে তাহার সাংসারিক অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইল তাহা তিনি নিজেই ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। এই তো সে দিন,—অধিক দিনের কথা নয়, তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহোপলক্ষে, তাহার পিতা কত সহস্র টাকা ব্যয় করিলেন। কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় হইল, কত গান বাজনা হইল, কত বাইনাচ খেমটা নাচ হইল, কত কাঙ্গালী বিদায় হইল, কত হাজার হাজার লোক তাহার পিতৃদেবের সুখ্যাতি করিয়া চলিয়া গেল। তিনি অত্যাচারী, অমিতাচারী ছিলেন। নানাদিক হইতে অশান্তি দেখা দিল, মামলা মোকদ্দমা বাজিয়া উঠিল। ঋণ আসিয়া দেখা দিল। ব্যারিষ্টারে উকীলে, মোক্তারে টর্ণিতে, জালিয়াতে জুয়াচোরে, টাকা লুটপাট করিয়া নিতে লাগিল।

তাহার মৃত্যু হইল। নীলমাধব বাবু তাহার স্থলে জমীদারী-পদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু যে পাপ-স্রোত তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল, তিনি তাহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না। তিনি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ধর্ম্মজ্ঞ কিন্তু অদৃষ্টের হাত এড়াইতে পারিলেন না। আজ, এ মোকদ্দমায় অনর্থক অত হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গেল, কাল, বেগবতী নদী মূল্যবান্ তালুকখানা ভাঙ্গিয়া লইয়া গেল, কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই অমুক মহালের নায়েব অত হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিল। এমন করিয়া, সবই যেন এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল! যখন যায়, এমন করিয়াই যায়!

উপায়ান্তর না দেখিয়া, নীলমাধব বাবু চাকরীর অন্বেষণে বাহির হইলেন। প্রথম প্রথম, অনেকে তাহার অবস্থার এমন বিপর্য্যয়ের কথা বিশ্বাস করিল না। যাহা হউক, অনেক চেষ্টার পর,—সহরে এক জমীদারের অধীনে স্বল্প বেতনে দেওয়ানজীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত ইতি পূর্ব্বেই ঋণ-দায়ে নিলামে বিক্রী হইয়া গিয়াছিল। সহরের ভিতর একখানা ক্ষুদ্র বাটীতে পরিবার সহ মাথা গুঁজিয়া কোনও প্রকারে দিন গণিতে লাগিলেন।

দুঃখের ভিতরও একটু সুখ দেখা দিল। এতদিন অর্থতাড়নায় ও সংসারের

জ্বালা যন্ত্রণায় বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া যে স্ত্রী ও সন্তানগণকে এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আজ এই বিপদের দিনে তাহাকে সুখী করিবার জন্য, তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার স্ত্রী, তাহার যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তজ্জন্য রমণীসুলভ কত উপায়ই না উদ্ভব করিতে লাগিলেন। তাহার সেবাশুশ্রূষায় তাহার ভাঙ্গাপ্রাণ যেন আবার যোড়া লাগিবার উপক্রম হইল।

তখন তাহার তিনটী পুত্র,—বিরাজ মোহন, আনন্দ মোহন ও ধীরাজ মোহন। দুইটী কন্যা। বড় কন্যা লাবণ্যবালার ইতি পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়াছিল। ছোট কন্যা অমলা কোলের শিশু। আনন্দ ও ধীরাজকে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। বিরাজ এণ্ট্রাস পাশ করিয়া, পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতায় পড়িতেছিল। কয়েক বৎসর এক প্রকারে চলিয়া গেল।

কিন্তু, তখনও নীলমাধব বাবু তাহার অদৃষ্টের হাত এড়াইতে পারেন নাই। একদিবস সন্ধ্যাকালে, তিনি বিষয় কর্ম্ম হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, এমন সময়, আনন্দমোহন চিন্তাক্লিষ্টমুখে তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "বাবা! মা যেন কেমন কচ্ছে। বৈকালে কয়েকবার দাস্ত ও বমি হয়েছে। শীঘ্র ভিতর বাড়ীতে যান, আমি কেদার ডাক্তারকে ডাক্‌তে চল্লেম।" বালক ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাক্তারের বাটীর দিকে চলিল।

'কি বল্লে, বাবা! কলেরা তো নয়', এই বলিয়া নীলমাধব বাবু থতমত হইয়া দাঁড়াইলেন। তৎপর, বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। একটু পরে, ডাক্তার সহ আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা। ইহার ঘণ্টা কয়েক পরে, পত্নী নীলমাধব বাবুকে উদ্দেশ করিয়া অর্দ্ধভগ্ন ক্ষীণস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আমি তোমায় ভাসিয়ে চল্লেম।' আর বলা হইলনা। সে রাত্রিতে শ্মশানে স্বামী-স্ত্রীতে আবার দেখা হইল! শেষবার!

মাতার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ পাইয়া, বিরাজ মোহন কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিল। তখন তাহার বয়স বৎসর সতর আঠার, আনন্দমোহনের চৌদ্দ পনর এবং লাবণ্যবালার ষোল সতর। লাবণ্যবালাও পিত্রালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ধীরাজের বয়স, অনুমান বৎসর সাত আট। অমলা তাহার অপেক্ষা বৎসর

দুই একের ছোট। সর্ব্বকনিষ্ঠা একটী কন্যা, তাহার বয়স অনুমান মাস আট নয়। তাহাকে লইয়াই, সকলে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িল।

স্ত্রী-হারা হইয়া, নীলমাধব বাবু চারিদিক আঁধার দেখিতে লাগিলেন। এতগুলি অপোগণ্ড ছেলেপেলে কেমন করিয়া ভরণপোষণ করিবেন, তজ্জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

অনেকেই, আবার দারপরিগ্রহ করিতে বলিলেন কিন্তু সে উপদেশে তিনি কাণও পাতিলেন না।

লাবণ্যবালা আসিয়া, আপাততঃ কয়েক মাসের জন্য ছোট ভগিনীটীর ভার লইল। বিরাজমোহন কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সহরের কলেজে ভর্ত্তি হইল। সে সংসারের সমস্ত খরচপত্রের হিসাব গ্রহণ করিল। পিতার যাহাতে কোনও প্রকার কষ্ট না হয়, তজ্জন্য ভ্রাতাভগ্নীগণ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আনন্দমোহনের বৈকালের খেলা এক্ষণে আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল।

এমন পিতৃভক্ত, পিতৃগতপ্রাণ পুত্রকন্যা কাহারও ভাগ্যে বুঝি কখনও জোটে নাই। এসময় সন্ধ্যাবেলা যিনিই সে গৃহে বেড়াইতে গিয়াছেন, তিনিই একটী মধুর দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছেন। বাহির বাটীর ঘরে নীলমাধব বাবু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শয্যার উপর উপবিষ্ট। অমল তাহার ক্রোড়ে বসিয়া আছে। সুকুমারীকে কোলে লইয়া লাবণ্যবালা বিছানার এককোণে খেলা দিতেছে। আনন্দ পিতার পা টিপিয়া দিতেছে। বিরাজ তাহার সহিত হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিতেছে এবং তিনি মাঝে মাঝে তাহার কথার উত্তর দিতেছেন। মাঝে মাঝে লাবণ্যবালার গলা জড়াইয়া, 'দিদি' 'দিদি' করিয়া, অমলার সহিত লুকুচুরি খেলা জুড়িয়া দিবার উপক্রম করিতেছে। নীলমাধব বাবুকে ঘিরিয়া সুখ ও প্রীতি যেন নানামূর্ত্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

পুত্র ও কন্যাগণের আদর ও যত্নে, তিনি জীবনের কষ্ট অনেকটা ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। এমন সময়, অদৃষ্ট আবার বজ্র নিক্ষেপ করিল। সর্ব্বকনিষ্ঠা সুকুমারী, মার অঞ্চলের ধন, মাতার ভালবাসায় বঞ্চিত বলিয়া পিতার নয়নমণি, পিতার কোলে অন্তিম শয্যায় ঢলিয়া পড়িল। লোকে বলিল, জ্বর বিকার। মিছা কথা—নীলমাধব বাবুর অদৃষ্ট।

লাবণ্যবালার কাজ ফুরাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে স্বামীর আলয়ে চলিয়া গেল। কয়েকমাস যাইতে না যাইতেই সংবাদ আসিল, তাহার আদরের, গৌরবের, বংশের তিলক বড়দাদা ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত! কিছুতেই কিছু হইল না। পিতাকে পাগলপ্রায় করিয়া, পিতৃভক্ত দেববালক জন্মের মত চলিয়া গেল!

ইহার পরবৎসর কন্যা লাবণ্যবালা, আজ পাঁচবৎসর হয়, যাহাকে সুচারু চেলি পরিধান করাইয়া, সর্ব্বস্বহারা দরিদ্র মাতা স্বীয় দেহ হইতে শেষ অলঙ্কার-টুকু খুলিয়া লইয়া নববধূবেশে সাজাইয়া ছিলেন, যাহার তিনটা পাশ করা সুন্দর বর দেখিয়া পাড়াশুদ্ধ লোক তাহার ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছিল, সে যখন সন্ধ্যাকালে ভূষণবিহীন হস্তে, শুভ্রবসন পরিধানে, "বাবা গো! বাবা গো!" বলিয়া পিতার কোলে আসিয়া ঝাপাইয়া পড়িল,—তখন—তখন—আমি কি বলিব!

অনেক সহিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। পলে পলে, তিল তিল করিয়া নীলমাধব বাবুর জীবন প্রদীপ নিবিতে লাগিল। শেষে অন্তিম সময় নিকটে দেখিয়া, আনন্দমোহনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'বাবা! তোমাকে ভিখারী করে গেলাম! ছোট ভাই ও বোনকে আদর করিও। নিজে না খেয়েও তাদের খাওয়াইও। আমার কিছু নাই বাবা! সৎপথে থেক, ভগবানে বিশ্বাস করো। লাবণ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখো, প্রয়োজন হলে তাকে দুটী অন্ন দিও।'

আরও কি যেন বলিতেছিলেন কিন্তু বলা হইল না। লুপ্তসিন্দূরবিন্দু-কপালা, শুভ্রবস্ত্র-পরিহিতা কন্যাকে তদ্দণ্ডে সম্মুখে দেখিয়া বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে জড়িত কণ্ঠে বিকৃত স্বরে বলিলেন, "ও কে—কে?"

আনন্দমোহন বলিল, "দিদি"।

'ভগবান,' বলিয়া তিনি মুখ ফিরাইলেন।

ইহার দণ্ড দুই পরে মৃত পিতার পদে মাথা রাখিয়া আলুলায়িতকুন্তলা পরম রূপবতী একটি যুবতী, 'বাবা! বাবা গো!' বলিয়া চীৎকার করিয়া বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছিল। কে সে? নীলমাধব বাবুর অদৃষ্ট!

*　　*　　*　　*

পিতার মৃত্যুর পর বালক আনন্দমোহন বড়ই বিপদে পতিত হইল। একবার

ভাবিল পড়া ছাড়িয়া দিবে কিন্তু অবশেষে আত্মীয়স্বজন ও বিশেষতঃ বিজয়ের ইচ্ছানুসারে কলেজেই পড়িতে লাগিল।

ছোট ভাই ধীরাজ ও দিদি লাবণ্যবালা এবং কনিষ্ঠা ভগ্নী অমলাকে নবগ্রামে বৃদ্ধা পিসিমার কাছে পাঠাইয়া দিল। সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ। অতিকষ্টে ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

পিতার আমলের অনেক বন্ধু বান্ধব, যাহারা প্রথম প্রথম বলিয়াছিলেন, "ভাবনা কি, আমরা আছি", তাহারা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইলেন। কেবল তাহাকে পরিত্যাগ করিল না, তাহার বাল্যবন্ধু বিজয়। তাহার বৃত্তির টাকার সাহায্যেই তাহার পড়ার খরচ চলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

যদিও তোমার অভয় চরণ
আমি না হেরিতে চাই,
যদি তুমি এসে কাছে দাঁড়ালেও
তবু না দেখিতে পাই!
তন্দ্রা-অলস আমার এ আঁখি,
মিছে মোহ-ঘোরে যদি মুদে রাখি
তুমি দয়া করে খুলে নয়ন আমার
তোমারে দেখিতে দিও গো!
ষড় রিপু সনে বিহরি সদাই
ভব-সাগরের তীরে,
কে জানে কখন ফেলে দেয় তারা
অগাধ অতল নীরে।
জানিনা সাঁতার অকূল-পাথারে
ডুবু ডুবু প্রাণ কাঁদিলে কাতরে,

তুমি চরণ-তরণী দানিয়া তখন
দয়া করে কূলে নিও গো !
বাসনার গতি তব পানে প্রভু
ফিরায়ো করুণা করে
তব প্রেম-সুধা ঢেলে দিও তুমি
মোর সারা প্রাণ ভরে !
ডাকিতে ভুলিলে ডাকিতে শিখায়ো
তোমারে ভুলিলে এসে দেখা দিয়ো
তুমি ধ্রুবতারা সম থেক হিয়া মাঝে
আমার পরাণ প্রিয় গো !

শ্রীশ্যামনলিনী দেবী।

বিক্রমপুরবাসীর চরিত-কথা

(১) ৺গিরিশচন্দ্র মজুমদার

গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালা ১২৪৪ সালের ২৪এ ভাদ্র, ইংরাজি ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, তাঁহার পৈত্রিক বাসভূমি ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বীরতারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বীরতারার মজুমদারগণ বংশমর্য্যাদায় ও প্রতিপত্তিতে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে সুপরিচিত।

গিরিশচন্দ্রের খুল্লপিতামহ রামহরি মজুমদার কার্য্যব্যপদেশে বরিশালে আইসেন, তিনি দশশালা বন্দোবস্তের প্রধান কর্ম্মচারী টম্‌সন্ সাহেবের খাজাঞ্চীর কার্য্য করিতেন; মুন্‌সেফী পদের সৃষ্টি হইলে তিনি উক্ত পদে উন্নীত হইয়া স্থানান্তরে গমন করেন। গিরিশচন্দ্রের পিতৃব্য রামরাজা মজুমদার বরিশালে দায়রার আদালতে উকিলের কার্য্য করিতেন এবং কালীকৃষ্ণ ও গোপীকৃষ্ণ মজুমদার বরিশাল জিলার তৎকালীন অধিকাংশ জমিদারের এষ্টেটের আমমোক্তারের কার্য্য করিতেন। গোপীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর ভ্রাতার কার্য্যভার গিরিশচন্দ্রের পিতা

হৃদয়কৃষ্ণ মজুমদারের উপর পতিত হয়। হৃদয়কৃষ্ণ স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্য-কুশলতার বলে কিয়ৎকাল মধ্যে সরকার পক্ষের সরবরাকার (Manager, Court of Wards) মনোনীত হন এবং বহুকাল প্রশংসার সহিত এই কার্য্য করেন। হৃদয়কৃষ্ণ অতি বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন এবং দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন, ৯১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গিরিশচন্দ্রের মাতা দয়াময়ী ঠাকুরাণী বাখরগঞ্জ জিলার গাভা গ্রামের রতন-কৃষ্ণ ঘোষ দস্তিদারের কন্যা। গাভার ঘোষ বংশ বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থানীয়। হৃদয়কৃষ্ণের পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা, গিরিশচন্দ্র পিতার তৃতীয় পুত্র। হৃদয়কৃষ্ণের সন্তানগণমধ্যে গিরিশচন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও সুশ্রী ছিলেন। মাতা দয়াময়ী পরম স্নেহময়ী জননী ছিলেন। পুত্রগণও মাতাকে রমণীকুলরত্ন বলিয়া আজীবন ভক্তি অর্পণ করিতেন।

গিরিশচন্দ্র বাল্যকালেই ভাবী উজ্জ্বল জীবনের আভাস দিয়াছিলেন। পিতামাতা আত্মীয় স্বজন বালক গিরিশচন্দ্রের উপর অতি উচ্চ আশা স্থাপন করিয়াছিলেন। মাতার অতি স্নেহের, আশার ও গৌরবের স্থল গিরিশচন্দ্র শৈশবে অতি যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পিতামাতার অত্যধিক যত্ন ও আদরের ফলে অনেক বালকের ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু পিতা-মাতার এই অতিশয় আদর ও যত্ন গিরিশচন্দ্রকে নষ্ট করিতে পারে নাই। হৃদয়-কৃষ্ণের পুত্র স্বভাবতঃই হৃদয়বান্, পরোপকারী, সমদর্শী, পিতৃমাতৃভক্ত, ভ্রাতৃ-বৎসল, গুরুজনে শ্রদ্ধাবান্ ও বিদ্যানুরাগী হইয়া উঠিলেন। শৈশব হইতেই গিরিশচন্দ্র বিনয়নম্র ও মিষ্টভাষী ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই গিরিশচন্দ্রের পড়াশুনায় বিশেষ অনুরাগ দেখা গিয়াছিল, তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল; চিত্র, রন্ধন ও সেলাই কার্য্যেও তাঁহার যথেষ্ট নিপুণতা জন্মিয়াছিল। গ্রাম্য পাঠশালায় ও টোলে তাঁহার প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়। পরে ইংরাজী শিক্ষালাভের জন্য বরিশালে পিতার নিকট গমন করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যার্থীরূপে গিরিশচন্দ্র অসামান্য নৈতিক বলের পরিচয় দিয়া-ছেন। দেশে তখন ঘোরতর দুর্নীতির স্রোত প্রবাহিত ছিল। গিরিশচন্দ্রের সহাধ্যায়িগণের মধ্যেও অনেকে দুর্নীতিপরায়ণ ছিল। বহু স্খলিতচরিত্র যুবক বন্ধু তাঁহাকে বিপথগামী করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু প্রভূত শারীরিক,

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র মজুমদার

মানসিক, ও নৈতিক শক্তিশালী গিরিশচন্দ্র অটল অচল ভাবে সমস্ত প্রলোভন ও প্রতিকূল ঘটনায় জয়লাভ করিয়াছেন। তিনি পাপকে ঘৃণা করিতেন, পাপীকে ঘৃণা করিতেন না। উচ্ছৃঙ্খল যুবক বন্ধুগণের সহিতও তিনি অবাধে মিলিত হইতেন। এইরূপে বহু মদ্যপায়ী চরিত্রহীন যুবক তাঁহার পবিত্র চরিত্র প্রভাবে নবজীবন লাভ করিয়াছে, পরশমণির পরশে সোণা হইয়াছে।

কিছুকাল বরিশালে থাকিয়া পড়িবার পর জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা জয়চন্দ্র মজুমদার আগ্রহ সহকারে গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার কার্য্যস্থল নোয়াখালিতে শিক্ষা-দানার্থে লইয়া যান। অল্প কিছুদিন নোয়াখালিতে থাকিয়া পরে গিরিশচন্দ্র ঢাকা যাইয়া পোগোজ স্কুলে ভর্ত্তি হন। পোগোজ স্কুল হইতে ১৮৬০ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গিরিশচন্দ্র মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি ও একটী মেডেল প্রাপ্ত হন। ১৮৬১ সনে গিরিশচন্দ্র ঢাকা কলেজে প্রবিষ্ট হন।

গিরিশচন্দ্র যখন ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা লইয়া নগরে নগরে উপস্থিত হইতেছিল, গিরিশচন্দ্রের নির্ম্মল মানস-ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী দ্বারাই সত্যধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র যখন সব পরিত্যাগ করিয়া 'সেই একের' শরণ লইতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার সংসারে অনাসক্তির ভাব টের পাইলেন এবং তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথমতঃ তিনি কোন মতেই বিবাহ করিতে সম্মত হন না, অবশেষে মাতার আকুল ক্রন্দনে এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিতান্ত আগ্রহে তিনি প্রকাশ করেন যে, যদি ধর্ম্মভাবাপন্না শিক্ষিতা গৌরবর্ণা কোন পাত্রী পাওয়া যায় তবে তিনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর ঢাকা জিলাস্থ বহর গ্রামের কৃষ্ণমঙ্গল রায়ের কন্যা শ্রীমতী মনোরমা দেবীকেই তাঁহার উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া হরিশ বাবু স্থির করেন। গিরিশচন্দ্রের সহাধ্যায়ী বন্ধু বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ (পরে সাহিত্যসম্রাট্ বান্ধব সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি, আই, ই) পাত্রী দর্শনার্থ প্রেরিত হন, তাঁহার অনুমোদনের পর শ্রীমতী মনোরমা দেবীর সহিত গিরিশচন্দ্র বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন।

এই সময় গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে প্রবল ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। গিরিশ বাবু ঘনিষ্ট ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন এবং অদম্য উৎসাহের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন হইতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই তাঁহার প্রাণ হইল। সাংসারিক তথাকথিত উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের নবোন্নতির যুগে তিনি সঙ্গীতনায়ক, শাস্ত্রব্যাখ্যাকর্ত্তা, আচার্য্য, উপদেষ্টা হইলেন। যখন কেশবচন্দ্রের উপদেশ, আরাধনা ও প্রার্থনার শক্তি কলিকাতা রাজধানীকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, তখন গিরিশচন্দ্রের ভাষা-সম্পদ-পরিপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী বাগ্মীতা উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে নবীন ভাবের অবতারণা করিল। তাঁহার কলঙ্কহীন দেবপ্রকৃতি পারিবারিক ও সামাজিক সর্ব্ব কার্য্যে এক অপূর্ব্ব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিল। ১৮৬৫ সনের ২৩ শে আগষ্ট (৮ই ভাদ্র) তাঁহাকে স্থায়ীভাবে উপাচার্য্যের পদে বরণ করা হয়। এই সময় স্বনামখ্যাত বাবু দুর্গামোহন দাস, বাবু সর্ব্বানন্দ দাস, ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি, বাবু রাখালচন্দ্র রায়, বাবু চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী প্রভৃতি প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগদান করেন। বরিশাল-সমাজের পক্ষে দুর্গা-মোহন বাবু, গিরিশবাবু ও সর্ব্বানন্দবাবু এই তিন ব্যক্তির সম্মিলনকে ত্রিবেণী-সঙ্গম বলা যাইতে পারে।

গিরিশচন্দ্র প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্ম হইবার পরও এক বৎসর পর্য্যন্ত মনোরমা দেবী বীরতারা ছিলেন। গিরিশচন্দ্র স্ত্রী সম্বন্ধে তাঁহার কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময় বীরতারা হইতে মনোরমা দেবী স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, চিরজীবনসঙ্গিনী হইবার একান্ত ইচ্ছা স্বামীকে জ্ঞাপন করিলেন। যখন মনোরমা দেবী স্বামীর দুঃখ দারিদ্র্যের ভাগিনী হইতে প্রস্তুত হইলেন তখন তাঁহাকে স্বীয় সকাশে আনয়ন করা স্থির হইল। যে দিন তিনি স্ত্রী ও অনুজ প্রসন্নচন্দ্রসহ বীরতারা হইতে বহির্গত হন সেদিনকার শোকাবহ দৃশ্য বর্ণনাতীত। শত শত লোক নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে গিরিশচন্দ্রের সংসার, সমাজ ও দেশত্যাগ ব্যাপার দেখিতে সমবেত হইল। সকলেরই হৃদয়ে বেদনা, মুখ মলিন, চোখে জল। মাতা কাঁদিয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিলেন, পিতা কাতর ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, চারিদিকে ক্রন্দনের হা হতোস্মির রোল উঠিল। মাতা প্রিয় পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,

"গিরি, তুই আমাকে কোন দিন কোন বাক্য কি ব্যবহার দ্বারা কষ্ট দিস্ নাই, আজ কেন আমার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিতেছিস্?" মাতৃভক্ত গিরিশচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু যিনি মাতার মাতা, প্রিয় হইতে প্রিয়তম তিনি, আহ্বান করিতেছেন, কে রহিবে ঘরে? মাতার বক্ষ হইতে গিরিশচন্দ্র নিজকে ছিন্ন করিয়া কিছু দূর দৌড়াইয়া অগ্রসর হইলেন। পিতার পদধূলি মস্তকে লইতে যাইয়া বলিলেন, "পিতঃ! এই দেহ আপনা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনি আদেশ করিলে এই দেহের রক্ত দ্বারা আপনার চরণ ধৌত করিয়া দিতে পারি, কিন্তু আমি বিবেক-নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।" পিতাও উদারভাবে উত্তর করিলেন, "আমার এই ৭০ বৎসরের বদ্ধমূল সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া তোমার ধর্ম্মের অনুসরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু আমি বুঝিতেছি তুমি যে পথ ধরিয়াছ তাহাও খাঁটী পথ। আশীর্ব্বাদ করি তুমি এই পথে অগ্রসর হইয়া সিদ্ধিলাভ কর।" শোকার্ত্তহৃদয়ে পিতা যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন তাহা সফল হইয়াছে সন্দেহ নাই।

গিরিশচন্দ্র সস্ত্রীক সানুজ দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিলেন। এই সময়কার লোকগঞ্জনা, সমাজের অত্যাচার, উৎপীড়ন, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ সব অগ্রাহ্য করিয়া গিরিশচন্দ্র কিরূপ শান্ত অবিচলিত ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা অবাক হইয়াছেন। মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু বলিতেন "যাঁহার পেটে ক্ষুধার জ্বালা কিন্তু মুখে হাসি, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্ম।" গিরিশচন্দ্র এইরূপ খাঁটী ব্রাহ্ম ছিলেন। ধর্ম্মাচরণে, নরসেবায় যিনি প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন তাঁহার চাকুরী করিবার অবসর কোথায়? গিরিশচন্দ্রের পারিবারিক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য একটী প্রচারভাণ্ডার স্থাপন করা হইল, বাবু দুর্গামোহন দাস ও বাবু রাখালচন্দ্র রায় মাসিক ১০।১৫৲ টাকা দান করিতে লাগিলেন। মনোরমা দেবী গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্ম ও কর্ম্মময় জীবনের প্রকৃত সহায় হইলেন। গিরিশচন্দ্রের আয় অতি সামান্য হইলেও তাঁহার গৃহ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হইল। কত বিধবা, কত দরিদ্র, কত ধর্ম্মপিপাসু গৃহবহিষ্কৃত সমাজচ্যুত যুবক তাঁহার গৃহে স্থান পাইয়াছে, স্বামী স্ত্রী উভয়ই প্রসন্ন মনে তাহাদের সেবা করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র বাহিরের কাজ করিতেন, বাজার করিয়া আনিতেন, মনোরমা স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। গিরিশচন্দ্রের

পক্ষে তখনকার দিনে বাজার হইতে দ্রব্যজাত স্বহস্তে বহন করিয়া আনা যে কতদূর আভিজাত্যাভিমানশূন্যতার পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়, কারণ তাঁহার পিতা হৃদয়কৃষ্ণ তখন বরিশালে যথেষ্ট প্রতাপপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের আর্থিক অভাব দেখিয়া যদি কোন বন্ধু তাঁহার গৃহ হইতে স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা ভাবগতিকে প্রকাশ করিতেন, তিনি তাঁহাকে বাধা দিয়া সহাস্যবদনে বলিতেন, "দেখ ভাই, যত দিন কিছু আছে একসঙ্গে খাইব, আবার যখন না থাকিবে একসঙ্গে উপবাস করিব, ভয় কি ?" গৃহে সমতা রক্ষার দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল ; বাজার হইতে মৎস্য আনিয়াছেন, কোন কোন মৎস্য অপেক্ষাকৃত বড়, কাহার পাতে বড় মাছটী পড়িবে, কাহাকে ছোটটী দিবেন, মনোরমা দেবী ইতস্ততঃ করিতেছেন, গিরিশচন্দ্র ব্যবস্থা করিলেন—"দুই তিন জনকে একত্র এক থালায় বসাইয়া বড় ছোট মাছ একসঙ্গে দিয়া দেও।" একবার সারদা (গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্ম হইলে পর মাতা বীরতারা হইতে এই পরিচারিকাকে তাঁহার গৃহকার্য্যের সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত বলিয়া সারদাকে তিনি চিরদিন অতিশয় স্নেহ যত্ন করিয়াছেন।) বাবুকে খাওয়াইবার জন্য কিছু ঘি কিনিয়া রাখিল, গিরিশ বাবু আহারে বসিলে সারদা ঘি নিয়া উপস্থিত। গিরিশ বাবু অপর সকলকে ফেলিয়া একাকী ঘি খাওয়া অন্যায় বিবেচনা করিয়া উহাতে আপত্তি করিলেন, সারদা শুনিল না, বাবুর থালায় ঘি ঢালিয়া দিল। গিরিশচন্দ্র নিতান্ত বিরক্তির সহিত সে দিন আহার করিলেন। দ্বিতীয় দিবস আবার সারদাকে ঐরূপ করিতে উদ্যত দেখিয়া গিরিশ বাবু না খাইয়া বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অবশেষে সারদা অনেক হাত পা ধরিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া নিয়া আসে। বৃদ্ধ বয়সে যখন অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন তখন দেখা গিয়াছে চাকর চাকরাণীর প্রতি যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে তিনি দুঃখিত হইতেন এবং বলিতেন, "আমি সুকোমল শয্যায় শয়ন করিব আর ইহাদের উপযুক্ত বিছানা দেওয়া হইবে না, আমি দুধ খাইব ইহারা পাইবে না, ইহা চিন্তা করিলে আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না।"

প্রেমময়ের প্রেমিক পুত্র গিরিশচন্দ্রের সর্ব্ব জীবে সমদয়া ছিল। অপরের

দুঃখ দেখিলে তাঁহার করুণ হৃদয় বিগলিত হইত। রোগীর শিয়রে, মৃত্যুর শয্যায়, দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অক্লান্তকর্ম্মা গিরিশচন্দ্র জাগিয়া, দয়াল নাম গাহিয়া সেবা করিতেন। যেখানে রোগ সেইখানেই গিরিশচন্দ্র উপস্থিত ; কলেরা, বসন্ত, ডিপ্‌থেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগ আরম্ভ হইয়াছে, আত্মীয় স্বজন রোগীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বিপন্নের বন্ধু গিরিশচন্দ্র সেথানে মাতার ন্যায় রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন ! সেবাব্রত সাধনে তিনি অতুলানন্দ লাভ করিতেন। বরিশালে একবার ভীষণ কলেরা সংক্রামক ভাবে আরম্ভ হয়, কোন হিন্দু ভদ্র লোকের বাটীতে তাহার ভৃত্যের ঐ দারুণ রোগে মৃত্যু হয়। কলেরার নামে তখন এমন বিভীষিকা উপস্থিত হইত যে ব্যারামের কথা শুনিলে কেহ কাহারও বাড়ী যাইত না, শ্মশানে যাওয়া দূরের কথা। গিরিশ বাবু রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, শুনিলেন এক মৃত ব্যক্তি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাকে দাহ করিবার কেহ নাই। গিরিশচন্দ্র আর কোথায় যান ? বাড়ীর কর্ত্তাকে বলিলেন, "আমি অন্যধর্ম্মাবলম্বী, শব ছুঁইলে তো কোন দোষ হইবে না ?" গৃহস্বামী উত্তর করিলেন, "দোষ গুণ বিচার এখন থাক, শব বাড়ী হইতে বাহির হইলেই বাঁচি।" গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ একাকী শব স্কন্ধে বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইয়া দাহ কার্য্য সমাপন করিলেন। এই প্রকারে কত রোগীর সেবা, কত মুমূর্ষুর গতি, কত মৃতের শবদাহ তিনি একাকী করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

ধর্ম্মগতপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ধনোপার্জ্জনে স্পৃহাশূন্য ছিলেন। প্রচুর অর্থাগমের প্রশস্ত পন্থা তাঁহার নিকট উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু তিনি অর্থাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে যে দুর্লভ শক্তি ও সাহসিকতার আবশ্যক তাহা তাঁহার ভিতরে যথেষ্টরূপে বর্ত্তমান ছিল। গিরিশচন্দ্রের পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রচার ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল এবং তিনি মাসিক ২০৲ টাকা প্রাপ্ত হইবেন স্থির ছিল, কিন্তু ভাণ্ডারের অবস্থা সচ্ছল না থাকায় ঐ সাহায্য তিনি কখনও নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হন নাই। এদিকে পরিবারের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, অনুজ প্রসন্নচন্দ্রের শিক্ষার ভার তাঁহার উপর পতিত হইয়াছে, প্রসন্নচন্দ্র কলিকাতা মেডিকেল স্কুলে পড়িতেছেন, তাঁহাকে মাসিক ৭৲ টাকা পাঠাইতে হয়। গিরিশচন্দ্র দারিদ্র্যের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিতেছেন দর্শনে

পরহিতব্রত বন্ধু দুর্গামোহন দাস তাঁহাকে বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ওভারসিয়ারের কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহাকে এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তৎকালে মিঃ বিভারিজ বাখরগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তা ছিলেন। একদিন মুসলমানদিগের একটী উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে তাঁহার কোন কার্য্যে অবিশ্বাস করিয়া সাহেব তাঁহাকে প্রকারান্তরে মিথ্যাবাদী বলেন। পুরুষসিংহ গিরিশচন্দ্র অমনি গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "যে মুনিব অবিশ্বাস করে, তাহার অধীনে চাকুরী করা আমার পক্ষে অসম্ভব।" তিনি তৎক্ষণাৎ কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন এবং ঘরে ফিরিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "মনোরমা, আমি এক কাজ করিয়া আসিয়াছি, সাহেব আমাকে অবিশ্বাস করায় আমি চাকুরী পরিত্যাগ করিয়াছি, আমি জানি ইহাতে তোমারই অধিক কষ্ট হইবে, কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষা আমি করিতে পারি নাই।" পরে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান তাঁহার ঐ কার্য্য পুনঃ গ্রহণের পথে দাঁড়াইয়াছিল। এই ঘটনার তিন বৎসর পরে মিঃ বিভারিজ তাঁহার নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। গিরিশচন্দ্রের আজীবন বন্ধু দুর্গামোহন পুনরায় তাঁহার জন্য এক চাকুরী ঠিক করিলেন, বরিশাল বঙ্গবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক কার্য্যে অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় তৎস্থলে গিরিশচন্দ্রকে নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র যখন শুনিলেন যে একজনকে অপসৃত করিয়া তাঁহার জন্য স্থান করা হইতেছে, তিনি এইরূপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। কাহারও অনিষ্ট করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধি করা স্বার্থশূন্য, ন্যায়পরায়ণ গিরিশচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবশেষে বরিশাল জিলা স্কুলের তৎকালীন হেডমাষ্টার বাবু জগদ্বন্ধু লাহা মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে গিরিশচন্দ্র প্রৌঢ়াবস্থায় (৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে) বরিশাল জিলা স্কুলে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই পদ গ্রহণ করিয়াই তিনি সমাজের বৃত্তি পরিত্যাগ করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র যে একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহাকে কিরূপ ভক্তির চক্ষে দর্শন করিত মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত গত ১৬ই অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদী

পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি একাধারে ছাত্রদিগের শিক্ষক, গুরু ও বন্ধু ছিলেন। ছাত্রদিগের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ স্কুলগৃহের ভিতর আবদ্ধ ছিল না। তিনি অনেক ছাত্রকে স্বগৃহে লইয়া যাইতেন, নানা প্রকারে তাহাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার পত্নীও তাহাদিগকে মাতার ন্যায় যত্ন করিতেন। কেহ কেহ মনোরমা দেবীর নিকট নিয়মিতরূপে পাঠাভ্যাস করিত, কত আব্দার করিত এবং সময় সময় কত বালকোচিত উপদ্রব করিত; গিরিশচন্দ্র নিজ ছাত্রদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

যে সকল জনহিতকর কার্য্যে গিরিশচন্দ্র দেহের রক্ত জল করিয়াছেন স্ত্রী-শিক্ষা তাহার অন্যতম। স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা প্রভৃতি নারীজাতির অধিকার বিষয়ে তাঁহার কেবলমাত্র মতের উদারতা ছিল না, তাহাদিগকে সকল উচ্চাধিকার দিবার জন্য হৃদয়ে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার দুর্দ্দমনীয় সাহস তাঁহার ছিল। তাঁহার স্ত্রী মনোরমা দেবী প্রথমতঃ সুশিক্ষিতা ছিলেন না, নানা সাধু কার্য্যে ব্যস্ততা এবং দারিদ্র্যজনিত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁহাকে রীতিমত শিক্ষা দান করিবার অবসর তিনি করিয়া লইয়াছিলেন। মনোরমা দেবী দৈনিক পড়া প্রস্তুত করিতে না পারিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন এবং যে কোন প্রকারেই হউক সময় করিয়া দৈনিক পাঠ অভ্যাস করাইয়া লইতেন। মনোরমা দেবী পাঠে কোনরূপ অমনোযোগ প্রদর্শন করিলে তিনি অতি অদ্ভুত শাস্তি বিধান করিতেন—স্বয়ং আহার না করিয়া মনোরমা দেবীকে আহার করিতে বাধ্য করিতেন। মনোরমা দেবী স্বহস্তপ্রস্তুত খাদ্য স্বামীকে ফেলিয়া খাইতে বাধ্য হইয়া যে মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেন তাহাই ছিল তাঁহার যথেষ্ট শাস্তি। গিরিশ-চন্দ্রের এইরূপ একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের ফলেই মনোরমা দেবী, ঢাকা "ইডেন ফিমেল স্কুলের" যশস্বিনী শিক্ষয়িত্রী মনোরমা দেবী, প্রখ্যাতনামা প্রচারিকা মনোরমা দেবী, জগতের ইতিহাসে স্ত্রীজাতির মধ্যে ধর্ম্মসমাজের বেদীর প্রথম অধিকারিণী মনোরমা দেবী, গড়িয়া উঠিয়াছিলেন।

গিরিশ বাবু, দুর্গামোহন বাবু, সর্ব্বানন্দ বাবু প্রভৃতি উৎসাহী ব্রাহ্মগণের প্রযত্নে ১৮৬৭ সালে বিবাহিতা মহিলাদিগের শিক্ষার জন্য একটী স্কুল স্থাপিত হয়। তৎকালীন জজ সাহেবের পত্নী মিসেস্ বেলফুর সাগ্রহে ইংরাজি ও সেলাই শিক্ষার

সহায়তা করিতেন। ১৮৭১ সালে ইঁহাদের উৎসাহে স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধায়িনী সভা (Female Improvement Association) স্থাপিত হয়। এই সভা বহুদিন পর্য্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণ, পুরস্কার বিতরণ, ইত্যাদি নানা প্রকারে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করিয়াছেন। ১৮৭৭ সালে ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব সময়ে গিরিশচন্দ্র অদম্য উৎসাহ ও প্রগাঢ় অধ্যবসায় সহকারে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছিলেন। বন্ধুদিগের গৃহে গৃহে যাইয়া, মহিলাগণকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া, অলস আলাপ হইতে নিবৃত্তি করিয়া, লেখা, পড়া, সেলাই, রন্ধন ও সঙ্গীত শিক্ষা ইত্যাদি কার্য্যে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। প্রতিদিন নিয়মিত-রূপে স্বর্গীয় রাখাল বাবু, দুর্গামোহন বাবু, সর্ব্বানন্দবাবু, জগৎ বাবু, হরকান্ত বাবু প্রভৃতির বাড়ীর মহিলাদিগকে ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পত্নী ও শাশুড়ী মহাশয়াদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। গিরিশচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না বলিয়া তাঁহার অবস্থাপন্ন বন্ধুগণ তাঁহাকে মহিলাগণের শিক্ষাদানের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তিনি স্ত্রী-শিক্ষা দিয়া অর্থগ্রহণ করিবেন না। স্ত্রী-শিক্ষা কার্য্যে গিরিশচন্দ্র কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। স্বীয় কন্যাগণকে কলেজের উচ্চ শিক্ষা দিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই, কিন্তু তাঁহার অবস্থানুসারে তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে তাঁহার সযত্নরোপিত স্ত্রী-শিক্ষালতা যে সুফল প্রসব করিয়াছে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া সার্থকশ্রম হইয়া গিয়াছেন। স্বীয় দৌহিত্রীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতেছেন দেখিয়া তিনি কত আনন্দ লাভ করিয়া গিয়াছেন।

লোক সাধারণতঃ রক্ষণশীল হয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র যে নিগড় একবার ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা আর কদাচ পায়ে তুলিয়া লন নাই। জীবনের প্রারম্ভে যাহা কুসংস্কার কদাচার বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যেও তাহা সেই চক্ষে দেখিতেন। একদিন যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, জীবনে কখনও তাহা আর গ্রহণ করেন নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের সমাজ সংস্কারের দিনে গিরিশচন্দ্র প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলেন—বিবাহে যৌতুক প্রদান কিম্বা গ্রহণ করিবেন না, স্ত্রী কি কন্যাকে অযথা বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত করিবেন না। তিনি আজীবন এই প্রতিজ্ঞা

রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম দুই কন্যার বিবাহের সময় কলিকাতার বহু লোক যৌতুক লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন, "আমার কন্যাদ্বয়কে আজ যে যাহা উপহার দিবেন সমস্ত ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পত্তি হইবে।" এই কথা শুনিয়া অনেকে যৌতুক প্রদানে বিরত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন ঋষির ন্যায় গিরিশচন্দ্র কর্ম্মকে পূজা জ্ঞান করিতেন। নিষ্কাম-সাধক সংসারে অনসাক্ত থাকিয়া কর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ম্মযোগী গিরিশচন্দ্র গৃহের সর্ব্ব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্ব লইতেন। কাহার কোন্ অভাব, কাহার কি দুঃখ সব মোচন করিবার জন্যই তাঁহার বিশাল হৃদয় ব্যাকুল হইত। তাঁহার দ্বারা পরিবারের কাহারও কোন ক্লেশ না হয় এ বিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। প্রাতে ৮ টার সময় "ইডেন ফিমেল স্কুলের" গাড়ী আসিবে, প্রত্যূষে উঠিয়া বাজার করিয়া আনিয়া, স্নান আহার করিয়া মনোরমা দেবীকে অবসর করিয়া দিয়াছেন। গাড়ী আসিলে তাঁহার দ্বারে গাড়োয়ানকে যেন এক মিনিটও অপেক্ষা করিতে না হয় ইহা তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কোন দিন ঘটনাক্রমে ৫।৭ মিনিট দেরি হইলে স্কুলের গাড়ী বিদায় করিয়া দিয়াছেন এবং ভিন্ন গাড়ী ভাড়া করিয়া নিজে স্ত্রী কন্যাকে স্কুলে দিয়া আসিয়াছেন।

দেনা,পাওনা সম্বন্ধে এমন পরিষ্কার আচরণ অতি বিরল। কাহারও এক পয়সা পাওনা থাকিলে তাহাকে না দেওয়া পর্য্যন্ত সুস্থির হইতে পারিতেন না। ঢাকায় এক গোয়ালা হইতে কিছুদিন দুধ লইয়াছিলেন, বাড়ী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে গোয়ালাকেও ছাড়িতে হইয়াছিল। একদিন স্ত্রীর নিকট শুনিলেন গোয়ালার কিছু পাওনা থাকা সম্ভব, অমনি ছুটিয়া গোয়ালার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"আমার নিকট তোমার কত পাওনা আছে?" গোয়ালার কিছুই স্মরণ নাই, তিনি তাহাকে ডাকিয়া বাড়ী লইয়া আসিলেন, এবং হাতে দশটী টাকা দিয়া বলিলেন, "আমি তোমার প্রাপ্য স্বরূপ তোমাকে এই ১০টী টাকা দিলাম, যদি ইহা অপেক্ষা আমার নিকট তোমার বেশী প্রাপ্য থাকে তবে তুমি আমাকে তাহার জন্য ক্ষমা কর। আর যদি আমি তোমাকে বেশী দিয়া থাকি তজ্জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।" গোয়ালা অবাক, অগত্যা প্রণাম করিয়া ঐ টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবে গিরিশচন্দ্রের কি জীবন্ত বিশ্বাস ছিল! পুত্র দীনরঞ্জন কলেরা রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া গভীর শোকে, অটল বিশ্বাসের সহিত পুত্রকে পরম পিতার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আকুল প্রার্থনা গগন ভেদ করিয়া মঙ্গলময়ের চরণোদ্দেশে উত্থিত হইল। মনোরমা দেবী অধীরা হইয়া নিকটে পড়িয়া কান্দিতেছেন দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "মনোরমা, আজ এই পুত্র বিয়োগে আমার যতদূর কষ্ট হইতেছে, তাহা অপেক্ষা তোমার অবিশ্বাসজনিত অশ্রুপাত দর্শনে আমি অধিকতর কষ্ট অনুভব করিতেছি।" অমনি গভীর শোকে স্বর্গের সান্ত্বনা অনুভূত হইল, মনোরমা শান্ত হইলেন।

হঠাৎ গত ১৩১৯ সনের মাঘ মাসের শেষভাগে তাঁহার Angina রোগের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। জামাতা নীলরতন বাবু, বঙ্কুবাবু ও অন্যান্য আত্মীয় ডাক্তারগণ তাঁহার জন্য আশঙ্কান্বিত হন। কিন্তু কিছুদিন সুচিকিৎসার পর তিনি পুনরায় সুস্থতা লাভ করেন। গত কার্ত্তিক মাসে আবার ঐ দুষ্ট ব্যাধি অকস্মাৎ আক্রমণ করে। ডাক্তারগণ সর্ব্ব কর্ম্ম হইতে অবসর, সম্পূর্ণ বিশ্রাম ব্যবস্থা করায় তিনি তদবধি সর্ব্বদা গৃহাভ্যন্তরে থাকিতেন। মৃত্যুর দিন সন্ধ্যার সময় একবার বুকে জ্বালা উপস্থিত হইয়া শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ১০।১২ মিনিট পরেই আবার রোগের উপশম হয়। রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্যান্ত বসিয়া তিনি নানাবিষয়ে স্বাভাবিক ভাবে আলাপ করিতেছিলেন। একবার বলিয়াছিলেন "এই বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবশিষ্ট কার্য্য মৃত্যু, এইরূপ এক একটা হিল্লা অবলম্বন করিয়া হঠাৎ একদিন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন একমাত্র পরপারের কথা ভিন্ন অন্য কিছু আমার চিন্তায় আসে না।" তখন কে জানিত তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইবার শেষ মুহূর্ত্ত সমাগত প্রায়? ১২॥ ঘটিকার সময় কণ্ঠ যখন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল তখন পার্শ্বস্থিতা কম্পমানা পত্নীকে বলিলেন "ভয় নাই, সংসার এইরূপই" নিকটে উপবিষ্ট পুত্রের প্রতি বাহুপ্রসারণ করিয়া অকম্পিত স্বরে বলিলেন "প্রেম রে, এই বুঝি আমার শেষ?" যাঁহার বাগ্মীতায় কত শত লোকের হৃদয় বিগলিত হইত সেই বাগ্মীপ্রবরের মর্ত্ত্যলোকে ঐ শেষ কথা।

তিনি মুক্ত পুরুষ ছিলেন, বীরের ন্যায় যেমন অক্লেশে জীবন বহন করিয়াছেন, তেমনই সহজে পরপারে চলিয়া গেলেন। ঊর্দ্ধ হইতে আহ্বান আসিল আর

বীর পুরুষ পশ্চাৎ পানে না তাকাইয়া ছুটিয়া গেলেন। ধন্য গিরিশচন্দ্র, তুমি জীবনেও ধন্য, মরণেও ধন্য !

শ্রীভবরঞ্জন মজুমদার।

(২) স্বর্গীয় ভুবনমোহন দাস

জন্ম—১৮৪৪ খ্রীঃ তেলিরবাগ।

মৃত্যু—৮ই আষাঢ় সোমবার ১৩২১

পূর্ব্বাহ্ণ ৫½ ঘটিকা, ২২শে জুন ১৯১৪।

বিক্রমপুর পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব—বঙ্গের উজ্জ্বল মুকুট-মণি। বিক্রমপুরে কত মহাপুরুষ যে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেশকে পবিত্র ও ধন্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমান যুগে যে সমুদয় মহাপুরুষ ভারতবর্ষের গৌরব বলিয়া, বাঙ্গালার কৃতী পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশেরই জন্মস্থান বিক্রম-পুর। স্বনামধন্য সমাজ-সংস্কারক রাসবিহারী, দ্বারকানাথ, মনোমোহন, লাল-মোহন, গুডিভ্ চক্রবর্ত্তী, গুরুপ্রসাদ সেন, রজনীনাথ রায়, অভয়াচরণ দাস, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র, সরোজিনী নাইডু, চন্দ্রমাধব, ডাঃ অঘোরনাথ প্রভৃতি সকলেরই জন্মভূমি বিক্রমপুর। প্রকৃতপক্ষে 'আধুনিক যুগের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির মূলে বিক্রমপুরের ইতিহাস জড়িত।'

'সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণি ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্মপাবলিক ওপিনিয়নের সুযোগ্য সম্পাদক, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথিতনামা কর্ম্মী, সহৃদয়, সৌম্যমূর্ত্তি ভুবনমোহন দাস ৭০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত ব্যবহারাজীব পুণ্যবান্ স্বর্গীয় কাশীশ্বর দাস মহাশয় ইঁহার জনক। কাশীশ্বর বাবুর খুড়তুত ভাই স্বর্গীয় জগবন্ধু দাস মহাশয় ইঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।' ভুবন বাবু বিক্রমপুরস্থ তেলিরবাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভুবন বাবুর দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বনামধন্য স্বর্গীয় কালীমোহন দাস ও পুরুষ-সিংহ স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস। ভুবন বাবু মৃত্যুকালে দুই কৃতী পুত্র, চারি কন্যা ও বহু পৌত্র পৌত্রী,

দৌহিত্র দৌহিত্রী ও প্রদ্রৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বাঙ্গালার সুসন্তান বাঙ্গালীর গৌরব-মণি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস।

ভুবন বাবু ঢাকাকলেজে শিক্ষালাভ করিয়া প্রথমে এটর্ণি ও পরে উকিল হ'ন। আইন ব্যবসায় দ্বারা ইঁহারা বংশ পরম্পরানুক্রমে যশস্বী ও অর্থশালী হইয়া দেশের ও দশের প্রভূত উপকার করিয়া আসিতেছেন। এক সময়ে বাঙ্গালা দেশে সমাজ সংস্কারের যে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল তন্মধ্যে বহু খ্যাতনামা বিক্রমপুর-বাসীর স্মৃতি বিজড়িত। সেই সংস্কারকের দলে ভুবনমোহনের নামও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতায় যেমন অধিকাংশ স্থলেই ঠাকুর পরিবার আদর্শ পরিবার বলিয়া বিবেচিত হয়, বিক্রমপুরেও তেমনি তেলিরবাগের দাস পরিবার আদর্শ পরিবার বলিয়া বিবেচিত। ভুবন বাবু এই দাস পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের বহু সৎকার্য্যে যোগদান করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের সম্পাদক রূপে তিনি বিবিধ প্রকার সংস্কার ও উন্নতির জন্য নিয়ত লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। ভারতসভা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য থাকিয়া বহু কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা করপোরেসেনের সভ্য থাকিয়া স্বায়ত্ত শাসনের প্রচার কল্পেও অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। A few thoughts on the Brahmo Samaj—An open letter to the president of the Sadharan Brahmo Samaj নামক সুচিন্তিত ও সুলিখিত গ্রন্থ খানা তাঁহার অসাধারণ স্বাধীনচিত্ততার এবং সৎসাহসের পরিচায়ক।

ভুবন বাবু স্থির, ধীর, সহিষ্ণু ও ভালবাসার একখানি জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ছিলেন। সংসারের ঝড় ঝঞ্ঝা নানারূপে নানাভাবে তাঁহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, উত্তমর্ণ নানারূপ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কঠোর দৈন্য আসিয়া চির সুখপুষ্ট পরিবারকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে —তবু তিনি অটল অচল। বন্ধুবান্ধবেরা বিপদের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, শোকে দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি সে সকলের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া শুধু হাসি মুখে বলিতেন Clouds will roll by, দুর্দ্দিন কাটিয়া যাইবে। আর গাহিতেন 'প্রবল সংসার-স্রোতে আমরা দুর্ব্বল অতি,

কেমনে করিব নাথ প্রতিকূল মুখে গতি।' তাঁহার চরিত্রের মহৎ গুণ ছিল সার্ব্বভৌমিক প্রীতি, ছোট বড় সকলের সঙ্গেই তিনি হাসিমুখে মেলামেশা করিতেন, যখন শিশুদের সঙ্গে মিশিতেন, তখন তাঁহাকে শিশু বলিয়া মনে হইত, যুবকদের সঙ্গে ক্রীড়ায় যোগ দিতেও ইতস্ততঃ করিতেন না। বিপদে তাঁহার অসীম ধৈর্য্য ছিল। ঘোর বিপদে পতিত হইলেও তিনি কিছুতেই বিচলিত হইতেন না। 'একবার কলিকাতার কোনও ধনী ব্যক্তি তাঁহার নামে একটী মিথ্যা মোকদ্দমা করেন। তিনি তখন হোসেনাবাদে প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় সত্যরঞ্জন দাসের প্রবাস-গৃহে সপরিবারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। গৃহ-প্রত্যা-বর্ত্তনের সময় সকলেরই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, পথিমধ্যেই হয়ত ওয়ারেণ্ট দিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে। এই জন্য সন্তানেরা সমস্ত পথ অতিশয় উদ্বিগ্ন ভাবে অতিক্রম করিলেন। পথে ঐরূপ কোনও বিপদ ঘটিল না। গৃহে ফিরিয়া তিনি তাঁহার সুযোগ্য সহধর্ম্মিণীকে, সত্য সত্য উক্ত বিপদ উপস্থিত হইলে, কি কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিয়া শ্রান্তিহরা তাম্রকূটের সেবনে মনোনিবেশ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। প্রাতে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া ও সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত না করিয়া নাতি নাতিনীদিগকে পুরুলিয়া ধামে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন।' 'কঠোর দারিদ্র্যের সময় এবং বর্ত্তমানের প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তাঁহার প্রকৃতিতে আচারব্যবহারে কখনও বিশেষ কিছু পার্থক্য হইয়াছে একথা কেহই বলিতে পারিবে না। ভুবন বাবুর জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপার ঘড়ীর কাঁটার মত চলিত। তিনি প্রত্যেক দিনের প্রতি কার্য্য প্রত্যহ ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্ব্বাহ করিতেন। এ বিষয়ে তিনি খাটি ইংরেজ ছিলেন'* বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুত্র ও কন্যা বিয়োগ অনেক সহিয়াছেন, কিন্তু যখন সর্ব্বকনিষ্ঠ প্রিয়তম পুত্র বসন্তকুমার প্রফুল্ল কমলের ন্যায় কালের কঠোর আক্রমণে অকালে ঝরিয়া পড়িল, তখন তাঁহার চিত্ত একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তারপর পঞ্চাশ বৎসরের জীবন-সঙ্গিনী প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী অন্নপূর্ণা-রূপিণী গৃহ-লক্ষ্মী যখন অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন তখন ভুবন বাবুর জীবন-বিহঙ্গও যেন তাঁহার অনুসরণের

* ভারতবর্ষ শ্রাবণ, ১৩২১।

জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পত্নীর মৃত্যুর আট মাস পরে ভুবন বাবু সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। দেশের একজন মহাপুরুষ চিরদিনের জন্য অন্তঃহিত হইলেন!

ভুবন বাবু সাহিত্য চর্চ্চা করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার এই সাহিত্য-প্রীতি তদীয় পুত্রকন্যাগণের মধ্যেও অনুপ্রাণিত হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্তরঞ্জন বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। চিত্তরঞ্জনের 'মালঞ্চ' ও 'সাগর-সঙ্গীত' বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। কন্যা শ্রীমতী অমলা ও উর্ম্মিলা গল্প ও নাটক লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন ইংরেজী ভাষায় একজন সুকবি। ইঁহার রচিত ইংরাজী কবিতা পুস্তকও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ভুবন বাবুর তপস্যার ফল পুত্র চিত্তরঞ্জন। এমন মহাপুরুষ বাঙ্গালা দেশে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পিতৃঋণ পরিশোধ করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র রাজ্য-সুখ-ভোগ-স্পৃহা ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন তাই আজ হিন্দুর হৃদয়-মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ নারায়ণরূপে চিরপূজিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দুঃখ দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়া পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তিনি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নামে চিরপূজিত। আর চিত্তরঞ্জন, ইন্‌সল্‌ভেন্সিতে সুরক্ষিত পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া যে অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন তাহার তুলনা কোথায়? যে ঋণ পরিশোধ না করিলেও কেহ দোষা-রোপ করিতে পারিত না, সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া পিতৃভক্ত পুত্র চিত্তরঞ্জন পিতাকে ঋণমুক্ত করিয়া যে অমানুষিক চরিত্রবত্তা—দেব-চরিত্র প্রদর্শন করিলেন তাহা চিন্তা করিতে গেলে প্রাণ আনন্দে বিভোর হয়, ভাষা মূক হইয়া পড়ে, হৃদয় শুধু শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে নত হইয়া আসে। স্বার্থময় কলিযুগে, স্বার্থময় সংসারে চিত্তরঞ্জনের এই মহৎ আদর্শ চিরকাল জীবিত থাকিয়া বাঙ্গালী চরিত্রের এই মহৎ আদর্শ, মহৎ আত্মত্যাগ কাহিনী জগৎবাসীর সমক্ষে ঘোষণা করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে ধন্য করিবে। চিত্তরঞ্জন পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া পিতার মনঃকষ্ট দূর করিয়া যে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, যে অমরত্ব পাইয়াছেন, তাহাতে বিক্রমপুর এবং বিক্রমপুরবাসী চিরগৌরবান্বিত রহিবে। চিত্তরঞ্জনের পুণ্যধারায় আজ বিক্রমপুরের দাস পরিবার ধন্য—বিক্রমপুর—ধন্য। আমরা

জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া পিতৃপিতামহের অমল যশ-রশ্মি চারিদিকে বিকীর্ণ করুন। তাঁহার স্বার্থত্যাগের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত, পিতৃভক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন প্রত্যেক পুত্রের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হউক। ধন্য ভুবন-মোহন! ধন্য চিত্তরঞ্জন!

বিক্রমপুর-প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান সময়ে পল্লীগ্রামে মধ্যবিত্তাবস্থাপন্ন গৃহস্থের গ্রামেবাস একরূপ অসম্ভব। প্রথম কথা অন্ন-সমস্যা। অন্ন-সমস্যাই অতি বড় প্রধান কথা। দেশের প্রায় অধিকাংশ মধ্যবিত্তাবস্থাপন্ন গৃহস্থই চাকুরী করিয়া নানারূপ ক্লেশ সহিয়া পরিবার প্রতি-পালন করেন। তাহাদিগকে যে জীবন-যুদ্ধে কিরূপ ক্ষত বিক্ষত হইতে হয় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। তারপর দুর্ভিক্ষ ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াই আছে। খাদ্য দ্রব্যের মূল্যাধিক্যই আমাদের দরিদ্রতার প্রধান কারণ। কেন এরূপ হইল তাহার কারণানুসন্ধান করিতে গেলে মোটামুটি পাটের চাষ, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি, শস্য রপ্তানী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অত্যধিক চাকুরী-প্রিয়তাই মূল হেতু বলিতে হইবে। পূর্ব্বে কৃষকগণ পাটের চাষ করিত না, ধানের চাষ হইত বলিয়া বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য চাউলের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইত না। কিন্তু এক্ষণে পাটের চাষে দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, ধান্য পূর্ব্বাপেক্ষা পরিমাণে অল্প উৎপন্ন হইতেছে। যে দেশের প্রধান খাদ্য চাউল—সে দেশে যদি ধান্য উপযুক্ত রূপ না জন্মিল তাহা হইলে খাদ্য দ্রব্যের মূল্যাধিক্য কোনরূপেই দূর হইতে পারে না। কৃষকদিগকে ধান ও পাটের চাষের তারতম্য বুঝাইতে গেলে তাহারা বলে এক বিঘা জমিতে ধান বুনিয়া যে টাকা পাই, ঐ জমিতে পাট বুনিলে তাহার চতুর্গুণ পাই, অতএব পাট ছাড়িয়া ধান বুনিব কেন? কৃষকের দল পাটের চাষ করিয়া অর্থলাভ করে সত্য কিন্তু তাহারাও ত কেহই ঋণমুক্ত নহে। এমন সঙ্গতিশালী কৃষক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় যাহার ঋণ নাই। বিলাসিতা

পল্লীগ্রামের সুখ দুঃখ।

আজকাল এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে পল্লীগ্রামের সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত পাট বিক্রীর নগদ টাকা দ্বারা তুচ্ছ বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করে না।

আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ন্যায় চাকরীপ্রিয় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কায়িক শ্রমে সকলেই অপটু। ইহাদের অধিকাংশেরই জোত জমি কিছুই নাই, যাহার দু'এক বিঘা আছে তাহাও বর্গা-পত্তনি, কাজেই উহা হইতে যে সামান্য উপস্বত্ব টুকু আইসে তাহার দ্বারা বৎসরের খোরাক দূরে থাকুক অনেক পরিবারের এক মাসের খোরাকও চলে না। চাকরী অপেক্ষা ব্যবসায় বা কৃষিকার্য্য বহু গুণে শ্রেয়ঃ। কৃষকেরা যেমন চাষ বাস করিতেছে ভদ্রলোকেরাও কি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন না? দেশে ত জমির অভাব নাই, কিন্তু কেহই এ দিকে অগ্রসর হইবেন না! আমাদের বৃথা আত্মাভিমানটা যতদিন পর্য্যন্ত না দূর হইবে ততদিন পর্য্যন্ত আমরা কোনরূপেই মানুষ হইব না।

গ্রামে আজ কাল নানা রূপ সামাজিক স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ছোট বড় সকলের মধ্যে আর প্রীতির বন্ধন নাই, কেহই কাহারো অধীনতা স্বীকার করিতে চাহে না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। পূর্ব্বে গ্রামের লোকের পরস্পরের মধ্যে যে মিষ্ট ভাবটুকু ছিল এখন আর তাহা নাই। এখন ভয়ানক সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত। কুমার পূর্ব্বের ন্যায় আর হাঁড়ী পাতিল মাথায় করিয়া কোন ভদ্রলোকের বাড়ী পঁহুছাইয়া দেয় না। চাকর মেলা ভার। সকলেই নিজ নিজ জাত্যাভিমান লইয়া ব্যস্ত। এমন কি গ্রামে কাহারো মৃত্যু হইলে শবদাহকারী লোকের এবং গাছকাটার মজুরের পর্য্যন্ত অভাব হয়। পূর্ব্বে যাহারা সামান্য মজুরী লইয়া খাটিত এখন তাহাদিগকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না। ডিঙ্গি নৌকার মাঝিরা পূর্ব্বে ।৵০, ॥০ আনা রোজে খাটিত এখন তাহারা ১৲, ১॥০ রোজের কমে খাটে না। এক টাকায় ষোল সের, চৌদ্দ সের দুধ মিলিত এখন টাকায় তিন সের খাঁটি দুধ পাওয়াও কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। জেলেরা মাছ ধরে, জাহাজে চালান দেয়, কাজেই দেশের হাটে বাজারে মৎস্য দুষ্প্রাপ্য। আর যাহা পাওয়া যায় তাহারও মূল্য এত অধিক যে ভদ্র গৃহস্থের পক্ষে ঐরূপ ভাবে ক্রয় করা অসম্ভব। এখন আমাদের চাকুরীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসাবাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। ব্যবসায় আর্থিক উন্নতি লাভের প্রধান উপায়। কিন্তু অতি অল্প-

সংখ্যক বাঙ্গালীকেই ব্যবসায়ে অনুরাগী দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যাঁহারা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যককেই কৃতকার্য্য হইতে দেখা যাইতেছে। ইহার প্রধান কারণ আমাদের ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাব। প্রথমেই বহু সহস্র মুদ্রা মূলধন লইয়া বিশেষ জাঁকজমকের সহিত বহু লোকজন লইয়া কোনও দোকান ইত্যাদি দেওয়াই 'ফেল' হইবার প্রধান হেতু। ব্যবসায়-বাণিজ্যে কার্য্যকরী শিক্ষা প্রয়োজন। মাড়োয়ারীরা প্রথম যখন কোনও কারবার খোলে তখন অতি অল্প মূলধন লইয়া অতি পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, পরে দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যেই উহা সুবৃহৎ করিয়া তোলে। তাহাদের এ রীতি অনুকরণ করা উচিত। জীবন সমস্যার দিনে আমাদের বাঁচিবার উপায় কি তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই বিবেচ্য।

* * * *

সানিহাটি নিবাসী অক্লান্তকর্ম্মী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার এম, এ, মহোদয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের সহকারী রূপে বিলাত গমন করিয়াছেন।

বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এ সংবাদ প্রত্যেক বিক্রমপুরবাসীর পক্ষেই আনন্দের বিষয়। ছোট, বড় সকলেরই দেশের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে। বিশ্বজনীন প্রেম সকলের মধ্যে সম্ভবে না। সে শক্তিও সকলের থাকে না। যাহার যে দিকে যতটুকু শক্তি আছে তাহার সেই দিকে ততটুকু কার্য্য করা কর্ত্তব্য। বিক্রমপুর—বঙ্গদেশের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান, সেখানে শিক্ষিত লোকের অভাব নাই, একথা কয়টি শুনিতে বেশ, কিন্তু দেশবাসীর পরস্পরের তেমন সহানুভূতি কই? দেশের সহিত কেহ বড় একটা সংযোগ রাখিতে চাহেন না। 'বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা' সৃষ্ট হইয়াছে—এইরূপ বিছিন্ন ভাব দূর হইবে বলিয়া আশা করি।

বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা।

আমাদের কার্য্য-বিবরণীতে যত বেশী কথা লেখা থাকে এবং বক্তৃতার মাত্রা যত বেশী বাড়িতে থাকে ততই কাজ কিছুই হইবে না এইরূপ একটা আশঙ্কা আপনা হইতেই মনে আইসে। বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা শুধু কলিকাতা প্রবাসী

বিক্রমপুরের কতিপয় লোক লইয়া সুপরিচালিত হইতে পারে না। গ্রামে গ্রামে ইহার কেন্দ্র থাকা উচিত।

সভা সমিতি অনেক হয়, সম্পাদক, সহকারী-সম্পাদক এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যও অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! নচেৎ সম্মিলনী সভা দ্বিতীয়বার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাহার জীবন প্রদীপটী জ্বলিতে না জ্বলিতেই নিবিল কেন? প্রত্যেক বিষয়েরই একটী মূল কেন্দ্র থাকে। বিক্রমপুর একটী পরগণা কতিপয় গ্রামের সমষ্টি। অধিবাসীর মধ্যে যাহারা শিক্ষিত তাহারা অধিকাংশই বিদেশবাসী, আর যাহারা অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত তাহারাই দেশবাসী। স্ত্রীলোকেরা অজ্ঞ। সম্মিলনী বাঁচিবে কিরূপে? গ্রামের লোকের শিক্ষার ভার কে লইবে? কে দেশবাসীর উন্নতির জন্য উদ্বুদ্ধ হইবে? কে গ্রামে গ্রামে সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া তাহারি হিতার্থে গ্রামবাসীকে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিতে আগ্রহান্বিত হইবে? কলিকাতার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যেরা সে কার্য্যে অগ্রসর হইবেন কি? আমারত মনে হয় না। প্রকৃত কর্ম্মীর অভাব দেশে অত্যন্ত বেশী, নীরবে কার্য্য করিবার শক্তিও অতি অল্প লোকেরই আছে। রাসবিহারীর ন্যায় সমাজ-সংস্কারক, কাঙ্গাল হরিনাথের ন্যায় অক্লান্ত সেবকেরই এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

একনিষ্ঠ সেবক ব্যতীত এ সব কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। যাহারা দশদিকে দশ কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও কোনও সভাসমিতির গুরুভার অনুরোধে ঢেকি গেলার মত গ্রহণ করেন তাহাদিগকে আমরা চাহি না। বড় বড় নাম থাকিলেই কাজ বড় হয় না। সম্মিলনী সভা সুপরিচালিত করিতে হইলে এমন লোকের প্রয়োজন যিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া উহারি উন্নতিকল্পে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারেন, যাহার শুধু ধ্যান হইবে বিক্রমপুর, যাহারা শুধু শয়নে স্বপনে চিন্তা হইবে বিক্রমপুরের উন্নতি বিষয়ক, নচেৎ শুধু সভার অধিবেশন হইল, সামাজিক মিলন হইল, তাহাতে ফল হইবে না। গ্রামে গ্রামে কর্ম্মীলোকের প্রয়োজন, গ্রামে গ্রামে উৎসাহী যুবকের দেশপ্রীতি, উৎসাহ ও উদ্যমের আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী। বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের এ কথা কয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুখী হইব। * * *

বিচারপতি সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় বিক্রমপুরের উজ্জ্বল রত্ন। দেশের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ অনেকেরই অনুকরণীয়। এ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি মাতৃভূমির হিত-কল্পে দেশবাসীর অনুরোধক্রমে সম্মিলনী সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কিরূপ ভাবে সম্মিলনীর কার্য্য প্রণালী চলিলে অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাহা সুফল প্রসব করিবে তৎসম্বন্ধে উপদেশাদি প্রদান করিতেছেন, দেশেও তাঁহার বিবিধ সৎকর্ম্ম আছে। নিজ গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া তাহার সর্ব্ববিধ ব্যয় বহন করিতেছেন। এই মহাপুরুষের আদর্শে প্রত্যেক বিক্রমপুরবাসী শিক্ষিত লোকের দেশের হিতানুষ্ঠানে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

*   *   *   *

স্বর্গীয় মহাত্মা দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র তেলিরবাগ গ্রাম নিবাসী সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস মহাশয় অস্থায়ী ভাবে গভর্মেণ্টের Standing Counsel এর পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে বিক্রমপুরবাসী মাত্রেরই আনন্দ হইবার কথা। আমরা সতীশ বাবুর দীর্ঘজীবন ও কার্য্যের সফলতা প্রার্থনা করি।

*   *   *   *

বিক্রমপুরের লোকের সহিত যখন অন্য কোনও জেলার কাহারো সহিত কোনও তর্ক বাধে, তখন শতকরা নিরনব্বুই জন বিক্রমপুরবাসীই গর্ব্বের সহিত বলিয়া থাকেন 'দেখ আমাদের এক ক্ষুদ্র পরগণার মধ্যে দেশের যত মনস্বী ব্যক্তির বাসস্থান তেমন বাঙ্গালা দেশের কয়টি জেলায় বা নগরে আছে?' কথাগুলি বেশ। আমাদের দেশে যাঁহারা বড় আছেন তাঁহাদের সহিত আমাদের কতটুকু সম্পর্ক? তাঁহারা কি গ্রাম ভালবাসেন না দেশবাসীর সহিত সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছা করেন? আর গ্রামবাসীরাই কি তাঁহাদের সহিত কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিবার ইচ্ছা করেন? দোষ উভয় পক্ষেরই। আমরা কি এই দোষ ক্ষালন করিতে পারি না? দেশে যেমন কংগ্রেস, কনফারেন্স বা সাহিত্য সম্মিলন হয়, তেমন প্রতি বর্ষে একবার বিক্রমপুরবাসীর সম্মিলন হওয়া চাই। ভাবের আদান প্রদান চাই। এইরূপ সম্মিলনে আমরা কাহাদিগকে দেখিতে চাই? আমরা চাহি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন,

সতীশরঞ্জন, সত্যানন্দ বসু, যামিনীমোহন, বসন্তকুমার, বক্তা বিমলানন্দ নাগ, রাজা শ্রীনাথ, অনারেবল সীতানাথ, জানকীনাথ, হরেন্দ্র লাল প্রভৃতিকে। তাঁহারা যদি প্রতি বৎসর একবার বিক্রমপুরে শুভ পদার্পণ করেন, তাহা হইলে গ্রামে গ্রামে ইন্দ্রজাল ক্রীড়া করিবে, দেখিতে পাইব ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তিই সভায় উপস্থিত হইয়াছে। এই সভায় যদি গ্রাম্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট, কৃষিকার্য্য ইত্যাদি সকল বিষয়ে আলোচনা হয়, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য পদার্থ সমূহের চিত্র প্রদর্শিত হইয়া ইতিহাস ব্যাখ্যাত হয় তাহা হইলে একত্র শিক্ষা ও আমোদের সমাবেশ হয়। তোমার আমার কথায় ফল না হইতে পারে, কিন্তু ডাক্তার জগদীশচন্দ্র, স্যার চন্দ্রমাধব, চিত্তরঞ্জনের কথা কে শুনিবে না? উহা গ্রামবাসী বেদবাক্যরূপে গ্রহণ করিবে।

আমরা এইরূপ সম্মিলনের একান্ত পক্ষপাতী। মুন্সীগঞ্জেই ইহার প্রথম বৎসর অধিবেশন হওয়া কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে আমরা দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কোনও জাতিগত বা সমাজগত সম্মিলন অপেক্ষা এইরূপ সার্ব্বভৌমিক মিলনের ফল অত্যন্ত কল্যাণজনক। বিশেষ উত্তর বিক্রমপুর সম্মিলন ও দক্ষিণ বিক্রমপুর ভিন্ন সম্মিলন না হইয়া প্রতি বৎসর 'বিক্রমপুর সম্মিলন' নামে সাধারণ সম্মিলন হওয়াই সঙ্গত।

*   *   *   *

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু—নিমন্ত্রিত হইয়া বিলাত গমন করিয়াছেন এ সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। তথায় তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রদ্বারা উদ্ভিদের জীবন সম্পর্কে গবেষণামূলক নবীন তত্ত্বসমূহ বিজ্ঞ জন সমক্ষে প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বত্রই যশস্বী হইয়াছেন। অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়ানা নগরেও স্বীয় আবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছেন। জগদীশচন্দ্র বিক্রমপুরের অধিবাসী, কাজেই তাঁহার এই অপূর্ব্ব যশলাভে প্রত্যেক বিক্রমপুরবাসীরই আনন্দিত হওয়া উচিত।

কলিকাতা—৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে শ্রীমনোরঞ্জন সরকার দ্বারা মুদ্রিত এবং পোঃ ফুলকোচা, জিলা ময়মনসিংহ, মহীরামকোল হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

.বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার সভাপতি স্বদেশবৎসল

স্যার শ্রীচন্দ্রমাধব ঘোষ, কে, টি।

২য় বর্ষ | আশ্বিন ; ১৩২১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অন্তর্য্যামি

ঘুরিতে ঘুরিতে আজ জীবনের অন্ধকারে,
সম্মুখে সকলি বন্ধ, দুই পথ দুই ধারে।
কোন্ পথে যাব আজ ? ভেবে ভেবে নাহি পাই,
কে দেখাবে আলো মোরে কেহ নাই ! কেহ নাই !
কিছু নাই ! কিছু নাই ! পরাণের চারিপাশে,
আঁধার নয়নে আরো আঁধার ঘনায়ে আসে।
হে মোর বিজন বঁধু, হে আমার অন্তর্য্যামি,
কতদিন কতবার আভাস পেয়েছি আমি !
আজ কি বঞ্চিত হব, ফেলে যাবে একেবারে,
এ মহা বিজন রাত্রে এই ঘোর অন্ধকারে !
হাহা ! হাহা ! করে উঠে পরিচিত হাস্যরব !
কোথা তুমি কোথা তুমি এযে অন্ধকার সব !
যেখানেই থাক নাথ ! আছ তুমি, আছ তুমি !
সকল পরাণ মোর তোমার চরণ-ভূমি !
ভাবনা ছাড়িনু তবে, এই দাঁড়াইনু আমি,
যে পথে লইতে চাও লয়ে যাও অন্তর্য্যামি।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

দক্ষিণ বিক্রমপুরের কথা

বিক্রমপুর এই নামটি কতকাল যাবৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা অবধারণ করা সহজসাধ্য নয়। রাজা বিক্রমাদিত্যের অবস্থান নিবন্ধন অথবা বিক্রম-শালী সেনরাজগণ হইতে বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ঠিকভাবে বলা যায় না। তবে সমতট বঙ্গ বলিয়া একটি স্থানের পরিচয় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, উহার ব্যাপকতা কতদূর ছিল অধুনা তাহা নিরূপণ করাও সুকঠিন। ফার্গুসন সমতট বলিতে ঢাকা জেলা, ইৎচিঙের মতে ভারতের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত কোন স্থান এবং ওয়ার্টসারের লেখায় ফরিদপুরের পূর্ব্ব এবং ঢাকার উত্তরবর্ত্তী স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন। ফার্গুসনের কথায় বিক্রম-পুর সমতটের মধ্যেই পড়িয়া যায়। ইৎচিঙের বিভাগানুসারে পূর্ব্বভারতের অন্তর্গত বলিয়াও বিক্রমপুরকে সমতটের অন্তর্গত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু ওয়ার্টসার যে ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে একমাত্র বিক্রমপুরকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। অনেকেই এই কথার অনুমোদন করিতেছেন, আমরাও উহা সমীচীন বলিয়া মনে করি।

সেনরাজগণের তাম্রশাসনে বিক্রমপুরের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে এই নামটি হয় সেন রাজত্বকালে অথবা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজগণ দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়াছিল। এই কারণে বলা যাইতে পারে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরের নামকরণ হইয়াছে।

অধুনা বিক্রমপুর বলিতে যে স্থানটুকু নির্দ্দিষ্ট হয়, বাস্তবিক পক্ষে প্রথমো-দ্ভূত বিক্রমপুর কিছু এতটুকু স্থান লইয়া সংগঠিত হইয়াছিল না। তৎকালে বহু বিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া উহার সংস্থিতি ছিল, পরে উহার অনেক স্থান বিভিন্ন পরগণায় পরিগণিত হইয়াছে। কার্ত্তিকপুর, ইদিলপুর, পারজোয়ার প্রভৃতি স্থানগুলি নিশ্চয় বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ পরগণাগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না। আমরা ক্রমে এই বিষয় প্রদর্শন করিতেছি।

ইদিলপুরে প্রাপ্ত সেনরাজগণের একখানা তাম্রশাসন এশিয়াটিকজার্ণেলের প্রথম অংশের ৮০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে "বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশে প্রশস্ত * লতা * ঘোড়াঘটক পূর্ব্বে * স * একা * ধীগ্রাম সীমা দক্ষিণে শাঙ্কর বসাগোবিন্দ বলান্ত ভূসীমাপশ্চিমে * ইত্যাদি—

এই তাম্রশাসনে "লতা" ও "ধীগ্রাম" বলিয়া যে দুইটি স্থানের পরিচয় আছে উহা যে বর্ত্তমান ইদিলপুরের অন্তর্গত লতা ও ধীপুর গ্রাম তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসনে * নাগরকুণ্ডী, সামন্তসার লক্কাচুয়া ও ধীপুর নামের উল্লেখ আছে। ঐ সকল শাসনপত্রের কোথাও ইদিলপুর বা কার্ত্তিকপুরের নামের উল্লেখ নাই। যে সকল নাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত বলিয়া শাসনপত্রে দেওয়া হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু ঐ সকল স্থান ঐ দুই পরগণার অন্তর্গত দেখা যায়।

উপরে যে দুইখানা শাসনপত্রের কথা উল্লেখ করা হইল, উহা প্রায় আট নয়শত বৎসরের পূর্ব্বের বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। যদিও কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে শ্যামল বর্ম্মার শাসনপত্র কৃত্রিম বলিয়া শুনা যায়, তথাপি ঐ কৃত্রিম দলিলও যে বহুশতবৎসর পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, ইদিলপুর ও কার্ত্তিকপুর এই দুইটি নাম পরগণা বিভাগেরও বহুপরে উৎপন্ন হইয়াছে।

সাহান্‌সাহ আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডরমল্ল দ্বারা বঙ্গদেশ উনিশটি চাকলায় বিভক্ত হয়। এই সময়ে সরকার সোণারগাঁর অন্তর্গত ৫১টী মহলের মধ্যে বিক্রমপুর ও কার্ত্তিকপুর এবং সরকার বাকলার অন্তর্গত চারিটি মহালের মধ্যে ইদিলপুরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস বিক্রমপুরের অংশ হইতেই অন্যান্য নূতন পরগণার ন্যায় এই সময়ে কার্ত্তিকপুর সুজাবাদ ও ইদিলপুর নামে দুইটি পৃথক্ পরগণা নির্দ্দেশ করা হয়। এইরূপে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত প্রাচীন বাকলাচন্দ্রদ্বীপ হইতে বহু বিভিন্ন পরগণার উৎপত্তি হইয়াছে। মিঃ বিভারেজ তদীয় বাখরগঞ্জের ইতিহাসে উহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুজাবাদ ও ইদিলপুর, এই দুইটি নাম যে মুসলমান নামের সহিত সম্বন্ধ ও জড়িত তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। অতএব হিন্দু রাজত্বে উহা বিক্রমপুর বলিয়াই পরিচিত ছিল।

দেশের বিভাগ ঠিক রাখা বা না রাখা রাজার ইচ্ছা। আমরা বিক্রমপুর পরগণা দ্বারা উহা সপ্রমাণ করিতেছি। সেনরাজগণের সময়ে বিক্রমপুরের পরিধি যতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। তৎপর নবাবী আমলে এই বিক্রমপুর মধ্যেই আবার আরাঙ্গাবাদ, রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর প্রভৃতি তিন, চারিটি পরগণার সন্নিবেশ সাধিত হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৬০ পর্য্যন্ত গেষ্ট্রেল ও ডেলী কর্ত্তৃক যে সার্ব্বে হয়, তাহাতে দেখা যায় বিক্রমপুর পরগণাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

৮।৯ নং মকিমাবাদ। ১০ নং বিক্রমপুর। ১৩।১৪ নং রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর। এই তিন খণ্ডের মধ্যে ৮, ৯ ও ১৩, ১৪ নং এই দুই বিভাগে বিক্রমপুর ব্যতীত অপর কয়েক পরগণার জমিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৮।৯ নম্বরে মকিমাবাদ ও আরঙ্গাবাদের মধ্যে উত্তর বিক্রমপুরের দত্তপাড়া, সেকেরনগর, হাসারা, বীরতারা, ষোলঘর, দেওভোগ, শ্রীনগর, মাইজপাড়া, কামারগাঁ, পাটাভোগ, বেজগাঁ, পরাণীমণ্ডল, কয়কীর্ত্তন, নাগরভাগ, কুমার-ভোগ, মেদিনীমণ্ডল, হলদিয়া, ইছাপাশা, বাজপুর, দেড়শত, ভাওয়ার, মাওয়া, কাওয়ালীপাড়া, কোঁয়রপুর প্রভৃতি বিক্রমপুরের বহু গ্রাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কীর্ত্তিনাশা নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী স্থান সমুদয় ১৩।১৪ নম্বর রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর এই দুই বিভাগের অন্তর্গত করা হইয়াছে। ৮।৯।১০ নং উহা বর্ত্তমান সময়েও ঢাকার অন্তর্গত থাকায় সর্ব্বসাকুল্যে বিক্রমপুর নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। কীর্ত্তিনাশার দক্ষিণ তীরস্থ স্থানগুলি সম্প্রতি ফরিদপুরের অন্তর্গত হওয়ায় উহা 'দক্ষিণ' বিশেষণ বিশিষ্ট হইয়া দক্ষিণবিক্রমপুর নামে অভিহিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু বিক্রমপুরবাসী কেহই পরিচয় প্রদানকালে, মকিমাবাদ, আরঙ্গাবাদ বা রাজনগর, বৈকুণ্ঠপুরের পরিচয় প্রদান করেন না। 'প্রকৃত রাজনগর গ্রামবাসীরাও বাড়ী রাজনগর, পরগণা বিক্রমপুর বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। রাজবিধান কাগজপত্রেই নিবদ্ধ আছে। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বিস্তৃত বাকলা (চন্দ্রদ্বীপ) পরগণার বহু খর্ব্বতা সাধন হইলেও তত্রত্য পণ্ডিতগণ, যাঁহারা বিভিন্ন পরগণায় বিভক্ত স্থানসমূহে বাস করিতেছেন, তাঁহারাও সগর্ব্বে বাকলার পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না।

দক্ষিণবিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীপুর নগরে সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ ও কেদাররায়ের

রাজধানী ছিল। এতদ্ভিন্ন সঙ্কট নামক স্থানে, সমতটের সদরস্থান ছিল। সমতটকে বৈদেশিক লেখকগণ কেহ সণকট, 'কেহ সকাট' বা সাকাট লিখিয়া গিয়াছেন। উচ্চারণের বৈষম্যবশতঃ বিক্রমপুরবাসিগণ উহাকে সঙ্কট বা সমকট বলিতেন (১)। সমগ্র বেহার প্রদেশ মধ্যে যেমন একটি খণ্ড স্থানের নাম বেহার, সেইরূপ সরকার খলিফেতাবাদ, ফতেয়াবাদ, পূর্ণিয়া প্রভৃতির মধ্যে কয়েকটি খণ্ড স্থানেরও ঐ রূপ নাম ছিল, যাহা তৎকালীন সেই সেই বিভাগের সদর স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সমকট (সমতট) ও তদ্রূপ সমগ্র সমতটের সদরস্থান ছিল। রামপালের পূর্ব্বে সমকটের অভ্যুদয় হয়। এক সময়ে এই সমকটের নিম্ন দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত থাকাও অসম্ভব নয়। ১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দে মেজর জেম্‌স্‌ রেণেল গঙ্গা (পদ্মা) ব্রহ্মপুত্র বা মেঘনার সার্ব্বে উপলক্ষে যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে এই স্থানটির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থানে বৈদ্যের এক সমাজ ছিল। এতদ্ভিন্ন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্য সম্প্রদায়ের বহু হিন্দু এই স্থানে বাস করিতেন। প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল দক্ষিণবিক্রমপুরের এই প্রসিদ্ধ স্থানটি ও তন্নিকটবর্ত্তী গোবিন্দমঙ্গল, খাগটিয়া প্রভৃতি গ্রামগুলি নদীপ্রবাহে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন দক্ষিণবিক্রমপুরের নিম্নলিখিত স্থানগুলি কীর্ত্তিনাশা দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজনগর, জপসা, ভোজেশ্বর, লড়িকূল, কানার গাঁ আক-সাইল, সোণার দেউল, গঁজনাইপুর, পোড়াগাছা, মূলপাড়া, মূলনা, দেভোগ, খীলগাঁ, খারচাকা, বক্‌সীবাজার, রাজপাশা, রাউতপাড়া, পশ্চিমপাড়া, নারিকেলতা, পশাইল, কান্দাপাড়া, রণক, নবিপুর, শ্যামপুর, বিলাসপুর, আমবাড়িয়া, দক্ষিণ সিমলীয়া, পারগাঁ, গাগৈরজোড়া, দিয়াপাড়া, হাসেরকান্দী, চণ্ডীপুর, বউলাসার, হাতারভোগ, গোপালপুর, মজগুন্নী, ছয়পাড়া, গোকুলগঞ্জ,

---

(১) বিক্রমপুরের বহু গ্রামের নাম আংশিকভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—সোণারটং (সোণারঙ্গ) 'কাউলীপাড়া (কালীপাড়া') মাঐসার (মহিসার) প্রভৃতি। সমতট প্রথম সঙ্কটে বা সমকটে উচ্চারিত হইত, পরে এখন যাঁহারা ঐ নাম উচ্চারণ করেন বা লেখেন, তাঁহারা পড়িয়া ভুলিয়াছেন, সোমকোট।

গোড়াইল, করণগাঁ, বামগাঁ, মইজপাড়া, একান্দল, লক্ষ্মীপুরা, সাড়া, দগরী প্রভৃতি আরও বহুগ্রাম আংশিকভাবে নড়িয়া, কোমরপুর, চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানের ভূমিও নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে।

উপরের লিখিত ভগ্নস্থানগুলির মধ্যে আবার অনেক স্থান পয়স্ত (alluvian) হইয়া, চর রাজনগর, চর জপসা প্রভৃতি নামে পরিচিত হইতেছে।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ

বিদগাঁও

রাস্তাঘাট।—বিদগাঁও বিক্রমপুরের একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। ইহার দক্ষিণে সুবিশাল পদ্মানদী। নদীর পারেই বাজার। বাজারের ঠিক পূর্ব্বদিকে একটী অপ্রশস্ত খাল কতকদূর বহিয়া যাইয়া দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা গুণগাঁও নামক গ্রামের মধ্য দিয়া যাইয়া নদীতে পতিত হইয়াছে, অন্যটি বানারী হইয়া কল্‌মা পর্য্যন্ত গিয়াছে। দ্বিতীয় শাখাটীর দৈর্ঘ্য প্রায় এক মাইল, সব ঋতুতেই জল থাকে ; গ্রাম্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথগুলি ছাড়া একটী জেলা বোর্ডের রাস্তা বানারী স্কুল পর্য্যন্ত গিয়াছে। বার মাসই এ রাস্তা দিয়া বানারী যাইতে কোনও অসুবিধা হয় না, তবে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের অত্যধিক বর্ষার জলে সময় সময় রাস্তাটীর উপরেও জল উঠে, সে সময়ে আনন্দ কবিরাজের বাড়ীর সন্নিকটস্থ সাঁকোটীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়। রাস্তাটীর উপরে একহাত উঁচু করিয়া মাটী উঠাইয়া দিলে এবং উক্ত সাঁকোটীর পরিবর্ত্তে একটী কাঠের পুল তৈরী করিয়া দিলে সাধারণের ও ছাত্রগণের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইবে। খালের উপর বাজারের সংলগ্ন দুইটী কাঠের পুল আছে, এই দুইটীর অবস্থা এখন বড় শোচনীয়—অধিক লোক উঠিলে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকে! অধিক দিন এ অবস্থায় থাকিলে অনেক দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। উপরোক্ত দুইটী ব্যতীত আর

একটী কাঠের শক্ত পোল আছে। গ্রামের লোকের যত্নে বাজার হইতে পূর্ব্বদিকে যাইতে একটী বাঁশের সাঁকো আছে, এই সাঁকোটী বড় অপ্রশস্ত, একটু বেশী প্রশস্ত ও মজবুত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। শ্রীযুক্ত রজনী চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর নিকট একটী সাঁকো ছিল, ব্যবসায়ী পালপাড়ার লোকের যত্নে এইটীর পুনর্গঠন আবশ্যক, হাল্‌দার বাড়ীর নিকট গুণগাঁয়ের পথে একটী সাঁকো থাকাও বিশেষ আবশ্যকীয়। বর্ষার সময় গ্রামে খুব জলবৃদ্ধি হয়, কোন কোন জোয়ারে বাড়ীগুলিতেও জল উঠে। গ্রামে নৌকা মাল্লা বেশ পাওয়া যায়। বর্ষার সময় রোজ আট আনা হয়। পূজার সময় দাম খুব চড়া হয়।

লোক সংখ্যা—বিদগাঁয়ে লোকসংখ্যা প্রায় দশ হাজার। গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, তিলি, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, পাটীকার, নাপিত, ভূইমালী, ধোপা, কাপালী ও মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতিরই বাসস্থল। এ গ্রামে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণই বিশেষ শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী, ইঁহাদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন গ্রাজুয়েট হইয়াছেন। সকল জাতিই এক এক পাড়ায় বেশ প্রতিপত্তিসহকারে অবস্থিত, কেবল ব্রাহ্মণগণ গ্রামের নানাদিকে ছড়াইয়া আছেন। সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণের মধ্যে দত্ত ও ভুইয়ারা পূর্ব্বে খুব সমৃদ্ধিশালী ছিলেন, কালে তাঁহাদের অবস্থা কিছু হীন হইয়া পড়িয়াছিল। এখন আবার কেহ কেহ মাথা নাড়া দিয়া উঠিতেছেন। ব্যবসায়ে তিলি জাতি বিশেষ উন্নতিশীল। শিক্ষার দিকেও এখন তাহাদের বিশেষ ঝোঁক পড়িয়াছে। যোগীগণ বিশেষ ভদ্র, কর্ম্মকারগণ ব্যবসায়ে পাকা, কুমারগণ মাটীর কার্য্যে খুব নিপুণ। পূর্ব্বে অনেক দুর্গা পূজা হইত, কোন কোন প্রতিমাগঠন অতীব আশ্চর্য্যজনক ছিল। ক্রমে ক্রমে নাপিতগণ নিজ ব্যবসা পরিত্যাগ করিতেছে। কুমার, যোগী, পাটীকারগণ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ না করে তাহাই বিশেষ বাঞ্ছনীয়। মুসলমানগণ নদীভাঙ্গায় নানাদিক হইতে ছড়াইয়া আছে, ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিরীহ। গ্রামে ধান, পাট ও তামাকের চাষ হয়। ধানের চাষ অধিক হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। গোচারণের মাঠের অভাবে গৃহস্থেরা আর পূর্ব্বের ন্যায় গরু পালিতে সক্ষম নয় তাই দুগ্ধ মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে।

ক্রয়বিক্রয়—গ্রামের বাজারটী খুব বড়। তরকারী মাছ, দুগ্ধ বিস্তর আমদানী হয়, পূর্ব্বে গ্রাম্য ভদ্রলোকগণ নদীর ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে মাছ কিনিয়া

ফেলিতেন। ধীবর যেমন মৎস্য ধরিত, অমনি দাম হইত ৵০, ৵১০, ৶০। এখন মাছ অন্যান্য জায়গায় খুব রপ্তানী হয়, তজ্জন্য গ্রামবাসিগণ সস্তায় আর বড় পায় না। দুগ্ধও পূর্ব্বে খুব সস্তা ছিল। ৴১০ দুই পয়সা করিয়া সের বিক্রী হইত। এখন ৵০, ৶০, ।০ পর্য্যন্ত হয়, পূজার সময় দাম ।৴০, ।৵০ পর্য্যন্ত হয়, বরাবর যাহারা যোগায় তাহারা টাকায় আট দশসের দিয়া থাকে। প্রাতে ৮ টা হইতে ১১ টা পর্য্যন্ত সকল জিনিষেরই আমদানী হয়, এতদ্ব্যতীত প্রায় সর্ব্বদাই ডাইল, চাউল, গুড়, চিনি, ময়দা ও নানা রকম মিষ্টদ্রব্য ও বস্ত্রজাত দ্রব্যাদি সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। বাজারের ব্যাপারীরা সপ্তাহে ২ বার একক্রোশের মধ্যস্থিত হাঁসাইল হাট করিতে যায়। হাঁসাইলের হাটে বিস্তর তরকারী ধান ও মাছের আমদানী হয়। ব্যাপারীরা সর্ব্বদাই লৌহজঙ্গ বন্দর হইতে কাঠ ও টিন ইত্যাদি আনিয়া বেশ পয়সা লাভ করে।

শিল্প—বানারী গ্রামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। বিদগাঁয়ের বাজার হইতে ইহা এক মাইল দূরে অবস্থিত। স্কুলটীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছে, লাইব্রেরী নাই, উপযুক্ত ঘর নাই, এবং উপযুক্ত শিক্ষকেরও অভাব। এত অসুবিধা সত্ত্বেও ছাত্র সংখ্যা অন্যূন দুইশত। গত দুই বৎসর হইতে যে কয়টী এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় পাঠানো হইয়াছে সব কয়টীই পাস হইয়াছে। স্কুলটীকে সজীবরাখা গ্রামবাসীদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা জানি বর্ত্তমান হেড্‌মাষ্টার বাবু উপাধিধারী না হইলেও অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক এবং শিক্ষা প্রণালীও অনিন্দ্য, কিন্তু স্কুলটীকে দাঁড়ান রাখিতে হইলে গ্রামবাসীদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের হাতে সমস্ত ভার দিলে কাজের অনেক সহায়তা হওয়া সম্ভব। যাহারা স্কুলের জন্য বাস্তবিক খাটিবে তাঁহাদের অন্ততঃ ১৫।২০ জন লইয়া একটী কমিটী হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় এবং দুইটী ভাল টিনের ঘর করিয়া লাইব্রেরী ও শিক্ষক ঠিক করা বিশেষ প্রয়োজন। দ্বন্দ্ব ভুলিয়া এবার পূজাবকাশে গ্রামের সম্ভ্রান্ত সকলে পরামর্শ করিয়া স্কুলটীর উন্নতি বিধানের চেষ্টা বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

উক্ত উচ্চ বিদ্যালয় ব্যতীত ২।৪টী পাঠশালাও আছে কিন্তু ইহাদের উন্নতি সম্বন্ধেও প্রায় সকলেই অমনোযোগী। এত বড় গ্রামে মোটে একটী বালিকা বিদ্যালয় বিদ্যমান তাহাতেও মোট ২০।২৬ টী ছাত্রী। উচ্চশিক্ষা প্রাথমিক, ও

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে গ্রামের লোক এত উদাসীন বোধ হয় কুত্রাপি নাই। এক সময়ে শিক্ষার জন্য স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র দাস ও মহামান্য কাশীচন্দ্র মুখী মহাশয় বহু অর্থব্যয় ও অন্নদান করিয়া গ্রামবাসীদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই মহৎ আদর্শ এখনও গ্রামবাসী কৃতী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

টোল—গ্রামে প্রাতঃস্মরণীয় ৺ঈশান স্মৃতিপঞ্চানন ও পরোপকারী ৺আনন্দ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়দের বাড়ীতে টোল ছিল। প্রাতে সন্ধ্যায় সর্ব্বদা স্মৃতি, পুরাণ, ব্যাকরণের আলোচনা হইত। ছাত্রগণও বড় ভদ্র ছিলেন, আমরা তাঁহাদের সঙ্গে সদালাপে কত আনন্দ পাইতাম। টোলের অস্তিত্বের লোপের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে দেবভাষার আর চর্চ্চা নাই। জানি না আবার কোন কালে এ গ্রামে লুপ্ত সংস্কৃত চর্চ্চার উন্নতি হইবে কি না! আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের মধ্যেও এই গ্রামে ৺দ্বারিকানাথ দাস মহাশয়ের নাম বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য।

চিকিৎসা—এ গ্রামে উপযুক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে একটী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় আছে। একজন পাশকরা এলোপ্যাথি ও একজন বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিও আছেন। মোটের উপর গ্রামের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। তবে কোনও কোনও সময়ে কলেরা ও জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। কলেরা ও শিশুদিগের পীড়ায় হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। আমাদের দেশে পীড়া সম্বন্ধে আমরা এত অবহেলা করি যে ৫বৎসর বয়স্ক শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা প্রাপ্ত বয়স্কগণ অপেক্ষা চারিগুণ অধিক। গ্রামে এই অসুবিধা দূরীকরণ নিমিত্ত একটী দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। কোন জনহিতৈষী সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা এই অভাবটী দূর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

• লাইব্রেরী—সম্প্রতি কয়েকজনের উদ্যোগে একটী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা হওয়ার সূচনা হইয়াছে। এখন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা রীতিমত অনেক যাইতেছে। একজন ভদ্রলোক তাঁহার নিজের ঘর দিয়া নিজে তত্ত্বাবধান করিতেছেন। শীঘ্রই একটী স্থায়ী ঘর ও সহস্রাধিক পুস্তক সংগ্রহ হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

পোষ্টাফিস—একটী সব্ আফিস্ আছে। একটী তারের আফিস বিশেষ আবশ্যক।

পুষ্করিণী ও ডোবা—শীত ও গ্রীষ্মের সময় গ্রামের ভিতর দিকে বড় জলকষ্ট হয়। গ্রামে পুকুরগুলির সংস্কার বিশেষ আবশ্যক। পূর্ব্বে পুকুর খনন একটা দেবকার্য্যের মধ্যে ছিল। এখন ধর্ম্মজ্ঞান ও লোকহিতৈষণা আমাদের আর নাই, আমরা নিজ নিজ লইয়াই ব্যস্ত। পচা পুকুরে ম্যালেরিয়া উঠে, জলে মশা খুব বেশী হয়, নিকটস্থ জঙ্গল শীঘ্র পচিতে থাকে এবং পচাপুকুরের জল বিষবৎ হয়। পুকুর খনন বা সংস্কার করিলে, ভাল জল পাওয়া যায়, বাড়ী উচু হয় এবং নূতন মাটীতে কলা, আম প্রভৃতির ফসল খুব ভাল হয় আর আজকাল মৎস্যাভাবের দিনে বিবাহ উৎসবাদিতে মাছের কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। জঙ্গল পরিষ্কার সম্বন্ধেও আমরা তুল্য উদাসীন। জঙ্গল পরিষ্কার থাকিলে বাতাস ভাল থাকে এবং ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পুকুর পাড়ে জঙ্গল ও বাঁশ গাছ ও গাছের পাতা সম্বন্ধে আমরা এত অমনোযোগী যে ইচ্ছা করিয়া ব্যারাম ডাকিয়া আনিয়া থাকি।

ক্রীড়া ও আমোদ—“নিলখোলা”য় আগে ক্রিকেট ও হাডুডু খেলা হইত, এখন ফুট্‌বল খুব খেলা হয়। বালকগণ হাডুডু, সাঁতার, দৌড়ান প্রভৃতি ভাল রকম শিখিয়া যাহাতে বলিষ্ঠ ও নীরোগ থাকিতে পারে তাহার বিশেষ দরকার। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রজনী চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে একটী হরিসভা হইত, সেখানে গঙ্গাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুমধুর দেবীকীর্ত্তন ও স্মৃতিপঞ্চানন মহাশয়ের পুরাণব্যাখ্যা কি মধুর ও শিক্ষাপ্রদ ছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঝুলনের সময়ও ঝুলন ও কৃষ্ণলীলা গান দেওয়াইয়া গ্রামের লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। এখন আর কাহারো উৎসাহ নাই। শিক্ষাভিমানী আর পাড়াগাঁয়ের লোকের সহিত মিশিতে চান না, এদিকে যাহারা গ্রামে পড়িয়া থাকে, শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক তাহাদের বড় পৌঁছায় না। এই অবস্থায় গ্রামে নির্দ্দোষ আমোদ করিয়া শিক্ষা বিস্তারেরও অনেকটা আবশ্যকতা আছে। গত ২ বৎসর হইতে বিদেশ হইতে উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি পূজাবকাশ সময়ে বাড়ী আসিয়া গ্রামের বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অভিনয় করিয়া গ্রামে বেশ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। রামায়ণ, কথকতা, যাত্রা, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি যত অধিক হয় ততই ভাল। সৌভাগ্যক্রমে বারোয়ারী খেম্‌টা নাচ প্রভৃতিতে গ্রামের অযথা অর্থব্যয় হয় না।

দেবমন্দির—বাজারে ৺কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবী বড় জাগ্রতা। মহামায়ার নামে বাজারটীও "কালীর বাজার" নামে খ্যাত। মায়ের মন্দিরের পাশাপাশিই শ্রীকৃষ্ণরাধিকার যুগলমূর্ত্তি। অধিকারী বাড়ীতে বাসুদেব মূর্ত্তি অনেকদিন হইতে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

বাল্য-যৌবন ও প্রৌঢ়ের স্মৃতিবিজড়িত মাতৃভূমির কল্যাণকামনায় প্রত্যেক গ্রামবাসী উদ্বুদ্ধ হউন। যাহাতে দেশের সামান্য সেবা করিয়াও ধন্য হইতে পারি সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর আমাদিগকে সেই শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করুন।

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত।

সংস্কৃত শাস্ত্রে বাঙ্গালী (৪)

অর্জ্জুন মিশ্র

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে মহাপুরুষের নাম উল্লিখিত হইল তিনি রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার জন্মস্থান "কাচনা" গ্রামে ছিল। ইনি প্রসিদ্ধ "কাচনার মুখুটী" বংশীয় ব্যক্তি। রাঢ়ীয় মুখোপাধ্যায় বংশীয় সমস্ত কুলীনদের পূর্ব্বপুরুষ "মুখুটী" গ্রামবাসী ছিলেন বলিয়া ইঁহারা সকলে "মুখুটী গাঁই" বলিয়া অভিহিত। যে সমুদয় মুখোপাধ্যায় বংশীয় ব্যক্তি "কাচনায়" বাস করিতেন তাঁহারা "কাচনার মুখুটী" বলিয়া বিখ্যাত। কাচনার বর্ত্তমান নাম কাঁচরাপাড়া। কাঁচরাপাড়া গ্রাম বর্ত্তমান সময়ে নদীয়া জেলার অন্তর্গত। এই স্থানে ইঃ বিঃ রেলওয়ের একটী ক্ষুদ্র ষ্টেসন আছে। কান্যকুব্জাগত ভরদ্বাজ গোত্রীয় মহর্ষি শ্রীহর্ষের বংশে অর্জ্জুন মিশ্রের জন্ম হয়। অর্জ্জুন মিশ্র, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, দেবীবর ঘটক প্রভৃতি সমসাময়িক লোক। দেবীবর যাহাদিগকে লইয়া মেল বন্ধন করেন অর্জ্জুন মিশ্র তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ফুলিয়া মেলোৎপত্তির কারণ স্থলে লিখিত আছে—

"অর্জ্জুনমিশ্র নামে ছিলা কাচনার মুখুটী—
সমাজগত দোষ পাইয়া হল বারৈ-হাটী॥" ইত্যাদি, দেবীবর।

নাঁদা, ধান্দা, বারৈহাটী, সপ্তশতী ইত্যাদি দোষ নিয়া ফুলিয়া মেলের সৃষ্টি হয়। এবং ছায়া নরেন্দ্রী মেলের সহিত অর্জ্জুন মিশ্রের পুত্র বাণেশ্বর ঘটকের সংশ্রব দৃষ্ট হয়, সুতরাং মেলবন্ধন সময় অর্জ্জুনমিশ্র পরিণতবয়স্ক ছিলেন। রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যদিগের মতে রাঢ়ী শ্রেণীয় কুলীনদের মেল বন্ধন ১৪৮০ খৃঃ অব্দে সম্পন্ন হয়। মেল বন্ধন সময় অর্জ্জুনমিশ্র এবং তৎপুত্র বাণেশ্বর ঘটক উভয়েই জীবিত ছিলেন এবং বাণেশ্বর তৎ সময়ে বিবাহিত সুতরাং ঐ সময় অর্জ্জুনমিশ্রের বয়স ৬০ বর্ষ ধরিয়া লইলে অর্জ্জুনমিশ্র ১৪২০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন দেখা যায়। শ্রীহর্ষ হইতে অর্জ্জুনমিশ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের বংশলতা নিম্নে দেওয়া গেল।
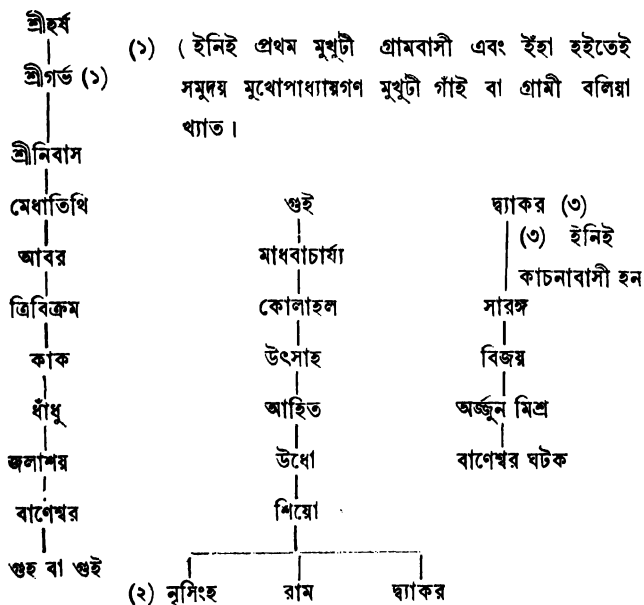
(২) ইনি বিক্রমপুর হইতে ফুলিয়া গ্রামে যাইয়া প্রথম বাস করেন। এই নৃসিংহের চতুর্থ পুরুষে প্রসিদ্ধ কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন।

অর্জ্জুনমিশ্র সমগ্র মহাভারতের এক বিস্তৃত ও বিশদ টীকা লিখিয়াছেন। তিনি

মহাভারতের মুকুটমণি সদৃশ ভগবদ্গীতার টীকাও বিশেষ বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছেন। মহাভারতের দুইখানি টীকাই বিশেষ আদৃত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তন্মধ্যে প্রথম খানা মহামহোপাধ্যায় নীলকণ্ঠ সূরি বিরচিত। দ্বিতীয় খানা অশেষশাস্ত্রবিদ্ মহাত্মা অর্জ্জুনমিশ্র কর্ত্তৃক লিখিত। এই মহাভারতের টীকা অর্জ্জুনমিশ্রের একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ। অর্জ্জুনমিশ্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন ও গ্রন্থাদি লিখেন। ঐ সমুদয় গ্রন্থ এইক্ষণ দুষ্প্রাপ্য তবে স্থানে স্থানে তৎকৃত কারিকাদি দৃষ্ট হয়। অর্জ্জুনমিশ্রের পুত্র বাণেশ্বর ঘটকতা ব্যবসা করিতেন।

অর্জ্জুনমিশ্র জ্ঞানী, ধীর, পরম পণ্ডিত ও একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন। তাঁহার মত সমাজসংস্কারক সচরাচর অল্পই দৃষ্ট হয়। অর্জ্জুনমিশ্র এবং ফুলিয়ার মুখুটী শিবাচার্য্য উভয়েই পণ্ডিত ও বড় কুলীন। শিবাচার্য্য শাক্ত, অর্জ্জুন বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। উভয়েই স্বীয় স্বীয় মতের বিশেষ আনুষ্ঠিকও আস্থাবান অথচ উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল। উভয়েরই বেদবিদ্ এবং ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন।

এই দুই প্রবীণ সামাজিক ও কৃতী ব্যক্তি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের একটী বিশেষ সংস্কারে ব্রতী হইলেন। উভয়েই, উন্নতমনা এবং উদার-প্রকৃতি। সমাজে হীনত্ব স্বীকার করিয়া, নিজের কুল গৌরবের হানি করিয়া উভয়ে "সপ্তশতী" ব্রাহ্মণদিগকে রীতিমত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে সমন্বয় করিয়া লইলেন ও তদবধি "সপ্তসতী" ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ রীতিমত রাঢ়ীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। *

অনেকে এই ভ্রান্ত মত পোষণ করেন যে "সপ্তশতীগণ" আদৌ ব্রাহ্মণই নহেন। এইটী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মত এবং সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ। সপ্তশতীগণ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সন্তান তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ নাই। তৎকালের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সন্তান বৌদ্ধপীড়নে কেহ কেহ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হন, কেহ কেহ বা বৌদ্ধরাজ বা রাজপুরুষের প্রিয়পাত্র হইবার জন্য, কেহ বা বৌদ্ধ ধর্ম্মে আস্থাবান্ বশতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। যাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণও কেহ রাজপুরুষের ভয়ে, কেহ বা তৎ সময়ের

---

* কোন কোন বারেন্দ্র কুলাচার্য্যের মতে "সপ্তশতী"গণ পূর্ব্বাবধিই রাঢ়ীয় সমাজে চলিত। কিন্তু বারেন্দ্র কুলাচার্য্যদের এই মতটী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ফলতঃ অর্জ্জুন মিশ্র ও শিবাচার্য্যের সময় হইতেই সপ্তশতী সমন্বয় হয়।

সমাজে বৌদ্ধ প্রভাব বশতঃ বৌদ্ধ মতালম্বীদের পরিহাসাসহিষ্ণু হইয়া, কেহ কেহ বা পারিপার্শ্বিক শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে, কেহ বা হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি সমাজের অবজ্ঞা হেতু হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নাদি না করিয়া প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণত্ব বর্জ্জিত হন। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ ভিন্ন উহাদের আর ব্রাহ্মণ-ত্বের কোন লক্ষণ থাকে না। কালক্রমে যখন বৌদ্ধ প্রভাব তিরোহিত হয়, যখন আদিশূর প্রভৃতি হিন্দু-রাজগণ গৌড়ের রাজদণ্ড গ্রহণ করেন, যখন সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রভাতোদিত সৌর-করবৎ সমস্ত গৌড়রাজ্য উদ্ভাসিত করিতে থাকে তৎসময় মহারাজ গৌড়েশ্বর প্রাতঃস্মরণীয় আদিশূর যজ্ঞার্থ ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করেন। ব্রাহ্মণগণ রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া সত্য কথা বলিলেন। উঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের আর এখন প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব নাই। আমরা সাগ্নিক নহি, আমাদের যজ্ঞ সম্পন্ন করার অধিকার বা তদুপযোগী শাস্ত্রজ্ঞান নাই, আপনি ইচ্ছা করিলে কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে পারেন। মহারাজ আদিশূর তদনুসারে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। যাঁহারা ঐরূপ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন কথিত আছে তাঁহারা গণনায় ৭০০ শত ঘর ছিলেন, এই জন্য উঁহাদিগকে সপ্ত-শতী বলে। কান্যকুব্জাগত সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের মূর্ত্তিমতী ব্রহ্ম-তেজপ্রভা এদেশবাসী উক্ত সপ্তশতী ক্ষীণপ্রভ ব্রাহ্মণগণকে ক্রমশঃ ক্ষীণতর অবস্থায় আনয়ন করে। এইরূপ ক্ষীণপ্রভ হইয়া উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নির্ব্বংশ হন। কেহ কেহ নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সহিত মিশিয়া যান। কালক্রমে মহারাজ বল্লাল সেন যখন কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণকে কৌলিন্য মর্য্যাদা ও বাস-স্থান জন্য প্রত্যেককে এক এক খানি গ্রাম প্রদান করেন তৎসময়ে সপ্তশতী দের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ বিদ্যা-ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন এইরূপ ২৮ ব্যক্তি মহারাজ বল্লাল সেনের সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দুরবস্থা জ্ঞাপন করেন। মহারাজ বল্লাল সেন উঁহাদের বিদ্যা ও ব্রহ্মণ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে ২৮ খানি বাসগ্রাম প্রদান করেন। তদবধি উঁহারা ও উঁহাদের বংশধরগণ ঐ ঐ গ্রাম বাসী বা "গাঁই" নামে খ্যাত।*

---

* সপ্তসতী গাঁইর নাম যথা :—

১। সগোই ২। সুরাই ৩। নালসী ৪। জগাই ৫। হাসাই ৬। কালাই

এইরূপে সপ্তশতীগণ মহারাজ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলেন বটে কিন্তু কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগ হইতে উঁহারা অনেক নিম্নেস্থলে রহিয়া গেলেন। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ, বিদ্যা-ব্রহ্মণ্যে, ধন সম্পদে ও কুলসম্মানে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে উঁহাদের বংশ ত্বরায় বিস্তৃত হইতে লাগিল। সপ্তশতীগণ তত উন্নতি লাভ করিতে পারিলেন না বটে কিন্তু উঁহাদের মধ্যেও ক্রমশঃ অনেক কৃতী লোক জন্ম গ্রহণ করিলেন। এইরূপ বহু পুরুষ চলিয়া গেলে শ্রীহর্ষ হইতে চতুর্ব্বিংশ পুরুষে মহাপ্রাণ অর্জ্জুন মিশ্র জন্মধারণ করিলেন। তিনি দেখিলেন এক শ্রেণীর নিষ্ঠাবান কতকগুলি ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণ সমাজের গণ্ডীর বাহিরে সমাজের প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পতিত থাকায় উঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবেই ক্রমশঃ হীনতেজা ও বিনষ্ট হইতেছেন। তাঁহার মত মহা সত্ব ও উদারচেতা ব্যক্তি ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নিজে প্রধান পণ্ডিত ও কুলীন আর বন্ধুবর কুলীনাগ্রগণ্য শিবাচার্য্যও তাঁহার এই সাধু সংকল্পে যোগ দিলেন। উভয় বন্ধু কুলীনদের দ্বারে দ্বারে গমন করিলেন। শিবাচার্য্য "মুলুকজুরী গ্রামী সপ্তশতীর" কন্যা বিবাহ করিলেন এবং অর্জ্জুন মিশ্র স্বয়ং "পিতারী গ্রামী সপ্তশতীর" কন্যা গ্রহণ করিলেন। এইরূপে স্বয়ং উদাহরণ দেখাইয়া অপরকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহাদের চেষ্টায় সপ্তশতী-গণ রাঢ়ীয় সমাজে শ্রোত্রিয়রূপে পরিগণিত হইয়া রাঢ়ীয় সামাজ ভুক্ত হইলেন। বর্ত্তমান সময়েও অনেক কুলীনের সপ্তশতী স্বীকার্য্য অর্থাৎ অনেক কুলীন এমন আছেন যে সপ্তশতীর কন্যা বিবাহ করিলে তাঁহাদের কুলের কিঞ্চিন্মাত্রও অনিষ্ট হয় না। অপর কুলীনদের সপ্তশতীতে বিবাহ করিলে কৌলিন্যের কিছু লাঘব হইলেও কৌলিন্য যায় না। অনেক মেলই সপ্তশতীর মিলন দোষে সৃষ্ট হইয়াছে।*

(ক্রমশঃ)

৭। ধাই ৮। বানসী। ৯। বাণ্টুরী ১০। ধানসী ১১। কাটানী ১২। কুশল ১৩। কাশ্যপকাঞ্জারী ১৪। বাতারী ১৫। পিতারী ১৬। মাতারী ১৭। বেরু ১৮। বাগবাই ১৯। উলুক ২০। ঝরঝর ২১। মুলুক ২২। ফরফর ২৩। কন্দু ২৪। কেড়ল ২৫। চেরচেরী ২৬। বালথোবী ২৭। যবগ্রামী ২৮। উজ্জ্বল।

বাউলের গান

একদিন চলিয়া যাইবে আলোক সাঁই
আলোকে আলোকে মিশিলে পলকের ভরসা নাই।
আলোক সাঁই তাঁর বালাম খানা,
কর জীবন স্বরূপ ঠিক ঠিকানা,
না জান্‌লে তাঁর উপাসনা কেমন করে সাঁইকে পাই,
এই যে ধরা তনু ভূতকায়া কেবল পঞ্চভূতের মায়া,
আসা যাওয়া হাত্‌না তাওয়া হাওয়া রূপে অভিপ্রায়,
আছেন প্রভু অন্তঃপুরে দীপ্তময় রূপ বিরাজ করে,
জ্ঞানবাত্তি জ্বালাইয়া ঘরে খোজ তাঁরে সুজন ভাই,
তারে তারে তিন তারে জিল তারে ঘের তারে,
ভক্তির তারে বেন্ধে তাঁরে ভজরে তাঁরে—ও সুজন ভাই
ধর্‌বি যদি মুক্তি তাঁর তালাস কর তাঁরে,
বাধ্য রেখে কাম তারে ভজরে গুরু গোসাঁই।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত

বরপণসম্বন্ধে কয়েকটী কথা

একদিবস পাড়ায় একটী গোলযোগ শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম "মল্লিক বাড়ীর চপলার মেয়ে স্নেহলতা আপনি আগুণে পুড়িয়া মরিয়াছে।" ১৪।১৫ বৎসরের মেয়ে আগুণে পুড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে জানিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল।

দুই তিন দিন পরে খবরের কাগজে অনেক সংবাদ জানিতে পারিলাম। পরে কত বক্তৃতা, কত সভা, কত যুবকদিগের প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর হইল। দেখিয়া শুনিয়া কতকটা আশা হইল স্নেহলতার আত্মহত্যা বুঝি বৃথা হইবে না। শুনিতেছি ইতিমধ্যেই কোন কোন স্থলে যাহারা পূর্ব্বে ছেলের বিবাহে কন্যা-পক্ষ

হইতে যতদূর সম্ভব পণ আদায় করিতে ত্রুটী করিতেন না তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ পণ না লইয়া কিম্বা বেশী জুলুম না করিয়া পুত্রের বিবাহ দিতেছেন। কিন্তু স্নেহলতা যে স্থানের মেয়ে সেই স্থানে এই আন্দোলনের ফল কিছুই দেখিতেছি না। এখনও মেয়েদের সম্বন্ধের প্রস্তাবে কেহইত পণটী ছাড়িয়া কথা বলেন না। সুন্দরী মেয়ে, আর টাকা এই কথাই শুনিতে পাই। যদি দৈবাৎ কেহ টাকা নিবেন না বলেন কিন্তু পাত্রীর অলঙ্কার, বরশয্যা, বরাভরণ প্রভৃতির দাবীর মাত্রা বাড়াইয়া দেন। ইহার প্রতিকারের কি কোন উপায় নাই? আমার মনে হয় কন্যাদায়গ্রস্তা জননীগণের চেষ্টায় কতকটা প্রতিকার হইতে পারে তাঁহারা যদি বলিতে পারেন যে মেয়ের বিবাহে পণ বা শক্তির অতিরিক্ত বস্ত্রালঙ্কার দিব না, বা কোন প্রকার বাহুল্য খরচ করিব না, এবং তদনুসারে স্বামী বা আত্মীয়স্বজনদিগকে বাধ্য করিতে পারেন তবে এই প্রথা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে পারে; কারণ কন্যার মা যিনি তিনিই ত আবার অনেক স্থলে পুত্রেরও মা। সুতরাং কন্যার বিবাহে যিনি পণ দিবেন না প্রতিজ্ঞা করিবেন বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে পুত্রের বিবাহে পণ নিব না বলিতে হইবে। মেয়ের মাতার অপেক্ষা ছেলের মাতার প্রতিজ্ঞা করাই সহজ ও সঙ্গত। মেয়ের মাতার মেয়ে অপাত্রে পড়িবার ভয়ে ও সমাজে লাঞ্ছনার ভয়ে ব্যাকুল হইবার কথা।

জননীগণ একটু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে কন্যার বিবাহে কালবিলম্ব হইতে পারে; সুতরাং অনূঢ়া বালিকাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা আবশ্যক। ১০।১১ বৎসর বয়স্কা হইলেই বালিকার স্কুল বন্ধ করিবার আমি কোন আবশ্যকতা দেখি না, ১২।১৩ বৎসরের মেয়েরা অনেক স্থলে নিরাপদে স্কুলে পড়িতেছে। যাঁহাদের স্কুলে রাখিতে নিতান্তই আপত্তি হয় তাঁহারা ঘরে কন্যার উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন।

জননীগণের সাংসারিক কাজকর্ম্মের একটু আধটু ত্রুটী হয় হউক কিন্তু বিলাস ব্যাসনে ঘুমে বা গল্প গুজবে সময় নষ্ট না করিয়া মেয়েরা একাগ্রচিত্তে বিদ্যা চর্চ্চা ও ধর্ম্মশিক্ষা করে তৎপ্রতি জননীগণের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ঘরে থাকিয়াও কোনও সম্মিলনীর পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া শিক্ষার জন্যে প্রস্তুত হওয়া অনূঢ়া কন্যাদিগের পক্ষে বড়ই ভাল, কারণ পরীক্ষার একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম ও চাপ থাকিলে একাগ্রতা বৃদ্ধি হয় এবং অন্য চিন্তায় মনকে বিচলিত

করিতে পারে না। মেয়েদের সাংসারিক কার্য্যে অভ্যাস করাইলে, একদিকে সাংসারিক কার্য্য শিক্ষা অপর দিকে শারীরিক পরিশ্রমে শরীরের উন্নতি সাধিত হয়। অনেক স্থলে দেখা যায় সহরের মেয়েরা লেখাপড়া শিক্ষা করে কিন্তু সাংসারিক কার্য্যে অনভ্যস্ত থাকে, এবং গ্রামের মেয়েরা কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করে কিন্তু লেখাপড়ায় অপটু থাকে। উভয়ই দূষণীয়, জননীদের উভয় দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

আমিও একদিন কন্যাদায়গ্রস্তা হইয়া বিস্তর লাঞ্ছনা ভুগিয়াছি। রূপে গুণে বালিকাটী নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না, কিন্তু দরিদ্র বিধবার কন্যা বলিয়া নিতান্তই বিপাকে পড়িয়াছিলাম। পরে সর্ব্বসন্তাপহারী বিপদভঞ্জন শ্রীহরি অব্যর্থ ব্যাধির করে আমার একমাত্র ধন বালিকাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। বালিকাটী যখন উৎকট পীড়ায় কাতর এবং যখন নিশ্চয়ই বুঝিলাম যে এ কঠিন ব্যাধি হইতে তাহার আর অব্যাহতি নাই, সেই সময় কোন সম্বন্ধের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে বড় দুঃখে বলিয়াছিলাম, "আমার খুকীর আর সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই। আর আমি খুকীর সম্বন্ধ বা বিবাহের জন্য কাহারও নিকট উপস্থিত হইব না; নিরুপায়ের উপায় অনাথের নাথ শ্রীহরিই খুকীর সম্বন্ধ সুস্থির করিয়াছেন, সুধু দিন ঠিক বাকী। আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি।"

কৃতান্ত আমাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, এখন দেখিতেছি কয়েকটী বালিকা আপনারাই কৃতান্তের কার্য্য করিয়া আপন পিতামাতাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়াছে। এই মহাপাতক হইতে দেশকে মুক্ত করিবার উপায় দেশের পিতামাতার হস্তে রহিয়াছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারি উল্লিখিত প্রকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া এবং কন্যার সুশিক্ষা ও ধর্ম্মচর্চ্চার বন্দোবস্ত করাই প্রধান উপায়। ইহাতে কাহারও অনেক দিন অনূঢ়া থাকিতে হয় তাহাতে বিশেষ ক্ষতি কি? পুত্রদিগের ন্যায় শিক্ষা সময়ে কন্যাগণও কি ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিতে পারে না?

শ্রীঅম্বিকা সেন।

প্রহেলিকা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আবার সেই শ্যাম সন্ধ্যাকাল, সেই নদীতীর। পূর্ব্বের ন্যায় পশ্চিম গগনে সেইপ্রকার সোণার সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছে, দুইবন্ধু পূর্ব্বেরই ন্যায় হাত ধরাধরি করিয়া ভ্রমণ করিতেছে।

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বিজয় বলিল, আনন্দ! তুমি সত্যি বল্‌ছ এই গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ী যাবে না?

আনন্দ। সত্যিই। বিজয়! আমি কি কথনও তোমার কাছে মিছে বলেছি!

বিজয়। কেন বাড়ী যাবে না? তুমি যেন ভাই কেমন হয়ে গেছ! একলা একলা বসে বসে কি ভাব? তোমার সহিত আমার কোন মতেরই মিল হয় না। সারাটি বন্ধ এখানে বসে বসে কি করবে?

আনন্দ বিষাদব্যঞ্জক স্বরে বলিল, লোকে বাড়ী যায় কেন? সুখের জন্য তো। আমার বাড়ী যেয়ে সুখ নাই তাই যাব না। আর আমার বাড়ীই বা কোথায়?

যদি কেহ তখন তাহার দিকে চাহিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, নয়ন কোণে অশ্রু দেখা দিয়াছে!

বিজয়। পূজার বন্ধে তো ভাই গিয়াছিলে। এবার যাবে না কেন?

• আনন্দ। আর যেতে ইচ্ছা করে না। দূর হতেই দিদি যে ওদের নিয়ে কষ্টে আছে, তার কথা ভাব্‌তে প্রাণটা কেমন করে। কাছে যেয়ে আর কষ্ট দেখতে ইচ্ছা করে না।

বিজয়। তাতো ঠিক। কিন্তু, তোমাকে না দেখ্‌লে যে তাঁদের বড়ই দুঃখ হবে।

আনন্দ। কি করব, আমার যে একেবারেই যেতে ইচ্ছে করে না। ভাই! বল্‌তে পার আমাদের কপালে এত কষ্ট কেন?

বিজয় বলিল, কেমন করে বল্‌ব ভাই ? তুমিই তো বল ভগবান্ যা করেন, আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন। চল ভাই! কাল দুজনেই বাড়ী যাই।

আনন্দ। না ভাই! আমায় এবার বাড়ী যেতে অনুরোধ করো না। অস্ত-গামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বলিল, ঐ দেখ সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে। এত সূর্য্য উঠ্‌ল ও ডুব্‌ল, কই ভগবান তো আমার প্রতি দয়া কল্লেন না। তাঁকে এত ডাক্‌লেম্। কই তিনি তো আমায় গ্রহণ কল্লেন না ?

বিজয়। যাও আনন্দ! তোমার এসব কথা শুন্‌তে যেন আমার কেমন লাগে! কেন ভাই! এত অল্প বয়সে মরবার জন্য বাসনা ?

আনন্দ। বিজয়! তোমার কি মনে হয়, আমি সাধ করে মরতে চাই। কে কবে সাধ করে, এই সোণার সংসার ফেলে চলে গেছে। আমি যে কেন মরতে চাই তা ভগবান জানেন। আর, তুমি ভাই! জেনেও বোঝ না, দেখ না।

বিজয়। কি বুঝবে, কি দেখ্‌বে, ? তুমি বড় দুঃখী। কিন্তু, তাই বলে কি তোমাকে এই বয়সেই মর্‌তে উপদেশ দিব ? এই সতর বছর বয়সই কি জীবনের প্রধান কাজ ? ভাই! তোমার দুঃখের দিন ফুরিয়ে আস্‌ছে, দেখ্‌বে কালে তুমি সুখী হবে।

আনন্দ। বুঝলে না বিজয়! আমার দুঃখ, তুমি বুঝেও বুঝলে না। ভাই! যখন একটী লোক স্বইচ্ছায় মর্‌তে চায়, তখন তার মনের যে কি ভীষণ অবস্থা তা লোকে বোঝে না। কে ইচ্ছা ক'রে এই সুন্দর পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যেতে চায় ? যে চায়, সে হতভাগ্য! পৃথিবী তার কাছে আগুন-ঘেরা কারাগার বিশেষ। সে সেই কারাগার হতে পালাবার জন্য পাগল-প্রায়! আমি সেই পাগল। আমার প্রাণে সুখ নাই, শান্তি নাই। আমার অতীত অন্ধকার, বর্ত্তমান-অন্ধকার, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। প্রাণে সকল সময়ই আগুন জ্বল্‌ছে। এ আগুন এখানে নিবিবার নয়। তাই দেখি ভাই! মরে ইহার হাত হতে উদ্ধার পেতে পারি কি না ?

বিজয়। আনন্দ! তুমি এসব কি বল ? কি বলছ ? এই না সে দিন বলে-ছিলে, চেষ্টা করে দেখবে অবস্থার উন্নতি কত্তে পার কি না ?

আনন্দ। বলেছিলেম সত্যি কিন্তু সেদিনকার প্রতিজ্ঞা আমার কোথায় যেন উড়ে গেছে। প্রাণটা সারাদিনই যেন কেমন করে। কি করব, কোথায় যাই ?

মার কথা, বাবার কথা, দাদার কথা সব সময়েই মনে হচ্ছে। তাঁরা সব কোথায় চলে গেলেন! আমার মনে হয়, অদৃষ্টে আরও অনেক দুঃখ আছে। চেষ্টা করে যে কিছু করতে পারব, এমত বোধ হয় না।

উভয়েই কতকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তৎপরে বিজয় বলিল, তুমি বাড়ী না গেলে, আমিও যাব না।

আনন্দ। তুমি বাড়ী যাবে না! কি বল, তুমি আর আমি?

বিজয়ের কথায় সে কর্ণপাত ও করিল না। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সে তাহাকে বাড়ী যাইবার জন্য সম্মত করাইল।

বিজয়ের পিতা চন্দ্রনাথ বাবু বহু বৎসর হইল অন্যত্র বদলী হইয়া গিয়াছেন। তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পরেশচন্দ্র আফিসে কাজ করিত। বিজয় তাহার কাছে থাকিয়া পড়িত।

পরদিবস, ভোর হইতে না হইতেই আনন্দ বিজয়ের গৃহে উপস্থিত হইল। অতি যত্ন করিয়া সে তাহার কাপড় চোপড়, গ্রন্থাদি এবং জিনিস পত্র সকল পোর্ট-মেণ্টে গোছাইয়া দিল। শেষে বিদায়ের সময় আসিল। দুই বন্ধু ষ্টীমার ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আনন্দ বিজয়ের হাত ধরিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল ভাই! বাড়ী যেয়ে চিঠি লিখো।

বিজয়। আচ্ছা। তুমিও কিন্তু লিখো। আনন্দ! তোমার জন্যে আজ প্রাণ যে কেমন কচ্ছে তা ভগবান জানেন। কোথায় দুজনে হাসতে হাসতে একত্র বাড়ী যাব, না একলা কাঁদতে কাঁদতে চলেছি!

এদিকে ষ্টীমারে সিটি দিল। আনন্দ বিজয়কে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিয়া আসিল। দুজনার চক্ষুই জলে ভরা।

ক্রমে ষ্টীমারের সিঁড়ী উঠিল। উচ্চৈঃস্বরে আর একবার সিটি দিয়া, ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। আনন্দ নদীতীরে দাঁড়াইয়া বিজয়ের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে যখন নদীর বাঁকের সহিত, ষ্টীমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তখন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সারাটীদিন, উদাসপ্রাণে সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইল। শেষে, বেলা পড়িয়া আসিলে পূর্ব্বদিন দুজনে যেখানে বসিয়া আলাপ করিয়াছিল, সেখানে

আসিয়া একবার দাঁড়াইল। সেই সন্ধ্যাকাল, সেই নদীতীর, অস্তগামী সূর্য্য তেমনি ধীরে ধীরে অপর পারে ডুবিয়া যাইতেছে। কিন্তু, পূর্ব্বদিন যাহার জন্য, তাহারা সকলে মধুময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল সে আজ কোথায়!

অনেকক্ষণ পরে বিষাদপ্রাণে সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সে রাত্রিতে লেখা পড়া কিছুই হইল না। বিছানায় পড়িয়া, সে বিজয়ের মুখখানির কথা ভাবিতে লাগিল। অনেক রাত্রিতে ঘুম আসিল।

আর বিজয়? (ক্রমশঃ)

হারু খুড়ার বিপদ

(গল্প)

আফিমের চাষ তুলিয়া দিলে যে কোম্পানী বাহাদুরের রাজলক্ষ্মীর আসন টলিবে, তাহা নিশ্চয়। খাঁটি আফিম টুকু পাওয়া যায় বলিয়া লক্ষ লক্ষ বুড়া দুই বেলা দুই হাত তুলিয়া কোম্পানীকে আশীর্ব্বাদ করে, তাহা কি কোম্পানী বাহাদুর জানিতে পারেন না? মুসলমানেরা ভাল আফিম টুকু নিজের জন্য রাখিয়া ময়লা গাদটি বিক্রয় করিত, সেই জন্যই মা চঞ্চলা চঞ্চল হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আফিমখোরের ন্যায় রাজভক্ত জাতি ভারতবর্ষে নাই, তাহার কারণ কিন্তু খাঁটি আফিম।

বুড়ার কথা শুনিয়া হাসিতেছ বাবা? কিন্তু মনে রাখিও যে তোমার ঐ ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশের তরঙ্গমালা চিরদিন থাকিবে না। ভরা যৌবনের ঢলাঢলে মুখখানি চিরদিন শতদল পদ্মের মত হাস্য বিকশিত থাকিবে না। যৌবনগর্ব্বে উন্নত দেহখানি নুইয়া পড়িবে, মাথার চুল হয় বিরল হইবে না হয় সাদা হইয়া যাইবে। তখন এই কালাচাঁদের প্রেমে মজিতেই হইবে। হারু খুড়া বুড়া, তাহার কথায় রাগ করিও না কিন্তু চল্লিশ পার হইলেই আফিম ধরিও, তাহা হইলেই হারু খুড়ার মত সত্তর আশী—খুড়ি—পঞ্চাশ ষাট বছর বাঁচিতে পারিবে।

কথাটা মনের মতন হইল না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। সত্য কথা বলিলে দুনিয়ায় সকলেই চটিয়া যায়। জগতে এক মাত্র সত্য আছে, আর সবই

মিথ্যা। কিন্তু তোমাদের সত্য আর আমাদের সত্য এক নহে। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, জগৎ, সংসার, মায়া, মোহ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সমস্তই অসার ; জগতে সার কেবল ঐ ভুবনমোহন শ্যামচাঁদ। শ্রীকৃষ্ণকেও অনেকটা সত্য বলিলেও বলিতে পার, কারণ আমার কালাচাঁদের সহিত বৃন্দাবনবিহারীর রঙের অনেকটা মিল আছে।

দেখ বাপু! হারু খুড়া বুড়া হইয়া জন্মায় নাই, তাহার এক দিন, দিন ছিল। তখন তৈলসিক্ত ঘন কালো বাবরী চুলের গোছা তাহার পিঠে লুটাইয়া পড়িত, তাহার ভ্রূযুগল দেখিলে বোধ হইত, যেন তাহা চিত্রকরে আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহার অঙ্গের বর্ণ গোলাপ ফুলের মত না হউক উজ্জল শ্যাম বর্ণ ছিল। তখন সে হুকা হাতে করিয়া দিন রাত্রি ঝিমাইত না, বা সকালে উঠিয়া সকল কাজ ফেলিয়া একটু নির্জ্জলা দুধের প্রত্যাশায় গোপনন্দিনীর গোময়লিপ্ত কুঞ্জের দুর্গন্ধময় অঙ্গনে ঘটী হাতে করিয়া হাজির থাকিত না।

তোমার হারু খুড়ার সেই দিন যখন ছিল, তখন তাহাকে দেখিয়া গ্রামে কন্যাকর্ত্তাগণ, পাগল হইয়া তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া বেড়াইত। হারাণ চন্দ্রকে জামাতা করিতে পাইবে শুনিলে তাহারা চরিতার্থ হইয়া যাইত। তখন এই বুড়া হারু খুড়ার দর খুবই চড়া ছিল। সে দিন গিয়াছে, এখনও যে টিকিয়া আছি সে কেবল ঐ কালাচাঁদের অতুল মহিমায়।

ক্রমে ঘনকুঞ্চিত বাবরী চুল পাতলা হইয়া আসিল, তখন অনেকগুলি ব্রাহ্মণের কুলরক্ষা করিয়াছি, সুতরাং উপার্জ্জনের কোন আবশ্যক ছিল না। নিশ্চিন্ত মনে মৎস্য মারিয়া দিন কাটাইয়া দিতাম। তোমরা এখন একটি বিবাহ করিয়া অকুল পাথারে ভাসিয়া বেড়াও, কিন্তু আমরা তখন স্বচ্ছন্দে দুই দশ গণ্ডা বিবাহ করিয়া নির্ব্বিবাদে দিনপাত করিতাম। কেবল একবার একটা বিপদে পড়িয়াছিলাম।

কুলীনের সন্তান, তায় অল্প বয়স, সুতরাং দুনিয়ায় কাহাকেও গ্রাহ্য করিতাম না। শুনিয়াছি সাহেব জাতির পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও পূর্ণ যৌবন থাকে, সে কালে আমাদেরও কতকটা সেই রকম ছিল, তখন আমরা তোমাদের মত ত্রিশ বৎসর বয়সে চুল পাকাইয়া বুড়া সাজিতাম না। কন্যাদায় উদ্ধার করিয়া জগতের উপকার করিয়া বেড়াইতেছি এই একটা উচ্চ ভাব সদাই মনে জাগিত।

একবার মাত্র বড় ঠকিয়া গিয়াছি, তাহাতে তখন মনে বড় দাগা লাগিয়াছিল, এখনও এই ত্রিশ বৎসর পরে দাগটা সম্পূর্ণ মিটিয়া যায় নাই। বর্ষাকাল, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আমড়া তলার ঘাটে একটা গাছের গুড়ির উপরে ছিপ গাছি হাতে লইয়া বসিয়া আছি। সকাল বেলা রাখাল হাজরার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, সুতরাং মাছ একটিও খায় নাই, কেবল দশরথ আর চিংড়ী মাছ। সকাল হইতে দুই তিন জায়গায় চার করিয়া বসিলাম, কিন্তু হাজরা পুত্রের মুখ দর্শনের এমনি গুণ যে কোন জায়গায় একটিও মাছ গাঁথিতে পারিলাম না।

উঠিব উঠিব মনে করিতেছি এমন সময় ঘাটের উপর হইতে কে বামাকণ্ঠে যদু হালদারের নাম করিয়া ডাকিল। ঘাটের উপরেই যদুর বাড়ী, সেখান হইতে যদুর স্ত্রী বলিয়া উঠিল যে যদু বাড়ী নাই মাছ ধরিতে গিয়াছে। তাহা শুনিয়া প্রশ্নকর্ত্রী ঘাটের নীচে নামিয়া আসিলেন। তিনি উপেন্দ্র ঘোষালের বৃদ্ধা পিসি। তাঁহার সহিত একটি পরমা সুন্দরী—কি বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না—যুবতী বা কিশোরী—নামিয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়া আমার আর উঠা হইল না। উপেন্দ্র ঘোষাল ব্রহ্মজ্ঞানী কসমের লোক। সে কলিকাতায় চাকরী করে, মোটা মাহিনা পায়, এবং বিস্তর উপরি রোজগার করে, শুনিয়াছিলাম তাহার একটি পরমা সুন্দরী কন্যা আছে। এই কি সেই? এই সময়ে একটা কাঁকড়া আসিয়া টোপ খুলিয়া লইয়া গেল, আমি তাহা জানিতে পারিলাম না।

উপেন ঘোষালের পিসি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হারু, তুই নৌকা বাহিতে জানিস?" আমি বলিলাম "জানি।" "বাবা, তুই আমাদের পার করিয়া দিবি?"

আমি নূতন উৎসাহে ছিপ ফেলিয়া বলিয়া উঠিলাম "দিব।" ঘাটে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি নৌকা পড়িয়াছিল, একখানা ছোট নৌকা বাছিয়া লইয়া তাহা জলে ভাসাইয়া, হালদার বাড়ী হইতে একখানা দাঁড় চাহিয়া আনিলাম, নৌকা বাহিয়া দুইজনকে পারে রাখিয়া আসিলাম।

ক্ষুদ্র নদী, তাহাতে স্রোত ছিল না সুতরাং ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইল না। ফিরিয়া আসিয়া নৌকাখানাকে ডাঙ্গায় তুলিয়া, সদানন্দ ঘটকের বাড়ী চলিলাম। তখন কাকে টোপ খাইয়া গিয়াছে, হালদার বাড়ীর ছেলে গুলা চারের মসলা জলে ফেলিয়া দিয়াছে সুতরাং মাছ ধরা অসম্ভব। সদানন্দ ঘটক ঘটককুলচূড়ামণি, এবং গ্রামের কুলীন সন্তানের একমাত্র আশ্রয় স্থল।

২

সদানন্দ ঘটক তখন চাদর খানা কোমরে বাঁধিয়া অন্য গ্রামে যাইতেছিল, আমি তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া, তাহার চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিলাম। সে দুই তিন স্থানে বিবাহের সম্বন্ধের কথা পাড়িল, কিন্তু তাহার কথার উত্তর না দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে, উপেন্দ্র ঘোষাল কি তোমায় ডাকাইয়াছিল ?" ঘটক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কই না। কেন বল দেখি ?"

"তাহার যে একটি বয়স্থা কন্যা আছে ?"

"তাত জানিতাম না। ঘোষাল বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়াছি।"

"তাহার কাছে একবার যাইতে পার ?"

"এখনই। মেয়েটির বয়স কত ?"

"তের চৌদ্দ হইবে।"

"তুমি দেখিয়াছ ?"

"এই মাত্র দেখিলাম। দেখিয়াই তোমার নিকট আসিতেছি।"

"তবে কি এখনই যাইব ?"

"যাও, আমি তোমার দাওয়ায় বসিয়া রহিলাম।"

এত ব্যস্ত কেন হে ভায়া ? ঘোষালের অবস্থা কেমন ?"

"অবস্থা খুবই ভাল, কলিকাতায় চাকরী করে, উপরি পাওনা বিস্তর।"

"তবে আমি চলিলাম, দাওয়ার কোণে তামাক টিকে আছে সাজিয়া লও, দুর্গা দুর্গা।"

তখনও আফিম ধরি নাই, তামাক সাজিয়া হুকাটী হাতে লইয়া, ভাবিতে বসিলাম। উপেন্দ্র ঘোষাল এমন সম্বন্ধ পাইয়া কখনই ছাড়িতে পারিবে না। আমি তাহার স্বঘর, তাহাদিগের মেলের শ্রেষ্ঠ কুলীন, আমাকে কন্যাদান করা তাহার পক্ষে পরম সৌভাগ্য। লোকটা অনেক টাকা রোজগার করে, তাহার একটী মাত্র কন্যা, বর পণ বলিয়া দুএক হাজার টাকা নিশ্চয়ই দিবে। বেলা পড়িয়া আসিল, ঘটক তখনও ফিরিতেছে না দেখিয়া, আর এক বার তামাক সাজিয়া লইলাম। সদানন্দ নিশ্চয়ই বিবাহের ফর্দ্দ করিতে বসিয়াছে, মোটা রকমের ফর্দ্দ, সেই জন্যই এত বিলম্ব হইতেছে। ঘটক জাতি, তাহাদিগের

প্রাণ অতি ক্ষুদ্র, সে হয়ত নিজের প্রাপ্য লইয়া গণ্ডগোল করিতেছে, মনে মনে ঘটকের উপর বড় রাগ হইল।

আবার ভাবিলাম, মতি খুড়া, রাস বিহারী ঠাকুরদা প্রভৃতি মাতব্বরগণ নিশ্চয়ই ঘোষালের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, ঘোষাল অনেক দিন পরে বাড়ী আসিয়াছে, তাহার উপর নিজ বাড়ীতে থাকিলে ঘরের পয়সা খরচ করিয়া তামাক পোড়াইতে হয়। সুতরাং ইঁহারা নিশ্চয়ই সেই খানে উপস্থিত আছেন। ইঁহারা হয়ত বিবাহের সময় সমাজের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবার ফর্দ্দ করিতেছেন। এত বড় পাকা ফলাহার অনেক দিন হয় নাই। সদানন্দ ঘটক লুচীর কথা শুনিয়া শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে। যখন এত বিলম্ব হইতেছে তখন বিবাহ বোধ হয় শীঘ্রই হইবে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, দলে দলে কুলবধূগণ নদীতে জল আনিতে চলিল। আমি তখন আর বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ঘটকের উঠানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এই সময়ে ঘটক দেখা দিল। তাহার মুখখানা খুব গম্ভীর। আমার মনে হইল যে, সে আমার নিকট হইতে বড় গোছের বিদায় মারিবার চেষ্টায় আসিতেছে। সে, তাহার গৃহে ঢুকিবার পূর্ব্বেই আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে, এত বিলম্ব কেন?" সদানন্দ কোন উত্তর না দিয়া, দাওয়ায় উঠিয়া, পা ধুইতে বসিল। আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "খবরটা কি আগে বল।" সদানন্দ পা ধুইতে ধুইতে বলিল, "ভাল জায়গায় আমাকে পাঠাইয়াছিলে, কলিকাটায় কিছু আছে?"

"অনেকক্ষণ পুড়িয়া গিয়াছে। কি হইল বল দেখি।"

"এমন স্থানেও মানুষে সম্বন্ধ করিতে পাঠায়। সে ইংরাজীনবিশ লোক, সে কি কুলশীল মানে, না কুলাচার্য্যের সম্মান রাখিতে জানে?"

"তবে করিলে কি?"

"সে তোমার সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিবে না।"

"কেন?"

"তুমি বুড়া। তাহার উপর দশ গণ্ডা বিবাহ করিয়াছ। তোমার স্বভাব চরিত্র নাকি তেমন ভাল নয়। তাহার কন্যা পারিজাতের মালা, সে এমন মালা বানরের গলায় দিতে পারিবে না।"

আমি রাগে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম, আমি হারাণচন্দ্র দেবশর্ম্মা, আমার সহিত ক্রিয়া করিতে পারিলে, বাঙ্গালা দেশের সমস্ত কুলীনের চতুর্দ্দশ পুরুষ চরিতার্থ হইয়া যায়, আমাকে এত বড় অপমান। উপেন্দ্র ঘোষাল কে? তাহাকে দেশে চেনে কে? তাহার অর্থ আছে বলে এত বড় অহঙ্কার? আমার মত কুলীন তাহার বাড়ীতে পদধূলি প্রদান করিলে তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষ নরক হইতে স্বর্গে চলিয়া যায়, সেই উপেন্দ্র ঘোষাল কি না আমাকে এত বড় অপমানটা করিল। ঘটককে জিজ্ঞাসা করিলাম "তাহার পর?" ঘটক কহিল, "আমি কি তাহাকে বুঝাইতে কম করিয়াছি।"

"সেখানে আর কেহ ছিল?"

"ছিল বই কি। মতি খুড়া, রাসবিহারী ঠাকুরদাদা, পাঁচকড়ি রায় প্রভৃতি অনেক বুড়াই ছিল। আমি মিশ্র গ্রন্থ হইতে দুই দশটা শ্লোক আওড়াইলাম, কুলীনের কুলমানের কথা বলিলাম, কিন্তু দাদা সমস্তই পণ্ড শ্রম। বেটা কলিকাতায় থাকিয়া ব্রহ্ম-দৈত্য. হইয়াছে, সে কি কুলশীল মানে? চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। মতি খুড়া কত বুঝাইয়া বলিলেন, রাসবিহারী ঠাকুরদাদা বলিলেন যে এমন সুপাত্র যখন পাওয়া গিয়াছে তখন সমাজের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করা উচিত, কিন্তু ঘোষাল কাহারও কথা কানে তুলিল না, সে বলিল যে তাহার কন্যার বিবাহ যদি নাও হয়, তথাপি সে, হারাণের সহিত কন্যার বিবাহ দিবে না। আমি অনেক বলিয়া কহিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি। দেখ ভায়া, গাঙ্গুলী বাড়ী বিবাহটা করিয়া ফেল, নগদ দুই শত টাকা—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে আমি ঘটক বাড়ী হইতে বাহির হইলাম, ক্রোধে অন্ধ হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। তখন হইতে কেমন করিয়া উপেন্দ্র ঘোষালকে জব্দ করিব ইহাই আমার একমাত্র চিন্তা হইল। ফুলের মুখুটী বিষ্ণুঠাকুরের সন্তানকে এত বড় অপমান কেহ বোধ হয় করে নাই। গ্রামে সকলেই তাহার উপরে বিরক্ত হইল, কিন্তু কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না।

৩

উপেন্দ্র ঘোষাল কন্যার বিবাহ দিতেই দেশে আসিয়াছিল। চারিদিকে পাত্রের সন্ধান হইতে লাগিল। ইংরাজী পড়া কুলীন পাত্র চাহি, কিন্তু তাহা মিলিয়া উঠা বড়ই কঠিন। তখন কুলীন সমাজে জাতি যাইবার ভয়ে কেহ ইংরাজী

লেখাপড়া শিখিতে চাহিত না, সুতরাং তেমন পাত্র মিলিল না। তখন পাষণ্ড বেটা বলিল যে সে, অঘরে কন্যাদান করিবে। তাহা শুনিয়া গ্রামের লোক ছি ছি করিয়া উঠিল, কিন্তু ঘোষাল পুত্র টলিল না।

অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার মনের মত একটি পাত্র মিলিল। পাত্র ইংরাজী জানা, তবে জাতি কুল আছে কি না সন্দেহ। মাঘ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইল, আমি ভাবিয়া আকুল হইলাম। তখনও পর্য্যন্ত ঘোষালকে জব্দ করিবার কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলাম না। সে যে আমাকে অপমান করিয়া নির্ব্বিবাদে কন্যার বিবাহ দিয়া যাইবে, ইহা কখনই সহ্য করিতে পারিব না। দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, উপেন্দ্র ঘোষালের অপমানের শোধ দিতে পারিলাম না।

সেবার বড় শীত পড়িয়াছিল. অনেক দিন এমন শীত পড়ে নাই। মাঘ মাস, পনেরো দিন ধরিয়া টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, শীতের জ্বালায় অস্থির। তিন দিন পরে ঘোষালের কন্যার বিবাহ, এমন সময়ে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন, মাথায় একটা মতলব আসিয়া গেল। এইবারে উপেন্দ্র ঘোষালকে দেখিয়া লইব। তাহাকে শুধু জব্দ করিব না, তাহার জাতি মারিয়া তবে ছাড়িব।

বর কলিকাতা হইতে বিবাহ করিতে আসিবে। তখন রেল হয় নাই, ঘোড়ার গাড়ীতে বা নৌকায় আসিতে হইত। বরযাত্রীর দল কতক পথ ঘোড়ার গাড়ীতে আসিয়া বাকী পথ নৌকায় আসিবে। হরিপুরের ঘাট অবধি ঘোড়ার গাড়ী আসিবে, সেখান হইতে আমাদিগের গ্রাম তিন ক্রোশ। যদু হালদার গ্রাম হইতে দুই তিনখানি নৌকা লইয়া গিয়া তাহাদিগকে লইয়া আসিবে। আমি স্থির করিলাম, যে নৌকার গোলযোগ করিয়া কোন মতে বিবাহের রাত্রিতে বরকে উপেন ঘোষালের বাড়ীতে আসিতে দেওয়া হইবে না। তাহা হইলে বিবাহও পণ্ড হইবে, ঘোষালেরও জাতি যাইবে।

এই সময়ে মাছ ধরিবার অছিলা করিয়া যদু হালদারের সহিত মিশিয়া পড়িলাম। হালদারের পো গাঁজা খাইত, আমিও তাহার সহিত গোপনে একটু একটু নেশা করিতে আরম্ভ করিলাম, কয়েক দিনের মধ্যে হালদার পো, আমার প্রাণের বন্ধু হইয়া উঠিল। গাঁজায় নেশাটা যখন জমিত না, তখন ভেলু সাহার দোকান হইতে রাত্রে একটু আধটু সোমরসও আমদানি করা যাইত।

নিত্যাই হালদারের নৌকায় চড়িয়া মাছ ধরিতে যাই, বাজার হাট দেখিলেই কিঞ্চিৎ সোমরস এবং গঞ্জিকা সংগ্রহ করি, মাছ ধরা বড় একটা হইয়া উঠে না। তাহাতে কিছু যায় আসে না, কারণ যদু আমার বড় বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে সে একটি পাকা মাতাল হইয়া উঠিল, তাহার জন্য তাহার স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়াছিল, ততদিন আমাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিত।

বিবাহের দিন নিকট হইয়াছে, মহাসমারোহ ব্যাপার। এত বড় ক্রিয়া গ্রামে অনেক দিন হয় নাই, মথুর রায় চৌধুরী তাঁহার কন্যার বিবাহে বড় ঘটা করিয়াছিলেন। রাস বিহারী ঠাকুরদাদা তখন ছেলে মানুষ, মতি খুড়ার তখনও জন্ম হয় নাই, কিন্তু তাহাতেও নাকি এমন ঘটা হয় নাই। বিবাহের সাত দিন আগে ভিয়ান বসিয়াছে। ঘোষালের বাহির বাড়ীর উঠানে মস্ত আটচালা বাঁধা হইয়াছে, তাহাতে দশ বার জন লোক দিবা রাত্রি ভিয়ান করিতেছে। গোয়ালা বেটারা ক্ষীর দধির বায়না পাইয়া, দুধের বদলে কেবল জল বেচিতেছে, ভাগ্যে তখনও কালাচাঁদের প্রেমে মজি নাই, তাহা হইলে আর কি রক্ষা থাকিত?

সমস্ত ঠিক ঠাক, আমিও প্রস্তুত। ভিন্ন গ্রামে তিন খানা নৌকা বায়না করিয়া রাখিয়াছি, তাহারাও সেই দিন হরিপুরের ঘাটে উপস্থিত থাকিবে। কোন মতে বরযাত্রীগুলাকে ভুলাইয়া, সেই নৌকায় তুলিতে পারিলেই কিস্তিমাত। তথাপি সদাই ভয়ে বুক কাঁপিত, যদি ফস্কাইয়া যায়, তাহা হইলেই ত সব মাটি। এত যত্ন, এত পরিশ্রম সমস্তই বিফল হইবে। এক মুঠা টাকা খরচ করিয়া জেলে বেটাকে মদ ধরাইয়াছি, তাহাও জলে পড়িবে। বারোয়ারি তলায় যখন কেহ না থাকিত, তখন কালীর বেদীতে গিয়া মাথা কুটিতাম, এবং মনে মনে বলিতাম "হে মা কালী, উপেন ঘোষালের মেয়ের বিয়ে যদি পণ্ড হইয়া যায়, তাহা হইলে বার মায়ে বার জোড়া পাঁঠা দিয়া পূজা দিব।"

ঘোষালের ভগিনীপতি বাঙ্গাল আনন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর আনিতে কলিকাতায় গিয়াছে। সে আমাদের দেশের পথঘাট ভাল রকম চিনে না, কিন্তু সে, গিয়াছে বলিয়া আর কেহ বর আনিতে হরিপুরে গেল না। যদু হালদার মধ্যাহ্নে নৌকা লইয়া হরিপুরে যাত্রা করিল, আমি পরমানন্দে গ্রামের সীমার বাহিরে তাহার নৌকায় চড়িয়া বসিলাম।

বৈকাল বেলাই নৌকা হরিপুরেব ঘাটে লাগিল, তখন তিন খানি নৌকা

বই অন্য নৌকার দাঁড়ি মাঝি নেশায় ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। সকাল হইতে মেঘ করিয়া আছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়িতেছে, বড়ই শীত। হরিপুরে পৌছিতে সমস্ত মাল মসলা ফুরাইয়া গিয়াছিল, হরিপুরের বাজারে গিয়া আর এক দফা সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যদু হালদার ও সমস্ত দাঁড়ি মাঝি নেশার ঘোরে অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

বরযাত্রীর গাড়ী আসিলে সমস্ত বরযাত্রী সমেত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার নৌকা তিন খানায় চড়াইয়া দিয়া আমি অন্ধকারে সরিয়া পড়িলাম। মাঝি-দিগকে বলা কওয়া ছিল তাহারা অন্ধকারে নৌকা বাহিয়া, উল্টা পথে তাহা-দিগকে কামার পাড়ায় লইয়া গেল। কামার পাড়া আমাদিগের গ্রাম হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে।

এক খানা ছোট জেলে ডিঙ্গি লইয়া, রাত্রি এক প্রহরের সময় গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম। তখনও বর আসিয়া পৌছায় নাই বলিয়া, ঘোষাল বাড়ী মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। লোক জন চারি দিকে ছুটাছুটি করিতেছে। দশ খানা গ্রামের ব্রাহ্মণ উপস্থিত, খাদ্যদ্রব্যাদি সমস্তই প্রস্তুত। সন্ধ্যার লগ্ন পণ্ড হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দুই প্রহর রাত্রিতে আর একটা লগ্ন আছে। দূরের কন্যা যাত্রীরা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহারা আহার করিয়া বাড়ী ফিরিতে পারিলে বাঁচে।

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতেও বর আসিয়া পৌছিল না। দেখিয়া, সকলেই বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। লোক পাঠাইবার কথা হইল, কিন্তু লোক যাইবে কেমন করিয়া, গ্রামে আর নৌকা নাই, যে তিন খানি নৌকা ছিল, যদু হালদার তাহা লইয়া গিয়াছে। বর তখন কামার পাড়ার ঘাটে, বরযাত্রীরা উপেন্দ্র ঘোষালের সন্ধান করিতেছে।

৪

দুই প্রহর রাত্রির লগ্ন কাটিয়া যায় দেখিয়া মতি খুড়া বলিয়া উঠিলেন, "যখন আত্যুতিক হইয়া গিয়াছে, তখন আজ রাত্রিতেই কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে।" উপেন্দ্র ঘোষাল প্রথমে তাহার কথা কানে তুলিল না, কিন্তু দশ খানি গ্রামের লোক একত্র হইয়া একই কথা বলিতে লাগিল, তখন ঘোষাল পুত্র বড়ই বিপদে

পড়িল। এই সুযোগে অন্দর মহলে তাহার পিশি ক্রন্দন জুড়িয়া দিলেন, চারি দিক হইতে গোলমাল আরম্ভ হইল।

বৃদ্ধগণ গ্রামের দুই একটী পাত্রের নাম করিলেন কিন্তু তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তখন আমার চির সুহৃদ্ সদানন্দ ঘটক সময় বুঝিয়া বলিয়া উঠিল, "এই গ্রামে হারাণ মুখোপাধ্যায়ের তুল্য আর উপযুক্ত পাত্র নাই।" উপেন্দ্র ঘোষাল কোন কথা কহিল না দেখিয়া, মতি খুড়া আমার পক্ষ হইয়া দুই একটি কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রাস'বিহারী ঠাকুরদাদাও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন, ঘোষালের মন ভিজিল।

আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। ভাবিয়াছিলাম কলিকাতার পাত্রের সহিত ঘোষালের কন্যার বিবাহ হইতে দিব না, সেই রাত্রিতে বিবাহ বন্ধ করিয়া ঘোষালের জাতি মারিব। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, ভগবান অলক্ষিতে পারিজাতের মালা আমার গলায় পরাইয়া দিবেন। আমার সাধনার ধন, যে সেই রাত্রিতে আমার হইবে তাহা আমি কখনই মনে করি নাই। মতি খুড়া আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন বিবাহে আমার মত আছে কি না? তখন আমি আনন্দে হাসিয়া ফেলিলাম।

স্নান করিয়া চেলির জোড় পরিতে যাইতেছি, এমন সময়ে বাধা উপস্থিত হইল। ঈশান খুড়া দূর সম্পর্কে আমার খুড়া। বুড়ার বয়স তখন আশী বৎসর, কি নব্বই বৎসর, বুড়া চোখে দেখিতে পায় না। তথাপি ক্ষীর, দধি, মিষ্টান্নের লোভ ছাড়িতে না পারিয়া বুড়া নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছে, বুড়া বেটা যদি সেই দিন না আসে, তাহা হইলে তখনই নির্ব্বিবাদে আমার বিবাহটা সম্পন্ন হইয়া যায়। আমাকে চেলি পরিতে দেখিয়া বেটা কি বলিয়া উঠিল জান? "কি মতি ভায়া, ব্যাপারটা কি?"

মতি খুড়া বলিলেন, "উপেন ঘোষালের জাতি যায়, আপনি অনুমতি করুন সে হারাণকে কন্যাদান করিয়া কুলরক্ষা করুক।"

বুড়া টাকপড়া মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, "এ কার্য্য ত কুলীনেরই কর্ত্তব্য কিন্তু হারাণও বিবাহ করিতে পারিবে না।"

আমার মাথায় যেন এক সঙ্গে সহস্র বজ্রাঘাত হইল, আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। মতি খুড়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ঈশান দাদা, কি হইয়াছে?"

"হারাণের যে কালাশৌচ, সাত মাস পূর্ব্বে উহার এক বিমাতার মৃত্যু হইয়াছে। স্বর্গীয় দাদা মহাশয় বিক্রমপুরে যে বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার কাল হইয়াছে।"

আমার পায়ের তলা হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া গেল, আমি মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। চাঁদ হাতে পাইয়াও পাইলাম না, আশা ভরসা সমস্তই ফুরাইল। একবার ভাবিলাম বুড়া বেটার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলি, কিন্তু তাহাতেই বা কি ফল হইবে। ঘোষালের কন্যা ত'এ জন্মের মত আমার হাত ফস্‌কাইয়া গেল। নিজের অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিতে দিতে চেলির জোড় খুলিয়া ফেলিলাম।

বুড়া, কাশরোগগ্রস্ত নবীন গাঙ্গুলীর সহিত ঘোষালের কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। শেষ রাত্রিতে ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের দল খাইয়া বাঁচিল। উপেন্দ্র ঘোষাল কন্যার বিবাহ দিতে মরমে মরিয়া গেল, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমিও মরিলাম। বহু কষ্টে অপমানের প্রতিশোধ লইলাম, ঘোষালকে জব্দ করিলাম বটে, কিন্তু মনে হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমিও জব্দ হইয়া গেলাম।

পরদিন প্রভাতে দন্তহীন লোলচর্ম্ম যমদ্বারের যাত্রী নবীন গাঙ্গুলী যখন নববধূ লইয়া বিদায় হইতেছে, তখন আনন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার বর লইয়া উপস্থিত হইলেন। উপেন্দ্র ঘোষাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, আবার মহাগোলমাল উপস্থিত হইল, সকলেই আমাকে খুঁজিতে আরম্ভ করিল, আমি বেগতিক দেখিয়া চম্পট দিলাম।

যথাসময়ে নববধূ লইয়া নবীন গাঙ্গুলী বাড়ী ফিরিল। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন জীবিত থাকিতে হইল না, তাহার কাশ রোগ সত্বর তাহার পরমায়ু ক্ষয় করিয়া তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিল। দুই একজন করিয়া গ্রামের লোক জানিতে পারিল যে, আমিই যদু হালদারকে মদ খাওয়াইয়া বর অন্য নৌকায় কামার পাড়া পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। প্রথমে উপেন্দ্র ঘোষালের বাড়ীর দুই একটা ছোঁড়া একটু তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছিল বটে কিন্তু ক্রমশঃ তাহা থামিয়া গেল। আমিও নিশ্চিন্ত মনে পূর্ব্ববৎ হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

উপেন্দ্র ঘোষাল জব্দ হইল বটে, কিন্তু আমিও একটু জব্দ হইলাম, একটু কেন, বিশেষ জব্দ হইলাম। সেই দিন হইতে বুকে একটা বিষম বোঝা চাপিয়া গেল, তাহা কিছুতেই নামাইতে পারিলাম না। সর্ব্বদাই মনে হইত বড়

শীকারটা হাতছাড়া হইয়া গেল, এমন ভাবে হাত ফস্‌কাইয়া গেল, যে আর কোন উপায় রহিল না। বরাত, বরাত, সকলই অদৃষ্টের দোষ। এক একবার বুড়া ঈশান খুড়া বেটার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্তপান করিবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু কি করিব কোম্পানীর রাজত্ব। অনেকগুলি ব্রাহ্মণীর হাতের নোয়া বজায় রাখিতে হয়, কাজে কাজেই খুড়া বেটা এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল। হরি নারায়ণ, হরি নারায়ণ, কালাচাঁদ তুমিই সত্য।

ঘোষালের কন্যার বিবাহের পরে তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই তিন বৎসরের মধ্যে একটি ব্রাহ্মণেরও কুলরক্ষা করি নাই, মন বড়ই খারাপ। সদানন্দ ঘটক দুই বেলা হাঁটাহাঁটি করে, এবং নিত্য আমার দাওয়ায় বসিয়া দশ বার ছিলিম করিয়া তামাক পোড়ায়। বিবাহে আর আমার মতি গতি নাই, মন বড়ই খারাপ। মাসিমা মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করেন, কিন্তু তাহা আমি বড় একটা গ্রাহ্য করি না, অবশেষে গ্রাহ্য করাইল ভগবান।

সে বৎসরটা বড়ই দুর্ব্বৎসর, পয়সা কড়ির বড়ই টানাটানি। সমস্ত শ্বশুর বাড়ী হইতে খাজানা আদায় করিয়া বর্ষার শেষে দেশে ফিরিলাম, তথাপি অভাব ঘুচিল না। সদানন্দ ঘন ঘন হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল, মাসিমার ক্রন্দনের সুর সপ্তমে চড়িয়া উঠিল। কি করি, কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না, অগত্যা হরিহর পাড়ার হরিবিনোদ ভট্টাচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলাম। অনেক দিন পরে সদানন্দ ঘটকের মুখে হাসি ফুটিল।

বড়ই অভাব সুতরাং শুভ কর্ম্মটা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই বিবাহ। কুলীনের বিবাহ, সুতরাং তোমাদের বিবাহে যেমন গণ্ডগোল হয়, তেমন কিছুই হইল না। বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে সদানন্দ ঘটক ও পরাণ নাপিতকে লইয়া যাত্রা করিলাম। বিবাহের দিন সকাল বেলা হরিহর পাড়ায় পৌছিলাম। মনটা হঠাৎ খারাপ হইয়া গেল, বাম চক্ষুটা নাচিতে লাগিল, বড় ভয় হইল।

বিবাহের আসরে উপস্থিত হইয়া দেখি সর্ব্বনাশ। সেখানে উপেন্দ্র ঘোষাল ও যম দূতের মত তাহার দুই পুত্র উপস্থিত। সুরেন্দ্র আর নরেন্দ্র এক একজন যেন এক একটা মহিষ অবতার। সম্প্রদানের পূর্ব্বে নিয়ম মত পণের টাকা

চাহিলাম, হরিবিনোদ একখানি থালায় করিয়া এক ত্রিশটী টাকা লইয়া আসিল, দেখিয়া আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। সদানন্দ বলিয়াছিল যে, সে পাঁচশত টাকা বরপণ ধার্য্য করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে খুঁজিলাম, কিন্তু পাইলাম না।

আমি তখন বাঁকিয়া বসিলাম, বলিলাম "পূরা টাকা না পাইলে কখনই বিবাহ করিব না।" তখন উপেন্দ্র ঘোষাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে বরপণ স্থির করিয়াছে?" আমি বলিলাম "সদানন্দ ঘটক ধার্য্য করিয়াছে।" তখন হরিবিনোদ আসিয়া কহিল "বরপণ কিছুই ধার্য্য হয় নাই, ভঙ্গ কুলীনের মর্য্যাদা বলিয়া একত্রিশটী টাকা দিতেছি।" আমার প্রধান সাক্ষী সদানন্দ ঘটক তখন গরহাজির, সুতরাং আমি হারিয়া গেলাম। সভাস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ একবাক্যে বলিল যে, উপযুক্ত মর্য্যাদা হইয়াছে, এবং আমাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিল।

বড়ই বিপদে পড়িলাম, আমার ত ধর্ম্মপত্নীর অভাব নাই, অভাব কেবল কাঁচা পয়সার। সেই পয়সাই যদি না পাইলাম, তবে বিবাহ করিয়া লাভ কি? আমার দলে মাত্র একজন লোক, সে বুড়া পরাণ নাপিত। উপেন্দ্র ঘোষালের যে দুইটা মহিষের মত পুত্র দেখিতেছি তাহারা এখনি মারিয়া আমাদিগকে গুড়া করিয়া ফেলিবে। অভাব বড় কঠিন জিনিষ বাবা! কি করি প্রহারের ভয় সত্ত্বেও বলিয়া বসিলাম যে, পাঁচশত টাকা না পাইলে আমি বিবাহ করিব না। আসরের লোক চটিয়া আগুন হইয়া গেল, তাহারা বলিল বিবাহ করিতেই হইবে! আমিও কোন মতে বিবাহ করিব না, ক্রমে ঝগড়া হইতে মারামারি আরম্ভ হইল, উপেন্দ্র ঘোষালের দুইপুত্র প্রহার করিয়া আমার হাড় ভাঙ্গিয়া দিল, পরাণ নাপিত ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, আমি চৈতন্য হারাইয়া পড়িয়া গেলাম।

যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম আমার হাত পা বাঁধা, একটা অন্ধকার ঘরের ভিতরে পড়িয়া আছি। বাহিরে বাজনা বাজিতেছে, হুলুধ্বনি হইতেছে, বুঝিতে পারিলাম হরিবিনোদের কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে, সমস্তই উপেন্দ্র ঘোষালের চক্রান্ত। সেই সদানন্দ ঘটককে হাত করিয়া, আমার এই লাঞ্ছনা করিল। এখন উপায় কি? কি করিয়া অব্যাহতি পাইব? আমার যতদূর দুর্গতি করিবার তাহা ত ইহারা করিয়াছে, তথাপি বাঁধিয়া রাখিয়াছে কেন? ইহারা কি আমাকে প্রাণে মারিবে? মারিয়া কোম্পানীর রাজত্ব ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? আবার ভাবিলাম আমি যদি প্রাণে মরিলাম,

তাহা হইলে উপেন ঘোষালের ফাঁসী হইল বা না হইল তাহাতে আমার লাভা-লাভ কি ? মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে ঘরের দুয়ার খুলিয়া প্রদীপ হস্তে একটি বিধবা রমণী সেই ঘরে প্রবেশ করিল। প্রদীপটি কুলুঙ্গীতে রাখিয়া রমণী বলিল, "হারু খুড়া, ইহারা আপনাকে পুলিশে দিবে বলিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে।" আমি কাতর কণ্ঠে কহিলাম, "তবে কি হইবে ?" "এখনও বিবাহ লইয়া সকলে ব্যস্ত আছে, আমি আপনার বাঁধন কাটিয়া দিতেছি, এই বেলা পালান।"

রমণী কে ? তাহাকে প্রথমে চিনিতে পারি নাই। প্রদীপের আলোকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, হঠাৎ পুরানো কথা মনে পড়িয়া গেল, সে উপেন্দ্র ঘোষালের বিধবা কন্যা। তাহার শীর্ণ উপবাসক্লিষ্ট মুখখানি হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইতেছিল। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে তাহাকে যেন শিশিরসিক্ত শেফালিকার মত দেখাইতেছিল। আমাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া সে বলিল "হারু খুড়া, বিলম্ব হইলে ধরা পড়িবেন। আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না ?"

তাহাকে কি বলিব খুঁজিয়া পাইলাম না, চিনিয়াছি, বিলক্ষণ চিনিয়াছি। আমিই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আমিই তাহার বালবৈধব্যের একমাত্র কারণ, ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম যে তাহাকে চিনিয়াছি। সে কহিল "তবে উঠুন, আর বিলম্বে কাজ নাই।" সে আমার বাঁধন কাটিয়া দিল, আমি উঠিয়া দাঁড়াই-লাম। সে তখনও মূর্ত্তিমতী করুণার মত জানালার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার শান্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল করুণ মূর্ত্তিটি এখনও আমি দেখিতে পাইতেছি। যে দিন নদীর ঘাটে তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম সে দিন তাহার রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম, সে সৌন্দর্য্যে তীব্রতা ছিল, মাদকতা ছিল, আমি তাহাতে মোহিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আজ তাহার শুষ্ক মুখের অপূর্ব্ব প্রভা সহ্য করিতে না পারিয়া আমার দৃষ্টি মুখ হইতে নামিয়া চরণতল আশ্রয় করিল।

আমার অত্যাচারে তাহার এই দশা হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার পিতা ও ভ্রাতা আমার অশেষ লাঞ্ছনা করিয়াছে। সে যদি অধিক-তর অত্যাচার করিতে বলিত, তাহা হইলেও আমি বিস্মিত হইতাম না। কিন্তু

সে দয়াপরবশ হইয়া আমাকে বাঁচাইল, আমাকে উদ্ধার করিল কেন? তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মনে বড় ব্যথা লাগিল, সেই ব্যথা মুছিয়া ফেলিবার জন্য দেশে ফিরিয়াই আফিম ধরিয়াছি।

শ্রীকাঞ্চনমালা দেবী।

বিক্রমপুর-প্রসঙ্গ

জীবন সমস্যা—বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে বিশেষতঃ বিক্রমপুরবাসীর জীবনোপায়ের নূতন পথ নির্দ্ধারণ করা বিশেষ দরকার। চাকুরী ওকালতি, কিম্বা চিকিৎসা ব্যবসায়ে বহুলোক নিযুক্ত আছে। প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যতসংখ্যক যুবক উপাধি পাইয়া থাকে তাহাদের সকলের চাকুরী ইত্যাদিতে সংকুলান হওয়া অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত কত লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি না পাইয়াই শিক্ষা সমাপ্ত করিতেছে। তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্যে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। ইংরেজ ও মারোয়াড়ীদের আদর্শ আমাদের নয়নসমক্ষে দেদীপ্যমান। আমাদের দেশস্থ সাহা ও বণিক্য প্রভৃতির নিকট হইতে অনেক শিক্ষা করিতে পারি। এখন ব্যবসা বাণিজ্য এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রমজাত শিল্প প্রভৃতির উন্নতিকল্পে ব্যাপৃত না হইলে মধ্যবিত্তাবস্থাপন্ন ভদ্রলোকগণের কষ্টের অবধি থাকিবে না। বিক্রমপুরবাসীদের এ বিষয়ে বিশেষ অনুধাবন করা উচিত।

* * *

আত্মশক্তি বা আত্মনির্ভর—আমাদের নাই বলিলেই হয়। আমরা সব কাজেই পরমুখাপেক্ষী। পাঠ্যাবস্থায় শিক্ষক ও Key note এর উপর নির্ভর করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, পরে চাকুরীর জন্য মুরুব্বির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি। আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করিতে কোন দিনই শিক্ষালাভ করি না। তাহারি ফলে স্কুল-কলেজ হইতে বাহির হইয়াই পৃথিবী অন্ধকারময় দেখি। জীবন-সংগ্রামে অপটু ভাবিয়া স্রোতে গা ভাসাইয়া দেই।

কোন স্থির আকাঙ্ক্ষা কোন দিনই থাকে না। ফলাফল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবার শক্তিও আমাদের অতি অল্প সংখ্যকেরই আছে। পূর্ব্বাপর লোকে যাহা করিয়াছে তাহাই করিতে উদ্যত হই। বাস্তবিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আমরা আরও নির্জ্জীব হইয়া পড়ি। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার ক্ষমতা আদৌ থাকে না। এ বড় বিষম অবস্থা। আত্ম-নির্ভর করিতে না শিখিলে আমাদের দুঃখ কষ্টের অবসান হইবে না। অন্নচিন্তারূপ বিষম দুর্ব্বলতা হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারিব না। প্রকৃতপক্ষে মানসিক দুর্ব্বলতাই সর্ব্ববিধ দুঃখ কষ্টের নিদান।

* * *

গ্রাম্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—গ্রামবাসীর দুইটী জিনিষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন—এক স্বাস্থ্য অপর শিক্ষা। এ দু'টীর প্রতি প্রত্যেক গ্রামবাসীরই মনোযোগী হওয়া দরকার। সামান্য কায়িক শ্রমে ও অর্থব্যয়ে আমরা অনেক রোগ-পীড়া হইতে অতি সহজে মুক্তি লাভ করিতে পারি। গ্রামে ক্রমশঃই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। তৎসম্বন্ধে আমাদের বিধিব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। পূর্ব্বপুরুষেরা এ কার্য্য করে নাই বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। সেকালে ও একালে প্রভেদ অনেক। তখন এত অধিক ব্যাধি পীড়া ছিল না। এখন নানা প্রকারের আধিব্যাধির আবির্ভাব হইয়াছে। ম্যালেরিয়া রোগ দেশের অনেক অনিষ্ট করিতেছে। গ্রামবাসী প্রত্যেকেই তাহার বাড়ীর নিকটস্থ জঙ্গলাদি সহজেই পরিষ্কার করিতে পারেন। গ্রাম্যলোকের সমবেত চেষ্টায় পুষ্করিণী খনন, প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ইত্যাদি বিবিধ গ্রাম্য হিতজনক কার্য্য অতি সহজে নিষ্পন্ন হইতে পারে। প্রত্যেকে এ বিষয়ে অল্প-বিস্তর মন দিলে গ্রামের প্রভূত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা।

* * * * *

'প্রখ্যাতনামা কবি—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় 'প্রেম ও প্রদীপ' এবং 'অন্তর্য্যামী' নামে দু'খানা অভিনব কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থ দু'খানা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। আইনের নীরস কূট তর্কের মধ্যে যিনি দিবারাত্রি ডুবিয়া থাকেন তাঁহার হৃদয়শতদলের মাঝখানে কোন্ ছলে যে দেবী বীণাপাণি তাঁহার আসনখানি পাতিয়া বীণার ঝঙ্কারতানে সুপ্ত কবিহৃদয়

জাগাইয়া তুলিল তাহা বিস্ময়কর বিষয় বটে! আমরা গ্রন্থ দু'খানা দেখিবার প্রত্যাশায় উৎসুক হইয়া রহিলাম। * * * *

শিক্ষার নিমিত্ত যে দান তাহাই মহৎ দান। আমাদের দেশে সেরূপ দান বিরল নহে। পূর্ব্বে টোলের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ নিজেরা শাকান্ন খাইয়াও বহু বিদ্যার্থিগণকে নিজগৃহে রাখিয়া বিদ্যাদান করিতেন। এখন সে দিন আর নাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিক্রমপুরস্থ মুন্সীগঞ্জে একটী কলেজ স্থাপনের জন্য আজকাল আন্দোলন হইতেছে, এক সময়ে ভাগ্যকুলের অন্যতম প্রখ্যাতনামা ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কলেজ স্থাপনের জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, দৈব প্রতিকূলতা বশতঃ তখন তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আর যে হইবে সে আশাও অতি অল্প—অথচ প্রত্যেক বিক্রমপুরবাসীই মর্ম্মে মর্ম্মে উহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র বাবু শিক্ষার নিমিত্ত দানে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। ভাগ্যকুল স্কুলের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় ভার বহন করিয়া তিনি স্কুলটিকে দিন দিন উন্নত করিতেছেন।

বিক্রমপুরে যাঁহারা শিক্ষার নিমিত্ত দানে মুক্তহস্ত তাঁহারা দেশের ও দশের ধন্যবাদভাজন। * * * * *

দেশের প্রতি সকলেরই কর্ত্তব্য সমভাবে বিরাজমান। ধনী ও দরিদ্র বলিয়া এক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য থাকিতে পারে না। বিদুরের ক্ষুদ্রদানে জগৎ-পতি তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু রাখালবালকগণের দেওয়া বনফুলও কি তিনি উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন! আমি ক্ষুদ্র, আমি দীন আমি নিজ বাসগ্রামের কি করিতে পারি? এ বিশ্বাস কোন গ্রামবাসীরই থাকা ভাল নহে। দেশ জননীর নিকট সকলই সমান। যাহার যেমন শক্তি সে ত ততটুকু করিবে। তাহাতে লজ্জা কি? কবিতায় কাঁদা আর গানে বন্দনা গাহিয়া আসর মাতান অপেক্ষা যাহারা গ্রামে রহিয়া শতকষ্ট সহিয়া গ্রাম্য হিতজনক কার্য্যে মননিবিষ্ট করেন, হাতে কলমে কাজ দেখান তাঁহারা অনেক পূজনীয়। ছোট বলিয়া দীন বলিয়া যাঁহারা দূরে থাকিতে চাহেন, তাঁহাদিগের মনে রাখা উচিত—

আমার কি লাজ? আমি ততটুকু দিব
তুমি দেহ যেটুকুর ভার।

* * * * *

জৈনসার গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দত্ত এম. এ. বি. ই. মহাশয় নিজ গ্রামস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ মাসিক ২৫৲ পঁচিশ টাকা হারে চাঁদা দিতেছেন। করুণা বাবুর এই মহৎ আদর্শ—বিক্রমপুরস্থ ধনী মহোদয়গণের আদর্শ হওয়া উচিত।

*   *   *   *   *

গ্রামের লোক কলহপ্রিয়, দলাদলিপ্রিয়, পরশ্রীকাতর, অলস এইরূপ কথা প্রবাসী বিক্রমপুরবাসী অনেককেই বলিতে শোনা যায়। তাহাদের এ নিন্দা সত্য হইতে পারে কিন্তু সেই সত্যের জন্য দায়ী কে? যাহারা বিদেশবাসী তাহা-রাই কি নির্দ্দোষ? গ্রামের ভাল মন্দের জন্য দেশবাসী এবং প্রবাসী সকলেই দায়ী। যাহারা বিদেশে থাকেন যাহারা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাহারা কি কখনও অহমিকার আচরণটুকু ফেলিয়া কুটীরবাসী নিঃসম্বল প্রতিবেশীর সহিত মিশিতে গিয়াছেন, না নিজেদের অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞানরাজিদ্বারা তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন? পরনিন্দা অতি সহজ, পরের প্রশংসা করিবার শক্তি লাভ অতি কঠিন কথা। যাহারা গ্রামবাসীর নিন্দা করেন তাহারা স্বীয় সকর্ম্ম আদর্শ দ্বারা গ্রামবাসীদের চিত্তে সত্য ও মহত্বের বীজ বপন করিতে চেষ্টা করুন, ভাল ফসল নিশ্চিতই ফলিবে। গ্রামে বহু মহাপ্রাণ কর্ম্মী আছেন কিন্তু কে তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন। সংসারে আত্ম-সুখ ও আত্ম-পরিজনের সন্তোষ বৃদ্ধির জন্যই সকলকে সচেষ্ট দেখা যায়, পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে সকলেই পরাঙ্মুখ। চিরকাল পরমুখাপেক্ষী হইয়া না থাকিয়া যাহার যখন যেরূপ অবসর হয় তখন তিনি সেই অবসরে দেশের মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করুন।

*   *   *

ভাগ্যকূলের স্বনামপ্রসিদ্ধ জমিদার রাজকীয় মন্ত্রণা-সভার সভ্য মাননীয় শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় মহাশয় মুন্সীগঞ্জে জলের কল স্থাপনের ব্যয়ভার বহন করিয়া বিশেষ কল্যাণ করিয়াছেন। তাঁহার এ দানে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে মুন্সীগঞ্জে ওলাউঠার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইত, পূর্ব্বা-পেক্ষা তাহা বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। ধনী সন্তানেরা ইচ্ছা করিলে নানারূপে দেশে বিবিধ সৎকার্য্য করিতে পারেন। বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামেই বহু

দীঘি-পুষ্করিণী আছে, অধিকাংশ দীঘি-পুষ্করিণীই প্রাচীন এবং তাহার জল অশেষ রোগের নিদান। এই সমুদয় পুষ্করিণী ইত্যাদির সংস্কার করিলে দেশের কত না উপকার হয়। প্রত্যেক গ্রামবাসীই ইচ্ছা করিলে প্রতি বৎসর এক একটী করিয়া পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে পারেন।

* * *

পূজা আসিতেছে। মা আনন্দময়ীর শুভাগমনে নির্জীব দেশ আবার কিছু দিনের জন্য সজীব হইয়া উঠিবে। পরিত্যক্ত পল্লীগ্রামসমূহ আবার কিছুদিনের জন্য বিদেশপ্রত্যাগত যুবকগণের, 'চাকুরিয়া'গণের কল-কোলাহলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। বিক্রমপুরের একঘেয়ে গ্রাম্য জীবনে একটা নবীনতার হিল্লোল প্রবাহিত হইবে। আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি যে গ্রামগুলির সংস্কার-সাধনে গ্রামবাসীমাত্রেরই একান্ত মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। আত্ম-নির্ভরতা ব্যতীত কোনও কার্য্য চলিতে পারে না। লোক্যালবোর্ড বা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের উপর পুষ্করিণী খননের বা রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়া গ্রামবাসিগণ নীরবে বসিয়া থাকিলে চলিবে কি? নিজ নিজ গ্রামের উন্নতি-কল্পে গ্রাম্য যুবক-গণের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি শারদীয় উৎসব উপলক্ষে যুবকগণ নিজ নিজ বাস পল্লীতে যাইতে ভুলিবে না, বাড়ী যাইয়া তাহারা সম্মিলিত হইয়া দেশের যে কোন কল্যাণজনক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারে। নিজ নিজ বাড়ীর জঙ্গল পরিষ্কার, পুষ্করিণীর পানা ইত্যাদি দূর করা, গ্রাম্যবালিকাগণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা, পাঠাগার স্থাপন, ক্রীড়া কৌতুক এবং নির্দ্দোষ আমোদ দ্বারা গ্রামে নবজীবন সৃষ্টি করেন তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই দেশের শ্রী ফিরিতে আরম্ভ করিবে। চেষ্টা, যত্ন করিলে কোন কার্য্য সফল হয় না ইহা আমরা মনে করি না। বিক্রমপুরের এমন অনেক গ্রাম আছে যে যে স্থানে গ্রাম্য যুবকগণের চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা বিবিধ কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছে। মুখে মুখে বড় বড় দেশ-হিতৈষিতার কথা বলা অপেক্ষা সামান্য গ্রাম্য হিতজনক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে পারিলে অনেক লাভ।

* * * *

সরোজিনী নাইড়ু।

বিক্রমপুর

২য় বর্ষ	কার্ত্তিক ; ১৩২১	৭ম সংখ্যা

বিক্রমপুরের আটপাড়া কালীবাড়ী

আটপাড়া গ্রামস্থিত প্রসিদ্ধ কালীমাতা বহুকালাবধি লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন কিন্তু উক্ত মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কৌতূহলোদ্দীপক ইতিবৃত্ত অনেকেরই অবিদিত। আমরা আজ তাহাই বলিতে যাইতেছি।

এই গ্রামে একটী শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত আছে। এই লিঙ্গমূর্ত্তি স্বর্গীয় রামলোচন চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুমান ১৫০।১৭৫ বর্ষ পূর্ব্বে কাশী হইতে আনিয়া স্থাপন করেন। ইহার কয়েক বর্ষ পরে আটপাড়া গ্রামে জ্বররোগের ভয়ঙ্কর প্রকোপ দেখা দেয়; জ্বরের ভীষণ আক্রমণে প্রতি গৃহেই রোগীর মর্ম্মন্তুদ করুণ আর্ত্তনাদ শ্রুত হয় ও বহুলোকে উহার তাণ্ডব উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া অকালে কালের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণকরতঃ শান্তি লাভ করে। এবম্বিধ দৈবদুর্ব্বিপাকে নিরীহ গ্রামবাসীদের প্রাণে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হয়, কাজেই মহামারীর প্রতিষেধক দৈব উপায়াবধারণার্থ এক বৈঠক বসে ও পরামর্শ ক্রমে দক্ষিণাকালীর পূজা দেওয়া স্থিরীকৃত হয়।

প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের একপাশে চালা তুলিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে যথারীতি মৃন্ময় মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে পূজা দেওয়া হয়। পূজা-অন্তে যে দিন চালা খুলিয়া ফেলা হয় সে দিন অবিরলধারে বহুক্ষণব্যাপী বারিপাত হয় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রবল বারিপাতসত্বেও অনাচ্ছাদিত মৃন্ময় মূর্ত্তিখানা গলিয়া না যাইয়া বরং উজ্জল

মূর্ত্তি ধারণ করে। এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব অসম্ভাবিত ব্যাপারে বিস্ময়াবিষ্ট স্থানীয় জনসঙ্ঘের চিত্তে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

সেই দিন রাত্রিতে উক্ত গ্রামবাসী স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীকে কালী-মাতা স্বপ্নে দর্শন দিয়া এইরূপ বলিয়া যান, "আমি বৃষ্টিতে ভিজিয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছি ও তোদের ঘরের পেছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাল কাটাইতেছি, তোরা আমাকে একখানা ঘর করিয়া দে।"

সেই রাত্রিতেই শ্রীরাধাচরণ দের পিতামহীও স্বপ্নযোগে কালীমাতাকে উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রাঙ্গণে ঘুরিতে দেখিতে পান। পরদিন প্রাতে উক্ত স্ত্রী-লোকটী স্নানান্তে শুচি হইয়া মাতৃমূর্ত্তি-সমীপে উপনীত হইবা মাত্রই সেখানে তাহার 'বায়াল' হয় অর্থাৎ অচৈতন্যাবস্থায় দেবীর আদেশবাণী তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। বায়ালের কথা—"আমি কালী, এই স্থানস্থিত পাঁচটী সহমৃতার শ্মশানে থাকিতে বড় ভালবাসি; আমাকে একখানা ঘর করিয়া দে; প্রতি অমাবস্যা তিথিতে আমার পূজা দিবি; ভয় নাই, আমাকে খাইতে দিতে কোনও প্রকার বেগ পাইতে হইবে না, আমার খাবার আমিই সংগ্রহ করিয়া লইব" ইত্যাদি। এবম্বিধ আদেশবাণীতে কাহার কাহারও দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, আর কেহ কেহ বা নানারূপ বিদ্রূপ করিতে থাকে। মৃত শঙ্কর চক্রবর্ত্তীই শেষোক্তদলের প্রধান নায়ক ছিলেন এবং তদ্ধেতুই তাঁহার বংশে বাতি দিতে কেহ নাই বলিয়া স্থানীয় লোকের ধারণা।

অনুসন্ধানের ফলে যখন দেখা গেল যে সত্য সত্যই উহা পাচজন সহমৃতার পবিত্র শ্মশান ভূমি, তখন গ্রামবাসীরা সেখানে একখানা খড়ের ঘর তুলিয়া মাতৃ-মূর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক পূজা দিতে আরম্ভ করেন। তিনটী শ্মশানোপরি কালী-মন্দির, একটীর উপর শিবমন্দির ও অপরটীর উপরে একটী বিল্ববৃক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে। অনুসন্ধান-লব্ধ পঞ্চসহমৃতার বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

১।	বিজয় রাম চক্রবর্ত্তী	ও	তদীয় সহধর্ম্মিণী		জিয়শমালা দেবী।
২।	রাম মাণিক চক্রবর্ত্তী	ও	"	"	নারায়ণী দেবী।
৩।	রাম লোচন চক্রবর্ত্তী	ও	"	"	যমুনা দেবী।
৪।	রাম গোপাল চক্রবর্ত্তী	ও	"	"	সর্ব্বাণী দেবী।
৫।	রাম নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ও	"	"	(অজ্ঞাত)।

অমাবস্যা তিথিতে আদিষ্ট পূজা দিবার নিমিত্ত পালাক্রমে যেরূপ বিভাগ করা হইয়াছিল তাহা :—

১।	স্বর্গীয়	শুকদেব চক্রবর্ত্তী	১	পালা।
২।	"	কৃষ্ণদেব চক্রবর্ত্তী	২	"
৩।	"	রুদ্রদেব চক্রবর্ত্তী	৪	"
৪।	"	শঙ্কর চক্রবর্ত্তী	১	"
৫।	"	বিষ্ণুদেব চক্রবর্ত্তী	২	"
৬।	"	রামদেব চক্রবর্ত্তী	৩	"
৭।	"	রঘুদেব চক্রবর্ত্তী	১	"

উপরোক্ত বিভাগদৃষ্টে দেখা যায় যে বিরুদ্ধবাদী গোঁড়া শঙ্কর চক্রবর্ত্তীও শেষে মাতৃপূজার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন যে পূর্ব্বে গভীর নিশিতে রুদ্ধ মন্দিরাভ্যন্তরোত্থিত কাঁশী-ঘণ্টা-শঙ্খাদির এক অভিনব গুরুগম্ভীর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইত; আর এখনও নাকি যখন প্রকৃতি সুষুপ্তিঘোরে নিমগ্না থাকে, জনমানবের কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না, এহেন নিশীথে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে উক্ত শঙ্খ-ঘণ্টাদির অস্ফুট ধ্বনি অনেক সময় শ্রুতিগোচর হয়।

প্রতি অমাবস্যা তিথিতে এখানে 'শিবাবলী' হয় অর্থাৎ দিনে বলির পর ছাগ-মুণ্ড সযত্নে তুলিয়া রাখা হয় এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পুরোহিত হাতে তালি দেওয়া মাত্র জটাধারী দুইটী শৃগাল আসিয়া নির্ভয়ে উপস্থিত জনতার সম্মুখহইতে উক্ত মাথাটী নিয়া যায়। এ সময় ভিন্ন উহাদিগকে আর দেখা যায় না; শৃগাল দুটীর একটী নাকি শ্বেতবর্ণ ও অপটীর বিশেষ কিছু বিশেষত্ব পরি-লক্ষিত হয় না।

প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বর্ষ পূর্ব্বে উক্ত গ্রামবাসী তিলি জাতীয় মৃত জগবন্ধু পাল মহাশয় মাতৃমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ১৩১১ সালে স্থানীয় লোকের চাঁদায় কালবশে জীর্ণ উক্ত মন্দিরের পুনঃ সংস্কার সাধিত হইয়াছে। প্রত্যেক দ্বাদশ বর্ষান্তে পুরাতন মাতৃমূর্ত্তি বিসর্জ্জন করতঃ নবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গ্রামস্থ জনৈক ব্রাহ্মণ প্রথমাবস্থায় পৌরহিত্য কার্য্য সম্পাদন করেন। তৎ-পর নয়নন্দ গ্রাম নিবাসী কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ

করেন। অতঃপর নোয়াখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলাম্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রায় ৭০ বর্ষকাল পৌরহিত্য কার্য্য সম্পন্ন করেন। নোয়াখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হস্তে ২।৩ বর্ষ যাবৎ উক্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। *

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।
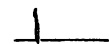
আবাহন

এস হে তাপিত জীবনে, আমার
শান্তিময় দাও সান্ত্বনা,
দাও হে দীক্ষা দাও হে শিক্ষা,
শিখাও ভুলিতে কামনা।
হৃদয়ে দাও হে অসীম বল,
সহিবারে দাও যাতনা ;
প্রলোভন পদে দলিতে শিখাও,
ত্যজিবারে নিজ ভাবনা।
পরের যাতনা হরিতে শিখাও,
শিখাও করিতে করুণা।
আপনার মত ব্যথিত জনের
জানিবারে দাও বেদনা।
সুখ দুঃখ তুচ্ছ করিতে শিখাও
দূর কর মোর গরিমা।
জানিতে দাও হে জগত মাঝারে
তোমার অপার মহিমা।

শ্রীস্নেহলতা দেবী।

---

* এ প্রবন্ধসংকলন বিষয়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

বাড়ব কুণ্ড

সেবার কয় বন্ধুতে মিলিয়া শিবরাত্রি মেলা উপলক্ষে চট্টগ্রাম হইতে বাড়ব কুণ্ড ও চন্দ্রনাথ দেখিতে গিয়াছিলাম।

কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ঘন অন্ধকার মাথায় লইয়া আমরা বাসা হইতে ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হই। সে দিন ষ্টেশনে কি ভিড়! কত পোট্‌লা, পুটুলি লইয়া অসংখ্য যাত্রী ট্রেনের অপেক্ষায় ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় গাড়ী ছাড়িবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি হইল এবং ট্রেনখানি সহস্র সহস্র যাত্রী লইয়া বিকট বংশীধ্বনি করিতে করিতে ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি ১০টায় বাড়ব কুণ্ড পহুঁছিলাম। নিদ্রালস নয়নে একবার চারিদিকে চাহিলাম। তখন সহসা চক্ষের সম্মুখে কোন সুনিপুণ চিত্রকর যেন তুলিকা সংযোগে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্য হইতে ভৈরবী প্রকৃতির কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মহান্ সৌন্দর্য্য-শ্রী উন্মুক্ত করিয়া দিল।

ষ্টেশন হইতে বাড়ব কুণ্ড প্রায় এক ক্রোশ পূর্ব্বে। দূরে কুণ্ড, পথে বাঘের ভয়। অতএব সকলে মিলিয়া বাড়ব কুণ্ডের মহান্তজীর গৃহসংলগ্ন নাটমন্দিরে রাত্রি যাপন করিব, স্থির করিলাম। আমরা সকলে অন্যান্য যাত্রীদের সহিত নাটমন্দিরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু মশকের তীব্র দংশনে সেখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়াও মহান্তজীর কর্ম্মচারীদের সাড়া পাওয়া গেল না। তখন আমাদের মধ্যে দুইজন উৎসাহী যবক নাটমন্দিরে সুরক্ষিত বড় একটা সতরঞ্চ সেখানে বিছাইয়া লইলেন। আমরা সকলে তদুপরি উপবেশন করিলাম। গল্প-গুজবে, তাস-ক্রীড়ায়, আমোদ-রহস্যে, মশক-তাড়নের চট্‌পট্‌ ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে সে স্থানটা মুখরিত বা কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এমন সময় একজন লোক আসিয়া আমাদের আমোদে বাধা দিয়া বলিল—

"মশায়, আপনারা কার হুকুমে মহান্তজীর এই সতরঞ্চ বিছাইয়া লইয়াছেন?" আমাদের মধ্যে একটি বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মনটা বেশ সাদসিদে, মুখে কেবলি হাসি, দেহযষ্টি বেশ লম্বা ও পাতলা, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান ও লোককে হাসানই তাঁহার কাজ, তিনি লোকের খুঁটিনাটি দেখাইয়া লোককে ক্ষেপাইতে

সিদ্ধহস্ত। তাঁহার পরিধানে লুঙ্গি, নাকে চস্‌মা, তাঁহাকে আমরা 'মোল্লাজী' বলিতাম। তুকি টুপি মাথায় দিলে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইত। সেই সদানন্দ মূর্ত্তিখানি অগ্রসর হইয়া লোকটাকে উত্তর করিলেন,—

"বাবা, আল্লার হুকুমে আমরা সতরঞ্চ বিছাইয়া লইয়াছি। তাতে তোমার কি ?" 'মোল্লাজীর' চেহারা দেখিয়া ততোধিক তাঁহার বাক্যসুধা পান করিয়া বেচারা স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ পর সে কহিল—"মশায়, মুসলমানের এখানে প্রবেশ করিতে নাই। আপনারা দেখ্‌ছি বড়ই দুঃসাহসের কাজ করিয়াছেন।" লোকটা আমাদের সকলকেই মুসলমান বলিয়া মনে করিয়াছিল। আমরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। সেখানে অধিকক্ষণ থাকা সুবিধাজনক নয় মনে করিয়া আমরা দলবল সহ সেস্থান পরিত্যাগ করিলাম। সেই সময়ে 'মোল্লাজী'র উপদেশ মত আমরা 'হর-হর-বম্‌-বম্‌' ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। সেই ভীম-মধুর ঐকতান বাদনের ধ্বনি শুনিয়া গাছের উপরে পাখীগুলি ছুটাছুটি করিতে লাগিল। রাস্তায় দেখি এখানে সেখানে কত তীর্থ-যাত্রী ঘুমে অচেতন, একদল বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী একটা গাছের ছায়ায় একতারা সংযোগে রাধাকৃষ্ণ ভজন গাহিতেছিল। আর অন্য দিকে একজন পথিক প্রসাদী সুরে প্রাণ খুলিয়া গাহিতেছিল,—

'কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশকোটি তীর্থ মায়ের চরণবাসা।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥'

দ্বিপ্রহর রজনীতে যখন চারিদিকে নীরব নিথর তখন পথিকের কণ্ঠোচ্চারিত এই মধুর ছন্দরাগ শুনিয়া আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম। আমরা নিজকে ভুলিলাম, সংসার ভুলিলাম, কেবল সেই ধ্রুব অনন্তের অনুভূতির মধ্যে ওঁকারের ঐশ্বর্য্যে পরিব্যাপ্ত জগজ্জননী মহামায়ার পরিপূর্ণ মূর্ত্তি মনশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিলাম!

* * * *

* * * *

সকাল বেলা সিঁথিতে সিঁদূর মাখিয়া ঊষা রাণী পূর্ব্বাকাশে উঁকি মারিতেছেন এমন সময় আমরা ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। ভোরের বাতাস তখন চামেলী

ও যুঁইর মিষ্ট গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল। ষ্টেশনহইতে পূর্ব্বদিকে বাড়বানল। আমরা সেই উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিবার জন্য পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হই। সহসা সম্মুখে চক্ষের উপর এক নয়ন-বিমোহন দৃশ্য প্রতিভাত হইল। সে দৃশ্য অপূর্ব্ব। কল্পনার অতীত—আমরা নির্ণিমেষ নয়নে, নিঃস্পন্দ দেহে সেই অপরূপ দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম,—নির্ম্মল আকাশ-গায়ে কণক কিরণ মাখিয়া হাসিতেছে—সম্মুখে ঊর্দ্ধগামী গিরিদেহ সুমুন্নত শিরে দণ্ডায়মান এবং তদুপরি নীলবৃক্ষরাজি সূর্য্যকিরণে ঝক্ মক্ করিতেছে, দেখিয়া মনে হয় যেন কোন বিরাট পুরুষ বিগ্রহ দেবতার শীর্ষদেশে নীল ছত্র ধারণ করিয়া আছেন। পথের উভয় পার্শ্বে স্তরে স্তরে সজ্জিত কত বৃক্ষলতা বাল সূর্য্যের কোমল কিরণে অতুল শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের শ্যাম সৌন্দর্য্যের গাম্ভীর্য্য ভক্তিরসে চিত্ত আপ্লুত করে এবং সাকার মূর্ত্তিতে আরাধ্য দেবতাকে প্রাণের ভিতর জাগাইয়া দেয়।

চারিদিকে বৃক্ষ-বনস্পতির অশ্রান্ত মর্ম্মর, বিহঙ্গমকুলের কণ্ঠোচ্চারিত ঐকতান বাদন, অদৃশ্য পাখীর করুণ কণ্ঠগীতি, উপলখাতিনী গিরী নির্ঝরিণীর কল্লোল, অনন্ত নীরবতাকে যেন এক একবার বায়ুতরঙ্গে স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছে। সম্মুখে ও পশ্চাতে 'হর—হর বম্—বম্' ধ্বনি এবং অগ্নিরূপী চন্দ্রশেখরকে দেখিবার আকুলতায় যাত্রীর আনন্দের কোলাহল দিগদিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিল। ক্রমে চটুল প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের মধ্য দিয়া আমরা কুণ্ডের নিকট পঁহুছিলাম। কুণ্ডের উপরিস্থ মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখি বহুযাত্রী ও কয়েক জন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হোমানল প্রজ্বলিত করিয়া ঐখানে বসিয়া আছেন। যাত্রীদের কেহ বা স্নান করিতেছে, কেহ বা স্নানের উদ্‌যোগে ব্যস্ত, কেহ বা স্নানের পূর্ব্বে তাম্রকুট সেবন করিয়া লইতেছে। সন্ন্যাসী ঠাকুরদের চারিদিকে চেলাদিগকে গঞ্জিকা বা 'সিদ্ধি' প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত দেখিলাম।

এখানে দুইটী কুণ্ড, একটির নাম বাসী কুণ্ড ও অপরটিকে বাড়ব কুণ্ড কহে। মন্দিরাভ্যন্তরে বাড়ব, উহার পরিমাণ আড়াই বর্গ হাত লম্বা ও প্রশস্ত। আমরা স্নানের জন্য প্রস্তুত হইলাম। একটি দরজার ভিতর দিয়া ২০।২৫টী সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে কুণ্ডে আসিয়া নামিতে হয়। মন্দিরপ্রাঙ্গণে পঁহুছিতেই গুম্

গুম্ ধ্বনি শ্রুত হয়। জলের উপর লক্ লক্ রসনা বিস্তার করিয়া অনলের খেলা, এ দৃশ্য অলৌকিক, ইহা দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলাম, মন-প্রাণ ভাবে ভরিয়া গেল। অসম্ভব সম্ভব বলিয়া মনে হইল।

কুণ্ডটী চতুষ্কোণবিশিষ্ট বৃহৎ চৌবাচ্চার ন্যায়। ইহার গভীরতা যে কত তাহা বলা যায় না। যাত্রীগণের স্নানের সুবিধার জন্য কুণ্ডের নীচে লৌহজালের বেষ্টনী, এই বেষ্টনী প্রাচীরের পূর্ব্ব প্রান্তে চারি পাঁচটী ছিদ্র। সেই ছিদ্র দিয়া এক একটি শিখা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়।

অনল-শিখার এইরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব অনবরত হইতেছে। যাত্রীরা এই কুণ্ডে নামিয়া স্নান করিতেছে। অগ্নিশিখা গায়ে লাগিলে কোনও তাপানুভব হয় না। ইহাই বাড়বানলের বিশেষত্ব। পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন পাপীরা এখানে স্নান করিলে কুণ্ডের অনল নিভিয়া যায়। কোনও যাত্রীর অবগাহনে অনল-শিখার নির্ব্বাণ হইলেই বুঝিতে হইবে লোকটী মহাপাপী! আমি একটু ভীত ও সন্ত্রস্ত মনে কুণ্ডে নামিলাম, স্নান করিতেই দেখি অনল-শিখা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তখন নিজকে মহাপুণ্যবান বলিয়া মনে হইল। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম অনেক যাত্রীর অবগাহনেই এইরূপ হইয়া থাকে। তবে কি হিন্দুসমাজের সকলেই মহাপুণ্যবান্! এই অনল পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া কুণ্ডের উপর উঠিয়া হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। নিরক্ষর পাণ্ডার পাপ-পুণ্যের মাপ কাঠির প্রকৃত রহস্য সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসিলাম এবং সঙ্গীদের বলিলাম—'যতদিন এই ধরণের নিরক্ষর ব্রাহ্মণগণ সমাজ ও তীর্থের অধিপতি থাকিবেন ততদিন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব সর্ব্বত্র সমভাবে বজায় রাখা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।'

এই অগ্নির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়া থাকেন.—এই বহ্নি মহাযোগী মহাদেবের নয়ন প্রান্ত হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে শিবনেত্রসম্ভূত এই পুণ্যাগ্নি কামদেবকে ভস্ম করিয়াছিল, মদনভস্মের পর সেই অগ্নি সৃষ্টিনাশে উদ্যত হইলে মহাদেব উহাকে কুণ্ডের ভিতর লুকাইয়া রাখেন। ইহা সাক্ষাৎ বাড়ব বা ব্রাহ্মণ। †

---

† 'যোগনেত্রান্ত-সম্প্রাপ্তো জলমধ্যে চ বাড়বঃ।
কামো ভস্ম চ সংনীতো যেন নেত্রাগ্নিনা পুরা।

স্নানান্তে পাণ্ডাজীকে কুণ্ড সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি সেই বিরাট গম্ভীর নগ্ন সৌন্দর্য্যের রহস্য—জলের সহিত অনলের খেলা কি করিয়া যে সম্ভব হইল তাহা তিনি কিছুতেই বলিতে পারিলেন না। তিনি 'যোগনেত্রান্ত সঞ্জাতো' শ্লোকটীর প্রথম চরণ অতি কষ্টে মুখভঙ্গির সহিত মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডাজীকে দেখিয়া 'নীলকমলকে' মনে পড়িল। তিনি একটি কথা বলিলেন। এই মন্দির-প্রাঙ্গণে রাত্রিকালে কেহই থাকিতে পারে না। তখন নাকি ডাকিনী যোগিনীরা কুণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেক দিন আগে একজন যাত্রী পাণ্ডাদের বাধা না মানিয়া রাত্রিতে এখানে ডাকিনীদের ভৌতিক ক্রিয়া দেখিবার জন্য থাকিয়া যায়। পরদিন ভোরে দেখা গেল তাহার প্রাণশূন্য দেহটা মন্দিরের বাহিরে পড়িয়া আছে। এইরূপ দুই একটি আষাঢ়ে গল্প পাণ্ডাজী অতি আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ মুদ্রা দক্ষিণা-স্বরূপ দিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া আসি। ষ্টেশনে পহুঁছিতেই সীতাকুণ্ডগামী ট্রেন প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা সেই ট্রেনে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে শিবচতুর্দ্দশীর মেলা দেখিতে চলিয়া যাই।*

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ত্রৈলোক্যং দহ্যতে যেন সমুদ্রশ্চৈব শোষ্যতে।
যুগান্তে দহ্যতে যেন ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরং
স সাক্ষাদ্বাড়বো বহ্নিঃ সর্ব্বপাপহরঃ শুভঃ।'

* এই কুণ্ড পরিদর্শন করিয়া বাংলার বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় বলেন,—বাড়ব কুণ্ডে জলের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে বলিয়া অশিক্ষিত সাধারণ লোকের বিশ্বাস। এই উষ্ণ প্রস্রবণের জলরাশি বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। যে স্থানে অগ্নি উত্থিত হইতেছে সেই স্থানে গুহাভ্যন্তর ইষ্টক দ্বারা বাঁধাইয়া জলের বেগ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে; সুতরাং নিয়স্থ অগ্নি উর্দ্ধভাগে অধিকতর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, বরং ক্ষীণভাবে রন্ধ্রপথে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া লোক-দিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছে।

প্রথমে বাসী কুণ্ডে ঈষদোষ্ণিত সলিলে অবগাহন করিলে সেই গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিবে। পথেই পয়সার উপদ্রব। সিঁড়ি বাহিয়া অন্ধকারময় পথে নিম্নে নামিলেই সেই কুণ্ড, সেই কুণ্ডের তলদেশ লৌহজালে আবদ্ধ। তথায় ইষ্টকনির্ম্মিত ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে অগ্নি

বিক্রমপুর ব্রত-কথা

অসময়ী নারায়ণী ব্রত

বিক্রমপুরে "অসময়ী নারায়ণী" ব্রতের বেশ প্রচলন আছে। শনিবার অথবা রবিবার দিবসে এ'ব্রত করিতে হয়। দুঃসময়ে এ'ব্রত করিলে সুসময়ের আবির্ভাব হয়। স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই এ'ব্রত করিতে পারে। একখানা ধৌত কাষ্ঠাসনে আম্রপল্লবযুক্ত ঘট বসাইয়া ধূপ ও দীপ দিতে হয়। তৈল, সিন্দুর, পান, সুপারি, কজ্জল, চন্দন ও যথাসম্ভব মিষ্টদ্রব্যাদি একখানা থালায় রাখিয়া ব্রতের কথা বলিতে হয়। কথা শেষে পাঁচটী হুলুধ্বনি দিয়া সকলে প্রণাম করেন এবং তৈল, সিন্দুর এবং চন্দনাদি মস্তকে ও ললাটে স্পর্শ করেন।

ব্রত কথা

এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। তাহার সন্তানাদি নাই। এক দিবস ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে,—রাস্তায় অসময়ী নারায়ণী তাহাকে বলিল, "ব্রাহ্মণ কোথায় যাও, আমাকে ভিক্ষা দাও।" ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "আমি নিঃসন্তান, অত্যন্ত দুঃখী। আমার নিত্য ভিক্ষা তন্নুরক্ষা।" অসময়ী নারায়ণী বলিল, "তুমি এই হলদি দু'খানা নাও, তোমার অভাব মোচন হবে। তোমার স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়াছে, ইহাতেই সে অন্তঃসত্ত্বা হবে এবং তাহার একটী ছেলে জন্মিবে। ছেলের ষষ্ঠী, অন্নারম্ভ, বিবাহ প্রভৃতিতে আমায় তৈল-সিন্দুর দিও এবং পৃথিবীতে আমার ব্রত প্রচার করিয়া দিও।"

কিছু দিন পরে ব্রাহ্মণের একটী ছেলে হইল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতবাড়ী চলিয়াছে—পথিমধ্যে এক বাঘের সহিত সাক্ষাৎ। বাঘ বলিল, "ব্রাহ্মণ তোকে

জ্বলিতেছে, সেই অগ্নি জলের উপর প্রতিভাসিত হইতেছে, সাধারণে মনে করে, বুঝি জলেই আগুন জ্বলে। যে স্থানটী জলবদ্ধ, তাহার নিম্নভাগ হইতে প্রস্রবণের জল রন্ধ্রপথে অবিরত বাসীকুণ্ডে যাইতেছে, তাহাতেই সেই স্থানের জল ঈষদোষ্ণ। ঐ কুণ্ডগুলি অতিশয় অপরিস্কার, বদ্ধ জলাশয় বলিয়া-ই উহা স্নানের উপযোগী নহে। ঐরূপ প্রস্রবণের ঈষদোষ্ণ জল স্বাস্থ্যের পক্ষে পরমোপকারী। এইরূপ প্রস্রবণের জলে ধাতব দ্রব্য মিশ্রিত আছে, কেহ কেহ এইরূপ বলেন।

খাই ?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "আমার ছেলে হইয়াছে, পুরোহিত-বাড়ী যাইতেছি, আমাকে খাইও না।" বাঘ বলিল, "১২ বৎসর যাবৎ লোহার খাঁচায় আবদ্ধ বাঘিনীকে আনিয়া দিতে পারিলে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।" ব্রাহ্মণ "তথাস্তু" বলিয়া চলিয়া গেল এবং বাড়ী আসিয়া অসময়ীর নিকট বাঘিনীর উদ্ধারের জন্য মানস করিল।

একদিন বাঘ বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিল শোলার খাঁচায় বাঘিনী আসিয়া উপস্থিত।

দৈবযোগে ঐ পথে এক পথিক যাইতেছিল। ব্যাঘ্র পথিককে হত্যা করিল এবং তাহার ধনরত্ন লইয়া ব্রাহ্মণকে (ভার্য্যাপ্রাপ্তির) পুরস্কার দিতে গেল। ব্রাহ্মণের বাড়ী আসিয়া বাঘ ডাকিল, "বাবা! বাবা! বাহিরে আসুন, প্রণাম করিব।" ব্রাহ্মণ ভয়ে ছেলেটীকে উপরে রাখিয়া দ্বারপথে উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিল যে বাঘ কি করে। বাঘ বারাণ্ডায় ধনরত্ন রাখিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল এবং বলিল, "ভ্রাতার অন্নারম্ভে যেন নিমন্ত্রণ করেন।"

ব্রাহ্মণের ছেলের অন্নারম্ভ। সমস্ত স্ত্রী-আচারাদি সম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু ভ্রমক্রমে অসময়ী নারায়ণীর তৈলসিন্দুর দেওয়া হয় নাই। ছেলে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণী নানা ছাঁদে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ ব্রাহ্মণের মনে হইল যে অসময়ী নারায়ণীর তৈলসিন্দুর দেওয়া হয় নাই। ক্ষিপ্রহস্তে ব্রতের নিয়মিত দ্রব্যাদি একত্রিত করিয়া উপস্থিত সকলে অসময়ী নারায়ণীর ব্রত করিল; ব্রতের গুণে ছেলে বাঁচিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে প্রচার করিয়া দিল যে, "অসময়ে অসময়ী নারায়ণীর ব্রত করিলে কাহারও দুঃখ থাকে না। যে যাহা মানস করিয়া ভক্তিভাবে এ ব্রত করে, তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয়।"

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যর্থ দান

একটি মাটির গর্ত্ত, না ঢালিতে বারি,
আপনি ভরিয়া গেল ! লয়ে পূর্ণ ঝারি
ফিরিলাম খেদে যবে, পাত্র প্রসারিয়া
তুমি দাঁড়াইলে প্রিয় ! আপনি আসিয়া।
নিঃশেষে নিঙ্গাড়ি আমি যত বারি ঢালি,
তবু দেখ পাত্র তব পড়ে আছে খালি।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ

রাড়িখাল

রাড়িখাল বা রাঢ়িখাল গ্রাম বিক্রমপুরের উত্তরপশ্চিমাংশে অবস্থিত। পদ্মা নদী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় এক ক্রোশ হইবে। এই গ্রামের পশ্চিমে কাঠিয়াপাড়া নাগরনন্দী, কামারগাঁ ও ভাগ্যকূল; দক্ষিণে কবুতরখোলা, মান্দ্রা, মণিমণ্ডল ও কোনাপাড়া; পূর্ব্বে মাইজ পাড়া ও দামলা এবং উত্তরে আরিয়ল বিল।

এই গ্রাম সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে আরিয়ল বিল সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা আবশ্যক। রাড়িখাল গ্রামটী এই বিলের দক্ষিণ তীর বা 'কান্দা'য় বিরাজমান। আরিয়ল বিলের উৎপত্তির ইতিহাস নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে কল্পনাবলে বলা যায় যে, যে সময়ে বিক্রমপুরের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল, হয়তঃ তাহারি কোন অংশ বিলের আয়তন প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিক্রমপুরে এত বড় বিল আর ছিল না এবং এখনও নাই বলা যাইতে পারে। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন পদ্মানদীর দূরত্ব বিল হইতে প্রায় তিন চারি ক্রোশ ছিল তখন বর্ষাকালে এই বিল অতিক্রম করিতে নৌকার মাঝিগণকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইত। সে সময়ে সামান্য বাতাসেই

আরিয়ল বিল।

নদীর ঢেউয়ের ন্যায় ভীষণভাবে ইহার সারা গায়ে ঢেউ খেলিয়া যাইত। সে সময়ে এ বিলে বহু দুর্ঘটনাও ঘটিয়াছে। তখন এই বিলের নৌকাচলাচলের পথে (যাহাকে চলিত কথায় 'দাড়া' বলে উহাতে) চৌদ্দ হাত দীর্ঘ লগি ব্যবহার করিতে হইত। দস্যু ডাকাতের প্রাদুর্ভাবও খুব ছিল। বিলের অধিকাংশস্থলই পূর্ব্বে অনাবাদী অবস্থায় জলজবৃক্ষ ও 'দাম'ভিটে পরিপূর্ণ ছিল। সে সকল জলজবৃক্ষমধ্যে নানাজাতীয় পক্ষী প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সমবেত হইয়া চীৎকার ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিত। চতুষ্পার্শ্বের লোকেরা ঐ সমুদয় জলজবৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করিত। এক্ষণে বিলের অবস্থা বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পদ্মানদী ক্রমশঃ বিলের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বিল ভরাট হইয়া চাষাবাদের যোগ্য হইয়াছে। পূর্ব্বের ভয়ঙ্কর ভাব আর নাই। এক্ষণে ইহা বৎসরের অধিকাংশ সময়েই শ্যামল-শস্যসম্ভারে পরিশোভিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে।

রাড়িখাল গ্রামটি বিলের দক্ষিণদিকে অবস্থিত বলিয়া গ্রামের দক্ষিণাংশ ক্রমশঃ ঢালু হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের দক্ষিণাংশ উচ্চ বলিয়া গ্রামের 'হালট' বা প্রধান রাস্তা পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা লম্বি চলিয়া যাওয়ায় গ্রামটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উত্তরভাগের বসতি শুধু রাড়িখাল নামে পরিচিত; আর দক্ষিণভাগের বসতিকে দক্ষিণ রাড়িখাল কহে। উত্তর রাড়িখালে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকের বাস, কিন্তু দক্ষিণ রাড়িখালে শুধু মুসলমানের বাস। এ গ্রামে এক সময়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রাধান্য ছিল, এখনও আংশিক পরিমাণে আছে। গ্রামের নামের উৎপত্তির ইতিহাস এইরূপ। এক সময়ে এই গ্রামে 'রাড়ি' নামে এক সম্প্রদায় মুসলমান বাস করিত। তাহারা সর্দ্দার বা লাঠিয়াল শ্রেণীর মুসলমান ছিল। সে সময়ে তাহারা তীর, ধনু, লাঠি, গুলতি, (গুলাইল বাশ) প্রভৃতি নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র চালনে দক্ষ ছিল। তাহারা অতি পূর্ব্বে কি ব্যবসায় করিয়া জীবন ধারণ করিত তাহা জানা যায় না। রাড়ি বংশের শেষ ব্যক্তি আজিমরাড়ি এই গ্রামের মুন্সীবাড়ীতে বহুকাল সসম্মানে বরকন্দাজের (নিকামানের) কার্য্য করিয়া অল্পকয়েক বৎসর হইল প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার বহু বীরত্বখ্যাতি অদ্যাপি জনপ্রবাদপরম্পরায়

গ্রাম্য-বিবরণ।

সঞ্জীবিত। আজিমরাড়ি নিজ হস্তে একটা আমগাছ রোপণ করিয়াছিল। তাহার নাম ছিল 'রাড়ির' গাছ, সে গাছটিও আর নাই। ঐ গাছটির সঙ্গে সঙ্গে রাড়ি-বংশের শেষ ব্যক্তির স্মৃতি বিজড়িত ছিল। গ্রামের অবস্থা দৃষ্টে এই বংশ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ইহারা অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ, সাহসী মুসলমান ছিল। বোধ হয় আরিয়ল বিলের প্রান্তদেশে কিছু উচ্চ ভূমি পাইয়া এবং জীবনোপায় সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে অনায়াসলভ্য দেখিয়া প্রথমে এইখানে বসবাস নির্ম্মাণ করে। রাড়িখাল গ্রামের অধিকাংশ ভূমি এখনও তালুক মকিসখাঁ ও তালুক গোরাপিয়ানের অন্তর্গত। ইহা হইতেও এই গ্রামে পূর্ব্ব-কালে মুসলমানপ্রাধান্য থাকা সূচিত হয়। এখনও দক্ষিণ-রাড়িখাল সম্পূর্ণ রূপে মুসলমান সম্প্রদায় দ্বারা অধ্যুষিত এবং উত্তর রাড়িখালের অতি প্রাচীন বসতিভাগ যাহা "বিলপার" নামে খ্যাত তাহাতেও মুসলমান ব্যতীত অন্য কোনও সম্প্রদায়ের বাস নাই। এই মুসলমানসম্প্রদায় কোন্ কালে কোন্ স্থান হইতে আসিয়া প্রথম এই গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে তাহা বলা কঠিন। এই গ্রামের মুন্সীবাড়ী ও ঘোষদের বাড়ীর মধ্যভাগে একটী গড়ের পঙ্কোদ্ধার করার সময় ৮।১০ হাত নীচে যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ মাটীর স্তর দেখা গিয়াছে তাহাতে সুদূর অতীতে এই স্থান যে এক অরণ্যানি ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; নামদৃষ্টে যদিও এখানে একটী খাল থাকা অনুমান হয় কিন্তু এই গ্রামে রীতিমত কোন খাল বর্ত্তমান নাই। গ্রামের উত্তরাংশে মুন্সীবাড়ীর দক্ষিণ ভাগ ও বিল পারের পূর্ব্ব ভাগ দিয়া "নাও দাঁড়া" বলিয়া একটী নৌকা চলাচলের জন্য নিম্নস্থান দৃষ্ট হয় এবং ইহা পূর্ব্বকালে দক্ষিণদিকস্থ উচ্চ ভূমি হইতে বিলাভি-মুখে জল নিঃসারণের স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী বলিয়া অনুমিত হয় এবং খুব সম্ভব তাহাই খাল বিবেচিত হইয়া এবং তাহার সহিত রাঢ়ি-বংশের যোগ হইয়া গ্রামের বর্ত্তমান নামাকরণ হইয়াছে। বর্গের চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ আমাদের অঞ্চলে কষ্টসাধ্য বলিয়া রাঢ়িখাল এখন রাড়িখাল নাম ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন কালের পত্রাদি ও দলিলে রাড়িখাল অপেক্ষা রাঢ়িখালের ব্যবহারই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই গ্রামে যে মুসলমান সম্প্রদায় বাস করে তাহাদের মধ্যে খাঁ বংশই প্রসিদ্ধ, এবং তাহারা এককালে ভূম্যধিকারী ছিল বলিয়া কথিত। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা অধিকাংশই কৃষিজীবী। উক্ত সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে

কেহ কেহ বা জাহাজে খালাসী বা সারেঙ্গের কাজ করে এবং অতি অল্প সংখ্যক রাজসেবা বা অন্যবিধ চাকুরী করে। এই খাঁ বংশে দক্ষিণ রাড়িখাল নিবাসী মৃত সুজাতালীখাঁ ডিপুটীর নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বংশে শিক্ষা অল্পাধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও এক শ্রেণীর মুসলমান এই গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বেলদার মুসলমান; তাহারা মাটীখনন বা কোদালীর কর্ম্ম, নৌকাচালন এবং অন্যান্য কার্য্যদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণমধ্যে এই গ্রামে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস আছে এবং নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শূদ্র, নাপিত, গোয়াল, কৈবর্ত্তদাস, সাহা, ধোপা, নমঃশূদ্র প্রভৃতির বাস দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণবংশমধ্যে রাঢ়ি শ্রোত্রীয় মহিন্তা বংশ প্রাচীন। বৈদিক চক্রবর্ত্তী বংশ এ গ্রামে অতি অল্পদিন যাবত বাস করিতেছে। বৈদিক ব্রাহ্মণবংশে রামরতন জ্যোতিষী নামে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ প্রতিভাবলে ঢাকার নবাব আবদুলগণিকে গণনাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া নবাব সরকার হইতে বার্ষিক বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ভদ্রকায়স্থ মধ্যে রাড়িখালের দেব-বংশই মৌলিক। উক্ত দেব-বংশের শেষ ব্যক্তি হরিহরদের মৃত্যুর পর হইতে আর কেহ উক্ত বংশে বর্ত্তমান আছে কি না জানা যায় না। তৎপর দাসবংশ এবং তাহাদের স্থাপিত ঘোষ বংশও কার্য্যকলাপ দ্বারা ক্ষমতাশালী। মিত্রবংশ জনসংখ্যায় কম হইলেও সেই বংশে দীন দয়াল মুন্সী ও জয়চন্দ্র মিত্র নামে দুই ব্যক্তিই কৃতী ছিলেন। দীনদয়াল মিত্র দিনাজপুর জেলার কালেক্টরীর সেরেস্তাদারের কার্য্য করিয়া এবং জয়চন্দ্র মিত্র আসামে একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের (E. A. C.) কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। উক্ত মিত্রদের সম্পর্কে দত্ত ও দেববংশ গ্রামে বসবাস করেন এবং দেব বংশের সম্পর্কে বসু বংশ পরে এই গ্রামে স্থাপিত হন। ইহা ছাড়া সেন বংশ, গুপ্ত বংশ, গুহবংশ, সরকারবংশ ও বসুবংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বাস করিয়া আসিতেছেন। দাস বংশের রামতনুদাস একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ সমারোহের সহিত তাঁহার বাড়ীতে অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্ত্তন হইত ও নানা স্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া তাহাতে যোগদান করিত। দেব বংশীয়েরা রায়োপাধিক এবং সেই বংশের ৺বৈদ্যনাথ রায় ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং "দেওয়ান বৈদ্যনাথ" নামে

তাঁহার নাম ত্রিপুরার রাজমালা গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে তৎপুত্র ৺লক্ষ্মীকান্ত রায়ও নিজ বুদ্ধিমত্তাবশতঃ সামান্য নকলনবিশ হইতে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন এবং পারশ্য ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া মুন্সী আখ্যা পান। তাঁহার নামানুসারেই উক্ত দেব বংশের বাড়ী পূর্ব্বোক্ত মুন্সী বাড়ী নামধারণ করিয়াছে। এই গ্রামে উক্ত দেব বংশের আনীত বসু বংশই গ্রামে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই বংশে ৺ভগবানচন্দ্র বসু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বাধীনচেতা ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বসু বহুকাল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। উক্ত ৺ভগবানচন্দ্র বসুর একমাত্র পুত্র অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু নিজ প্রতিভাবলে স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া বিজ্ঞানজগতে অমর হইয়াছেন। এককালে এই গ্রামে ৭।৮ খানা দুর্গা পূজা হইত। বর্ত্তমানে ৺কালী বসুর বাড়ী ও ৺লক্ষ্মীকান্ত রায়ের বাড়ী ও বৈদিক বাড়ী ছাড়া পূর্ব্বের দুর্গোৎসব সমস্তই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ঘোষের বাড়ীর রাইমোহন ঘোষ মহাশয় পুনরায় নিজ বাড়ীতে দুর্গোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ স্বধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন।

এই গ্রামে সর্ব্বসাধারণের চাঁদায় ও সরকারী সাহায্যে প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় চলিয়া আসিতেছে এবং নানা প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া আসিয়া বর্ত্তমানে বিদ্যালয়টী গ্রামস্থ দাস পাড়ার দক্ষিণে ৺সিদ্ধেশ্বরী তলায় একটী উন্নত প্রশস্ত ভূমিতে টিনের গৃহে স্থাপিত হওয়ায় বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বিষয়ে অনেকে আশান্বিত হইয়াছেন। এখানে বলা অত্যুক্তি হইবে না যে, এই বিদ্যালয় স্থাপন করার সময় শ্রীযুক্ত বাবু নলিনীকান্ত রায় যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি গ্রামবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহের স্থান এবং পোষ্টাফিশ ও বাজার নির্ম্মাণের স্থান গ্রামের দক্ষিণ ভাগে হালট পাট ৺সিদ্ধেশ্বরী তলায় দান করায় ঐ স্থানের মালিকগণের বিশেষতঃ দাস পরিবারের বদান্যতা সূচিত হইয়াছে। শ্রীনাথ গুপ্ত ও প্যারীমোহন দাস মহাশয়গণের পর্য্যবেক্ষণে স্থানভরট ও গৃহাদিনির্ম্মাণ হওয়ায় তাঁহারাও গ্রামবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। রাড়িখাল গ্রামে মুন্সেফ, ডিপুটী, উকিল, মোক্তার, ইনস্পেক্টর, দারোগা, গভর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান

গ্রাম্য বিদ্যালয়।

শিক্ষক ও অন্যান্য বহু রাজকর্ম্মচারী ও জমিদারের কার্য্যকারক, কণ্ট্রাক্টর, ওভারসীয়ার প্রভৃতি আছেন এবং গ্রামে কেহ খুব অবস্থাপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন না হইলেও সুখে হউক দুঃখে হউক সকলেরই এক প্রকার গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যায়। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা সকলেই নিজ নিজ ব্যবসায় চালাইয়া নিজ নিজ আহার-সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। তবে এই জীবন সংগ্রামের কঠোর দিনে সকলেই যে সুখে আছে এমত কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে।

গ্রামের মধ্যে চলাচলের ভাল রাস্তা নাই এবং গ্রামের দলাদলি ও মামলা মোকদ্দমাবশতঃ এই গ্রামের আশানুরূপ উন্নতি হইতে পারিতেছে না। এই

গ্রামের অবস্থা রাস্তাঘাট ও হাট বাজার

গ্রামের স্বাস্থ্য একরূপ মন্দ নয়। পানীয় জলের মধ্যে ৺ঈশ্বরচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ীর বাঁধা পুকুরের জল উল্লেখ-যোগ্য। এই গ্রাম বিলের নিকট অবস্থিত বলিয়া স্থান অত্যন্ত নীচু। বর্ষায় অনেক গৃহস্থের বাটীতে জল উঠে এবং শুকনার দিনে জল সরিয়া গেলে প্রতি বাড়ী সমতল ক্ষেত্র হইতে অনেক উচু বলিয়া এক এক খণ্ড উচ্চ ভূমিস্তূপ বলিয়া ভ্রম হয়। এখানে প্রাচীন কীর্ত্তি বা মন্দিরাদি নাই এবং উল্লেখযোগ্য কোন মেলাও মিলে না। মুন্সী বাড়ীতে যে একটী প্রাচীন ঠাকুরদালান ছিল তাহারও এখন ভগ্নাবস্থা। ৺সিদ্ধেশ্বরী তলায় যে একটী বটবৃক্ষ আছে তাহার তলভূমি বর্ত্তমানে বাঁধান হইয়াছে। তাহাতে বর্ষা ব্যতীত অন্যান্য কালে গ্রামবাসীদের ব্যবহারোপযোগী মৎস্য, তরকারী, তৈল, লবণ, মসল্লা, চিনি, বাতাসা, গুড়, তামাক, প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সামান্য একটী বাজার বসে মাত্র। আজ প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল, গ্রাম-বাসীদের চেষ্টায় গ্রামে একটী পোষ্টাফিস স্থাপিত হওয়ায় স্থানীয় অভাব বহু পরিমাণে পূরণ হইয়াছে।

প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে মুন্সী বাড়ীতে একখানি পদ্মপুরাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য কোন প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ কাহারও নিকট থাকা জানা যায় নাই।

প্রাচীন পুঁথি।

এই গ্রাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া ইহাতে কোন প্রাচীন কীর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। *

---

* এই গ্রাম্য বিবরণ রাড়িখাল গ্রামনিবাসী পাবনায় উকীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বি, জ,

সংস্কৃত শাস্ত্রে বাঙ্গালী

অর্জ্জুন মিশ্র (২)

অর্জ্জুনমিশ্র ও শিবাচার্য্য এইরূপে সমাজের একটী বিশেষ সংস্কার নির্ব্বিবাদে নিষ্পন্ন করিলেন। কিন্তু এই সংস্কারে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব সমুদয় শিরোধার্য্য করিয়া হিন্দুসমাজের বিশিষ্টত্ব অব্যাহত রাখিয়া সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহিত করা হইয়াছিল। সমাজকে পদদলিত করা দূরে থাকুক সমাজের পদধূলিই গ্রহণ করা হইয়াছিল।

অর্জ্জুনমিশ্র লোকসমাজে ব্রহ্ম-জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে দেবতা এবং অর্জ্জুনপত্নী পদ্মাবতী লক্ষ্মীর অংশে অবতীর্ণা বলিয়া বিঘোষিত হইলেও অর্জ্জুন "পিতারী"র কন্যা বিবাহ করার পর সমাজ বলিল, "আপনি সপ্তশতী কন্যা বিবাহ করিয়া প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়াছেন।" অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিয়া সপত্নীক ভারতীয় বহুতীর্থ পর্য্যটন করতঃ সামাজিকের দ্বারস্থ হইয়া বলিলেন—আমি সর্ব্বতীর্থগমনে বিধৌতপাপ হইয়াছি, আপনারা আমাকে এইক্ষণ গ্রহণ করিতে পারেন। সামাজিকগণও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে ও তাঁহার মত বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা সমাজসংস্কার করিতে যাইয়া সমাজের মূল পর্য্যন্ত ছেদন করিতে চাহেন, আর যাঁহারা সমাজের কোনও সংস্কারের প্রস্তাবেই ভীতিবিহ্বল হন, এই উভয়বিধ ব্যক্তিই সমাজসংস্কারের অনুপযুক্ত। সর্ব্বপ্রকার গোড়ামী সমাজের সর্ব্বনাশ-সাধক।

অর্জ্জুনমিশ্রকে তৎকালে অনেকে দেবতা বলিয়া মান্য করিতেন। অর্জ্জুনমিশ্র সম্বন্ধে নানা রূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, এক সময়ে সপত্নীক অর্জ্জুনমিশ্র ৺শ্রীধাম শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তথায় ঘোরতর ঝড়বৃষ্টিবশতঃ সস্ত্রীক অর্জ্জুন তিন দিবস উপবাসী থাকেন। স্বয়ং পুরুষোত্তম শিশুরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার গৃহে অন্ন নিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে কৃষ্ণনামামৃত পানে বিভোর, তাঁহাদের অন্নপানের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু ভক্তের সম্মান বৃদ্ধি করিবার জন্য রামকৃষ্ণরূপী শিশুদ্বয় পদ্মাসমীপে অন্নপাত্র নিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই শরীরধারী ব্রহ্মরূপী শিশুদ্বয় পদ্মাকে বলিলেন—মা তোমার ঘরে অন্ন বহন

করিতে বিলম্ব হওয়ায় পিতা আমাদিগকে বড়ই প্রহার করিয়াছেন। পদ্মা বালকদ্বয়ের পৃষ্ঠে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া বড়ই বিহ্বলা হইলেন এবং শিশুদ্বয়কে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক মাতৃস্নেহে গলিয়া গেলেন। সেই ব্রহ্মময় শিশুদ্বয়কে বক্ষে ধারণ করিয়া পদ্মা কৃতার্থা হইলেন। তাঁহার বহুজন্মার্জ্জিত শোকতাপ বিদূরিত হইল। ঐ সময়ে অর্জ্জুন গৃহে ছিলেন না, স্নানার্থ সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন। স্নান করিয়া বাটীতে আসিয়া তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তাঁহার প্রেমময় হৃদয় উদ্বেলিত হইল। সেই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ ক্ষণকাল মধ্যে শিশুদ্বয়কে চিনিলেন। হঠাৎ তাঁহার সমাধি হইল। যে পদার্থটীকে স্থূলরূপে বাহিরে দেখিতেছিলেন, সমাধিসময়ে সূক্ষ্ম শরীরে সে শিশুদ্বয়কে অশরীরী তেজোময় পদার্থরূপে দেখিতে লাগিলেন। সমাধি অন্তে আর শিশুদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন না। পতিপত্নী বিহ্বলচিত্তে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। হঠাৎ অর্জ্জুন স্বকৃত ভগবদ্গীতার টীকা খুলিলেন। ভগবদ্গীতার ৯ম অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে লিখা আছে—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥

আমার যে ভক্তগণ অনন্যমনা হইয়া কেবল আমাকেই সেবা করে, সেই মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদের যোগ (ধনাদিলাভ) ও ক্ষেম (মঙ্গল, বা পালন অথবা মোক্ষ) আমি প্রদান করিয়া থাকি। শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী উভয়েই "বহামি" অর্থ করিয়াছেন "প্রাপয়ামি" অর্জ্জুন "বহামি" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন "বাহয়ামি"। আজি প্রভুর এই দয়া দেখিয়া বুঝিলেন গীতায় ভগবদ্বাক্য যে "বহামি" আছে তাহাই সত্য। "বাহয়ামি" অর্থ কাটিয়া বহামি শব্দই ঠিক রাখিয়া দিলেন। এবং ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণে ও ভগবৎনির্ভরে নিশ্চিন্ত হইলেন।

এই সমুদয় কিম্বদন্তীর মূলে যাহাই থাকুক না কেন, অর্জ্জুন মিশ্রকে তাঁহার জীবিত কালে ও মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দেশীয় জনসমূহ কি চক্ষে দেখিত তাহা এই কিম্বদন্তীসমূহ প্রকাশ করিয়া দেয়।

মুলো পঞ্চানন নামে এই সময়ে চট্টোপাধ্যায় বংশে একজন স্পষ্টবাদী ঘটক জন্মগ্রহণ করেন। অর্জ্জুনমিশ্র, দেবীবর, রঘুনাথ, রঘুনন্দন, চৈতন্যদেব প্রভৃতির সময়ে ইনি বালক। সমাজের জন্য ইঁহার প্রাণ কাঁদিত, সমাজের বিস্ফোটক

স্বরূপ দোষরাশিকে তিনি স্পষ্ট করিয়া লোকলোচনীভূত করিয়া দিতেন এবং সমাজের নেতৃবৃন্দের চক্ষুরুন্মিলিত রাথার জন্য তিনি তাঁহাদের উপর কশাঘাত করিতে কদাপি কুণ্ঠিত হইতেন না। এমন কি, মাতা জীবিত থাকা অবস্থায়ও পত্নীর অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চৈতন্য প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ এবং চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মের প্রতি তাচ্ছিল্য দর্শনে, রঘুনাথ শিরোমণির নব্য ন্যায়ের প্রভাববশতঃ গোতম, কণাদ, জৈমিনি প্রভৃতির প্রতি এবং রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রকাশ দ্বারা মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির প্রতি বাঙ্গালীর হতাদর দৃষ্টে তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। দেবীবরের মেল বন্ধনের ভাবী কুফল ভাবিয়া তিনি ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ইহাঁদের গুণের প্রশংসা করিয়াও দোষ দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই *। সেই নুলো পঞ্চাননও অর্জ্জুনমিশ্রের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। অর্জ্জুনমিশ্র বিষ্ণুর অবতার বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

নুলো পঞ্চানন বলেন—

"পঞ্চানন নুলো ভণে দেবত্ব ছিল অর্জ্জুনে।"
"মিশ্রার্জ্জুন সূর্য্য তুল্য দিনকর বংশ॥"

---

* বাসুদেবের তিন শিষ্য চৈয়ে রঘুদ্বয়।
নদের লোক এদের নামে জীয়ে রয়।
* * *
তিন জনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ।
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হাতে গত।
শচীছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়।
মাতা পত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়।
কিছু পরে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে।
সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে ভাস।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাস।"

(নুলোপঞ্চানন কৃত গোষ্ঠীকথা)

আবার মেল সলাকায় লিখেন—

"অর্জ্জুনমিশ্রাদির ব্রাহ্মণ্য দেবত্ব প্রচুর।
তাই কুলের মুখগণে বলে যে ঠাকুর।
অর্জ্জুনমিশ্র ছিল পণ্ডিত শিরোমণি
যাঁর ব্যাখ্যায় ভারততত্ত্বজ্ঞানখনি।"

অর্জ্জুনমিশ্রাদির ন্যায় বাঙ্গালীর জীবনী দৈনিক পঞ্জিকার মত ঘরে ঘরে থাকা কর্ত্তব্য। আমাদের অজ্ঞতাবশতঃ এই সমুদয় মহাত্মার সংক্ষেপ জীবনী সম্বন্ধেও ভ্রম প্রমাদ হওয়া বিচিত্র নহে বিশেষজ্ঞ পাঠক এতৎসম্বন্ধে ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করিয়া দিলে অথবা ইঁহাদের সম্বন্ধে কোন নব্য তত্ত্ব অবগত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইলে নিতান্ত অনুগৃহীত ও সুখী হইব।

শ্রীকামিনীকুমার ঘটক।

চাপে পরিবর্ত্তন

শীতল লৌহকে তরল গুড়ের মত ঢালা যায় ইহা বোধ হয় অনেকেই দেখেন নাই। এক সময়ে টাকশালের প্রধান কর্ম্মচারী সার্ উইলিয়ম্ রবার্টস্ রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসনে ইহা সর্ব্বসাধারণকে দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি এক খণ্ড লৌহের উপরে গুরুতর হাইড্রলিক চাপ প্রয়োগ করিয়া কৌশলক্রমে ঐ চাপের সময়ে লৌহ খণ্ডের ছায়া একখানা পরদার উপরে ফেলিয়া দেখাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে পলমল গেজেটে (ই, এস্, জি) নাম স্বাক্ষরকারী একজন লিখিয়াছিলেন—"বস্তুতঃই আমরা কঠিন লৌহকে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি।" চাপের দ্বারা অন্যান্য কঠিন পদার্থও তরল হইয়া পড়ে। এক সময়ে জন্ মিল্‌নি অনুমান করিয়াছিলেন যে ভূমিকম্পের ইহাই একটী কারণ। ভূমিকম্পের সীমার অধিকাংশ স্থলেই দেখা গিয়াছে যে গভীর সমুদ্রের পার্শ্বে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ রহিয়াছে। আমেরিকার এণ্ডেস্ পর্ব্বত ও জাপানের ফুসিইমা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

অধ্যাপক মিল্‌নি বলেন সমুদ্রতীরস্থ পৃথিবীর নিম্ন স্তর অর্দ্ধ তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উপরের অংশ ধসিয়া পড়াতে ভূমিকম্পের উদ্ভব হয়। এই সিদ্ধান্ত আপাততঃ শুনিতে মন্দ বোধ হয় না কিন্তু পৃথিবীর যে স্তরের উপরে পর্ব্বত স্থাপিত উহার তুলনায় পর্ব্বত অত্যন্ত লঘু। যাহা হউক ইহার কোন-টাই পরীক্ষার দ্বারা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। পর্ব্বতপ্রমাণ চাপের দ্বারা পদার্থের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় আমাদের সেই জ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই। সার্ উইলিয়ম যে পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা অতি সামান্য মাত্র। বর্ত্তমানে পর্ব্বত-প্রমাণ চাপে পদার্থের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহার কিছু পরীক্ষা হইয়াছে এবং আরও পরীক্ষা হইতেছে। হারভার্ড (Harvard) পরীক্ষাগারে ডাঃ ব্রিজমেন্ কৃত্রিম উপায়ে চাপ প্রয়োগ করিয়া যে পরীক্ষা করিয়াছেন উহাই বোধ হয় আপাততঃ সর্ব্বোচ্চ চাপের পরীক্ষা হইয়াছে। তিনি কোন কোন স্থলে ২0,000 বায়ব্য চাপ দ্বারা পরীক্ষা করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। এবং তিনি উহার ১২,000 হাজার চাপ পর্য্যন্ত একরূপ পরিমাণ করিয়াছেন। ২0,000 হাজার বায়ব্য চাপ, প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে ৩00,000 তিন লক্ষ পাউণ্ডের চাপের সমান। ইহা শুনিতে যত সহজ মনে হয়, কিন্তু ধারণা করা তত সহজ নহে। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই একটী বড় কামান দাগিলে যে চাপ পাই উহার পরিমাণ ২,000 বায়ব্য চাপের সমান অথবা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩0,000 হাজার পাউণ্ড। কিন্তু উহা ডাঃ ব্রিজমেনের পরীক্ষিত চাপের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। একটী আবদ্ধ পাত্রে নাইট্রগ্লিসিরিন্ বিস্ফোরিত করিলে আমরা কাল্পনিক ১0,000 হাজার বায়ব্য চাপ পাইতে পারি। কিন্তু ডাঃ ব্রিজমেনের ২0,000 হাজার বায়ব্য চাপে আবদ্ধ করিলে নাইট্রগ্লিসিরিনের বিস্ফোরণ শক্তি রহিত হইবে।

পার্থিব জিনিষ হইতে উপমা সংগ্রহ করিতে হইলে আমরা সমুদ্রের গভীরতার বিষয় উল্লেখ করিব। সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশ প্রায় ৬ মাইল হইবে। তথায় সমুদ্রের তল দেশে বায়ব্য চাপ ১,000 হাজার হইবে। তাহা হইলে দেখা যায় যে যদি সমুদ্র ১২০ মাইল গভীর হইত তাহা হইলে তাহার তলদেশে মাত্র ২0,000 হাজার বায়ব্য চাপ পাওয়া যাইত। অথবা ৫0 মাইল মৃত্তিকার নিম্নেও ঐরূপ চাপ পাওয়া সম্ভব।

হারভার্ড পরীক্ষাগারে হাইড্রলিক উপায়ে চাপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। অধিকতর চাপ প্রয়োগ করিতে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু প্রধান অসুবিধা পিষ্টন ও পাত্রের ভিতর দিয়া জল চুয়ান বন্ধ করা। এই চুয়ান বন্ধ করায় জন্য পেক্ করিবার এরূপ বস্তুর প্রয়োজন হইয়াছিল যাহা চাপের দ্বারা আপনা হইতে সঙ্কুচিত হয়।

তরল পদার্থ একটী নলের ভিতরে রাঁখিয়া পিষ্টন দ্বারা চাপ দিয়া পরীক্ষা করার সময়ে ইস্পাতের পাতের কয়েকটী অভাবনীয় শক্তি বাহির হইয়াছে। ইহার একটী শক্তি এই যে যদি একটী ষ্টিলের নলের ভিতরে এরূপ চাপ দেও যে যাহাতে ইস্পাত ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, চাপ তাহা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে চোঙ্গের ভিতরের দিক ভাঙ্গিয়া কিম্বা ফাটিয়া যাইবে না। এরূপ অবস্থাতে ভিতরের দিক প্রসারিত হইয়া চোঙ্গের বাহিরের দিককে চাপ-সহনোপযোগী করিবে। যখন চোঙ্গ নিতান্তই ফাটিয়া যাইবে, ফাটা বহির্দ্দেশ হইতে আরম্ভ হইবে।

বহুদিনের এক সংস্কার আজ দূরীভূত হইয়াছে। কোন কোন পুস্তকেও ইহা দেখা গিয়াছে যে একটী লৌহ গোলক জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে অত্যধিক চাপ দিলে জল গোলকের সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা বাহির হইয়া পড়িবে। কিন্তু এ যাবৎ যত চাপের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, ডাঃ ব্রিজমেন্ তাহা হইতে অধিক চাপ দিয়াও দেখিয়াছেন তাঁহার লৌহ পাত্রের ভিতর দিয়া জল চুয়াইয়া বাহির হয় নাই। কিন্তু এরূপ দেখা গিয়াছে যে অত্যধিক চাপে লৌহ পাত্রের কোন এক স্থান হইতে জল সূক্ষ্ম ধারে বেগে বাহির হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ বাহির হইবার কারণ পাত্রেতে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকা। পারদ, লৌহ-পাত্রে রাখিয়া প্রবল চাপ দিলে পাত্রের ভিতরে পারদ রাখা অসম্ভব হয়। পারদ লৌহপাত্রের গাত্রে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে অত্যধিক চাপে পারদ লৌহের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে।

চাপের দ্বারা অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হয়। পেরাফিন্‌কে চাপের দ্বারা কাঁচা ইস্পাতের মত শক্ত করা যায়, রবার ইস্পাত হইতে শক্ত ও কাচের মত ভগ্ন-প্রবণ হয়। আমাদের সংস্কার আছে যে চাপের দ্বারা জল অতি সামান্য সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু ১২,০০০ হাজার বায়ব্য চাপে জল $\frac{1}{5}$ এক পঞ্চমাংশ

সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা অনেক কম চাপে জল বরফ হইয়া পড়ে। মুহূর্ত্তের মধ্যে একরূপ বরফকে অন্যরূপ বরফে পরিণত করা যায়। তখন মনে হয় বরফের অণুসকল যেন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসিয়া বিভিন্ন প্রকার বরফ তৈয়ার করিতেছে। ডাক্তার ব্রিজমেনের আবিষ্কারে পাঁচপ্রকার বরফ বাহির হইয়াছে।

শ্রীহরিচরণ দত্ত।

বর্ষাকালে বিক্রমপুরের অবস্থা

বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের বর্ষাকালের সহিত বিক্রমপুরের বর্ষাকালের বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যে সময়ে বিক্রমপুরের মাঠ, ইত্যাদি জলে প্লাবিত থাকে তাহাকেই আমরা বিক্রমপুরের বর্ষাকাল বলিয়া থাকি। এইরূপ অবস্থা জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ ভাগে বন্যার ন্যায় হঠাৎ নূতন জল-স্রোত আসিয়া প্রথমে খাল, নদী, নালা, ইত্যাদি প্লাবিত করিয়া ফেলে। সূর্য্যাস্তের পর হইতে ভেক-গুলি জলের ধারে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া অধিবাসীদিগকে বর্ষাগমনের সংবাদ দিতে থাকে। এই সময়ে পথিকদিগের পথ চলা ভার হইয়া উঠে। আষাঢ় মাসে এই জল-স্রোত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে হইতে কুলুকুলুস্বরে মাঠ, ঘাট ইত্যাদি ভাসাইয়া দেয়। মাঠের সবুজবর্ণ ধানগাছগুলি নূতন জলাগমনে আনন্দে উৎ-ফুল্ল হইয়া নৃত্য করিতে করিতে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মাঠের সর্ব্বত্র নূতন জলে আচ্ছাদিত হওয়ায় দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখায়। গৃহপালিত ও বন্য পশু-সমূহের মাঠে স্বাধীনভাবে আহার বিহার বন্ধ হইল দেখিয়া তাহারা উচ্চ স্থানে আশ্রয় খুঁজিয়া লয়। এই সময়ে আউস ধান্য পাকে। কৃষকেরা এক কোমর জলে দাঁড়াইয়া মনের আনন্দে ধান্যগুলি ছেদন করিতে থাকে।

ক্রমশঃ জল বৃদ্ধি হইতে হইতে শ্রাবণ মাসে গৃহস্থের বাড়ীগুলি যেন সমুদ্র মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র ভাসমান দ্বীপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আবার বিক্রম-পুরের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষকেরা পাট বুনিয়া থাকে। বর্ষার প্রারম্ভেই সব

পাট কাটিয়া পচাইবার জন্য মাঠের জলে ভিজাইয়া রাখে। ইহাকে 'জাক' দেওয়া বলে। পাট কাটার পর বড় বড় মাঠগুলির বিস্তৃত সলিল রাশি দেখিলে নদী বলিয়া ভ্রম হয়। শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাস বিক্রমপুর এই অবস্থায়ই থাকে। এই সময়ে অনেকের বাড়ী জলে ডুবিয়া যায়।

আশ্বিন মাস হইতে জল কিছু কিছু কমিতে থাকে। ফলভারাবনত হৈমন্তিক ধানগাছগুলি তাহাদের অবলম্বন জল কমিয়া যাওয়াতে এলাইয়া পড়ে। মাঠের জল সব পচিয়া যায়। মাঠ, বিল হইতে পচা জল খাল বাহিয়া বাহির হইতে থাকে। এইরূপে কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে মাঠ একেবারে জলশূন্য হইয়া যায়। কিছুদিন মাঠে কাদা থাকে। পরে সূর্য্যতাপে রাস্তাঘাট শুকাইয়া যায়। পথিকেরা আবার পায়ে হাঁটিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিতে থাকে। এইরূপে বিক্রমপুরের বর্ষাকাল শেষ হয়।

বর্ষাকালে বিক্রমপুরের অধিবাসীদিগকে যৎপরোনাস্তি অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বর্ষার প্রারম্ভে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের শেষভাগে ও আষাঢ়ের প্রথম ভাগে লোকের স্থানান্তরে যাওয়া বড়ই দুরূহ হইয়া উঠে। মাঠের প্রায় স্থানেই জলকাদা জমিয়া থাকে। এইজন্য পায়ে হাঁটিয়াও যাওয়া যায় না অথবা নৌকা-যোগেও যাওয়া যায় না। তারপর আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর লোককেই যেন দ্বীপান্তরে বাস করিতে হয়। এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইতে হইলেই নৌকার দরকার। নৌকা ছাড়া কোথাও যাওয়ার যো নাই। এই সময়ে প্রত্যেকের এক এক খানা ভিন্ন নৌকা না থাকিলে স্বাধীন ভাবে যাতায়াত করা দুরূহ হইয়া উঠে। বিক্রমপুরের প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই অন্ততঃ এক এক খানা নৌকা আছে। যে পরিবারের একখানাও নৌকা নাই তাহাদের পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। এই অবস্থায় যে কিরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহ অনুমান করিতে পারে না। বর্ষারম্ভের ন্যায় বর্ষাশেষেও স্থানীয় লোকদিগকে বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কার্ত্তিকমাসেও স্থানান্তরে যাওয়া দুরূহ হইয়া পড়ে। কোথাও জলদ্বারা, কোথাও কাদা দ্বারা রাস্তা আবৃত থাকে।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হওয়ায় অধিকাংশ স্থানেই নানা রকমের আগাছা জন্মিয়া থাকে। বর্ষাপ্রারম্ভে যখন নূতন জল আসে তখন ঐ সমস্ত আগাছা

পচিয়া যায় এবং উহা হইতে একরকম দুর্গন্ধ বাহির হয়। ঐ দুর্গন্ধ শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবিষ্ট হইলে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা অনেকে আক্রান্ত হইয়া থাকে। বর্ষাশেষেও জল কমিয়া যাওয়ায় ঘাস পাতা ইত্যাদি পচিয়া জল দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। জল পচিয়া যাওয়ায় অনেক মৎস্য মরিয়া ভাসিয়া উঠে, এবং অধিকাংশই পচিয়া জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। কাজেই এই সময়ে স্থানীয় অধিবাসীদিগকে ভয়ানক জলকষ্ট ভোগ করিতে হয়। পরিষ্কৃত পানীয় জলের অভাব হেতু ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, ইত্যাদি নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এই সকল দুরারোগ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রতি বৎসর কত অধিবাসী যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

বর্ষাকালে স্থানীয় অধিবাসীদিগকে সর্প ভয়ে বড়ই শঙ্কিত থাকিতে হয়। মাঠ ঘাট জলে প্লাবিত হওয়াতে অনেক বিষধর সর্প গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অসতর্কিত ভাবে মনুষ্য কর্ত্তৃক একটু আঘাত পাইলেই আঘাতকারীকে সক্রোধে তৎক্ষণাৎ দংশন করে। এইরূপে প্রতি বৎসর অনেক অধিবাসী সর্পদংশনে অকালে মানবলীলা সংবরণ করে।

বিক্রমপুর কৃষিপ্রধান স্থান। কাজেই প্রত্যেক কৃষককেই চাষের জন্য বলদ রাখিতে হয়। অনেক গৃহস্থ দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য গাভীও পালিয়া থাকে। বর্ষাকালে গৃহপালিত পশুগুলিকে বড় কষ্ট পাইতে হয়। মাঠ জলে ডুবিয়া যাওয়ায় গাভীগুলি স্বাধীনভাবে আহার বিহার করিতে পারে না; ফলে দুগ্ধও কম পরিমাণে দিয়া থাকে। আবার যাহাদের বাড়ী জলে ডুবিয়া যায় তাহাদিগকে দারা, পুত্র, পরিবার ও গৃহপালিত পশু ইত্যাদি লইয়া যৎ-পরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সুতরাং দুগ্ধের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

বর্ষাপ্লাবন দ্বারা বিক্রমপুর-বাসীরা অসুবিধার তুলনায় সুবিধা খুব কমই ভোগ করিয়া থাকে। বর্ষাকালে বিক্রমপুর জলে প্লাবিত হওয়ায় সর্ব্বত্র নির্ম্মল পানীয় জলের অভাব দূরীভূত হয়। কাজেই পূর্ণ বর্ষার সময়ে সাধারণতঃ কোন প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না।

এ সময়ে নৌ-বাণিজ্যের বড়ই সুবিধা হইয়া থাকে। এক সময়ে অনেক

মালামাল নৌকার সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নেওয়া যায় এবং ইহাতে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় অপেক্ষাকৃত যথেষ্ট কম হইয়া থাকে।

বিক্রমপুরে ময়লা নিঃসারণের কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই। কাজেই স্থানে স্থানে সমস্ত বৎসরের নানা প্রকার আবর্জ্জনা ও ময়লা জমিয়া থাকে। এই বর্ষা-প্লাবনে সেই সমস্ত ময়লা ও আবর্জ্জনা ধুইয়া লইয়া যায়। ইহাতে স্থানীয় অধিবাসীরা নানা রকম রোগের হাত হইতে মুক্তি লাভ করে। যদি বিক্রমপুরে প্রতিবৎসর একবার করিয়া এইরূপ জলপ্লাবন না হইত, তবে প্রতি বৎসরের ময়লা জমিয়া বিক্রমপুর নানা প্রকার সাংঘাতিক রোগের আকর হইয়া উঠিত এবং হয়ত এতদিনে বিক্রমপুর জনশূন্য হইয়া যাইত।

বর্ষাকালে বিক্রমপুরের জমিগুলি ভিজিয়া নরম হয় এবং ক্ষেত্রের উপরে এক প্রকার কাদামাটি পড়ে, তাহাকে পলিমাটি বলে। ইহাতে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে; কাজেই স্থানীয় কৃষকদিগকে চাষের সময় ক্ষেত্রে আর ভিন্ন সার দিতে হয় না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে যদি বিক্রমপুরের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিজ গ্রামের বর্ষাকালীন অসুবিধা নিবারণে মনোযোগী হয়েন, তাহা হইলে অধিবাসীদিগের কষ্ট অনেক পরিমাণে লাঘব হইতে পারে। যদি প্রতি গ্রামে গ্রামবাসীদের ব্যয়ে গোচারণের জন্য এক একটী বিস্তৃত উচ্চ ঘাসপূর্ণ মাঠ নির্ম্মিত হয় তবে বর্ষাকালে গৃহস্থদিগকে গৃহ-পালিত পশুর জন্য এত কষ্ট ভোগ করিতে হয় না; অথচ এদিকে দুগ্ধও অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পাওয়া যায়। বিক্রমপুরের অধিকাংশ গ্রামেই পল্লীগুলি পরস্পর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলেও বর্ষাকালে জলের জন্য এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া যায় না। যদি প্রত্যেক পল্লীর প্রতিবাসিগণ সামান্য অর্থব্যয় পূর্ব্বক ছোট ছোট রাস্তা বাঁধাইয়া পল্লীগুলিকে যুক্ত করিয়া লয়েন, তবে বর্ষাকালেও স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র গমনাগমনের বিঘ্ন হয় না। ইহাতে বর্ষাকালীন সুবিধাগুলিও নষ্ট হইবার কোনরূপ আশঙ্কা নাই। এই প্রস্তাবে বিক্রমপুরবাসী কয়জনে কর্ণপাত করিবেন? বিক্রমপুরের শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় সকলেই সপরিবারে সহরবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা বৎসরে হয়ত কোন কার্য্যোপলক্ষে অথবা শারদীয় পূজোপলক্ষে দশ পনর দিনের জন্য একবার নিজ

গ্রামে আসিয়া থাকেন। কাজেই তাঁহারা গ্রামের সুবিধা ও অসুবিধার দিকে বড় দৃষ্টি দেন না। ফলে গ্রামবাসীদের অবস্থা কোন ক্রমেই উন্নত হইতেছে না। হায়! কবে শিক্ষিত ও ধনিগণ কুটীরবাসী সামান্য গ্রামবাসীদের মনোবেদনা বুঝিবেন—কবে বা বিক্রমপুরের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইবে!

শ্রীমন্মথনাথ পাল।

প্রতিদান

প্রসিয়ার অধীশ্বর দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক রাজনৈতিক গাম্ভীর্য্যের আধার হইলেও তাঁহার জীবনে চটুল রঙ্গরসপ্রিয়তার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রিয় বয়স্য ও সভাষদগণের মধ্যেও অনেকে এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ব্যঙ্গবাণ প্রয়োগে সম্রাট ও তাঁহার বন্ধুগণ কিরূপ নিপুণ ছিলেন তাহার উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রায়শঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে।

কিম্বদন্তী এইরূপ যে সম্রাট মহোদয় এক দিবস কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে আপনার জনৈক প্রিয়বন্ধু ও সভাষদকে একটি স্বর্ণনির্ম্মিত নস্যপাত্র উপহার প্রদান করেন। রাজপ্রদত্ত উপহার প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে সভাষদ যেমন পাত্রের বহিরাবরণ উন্মোচন করিলেন, অমনি আবরণের অভ্যন্তরে একটি রাসভের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিয়া নৃপতির ব্যঙ্গপরায়ণতায় বিশেষ প্রীতিলাভ করিতে পারিলেন না। যাহাহউক তিনি তখন এসম্বন্ধে কোনও উচ্চ বাচ্য না করিয়া নীরবে এই ব্যঙ্গবাণের আঘাত সহ্য করিলেন।

তৎপর নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি নগরের প্রসিদ্ধ শিল্পীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং নস্যপাত্রের আবরণের অভ্যন্তরস্থ রাসভের প্রতিমূর্ত্তিটী বিলুপ্তকরতঃ তৎস্থলে সম্রাটের অবিকল প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে উপদেশ দিলেন। আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া শিল্পী যথাসময়ে নস্যপাত্রটী সভাষদকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে সম্রাট-ভবনে একটি প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হয়। বলা বাহুল্য সম্রাটের উক্ত বয়স্য অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যগণ সহ প্রীতিভোজে আহূত হন।

ভোজের সভায় বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সম্রাটের নানাবিধ প্রীতিপূর্ণ আলাপ চলিতে লাগিল। রঙ্গরসের বাক্যচ্ছটায় যখন আসর ভরপূর, তখন বয়স্য রাজ-প্রদত্ত উপহারের পাত্রটি পকেট হইতে বাহির করিয়া বড়ই গৌরবের সহিত যেন তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন, এইরূপ ভাণ করিতে লাগিলেন। সম্রাটের ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল কটাক্ষের নিকট তাঁহার এ কার্য্য বেশী ক্ষণ গুপ্ত রহিল না। তখন সম্রাট মহোদয় সভাষদকে লইয়া এ সভায় একবার বেশ একটু কৌতুক করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাই সম্রাট সমাগত জনৈক বন্ধুকে বলিয়া দিলেন যে তিনি তাঁহার উক্ত সভাষদকে এই স্বর্ণনির্ম্মিত নস্য-পাত্রটী উপহার দিয়াছেন। সম্রাটের কথায় উক্ত বন্ধু কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সভাষদের নিকট সম্রাটপ্রদত্ত উপহার পাত্রটি দেখিতে চাহিলেন এবং পাত্রটির আবরণ উন্মোচন করিয়া অভ্যন্তরে সম্রাটের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে শিল্পীর অসাধারণ কৌশলে বিমুগ্ধ হইলেন, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, শিল্পীর কি বাহাদুরী, শিল্পী ইহাতে কি আশ্চর্য্য কলা কৌশলই না প্রদর্শন করিয়াছে; উপহারপ্রদত্ত নস্যপাত্রটিতে আপনার প্রতিকৃতি ঠিক অবিকল অঙ্কিত করিয়াছে। শিল্পীর হাতে জীবন্তভাবে সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি এই নস্যপাত্রটিতে ফুটিয়া উঠিয়া শতগুণে ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে, এই বহুমূল্য ও অনিন্দনীয় কারুকার্য্যখচিত উপহারের বস্তুটি সম্রাটের উদারতার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

এই অপরূপ প্রশংসার পরে নস্যপাত্রটি একজনের হস্ত হইতে হস্তান্তরে ঘুরিতে লাগিল। সকলেই পাত্রের অভ্যন্তরে সম্রাটের অনিন্দ্যসুন্দর কান্তির অবিকল প্রতিকৃতি অঙ্কিত দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে শিল্পীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বারম্বার এই কথার উল্লেখ করিয়া সম্রাটের বদান্যতার জন্য অজস্র সাধু-বাদ করিতে লাগিলেন। সেই কৌতুকের আসরে সম্রাট বন্ধুবান্ধবগণের এই অযাচিত প্রশংসার কারণ নির্ণয় করিতে অক্ষম হইলেন। নস্যপাত্রে এখনও রাসভের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে এবং সম্রাটকেই লক্ষ্য করিয়া বন্ধুবান্ধব-গণের এ রহস্য চলিতেছে ভাবিয়া সম্রাটের মনে আর স্বস্তি রহিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার হৃদয় নানারূপ কষ্টকর কল্পনায় মথিত হইয়া উঠিল; কৌতুক করিতে যাইয়া তিনি নিজে বিজড়িত ও অপদস্থ হইলেন ভাবিয়া এই

ঘটনাটিকে কিরূপে উড়াইয়া দিবেন, এই চিন্তায় থতমত খাইলেন, একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন যেন এতটুকু হইয়া গেলেন। অবশেষে নস্যপাত্রটী এক হস্ত হইতে হস্তান্তরে ফিরিতে ফিরিতে যখন ক্রমে সম্রাটের নিজ হস্তে আসিয়া পড়িল তখন সম্রাটের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না, নস্যপাত্রের অভ্যন্তরে রাসভের প্রতিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে নিজের সুন্দর প্রতিকৃতি অঙ্কিত দর্শনে তাঁহার মনের ধাঁ ধাঁ দুরীভূত হইল এবং সভাষদের এই কৌশলপূর্ণ চাতুরীজালে যে তিনি ক্ষণকালের জন্যও বিজড়িত ও বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, এজন্য সমধিক প্রীতি লাভ করিলেন, এমন কি সভাষদকে অমিয়সিঞ্চিত মধুর বচনে আপ্যায়িত করিয়া যথোচিত উপহারে তাঁহার গৌরব বর্দ্ধিত করিলেন।

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী।

প্রহেলিকা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মায়াময়ি! তুমি পূর্ব্ব-শ্রীহারা, তথাপি তুমি চিত্তহারিণী—আনন্দদায়িনী! জগতে তুমি অতুলনীয়া!

বৈশাখ মাসের শেষ ভাগ। বড়ই গরম পড়িয়াছে। ছেলেরা গ্রীষ্মবন্ধোপলক্ষ্যে বিদেশ হইতে বাড়ী আসিতেছে।

রমাপ্রসাদ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী প্রিয়তম পুত্রের আগমন উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বিদেশ হইতে মায়াময়ী আসিতে হইলে, হাটখালি হইয়া আসিতে হয়। একদিন, মোক্ষদাসুন্দরী নদীরামকে সকাল সকাল আহার করাইয়া সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। সে দিন নগেন্দ্রের আসিবার কথা। দাদা আসিবে বলিয়া তবু যেন আনন্দে অধীরা হইয়া পড়িল।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। এমন সময়, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নদীরামের সহিত খগেন্দ্রসহ নগেন্দ্র বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাদের দর্শনে মোক্ষদাসুন্দরী বড়ই আনন্দিত হইলেন। বিশেষতঃ, খগেন্দ্রের অপ্রত্যাশিত আগমনে তিনি যার পর নাই সুখী হইলেন।

তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, পিরাণ খুলিয়া, গা মোছাইয়া, দুইজনকে দুইদিকে বসাইয়া বাতাস দিতে লাগিলেন। খগেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, খগু! তুমি শুকিয়ে গেছ। রংটা ময়লা হয়ে গেছে!

খগেন্দ্র তদুত্তরে বলিল, 'না, বড় মা! দাদা বলে আমি মোটা হয়েছি। এই দেখ।' এই বলিয়া তাহার ডান হাত দিয়া বাম হাতের বাহু মাপিয়া দেখাইয়া বলিল, দেখেছ, মোটা হয়েছি কি না? কেমন দাদা! মোটা হই নি?

নগেন্দ্র তাহার কথার কোনও উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছোট খুকী কোথায়! তবু কোথায়! আর, আমা?" কথা কয়টী বলিতে না বলিতেই, 'আমা, আমা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে সে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। খগেন্দ্র ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মোক্ষদাসুন্দরী ইত্যবসরে তাহাদের জিনিস পত্রগুলি গোছাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্র ছেলেটী চট্‌পটে। বয়স এক্ষণে অনুমান তের চৌদ্দ। খগেন্দ্র তাহার অপেক্ষা বৎসর তিনেকের ছোট—বড় দুর্ব্বল। সে দাদার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়ায়।

ইতিমধ্যেই, তাহারা দুজনে পাড়ায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সমবয়স্ক কাহারও কাছে ফুটবল খেলার গল্প, কাহারও নিকট রেলষ্টেশনের কথা, কাহাদেরও কাছে দিনাজপুর স্কুলের থার্ডমাষ্টারের কাহিনী বলিতে বলিতে, এক বাড়ী হইতে আর একবাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে, গ্রামের কয়েকটা ছেলেও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছে।

এদিকে, মোক্ষদাসুন্দরী ভাত লইয়া বসিয়া আছেন। শেষে, উপায়ান্তর না দেখিয়া নদীরামকে তাহাদের অন্বেষণে পাঠাইয়া দিলেন। সে যাইয়া, অনেক কষ্টে পাড়ার আর এক কোণায় কৈলাস দত্তের বিধবা স্ত্রীর ঘরের বারেন্দায় বসিয়া, যেখানে তাহারা গত শীতকালে দিনাজপুর সহরে যে সার্কাস দেখিয়াছিল, তাহার গল্প করিতেছিল, সেখান হইতে তাহাদিগকে এক প্রকার ধরিয়া লইয়া আসিল।

বাড়ী আসিলে মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন, তোদের ক্ষিধে পায় না?

নগেন্দ্র তদুত্তরে বলিল, 'হাঁ মা! বড্ড ক্ষিধে পেয়েছিল, কিন্তু বাড়ী আসার পর যেন কেমন করে চলে গেল।' তৎপরে হাসিতে হাসিতে, 'তেল দাও মা! নদে দা, গামছাটা দেও তো' ইত্যাদি বলিতে বলিতে, তেলের থালি হইতে ঘপাঘপ্ করিয়া হাতে কতকটা তেল ঢালিয়া লইয়া, কতকটা মাটীতে ফেলিয়া, খগেন্দ্র সহ দৌড় দিয়া, মিঠাদীঘিতে ঝুপ্‌ঝাপ্ করিয়া ডুব দিয়া কোন প্রকারে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া, রান্নাঘরে আসিয়া দর্শন দিল।

তাহারা আহার করিতে বসিয়াছে, এমন সময় তবু, 'মা! দাদারা নাকি এসেছে,' বলিতে বলিতে কোথা হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নগেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া বলিল, তুই তো বেশ তবি! আমরা এতক্ষণ হলো এসেছি, তুই তো আমাদের খবরও নিস্ না। আয়, আমার সাথে খাবি?

মাথা নাড়িতে নাড়িতে, ঈষৎ হাসিতে হাসিতে খগেন্দ্র বলিল, তোমার জন্যে সুন্দর একখানা ছবির বই এনেছি তবু!

সে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিল, কোথায় ছোট দা?

নগেন্দ্র (ঈষৎ হাসিয়া)। খেয়েই নি, তারপর পাবি।

তবু খুকীকে নদে দাদার কোলে দিয়া, ময়লা হাত কোনও প্রকারে ধুইয়া, বড় দাদার সহিত আহার করিতে বসিয়া গেল। তাহারা, কোনও প্রকারে তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া, তাহাকে ছবির বহিখানা দিয়া, পোর্টমেণ্ট হইতে তাহাদের ক্লাবের ফুটবলটা বাহির করিয়া, তাহা কিক্ করিতে করিতে জজবাবুর বাটীর সম্মুখস্থ মাঠের দিকে চলিয়া গেল। পাড়ার ছেলেরা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

সে দিবস সন্ধ্যার পরে রমাপ্রসাদ বাবু যখন সহর হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তাহার কিছু পূর্ব্বেই নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র খেলা সাঙ্গ করিয়া বাটী ফিরিয়াছে। রাত্রিতে, আহারের পর তাহারা বাল্যসুলভ সরলতার সহিত তাহাদের নাগরিক জীবনের কাহিনী সমবেত পরিজনবর্গের কাছে বিবৃত করিতে লাগিল।

অন্যের নিকট, তাহার ভিতর মনোহারিত্ব তেমন কিছুই ছিল না। কিন্তু তাহাদের কাছে তাহা মধুমাখা বলিয়া বোধ হইতেছিল। মায়াময়ী গ্রামের

সেই ক্ষুদ্র, দরিদ্রের কুটীর খানি, সে রজনীতে স্নেহে ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কয়েকদিন মধ্যে, ছেলের দলে গ্রামখানি বেশ ভরপূর হইয়া উঠিল।

তবু দাদাদের নিকট হইতে বড় অধিকমাত্রায় ভালবাসার নিদর্শনসমূহ আদায় করিতে আরম্ভ করিল। বড় দাদার ছবিখানা, ছোটদাদার লিখিবার স্থন্দর খাতা খানা, (সে নিজে কিন্তু ভাল করিয়া লিখিতেও জানে না) পেন্‌সিলটী, পোর্টমেণ্টের কোণায় পয়সাটী ইত্যাদি অনেক জিনিস সে আদায় করিয়া ফেলিল। তাহারা ভগ্নীকে বড় ভালবাসিত। তাহাদের ক্ষমতার ভিতর যাহা ছিল, তাহা দিয়া তাহাকে স্থখী করিতে কখনও ক্রুটী করিত না।

* * * *

পোষ্টাফিসে অর্থাৎ পার্লিমেণ্ট হাউসে প্রাতে এখন বড়ই ভিড় হইতে লাগিল। প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই ছেলের দলে ক্ষুদ্র পোষ্টাফিস গৃহ খানি ভরিয়া যাইত। বিশেষতঃ, শনিবার দিন, অর্থাৎ যে দিন কলিকাতা হইতে বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি আসিত, সে দিন সেখানে যে একটা তর্কতরঙ্গ উত্থিত হইত, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। পোষ্টমাষ্টার রাইমোহন বাবু লোকটি স্বভাবতঃ গোবেচারী কিন্তু তর্কশাস্ত্রে তিনিও স্থপণ্ডিত মন্দ নহেন। তর্ক আরম্ভ হইলে, তিনিও আফিসের কাজকর্ম্ম ফেলিয়া, কাণের পাশে কলম গুঁজিয়া, এক পক্ষ সমর্থন করিয়া, বাকবিতণ্ডা আরম্ভ করিয়া দিতেন। গ্রামের ছেলেগুলি, বিশেষতঃ বিদেশপ্রত্যাগতগণ, সে তর্কে মাতিয়া উঠিত। হা দেশধ্বংসকারী অসার তর্ক ও গল্প! বাঙ্গালার সাত কোটী সন্তান মধ্যে কয়জন তোমাদের কবলে পতিত না হইয়া নীরবতার ভিতর, প্রকৃত মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলিতেছে! অর্দ্ধ-শিক্ষিত গ্রাম্য পোষ্টমাষ্টারকে আর কি দোষ দিব!

সকলের অপেক্ষা স্থবিধা হইল, হাটখালি যাইবার রাস্তার ধারে, গ্রামের দীনুময়রা নামে একটা লোকের মিঠাইর দোকান ছিল, তাহার। পূর্ব্বে, তাহার দোকানে বড় জিনিস থাকিত না। পথিকগণ ছাড়া কেহ বড় একটা কিনিত না। ছেলেগুলি সারাদিন তাহার দোকানের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং দুপয়সার জিনিস চারি পয়সা দিয়া কিনিতে লাগিল।

জজ বাবুর বাটীর সম্মুখে যে মাঠটুকু ছিল, বেলা একটু পড়িয়া আসিতে

না আসিতেই, ছেলের দলে তাহা ভরিয়া যাইত। তখন, সে স্থানে কোথায়ও ডুগুডুগু, কোথায়ও বা ফুটবল খেলা আরম্ভ হইয়া যাইত। গ্রামের প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা মাঠের কোণায়, আম গাছের নীচে বসিয়া খেলা দেখিত ও মাঝে মাঝে বাহাবা দিয়া ছেলেদের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিত।

ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট মেয়েগুলিও মাতিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যাকাল। ধীরে মলয়ানিল বহিতেছে। বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত দিবসের অবসানের পর, কি যেন এক সুখের ছবি দেখাইয়া, প্রকৃতিদেবী বালক বালিকা সকলকে গৃহকোণ হইতে টানিয়া আনিয়া, সেই মাঠের ভিতর ছাড়িয়া দিয়াছে। বালক বালিকাগণ খেলিতেছে, হাসিতেছে, নাচিতেছে, দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। আকাশ, গাছ, লতাপাতা, চারিদিক হইতে কি এক আনন্দের স্রোত ঝরিয়া পড়িতেছে! কোথায় দৈন্য, কোথায় দুঃখ?

মাঠের এক পাশে, ছোট বালিকাগণ খেলা জুড়িয়া দিয়াছে। তবুও তাহাদের ভিতর একজন।

আমার প্রিয় পাঠিকাগণ মধ্যে যাহারা কখনও কাণামাছি খেলা খেলিয়াছেন, তাহারা অবশ্য জানেন যে সে খেলায় একজনকে চোর সাজিতে হয়। একবার অবলা চোর হইল, তার পর বিনোদিনী, তার পর সুশীলা, তার পর তবু। তাহার নয়নদ্বয় কাপড় দ্বারা সজোরে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তৎপর, পশ্চাৎ হইতে বালিকারা নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে—

"কাণা মাছি ভোঁ ভোঁ
ছুবি যদি ছোঁ ছোঁ"

বলিতে বলিতে চট্‌পট্‌ করিয়া তাহার মাথায় চপেটাঘাত করিতে লাগিল। আঘাতগুলি বড়ই জোরে হইতে লাগিল। ' তবুর একবার ইচ্ছা হইল,' চক্ষুর কাপড় খুলিয়া দেখে কে শেষটা মারিয়া গেল কিন্তু খেলার নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া, তাহা আর হইয়া উঠিল না। এমন সময় শৈলবালা পশ্চাৎ হইতে আসিয়া এমন জোরে একটা আঘাত করিল, যে তাহার বোধ হইল যেন মাথা ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতেছে ও ব্রহ্মতালুটা জ্বলিতেছে। ইহার পর, কমলা আসিয়া যখন তাহার মাথায় আর একটা জোরে চড় মারিল, তখন সে আর সহ্য করিতে পারিল না।

'এই বুঝি খেলার নিয়ম, সুবিধা পেয়ে যার যেমন ইচ্ছে মেরে নিচ্ছ, আমি

বুঝি ব্যথা পাইনে,' বলিতে বলিতে চোখের কাপড় খুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে কমলার পৃষ্ঠদেশে রাগের মাথায় কয়েক ঘা বসাইয়া দিল। সে তাহা সহ্য করিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন জুড়িয়া দিল।

কমলার দাদা সে সময় মাঠে খেলিতেছিল। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া সে দৌড়াইয়া আসিল এবং মুহূর্ত্তপরেই নগেন্দ্রের নিকট তবুর বিরুদ্ধে সাত পাঁচ কি বলিল।

নগেন্দ্র তাহার কাছে আসিয়া রাগান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তবি! কমলাকে তুই মেরেছিস্?

তবু তদুত্তরে ঢল ঢল জলভরা চোখে চাহিতে চাহিতে বলিল, ও আমায় মেরেছে কেন? আমার বুঝি ব্যথা লাগে না?

'হাঁ ব্যথা লাগে না! কেবলই ঝগড়া ও মারামারি, তোকে কিছু না শিক্ষে দিলে চল্‌ছেনা, চল আজ বাড়ী,' এই বলিতে বলিতে তাহার পৃষ্ঠে চটাপট্‌ কয়েক ঘা বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বালিকা মানে, ভয়ে ও ক্ষোভে সেখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে দিন-কার জন্য বালিকাদের খেলা ভঙ্গ হইয়া গেল। ক্রমে, বালকের দল ও প্রৌঢ়েরা মাঠ হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল। দূরে গ্রামান্তরের বৃক্ষরাজির পশ্চাতে সূর্য্য ডুবিয়া গেল। কতকক্ষণ পরে, সেই বালকবালিকাগণের কলধ্বনিমুখরিত প্রান্তর নীরব হইয়া পড়িল। সেই সন্ধ্যার আঁধারে, সেই নির্জ্জন মাঠে বসিয়া তবু কাঁদিতে লাগিল।

এদিকে, প্রতিবেশিনী কমলার মা মুখ ভার করিয়া, সত্যমিথ্যামিশ্রিত করিয়া মোক্ষদাসুন্দরীর কাছে আসিয়া বলিল, তোমার তবুর জ্বালায় টেকা দুষ্কর হলো। এই দেখ, কমলাকে মেরেছে। মেয়েটার চুলগুলি ছিঁড়েছে, গালটা ফুলিয়ে দিয়েছে, আর পিঠের তো কথাই নাই।

মোক্ষদাসুন্দরী তাহার কথা শুনিয়া আমতা আমতা করিতে লাগিলেন। কি যে উত্তর দিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। মেয়ের উপর বড়ই রাগ হইল।

একটু পরেই নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র বাড়ী ফিরিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবি কোথায়? সে নাকি আজ কমলাকে মেরেছে?

নগেন্দ্র উত্তর করিল। হাঁ মা! সে তো আমাদের ওখানেই খেলা কচ্ছিল। বুঝি, আবার কাদের দলে যেয়ে মিশেছে।

তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। নদীরাম গরুর জন্য বিচালী কাটিতেছিল, তাহারা তাহার সহিত গল্প আরম্ভ করিয়া দিল।

গ্রন্থ-সমালোচনা

মহাভারত—শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ডবলক্রাউন ষোলপেজী ফর্ম্মের ২৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ সিকা। কলিকাতা ৫০।১ কলেজষ্ট্রীট, আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে শ্রীআশুতোষ ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পাঁচখানা হাফ্‌টোন চিত্র সম্বলিত।

লেখক উপাখ্যানবহুল বিপুলবিস্তার মহাভারতের ঘটনাবলী বালকবালিকাগণের পাঠোপযোগী করিয়া অতি সরল ভাষায় সঙ্কলিত করিয়াছেন।

আমাদের দেশের সারশিক্ষা—ধর্ম্মশিক্ষা। এদেশ ধর্ম্মের দেশ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাচীন আদর্শ পূর্ব্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে খর্ব্ব হইলেও মূল আদর্শ পথ হইতে এখন পর্য্যন্ত ভারতবাসী স্খলিত হ'ন নাই। বালকবালিকার হৃদয়-ক্ষেত্রে শৈশব হইতেই ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইলেই অতি সহজেই তাহা সুফল প্রসব করে। শিক্ষা ও আমোদের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা বালকবালিকার হৃদয়-ক্ষেত্রে ধর্ম্মের বীজ বপন করিবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণোক্ত চরিত্রাখ্যান সংকলন করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন তাঁহারা বস্তুতঃই ধন্যবাদের পাত্র। রাজকুমার বাবু মূল মহাভারতকে আদর্শ রাখিয়া এ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কাজেই মহাভারতোক্ত চরিত্রসমূহ এ গ্রন্থে অবিকৃত রহিয়াছে। ভাষা সরল, সরস ও বিশুদ্ধ। শব্দসম্পদ এবং রচনা-কৌশল চিত্তহারী। যাঁহারা স্বীয় বালকবালিকাগণকে প্রকৃত সুশিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই মহাভারতখানা দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাইবেন। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই অতি পরিপাটি। 'শিশু' প্রেসে মুদ্রিত। লেখক বিক্রমপুরবাসী, তাই তাঁহাকে সাদরে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অভিনন্দন করিতেছি।

বিক্রমপুর-প্রসঙ্গ

সভা-সমিতি—এবার উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরে কয়েকটি সভা ও সমিতির অধিবেশন হইয়াছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ বিক্রমপুরস্থ সাহিত্য-সম্মিলন

দক্ষিণ বিক্রমপুরস্থ নগর নামক গ্রামে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘটক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উত্তর বিক্রমপুরে আউটসাহী গ্রামের 'বাল্য-সমিতি', মূলচর গ্রামের 'বাল্য-সম্মিলনী' প্রভৃতি সভারও বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আউটসাহীর সভায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, এ, (অধ্যাপক প্রেসিডেন্সী-কলেজ) এবং মূলচরের সভায় হাইকোর্টের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন, বি, এল মহোদয় সভাপতি হইয়াছিলেন।

জাতিগত উন্নতিমূলক সভা-সমিতির মধ্যে তেলিরবাগ গ্রামে বৈদ্যসম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। উহাতে উক্ত সমাজের বহু কল্যাণকর বিষয়ের আন্দোলন ও আলোচনা হইয়াছিল। তথায় মুন্সীগঞ্জের প্রখ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন মহাশয় বরপণ গ্রহণের অপকারিতা সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। উহা প্রত্যেক বর্ণের উপযোগী বিবেচনায় আমরা আগামী সংখ্যায় পত্রস্থ করিব। এ সকল সভাসমিতিতে যাঁহারা বক্তা তাঁহারাই 'কার্য্যকালে নিজ নিজ পথ খোঁজেন'। আমরা দেখিয়াছি যখন বক্তাগণ বরপণের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষবাণী প্রচার করিতেছিলেন তখনই কোন কোন মহাত্মা কন্যার পিতা বা অভিভাবকবর্গের সহিত পণের টাকা লইয়া দর কষাকষি করিতেছিলেন! এখানেই বাঙ্গালীর মহত্ত্ব!

দেশের অবস্থা—দেশের অবস্থা এবার বড়ই শোচনীয়। পাটের দর অল্প তাই সর্ব্বত্র হাহাকার। পাটবিক্রয়লব্ধ অর্থই বর্ত্তমান সময়ে কৃষকের একমাত্র সম্বল। এবার তাহা না হওয়ায় সর্ব্বত্র আর্ত্তের করুণ ক্রন্দন। অন্নচিন্তায় ছোট বড় সকলেই সন্ত্রস্ত। আমরা বিক্রমপুরের নানা গ্রাম পর্য্যটন করিয়া দেখিলাম—সর্ব্বত্র একই ভাব। মাঠে পাট পড়িয়া আছে, কৃষক কাটিতেছে না, কাটিয়া কি হইবে? কৃষকেরা যে পাট কাটিয়া ঝাড়িয়া শুকাইয়া বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে, হাটের পর হাট তাহা বিক্রয়ের জন্য লইয়া যাইয়া ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা প্রতি হাটেই পাটের মূল্য বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশা করে—কিন্তু পরে তাহার বিপরীত ভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া আসে। সৌভাগ্যের বিষয় এবার চাউলের দর ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে।

বিক্রমপুর সম্মিলনীসভার কর্ত্তব্য—এ বৎসর আমরা বিক্রমপুরের কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রাম পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই রাস্তা, ঘাট এবং জলের অবস্থা শোচনীয়। বহু গ্রামেই জল এবং রাস্তার কষ্ট। নৌকাচলাচলের পথের দুই ধারে বউনা, হিজল, বাঁশ, ছিট্‌কি ও বেতের ঝোপ আসিয়া পড়িয়াছে, আর পানা পচা জলের দুর্গন্ধের ত কথাই নাই। এসমুদয় কষ্ট গ্রামবাসীর অলসতার দরুণ দূর হয় না। খালের দুইধারের গাছগাছড়া কাটাইয়া দিলে বর্ষার দিনে নৌকাচলাচলের কোন অসুবিধা হয় না, পরন্তু 'খরার' দিনে হাটা পথেরও সুযোগ হয়। এ কার্য্য ত কঠিনও নহে। এমন গ্রাম অতি অল্পই আছে যে গ্রামে বর্ষার সময় নৌকা ব্যতিরেকে এ বাড়ী ওবাড়ী হাঁটিয়া চলা ফিরা করা যাইতে পারে। বিক্রমপুরে এক হিসাবে মাত্র দুইটী প্রধান রাস্তা আছে। একটী মুন্সীগঞ্জ হইতে শ্রীনগর। এই রাস্তাটির অবস্থাই সন্তোষজনক। অপরটি মুন্সীগঞ্জ হইতে রাজাবাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এ রাস্তাটি স্থানে স্থানে মাত্র বাঁধান হইয়াছে। মূলচর হইতে রাজাবাড়ী এবং কামারখাড়া হইতে পুরুল্যা পর্য্যন্ত এ সামান্য পথটুকুতে সামান্যরূপ মাটি ফেলিয়া উচুঁ করা হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জ হইতে রাজাবাড়ী পর্য্যন্ত এ রাস্তাটির দৈর্ঘ মাত্র বার মাইল। এইটি বাঁধান হইলে পূর্ব্বাঞ্চলের লোকের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হয়। এবং বহু গ্রামবাসী অতি সহজে নিজ নিজ গ্রাম হইতে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া প্রধান রাস্তার সহিত মিলিত করাইয়া দিতে পারেন। এ রাস্তাটি যাহাতে প্রস্তুত হয় তজ্জন্য বিক্রমপুর সম্মিলনী-সভার পক্ষ হইতে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের নিকট আবেদন করা কর্ত্তব্য। এ পথের পুলগুলি কাঠের তৈরী। সেগুলির অবস্থাও তাদৃশ ভাল নহে।

তারপর জলের কথা। এক টঙ্গীবাড়ী ও মুন্সীগঞ্জ থানার এলাকাভুক্ত স্থান ব্যতীত অন্যত্র জলের বিশেষ কষ্ট। টঙ্গীবাড়ী থানার অধীনস্থ অনেক গ্রামেই পুকুরের সংখ্যা খুব বেশী। নূতন পুষ্করিণী খননের তাদৃশ প্রয়োজন নাই, সংস্কার করিতে পারিলেই সব দিক্ রক্ষা পায়। প্রত্যেক গ্রামে দুই একটী করিয়া পুষ্করিণীর সংস্কার করা যে খুব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাহাও নহে। অথচ উহা কেন হয় না তাহার অনুসন্ধান করিলে গ্রাম্য কলহ ইত্যাদিই মূল হেতু বলিয়া উপলব্ধি হয়। গভর্মেণ্টের নিকট হইতে ঋণ করিয়াও পুষ্করিণীর সংস্কার করা যাইতে

পারে—কিন্তু সকলেই সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। গ্রামের হিতকল্পে গ্রামবাসিগণ মনোযোগী না হইলে কখনও গ্রামের কল্যাণ সংসাধিত হইবে না।

বিক্রমপুরের অধিকাংশ লোকই বিদেশবাসী। এবার পূজোপলক্ষে কতিপয় গণ্য মান্য ব্যক্তি দেশে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মালখাঁনগর গ্রামনিবাসী হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার বসু এম. এ. বি. এল এবং ফুরসাইল গ্রামের অনারেবল রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন বাহাদুরের নাম উল্লেখযোগ্য। শরৎ বাবু এবার সাত বৎসর পরে দেশে আসিয়াছিলেন। দেশে না আসিলে দেশের প্রতি সহানুভূতিও লোপ পায়। কাজেই বিদেশে যাঁহারা থাকেন তাঁহারা ক্রমশঃ দেশের প্রতি মমত্ব বিহীন হইয়া পড়েন। নিজ চক্ষে দেশের দুঃখদুর্দ্দশা পর্য্যবেক্ষণ না করিলে পরের চোখ দিয়া তাহা দেখিলে চলিতে পারে না। পল্লী-সংস্কারের ইহাও অন্যতম প্রতিবন্ধক।

ভাগ্যকুলের রায় পরিবার—শুধু বিক্রমপুরের কেন সমগ্র বাঙ্গালার একটী প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বংশ। ইঁহাদের পারিবারিক ইতিবৃত্ত অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা আগামী সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকরূপে এই পরিবারের প্রাচীন ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিব। উহাতে প্রসঙ্গক্রমে রাজা শ্রীনাথ, অনারেবল সীতানাথ, জানকীনাথ, দানবীর হরেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির জীবন কথাও আলোচিত হইবে।

বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা—অদ্য এক বৎসর হইতে চলিল সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি সার চন্দ্রমাধব ঘোষের নেতৃত্বাধীনে বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা এই সভার সভ্য কিম্বা অন্য কোনও প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুণদা চরণ সেন এম. এ. বি. এল মহোদয়ের নামে ৫৯ নং হ্যারিসনরোড এই ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবেন।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র—শীঘ্র ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। রয়াল ম্যাডিকাল সোসায়টী তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। শীতঋতুতে তিনি উদ্ভিদের স্নায়ুস্পন্দনের উপর য়ুরোপীয় আবহাওয়ার প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন। তিনি ইউরোপীয় ভূখণ্ডের ইউনিভার্সিটিগুলি দর্শন করিতেও যাইতে পারেন। তিনি আগামী বৎসরের মে মাসের মাঝামাঝি

দেশে ফিরিয়া, গ্রীষ্মাবকাশ অন্তে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দিবেন। ভারতসচিব জগদীশবাবুর য়ুরোপ প্রবাসের অনুমোদন করিয়াছেন। বিলাতের বহু বিখ্যাত পত্রে তাঁহার প্রশংসা বাহির হইয়াছে।

"বিক্রমপুর" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—যুদ্ধ বিগ্রহের নানাবিধ অশান্তির দরুণ আমরা নিয়মিত রূপ পত্র প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। 'বিক্রমপুরে'র আর্থিক অবস্থাও এরূপ স্বচ্ছল নহে যে এক যোগে বহু কাগজ ইত্যাদি ক্রয় করা যাইতে পারে। কাজেই গ্রাহক ও বন্ধুবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক বিলম্বে কাগজ প্রকাশের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। কাগজের প্রচার সম্বন্ধে কেহ সন্দিহান হইবেন না।

অনেকে 'বিক্রমপুরের' কোন কোন সংখ্যা পান নাই বলিয়া আপত্তি করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয় নানাস্থানে থাকায় এ সকল ত্রুটি অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। গ্রাহকবর্গের মধ্যে যিনি যে সংখ্যা পান নাই, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ম্যানেজার "বিক্রমপুর," ৫৪।১ নারিন্দা, ঢাকা, এই ঠিকানায় পত্র লিখিয়া জানাইবেন, আমরা তাঁহাদের অপ্রাপ্ত সংখ্যাগুলি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। গ্রাহকগণের মনস্তুষ্টিই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রবাসী বিক্রমপুরবাসী—বিক্রমপুরের অধিকাংশ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই ভারতের ও ভারতের বাহিরে নানা উচ্চপদে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু দেশের লোকে তাঁহাদের কোনও সংবাদ রাখেন না। আমরা তাঁহাদের বিষয় জানিতে পারিলে আনন্দের সহিত পত্রস্থ করিব। বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ আমরা 'বিক্রমপুরের' প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ করিতে চাহি। অতএব শিক্ষিত বিক্রমপুরবাসীরা যদি নিজ নিজ গ্রামের বিস্তৃত বিবরণ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের গ্রামস্থ প্রবাসী বিক্রমপুরবাসীর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠান তাহা হইলে বিশেষ কল্যাণের কারণ হয়। এরূপ করিলে সহজেই প্রবাসী বিক্রমপুরবাসীর যাহাতে দেশের সহিত যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকে সে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পল্লী দৃশ্য—বিক্রমপুর।

Photo by J. Sen Gupta
Sonarang, Dacca.

বিক্রমপুর

২য় বর্ষ | অগ্রহায়ণ ; ১৩২১ | ৮ম সংখ্যা

পল্লী-সংস্কারের উপায়

সমবেত বন্ধুগণ,

সভাপতির কার্য্য অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব সম্পন্ন। আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির উপরে এই মহৎ ভার ন্যস্ত হওয়ায় কার্য্যসিদ্ধি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছি। আপনাদের শুভ ইচ্ছাশক্তি আমার একমাত্র ভরসা। আপনাদের যে সমবেত মঙ্গলময় ইচ্ছার বলে আমার ন্যায় শক্তিহীন শক্তিমানের আসনে সমাসীন হইতে সমর্থ হইয়াছে আশা করি সেই শুভ ইচ্ছাই অদ্য নির্ব্বিঘ্নে আশানুরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া আমাদিগকে সিদ্ধি ও সাফল্যের দ্বারে উপনীত করিবে।

বাক্যবিন্যাসে আমার তাদৃশ পটুতা নাই। ভাষা বৈচিত্র্যে আপনাদের চিত্তরঞ্জন কি মনোহরণ করিতে পারিব এমন ভরসা করি না। আমি সাদাসিধা মানুষ। দুই চারিটী কাজের কথা সোজা কথায় বলিতে পারি। কাজ করিতেই মানুষ পৃথিবীতে আসে। আমরাও আজ কাজ করিবার উদ্দেশ্যে এইখানে সমবেত হইয়াছি। যদি অদ্য পরস্পরের হৃদয়ের ভাববিনিময়ে কাজ করিবার সুপ্ত শক্তিকে আপনাদের মধ্যে অনুভব করিতে পারি তবেই আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইল বলিয়া জ্ঞান করিব।

বড়লাট মহোদয়ের স্বর্গগতা পত্নী মাননীয়া লেডি হার্ডিঙ্গ মহোদয়া সর্ব্বদাই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভারতীয় জনগণের বিশেষতঃ বালকবালিকাগণের মঙ্গল-সাধনে নিরত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের বালকবৃন্দের যে ক্ষতি

হইয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তিনি বিধাতার কল্যাণময়ী করুণা-রূপে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবান্ লর্ড হার্ডিঙ্গ ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শান্তি প্রদান করুন।

আমাদের প্রজাবৎসল সম্রাট্ যে লোকক্ষয়কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন আশা করি তাহাতে বিজয়লক্ষ্মী অচিরে আমাদের শুভানুধ্যাননিরত সম্রাট্ মহোদয়ের অঙ্কশায়িনী হইয়া তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ আমাদের কল্যাণ-সাধনে নিযুক্ত করিবেন।

মানুষ সামাজিক জীব। ব্যাঘ্রাদি আত্মোদরপরায়ণ হিংস্র পশুরা একাকী বিচরণ করে। কিন্তু হস্তী, পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী প্রাণিগণ একত্র সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিয়া জীবন সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে আগে সিংহ পাওয়া যাইত, কিন্তু আজকাল, গুজরাট ভিন্ন অন্য সব স্থানে সিংহের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। আবাদের কার্য্য যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে বোধ হয় দুই তিন শতাব্দী পরে ব্যাঘ্রের কথাও কাহিনীর বিষয় হইবে নৈসর্গিক নিয়মে দেখা যায় যে জীবন-সংগ্রামে সমাজ-বন্ধন আত্মরক্ষার প্রধান উপায়।

সমাজে একত্র বাস করিতে হইলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনেক ন্যূনতা স্বীকার করিতে হয়। পরস্পরের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ না করিলে আত্মরক্ষারূপ মহান্ স্বার্থ সাধিত হয় না। একত্র এক স্থানে বাস করিতে গেলে পরস্পরের সহানুভূতি ব্যতীত আত্মরক্ষা সম্ভবপর হয় না। সহানুভূতি মানুষকে স্বার্থত্যাগে প্রণোদিত করে।

আমাদের এই প্রদেশে আমরা ভারত-খ্যাত মহারাজা দুর্য্যোধনের প্রতিজ্ঞা লইয়া বসিয়া আছি। তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগে যে মাটি কি জিদ্টুকু উঠে তাহাও বিনা যুদ্ধে ছাড়িব না। যুদ্ধ অর্থ ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া আপনার লোক পর করিয়া উকিল, মোক্তার প্রভৃতির ন্যায় পরকে আপনার করিয়া শীতাতপে পীড়িত হইয়া চূড়ান্ত নাকাল হওয়া মাত্র। আমাদের এই ভাবের মূলে সহানু-ভূতির অভাব। আমার গ্রামের লোক আমার কে? সে তাহার স্বার্থ লইয়া পৃথক্ থাকুক। দুঃখের বিষয় আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থ টুকুই দেখিয়া থাকি, গ্রামের লোক বলিয়া আমাদের সমবেত একটা যে মহৎ স্বার্থ আছে তাহা আমাদের

দৃষ্টিতে পতিত হয় না। আমরা সম্মুখের পথটুকুই দেখি, দূরে কি আছে তাহা দেখি না। একথা কখনও কি আমাদের মনে হয় যে, আজ যাহাকে চেষ্টা করিয়া দূরে রাখিতেছি তাহাদ্বারাই কাল আমাদের মহৎ উপকার সাধিত হইতে পারে? এক গ্রামে বাসহেতু আমাদের সাধারণ স্বার্থ যে মূলতঃ এক তাহা আমরা বুঝি না অথবা বুঝিতে চাহি না। যে ব্যাধি সংক্রামকরূপে আমার প্রতিবেশীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছে তাহা আমাকেও আক্রমণ করিতে পারে; কথাটা আমরা হঠাৎ না বুঝি নয়, কিন্তু প্রকৃত ভাবে আমরা তাহা তলাইয়া বুঝি না। তখন আমরা স্থানান্তরে যাওয়ার উদ্যোগ করি। কেন না আপনি বাঁচিলে বাপের নাম। প্রতিবেশীর কি হইবে তাহা একবার ভাবিয়াও দেখি না। এদিকে যে সংক্রামক ব্যাধির বিষ প্রতিবেশীর নিকটে অবস্থান হেতু আমার শরীরেও প্রবেশ করিয়াছে তাহা ভাবিবার অবকাশ হয় না। প্রতিবেশী ও আমি যে একই স্বার্থে সম্বন্ধ, তাহার সুখ দুঃখ যে আমার সুখ দুঃখের সঙ্গেই জড়িত, তাহার মঙ্গলে যে আমারও মঙ্গল, তাহার বিপদে যে আমারও বিপদের সম্ভাবনা, এই ভাব একবারও মনে জাগে না। জাগিলেও তাহা অন্য চিন্তায় চাপা দিয়া থাকি। অবশেষে সেই ব্যাধি আমার দেহে প্রকাশ পাইয়া প্রতিবেশীর সহিত আত্মীয়তা বিশেষরূপে বিঘোষিত করিয়া দেয়। সুখের বিষয় আজকাল দেশে একটা স্বার্থত্যাগের হাওয়া উঠিয়াছে। এই স্বার্থত্যাগের গতি যদি সৎপথে লোক-হিতার্থে প্রবাহিত হয় তবেই সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে।

মহৎ স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ সমাজবন্ধনের প্রাথমিক শিক্ষা। বড়ই দুঃখের বিষয় আমরা এই পাঠ ভুলিতেছি। আমাদিগকে এই কথা প্রকৃষ্টরূপে অনুধাবন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ইহা শিক্ষা দিবার জন্য উদ্যমশীল, মানাপমান-জ্ঞানহীন মহদাশয় ব্যক্তির প্রয়োজন। ঈদৃশ ব্যক্তিগণ আমাদের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন। এই দুর্দ্দিনে আমাদের আকুল আহ্বানে তন্মধ্যে কয়েকজনকে বিচলিত করিয়াছে। তাঁহারা সঙ্কুচিত চিত্তে অগ্রসর হইয়া মূলচর গ্রামে বাল্য সম্মিলনী ও বীণা পাঠাগারের উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষায়িতারূপে দেখা দিয়াছেন। আশা করি তাঁহারা আমাদের উপেক্ষা, অবহেলা, অবজ্ঞা, অপমান ও লাঞ্ছনার অঞ্জলি সানন্দে গ্রহণ করিয়া আমাদের শুভ বুদ্ধি জাগ্রত করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

শিক্ষার অর্থ কতকগুলি চর্ব্বিত চর্ব্বণের পুনরুদ্গীরণ নয়। উহার কাজ হৃদয়ের ভাবাবলীর সম্যক স্ফুরণ। যে শিক্ষায় হৃদয় সঙ্কীর্ণ হয় তাহা শিক্ষাপদ-বাচ্য নহে। হৃদয়ের উন্নত ভাবসমূহের সম্যক্ বিকাশ ও উৎকর্ষ-সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই শিক্ষায়ই আচণ্ডাল মনুষ্যে প্রীতি জন্মে। পণ্ডিতে, চণ্ডালে ও কুক্কুরে সমদর্শিতা এই শিক্ষার চরমাবস্থা। তখন অপরের সুখ-দুঃখও নিজের সুখদুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। গ্রাম্য গার্হস্থ্য জীবন এই শিক্ষার প্রাথমিক সোপান। আমরা ভারতীয় প্রথায় এইরূপ শিক্ষাই পাইয়া থাকি। আমার বিশ্বাস আমরা এই শিক্ষারই অনুষ্ঠানকল্পে অদ্য এইস্থানে সমবেত হইয়াছি।

আমরা সংসার দায়ে যেরূপ কঠোরভাবে নিপীড়িত, তাহাতে দশের জন্য স্বার্থত্যাগ দুষ্কর হইয়া উঠে। তবে নিজের স্বার্থচেষ্টায় অন্যের স্বার্থে যাহাতে ব্যাঘাত না দেই তাহার বিধান সহজেই করিতে পারি। আমার দাবী ষোল আনায় না বুঝিয়া অন্ততঃ পনর আনায় বুঝিলেও চলিতে পারে। আশা করি উপরিকথিত মহদাশয় ব্যক্তিগণ স্বকৃত আচরণ ও ব্যবহারে আমাদিগকে প্রথমে এই শিক্ষা দিবেন।

স্বার্থত্যাগে উন্নত যে সমুদয় মহাপ্রাণ, সহৃদয় কর্ম্মবীর 'মূলচর বাল্য সম্মিলনী' ও 'বীণা পাঠাগারের' কার্য্যব্যপদেশে আমাদিগকে স্বার্থত্যাগের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের সমীপে আমার কয়েকটি নিবেদন আছে।

তাঁহারা সিদ্ধিলাভে ব্যস্ত হইবেন না। মানুষের ক্ষমতা কাজ করা। সিদ্ধি-সাফল্য ভগবানের দান। পুনঃ পুনঃ ব্যাঘাতে কার্য্যহানি হইলে তাঁহারা নিরুদ্যম ও ভগ্নোৎসাহ হইবেন না। আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীতে আবদ্ধ। এই গণ্ডী কাটিয়া বাহিরে আসিতে কিছুতেই আমাদের প্রবৃত্তি হইবে না। আমরা সাধ্যমত তাঁহাদের কার্য্যে বাধা দিতে ও বিঘ্ন জন্মাইতে এমন কি তাঁহাদিগকে পর্য্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে কুণ্ঠিত হইব না। তাঁহারা যদি আপনা বাঁচাইয়া এই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চাহেন তবে তাঁহাদিগকে অচিরে রণ-ভঙ্গ দিয়া পলায়ণ-পর হইতে হইবে। সাধারণের হিতার্থে গ্রামবাসীর শুভবুদ্ধি জাগ্রত করা এক মহতী তপস্যা। ইহার সাধনা বড়ই কঠোর। তাঁহাদিগকে অর্জ্জুনের ন্যায় স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া এই তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সঙ্কল্প

করিতে হইবে যে "বিচ্ছিন্নাভ্রবিলায়ং বা নীয়ে বা নগমূর্দ্ধণি। আরাধ্য বা সহস্রাক্ষমযশঃ শৈল্যমুদ্ধরে॥" "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড যেমন এই পর্ব্বতের শিখরাগ্রে মিলাইয়া যায় আমিও হয় তেমনি এই গিরি-গাত্রে বিলীন হইব, না হয় সহস্রলোচনের আরাধনা করিয়া যে অপযশঃ আমার বুকে শেলসম বিদ্ধ হইয়াছে তাহা সমূলে উৎপাটন করিব।" ঈদৃশ কঠোর পণে শরীর পাত অবধি স্বীকার করিয়া সাধনাপথে অগ্রসর হইলে সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী হইবে। এই সম্বন্ধে নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের কতিপয় যুবকের বিষয় উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। তাঁহারা ১২৯৮ সালে গ্রামের প্রধান অভাব যাতায়াতের অসুবিধা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া, দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন করিয়া মুষ্টিভিক্ষার চাউল সংগ্রহ করিয়া বাঁশঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য হইতে লতা সংগ্রহ করিয়া যে স্থানে শাঁকো পড়িবে তথায় এই সব সরঞ্জাম স্কন্ধে বহন করিয়া জলে নামিয়া শাঁকো দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এবং স্বহস্তে গ্রামে নূতন পথ প্রস্তুত ও পুরাতন পথের সংস্কার করিতেন। এই শাঁকো দেওয়া ও রাস্তা বান্ধান কি সহজ ব্যাপার? কেহ গালাগালি দিয়া কেহ লোকদ্বারা বাধা জন্মাইয়া এমন কি কেহ কেহ ফৌজদারী মোকদ্দমার ভয়পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিয়াও তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে বিঘ্ন জন্মাইতে প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু যুবকেরা উহা ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া শিরোধার্য্যপূর্ব্বক আনন্দের সহিত স্ব স্ব কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ২।১ বৎসর পরে যখন গ্রামের লোক বুঝিতে পারিল এই সব কার্য্যে তাহাদের উপকার ব্যতীত ক্ষতি হইতেছে না তখন আর তাহাদিগের তাদৃশ রুদ্রমূর্ত্তি রহিল না। কিন্তু কেহই কাজকর্ম্মে উক্ত যুবকগণের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইল না। সংসারচক্রে পড়িয়া একে একে উল্লিখিত যুবকগণ উদরান্ন সংস্থানে ব্যস্ত হইয়া গ্রাম ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের কার্য্যও ক্রমশঃ শিথিলপ্রযত্ন হইয়া ধ্বংসের মুখে পতিত হইল। যুবকগণের কেহ কেহ তাঁহাদের শুভ সঙ্কল্পের বিষদৃশ পরিণাম দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিলেন। ভগবানের রাজ্যে সাধু চেষ্টা ব্যর্থ হয় না—তাঁহাদের শুষ্ক আশালতা পুনরায় অঙ্কুরিত হইল। তাঁহাদের উৎসাহ শিখা পরবর্ত্তী যুবকবৃন্দের হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া পূর্ব্বানুষ্ঠিত শুভকার্য্যসমূহ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইল। এখন কেবল রাস্তাঘাট নয়, দাতব্য চিকিৎসা, বিবাদ মীমাংসা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, দুঃস্থকে দান,

এমন কি, দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষা-বিধানে পর্য্যন্ত তাঁহারা অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছেন।

সহানুভূতির প্রধান উপাদান গ্রামবাসী পরস্পরের সহিত মিশামিশি 'গরুর কুটুম চাট্‌লে চুট্‌লে, মানুষের কুটুম আসিলে গেলে।' সর্ব্বদা যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া কথোপকথন দ্বারা হৃদয়ের ভাব বিনিময় হয় তাহার প্রতি সহজেই একটা আকর্ষণ অনুভব করা যায়। যাতায়াতের সুবিধা না থাকিলে পরস্পরের নিকটে যাওয়া আসা চলে না। যাওয়া আসা না থাকিলে হৃদগত ভাব বিনিময় হইতে পারে না। পরস্পরে ভাবের আদান প্রদান না হইলে কোন প্রকার প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হইতে পারে না। প্রীতির বন্ধন না জন্মিলে সহানুভূতির অভাব ঘটিয়া উদাসীনতা ও ক্রমশঃ বৈরিতারই প্রতিষ্ঠা হয়। অতএব গ্রামবাসিগণ মধ্যে পরস্পরের সহানুভূতির অনুশীলন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য এবং তদর্থে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও সংস্কার বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হওয়া উচিত।

আজকাল কথা হইতে কাজে লোক অধিক আকৃষ্ট হয় ও শিক্ষালাভ করে। উৎসাহী কর্ম্মবীরগণের আন্তরিক যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায় কথনই ব্যর্থ হয় না। কিন্তু এই সব কার্য্যে ধৈর্য্য ও অর্থের আবশ্যক। অর্থসংগ্রহ,—বিশেষতঃ এই-রূপ দশের কাজে—এক দুরূহ ব্যাপার। যে দেশে সদুদ্দেশ্যে অঙ্গীকৃত সহস্র মুদ্রা চাঁদা আদায় করিতে পাঁচ শত মুদ্রা গাড়ী ভাড়ায় যায়, যে স্থানে দেশের কল্যাণ-কল্পে প্রদত্ত লক্ষাধিক টাকার হিসাব দূরে থাকুক খোঁজটা পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, সে দেশের লোক যে সাধারণের হিতার্থে অর্থ ব্যয় করিতে অগ্রসর হইবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিছুতেই তাহা আশা করিতে পারেন না। তথাপিও শুভ-সঙ্কল্প প্রসূত কার্য্যে অর্থসমাগমের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যেন তাহা দাতার পক্ষে সুখকর ও সু-কর হয়। মাসান্তে খাতা হস্তে করিয়া চাঁদা সংগ্রাহককে আসিতে দেখিলেই যম-কিঙ্করের ছায়া মানস-পটে উদিত হয়। সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে কৃতান্তও ভয় করে এমন কি তিরোহিতও হয় বটে, কিন্তু চাঁদা-সংগ্রহকারীর হস্ত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। সংগ্রহকর্ত্তা এমন নির্লজ্জ যে পুনঃ পুনঃ মিথ্যাদ্বারা প্রতারিত হইয়াও তাগাদা করিতে বিরত হয় না। অবশেষে জীবন দুর্ব্বহ বোধে চাঁদার সহিত সমুদয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। চাঁদার

বিভীষিকা দূর করিয়া সংগ্রহকর্ত্তার কার্য্য সৌকর্য্যার্থে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ মনে হয়।

১। এই সভার উদ্দেশ্য সাধন সভ্যগণের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের প্রতি আপনাদের ব্যক্তিগত আসক্তির ন্যায় এমন একটী মধুর আকর্ষণ অনুভব করা আবশ্যক যাহার বলে আপনারা উহাকে সর্ব্বদা জীবনের সঙ্গী করিতে পারেন। এইভাবে প্রণোদিত না হইলে আপনাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। লোকে যেমন বন্ধুবান্ধবকে সম্পদে বিপদে স্মরণ করিয়া থাকে আপনাদের সভার উদ্দেশ্য সাধন যেন সর্ব্বদা আপনাদের চিন্তার বিষয়ীভূত হয়। এতদর্থে প্রত্যেক সভ্য একটী ক্ষুদ্র দানাধার প্রস্তত করিয়া নিজের বাটীতে রাখিবেন। তাহাতে সাংসারিক ছোট বড় সুখ দুঃখের ঘটনা কি কার্য্য উপলক্ষে প্রফুল্লচিত্তে যথাশক্তি অর্থ দান করিতে হইবে। লোকে যেমন পরিবারস্থ ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে উৎসব উপলক্ষে কি অন্য সময়ে অপর কারণে টাকা পয়সা দেয় এই দানাধারেও সেই ভাবে অর্থ রক্ষা করিতে হইবে। সভার সহিত প্রত্যেক সভ্যের এইরূপ একটী প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হইলে সভার উদ্দেশ্য সাধনে অর্থাভাব কখনই হইবে না।

২। লোকে জন্মতিথি উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনকে নানা বিধ উপহার দেয়। যে সভ্যগণের আয় মাসিক ত্রিশ টাকার উপরে তাঁহারা সভার জন্মতিথি অর্থাৎ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সভায় ১৲ দান করিলে সভার আয়ের পথ সুগম হইতে পারে।

বালা সম্মিলনী ও বীণা পাঠাগার সমগ্র গ্রামবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না, কারণ উহা গ্রামের অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির স্বার্থের সহিত সম্বন্ধ। জ্ঞানানুশীলন কি কাব্যামোদ যদি আপনাদের উদ্দেশ্য হয় তবে তাহাতে গ্রামবাসী স্বতঃই উদাসীন হইবেন। বিশেষতঃ জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া মনের উৎকর্ষ সাধন করিলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন বিষয়েও যত্নপরায়ণ হইতে হইবে। অতএব আপনাদের পরিগৃহীত সঙ্কল্পের সহিত গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও হৃদয়বৃত্তি অনুশীলনে বিধান করিতে হইবে। গ্রামবাসীর মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতি জাগ্রত করা আবশ্যক। এতদর্থে গ্রামে পথঘাটের সুবন্দোবস্তে মনোযোগী হওয়া আপনাদের প্রথম কর্ত্তব্য। পরস্পরে সহানুভূতি জাগ্রত হইলে আপনাদের কর্ত্তব্য সহজসাধ্য হইবে। স্বাস্থ্য-

রক্ষার জন্য উত্তম পানীয় জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমাদের পানীয় জলের দোষে গ্রামে নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিলে তাদৃশ আশঙ্কার কারণ অনেকটা প্রশমিত হইতে পারে। এই বিষয়ে আপনারা গবর্ণমেণ্টের সহায়তা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু আপনাদের নিকটে বিনীত নিবেদন আপনারা গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাহায্য এমন ভাবে গ্রহণ করিবেন যাহাতে কাঁহারও মনে এই ভাব না আসে যে তাঁহাকে প্রকারান্তরে পীড়ন করিবার নিমিত্তই আপনারা প্রবল প্রতাপান্বিত গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

গ্রামবাসিগণের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি উদ্রেক করা আপনাদের প্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সাধনের পথে বহু বিঘ্ন বাধা বর্ত্তমান। কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস, হৃদয়ে গ্রামবাসিগণের প্রতি অখণ্ড প্রীতি, মনে উৎসাহ, যত্নে অধ্যবসায় সঞ্চয় করিয়া অগ্রসর হউন, অনল শীতল হইবে কণ্টকাকীর্ণ পথ কুসুমাস্তৃত হইবে, পর্ব্বতপ্রমাণ অলঙ্ঘ্য বাধা নিমেষে দূর হইবে।

গ্রামবাসিগণের নিকটে আমার বিনীত নিবেদন যে আপনারা ভারতীয় শিক্ষা এখনও বিস্মৃত হন নাই। এখনও আপনাদের দুয়ার হইতে অতিথি ফিরিয়া যায় না। আপনাদেরই স্বজন, আপনাদেরই আত্মীয় আজ আপনাদের হৃদয়দ্বারে অতিথি। আপনারা কি অতিথিকে সাদরসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া আশ্রয়দানে পরাঙ্‌মুখ হইবেন? আসুন, হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নবাগত অতিথি জনপ্রীতিকে হৃদয়াসনে স্থানদানপূর্ব্বক গ্রামবাসীর মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় কল্যাণ বিধানে যত্নপর হউন। *

শ্রীহেমচন্দ্র সেন।

বরপণের দোষ গুণ

বরপণ-প্রথা রূপ অতি আবশ্যকীয় সামাজিক সমস্যাটী সম্বন্ধে আমি বহুদিন যাহা চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছি তাহা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাকারে লিখিলাম। আশা

* মূলচর বাল্য সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

করি আপনারা এই প্রবন্ধটী ধৈর্য্যাবলম্বনে পূর্ব্বাপর পাঠ করিয়া ইহার সফলতা সম্বন্ধে আমার সহায় হইবেন।

গত বৎসর হইতে এই প্রশ্নটী একটু নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। যাঁহাদিগকে পূর্ব্বে এই কুপ্রথাটীর বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর দেখিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন "আমাদের যখন কন্যা বিবাহে টাকা দিতেই হয় তখন বরপণ গ্রহণ করিব না কেন? আমাদিগকে কি তবে রসাতলে যাইতে হইবে?" কেহ কেহ বলেন "যখন কালবর্ণা ও কুরূপা কন্যার বর্ণের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মুদ্রার ব্যবস্থা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই তখন বরপণ রহিত করার প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।" সামাজিকগণ মধ্যে কেহ কেহ এমন কথাও বলিতেছেন "আমরা এতকাল বরপণ গ্রহণ না করিয়া অন্যায় করিয়াছি এই প্রথা উন্মূলনের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত ও সুষ্ঠ নহে।" আবার কেহ কেহ বলিতেছেন "কৌলিন্য-মর্য্যাদাদৃপ্ত সামাজিকগণ এতকাল কামধেনুর মত আমাদিগকে দোহন করিয়াছেন। ঈশ্বর আমাদিগকে অবসর দিয়াছেন, আমরা কিছুকাল তাহার পাল্টা শোধ করিয়া নি, তারপর এ প্রস্তাব নিয়া আমাদিগের নিকটে আসিবেন। এখন এবিষয় নিয়া আর আমাদিগকে ঝালাপালা করিবেন না।" পুত্র-সম্পৎসম্পন্ন ব্যক্তির এই সব উক্তি উপেক্ষণীয় নহে এই সব আপত্তিকারিগণ মধ্যে সমস্তই যে হৃদয়হীন ও নির্ম্মম আমি তাহা মনে করি না। অধিকন্তু অর্থ সমাগমের দ্বার প্রায় রুদ্ধ ও জীবিকা-নির্ব্বাহ ক্রমশঃ কঠোরতর হওয়ায় এবং আমাদের সমাজ এক ঘোরতর দারিদ্র পেষণে পিষ্ট হওয়ায় তাঁহারা হয়ত ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকেন। অর্থের অসচ্ছলতায় ঘোরতর দৈন্য সমাজবক্ষকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করিতেছে। যে পরিবারে পূর্ব্বে আনন্দ, উৎসাহও সদাশয়তা বিরাজ করিত এখন দরিদ্রতা নিবন্ধন তথায় নিরানন্দ, নিরুৎসাহ ও কার্পণ্য প্রকাশ পাইতেছে। অর্থ-কৃচ্ছ্র এই বরপণ সমস্যাকে যে নাটলতর করিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজকেত রক্ষা করিতে হইবে। বরপণ রূপ কুপ্রথা এইরূপ অব্যাহত ভাবে চলিলে প্রতীচ্য সমাজের সমস্ত আসুরিক ভাব আমাদের সমাজকে যে লাঞ্ছিত করিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই আমাদের জানা উচিত।

তবে জিজ্ঞাস্য আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করিব। পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে শিশু বালিকা বিবাহের প্রথা ছিল তাহা এক প্রকার রহিত হইয়াছে। সেই

অপ-প্রথা রহিত হওয়ায় সমাজের কল্যাণই হইয়াছে। আমাদের সমাজে এখন ১২।১৩ বৎসরের বালিকার বিবাহ দোষাবহ নহে। কিন্তু যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে ষোল বৎসরের অধিক বয়সের কন্যাও ঘরে ঘরে অবিবাহিত রহিয়াছে। ইহা সমাজের দুর্দ্দিন কি সুদিন আপনারা বিবেচনা করিবেন। আরও কিছুকাল এই ভাবে চলিলে যে সামাজিক বিপ্লব সমাজদেহকে অন্তঃসার-শূন্য করিবে তাহার আর সন্দেহ নাই'।

তৃতীয়বার কলমার সভায় বৃদ্ধ প্রাচীন সামাজিকগণ বলিয়াছিলেন 'সু পাত্র পাওয়া না গেলে কন্যার পিতাকে অপেক্ষা করিতে হইবে এবং সমাজ তাহা দোষাবহ গণ্য করিবেন না'। স্নেহলতার আত্ম-বলিদানের সভায় মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিতগণও শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া এই বচন উদ্ধৃত ও প্রচার করিয়াছেন

কামমারণাৎ তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যার্ত্তুমত্যপি
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।

যতদিন পর্য্যন্ত সু পাত্র সংগৃহীত না হয় ঋতুমতী কন্যাকে অনূঢ়া রাখিতে হইবে তথাপি গুণহীন পাত্রে কন্যা অর্পণ করিবে না।

এই সব আশ্বাসবাক্য বা উপদেশ কার্য্যকালে কতটা সুফলপ্রসূ হইবে জানি না। বিবাহ সংস্কার মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম সংস্কার, সৎপাত্রের আশায় হাত পা গুটাইয়া অপেক্ষা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত কি না জানি না। আর প্রতীচ্য দেশের মত আমাদের দেশে যুবতী বিবাহ বাঞ্ছিত কিনা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ইতিমধ্যেই প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ সুর পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ তত্তদ্দেশীয় যুবতী বিবাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা আরম্ভ করিয়াছেন। তত্তদ্দেশীয় চির প্রচলিত যুবতী বিবাহের কুফল দর্শনে তাঁহারা ভীত ও চমকিত হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ সমাজের অধঃপতন দর্শনে তাহা নিবারণকল্পে নানা তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেই ১০ লক্ষের অধিক অবিবাহিত যুবতীর তাণ্ডব নৃত্য সমাজ বক্ষকে তোলপাড় করিয়া তুলিতেছে। কে জানে সেই তরঙ্গ আমাদিগের সমাজকে একদিন প্রতিহত করিবে না? পূর্ব্ব কথিত উপদেশ ও পূর্ব্বোদ্ধৃত মনুর বচনের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই যেন আমরা জাগ্রত থাকি।

জনগণনায় স্থিরীকৃত হইতেছে প্রতীচ্যদেশে অবিবাহিত কন্যার সংখ্যা অবিবাহিত পুরুষ অপেক্ষা অধিক। বর্ত্তমান জনগণনায় আমাদের দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে জানি না কিন্তু সমাজের যে অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে মনে হয় আমাদের দেশেও ক্রমশঃ সেই অবস্থা দাঁড়াইতেছে। একটী পাত্র জুটিলে তাহার জন্য ১০টি কন্যার পিতা লুলোপ। অবিবাহিত কন্যার সংখ্যাধিক্যই যে ইহার একমাত্র কারণ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তবে দেখা যাক অবিবাহিত কন্যার সংখ্যা অবিবাহিত যুবকের সংখ্যা হইতে কোনরূপ হ্রাস করা যায় কি না? কেহ কেহ হয়ত আমার এই উক্তি প্রলাপোক্তি মনে করিবেন। তাঁহারা হয়তঃ বলিবেন তাহাতে আমাদের হাত কি? কেহ হয়ত বিদ্রুপ করিবেন—রাজস্থানের মত কন্যা হত্যার প্রথা প্রবর্ত্তিত কর কন্যার সংখ্যা আপনি আপনিই হ্রাস হইবে। কেহ হয়ত বলিবেন এতটা কেন? রজ্জু ও কলসীর ব্যবস্থা কর, কন্যাদায় তোমাকে আর প্রপীড়িত করিতে পারিবে না।

আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব এমন কৌশল ঋষিগণ বহু বর্ষ পূর্ব্বে অতীতের কোন্ যুগে আমাদের জন্য আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা সেই দর্শনের অধিকারী হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ তৎপ্রতি দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িয়াছি।

ঋষিগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন—

ত্রিংশবর্ষো বহেৎ কন্যাং দদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং
ত্র্যয়োষ্টবর্ষে অষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরম্॥

ত্রিশবর্ষ বয়সের যুবক দ্বাদশ বর্ষিকা শোভনা কন্যা ও চতুর্ব্বিশতি বয়সের যুবক অষ্টম বর্ষের বালিকা বিবাহ করিলে সত্বর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

আজ কাল শিক্ষিত সমাজে এই শ্লোক পাঠ করিলে হয়ত হাসির তরঙ্গ উঠিবে। অষ্টম বর্ষের বালিকার বিবাহ ব্যবস্থা দেখিয়া হয়ত কেহ বলিয়া উঠিবেন 'এই সব বর্ব্বরতামূলতঃ প্রলাপোক্তি মাত্র। ইহা মুখেও আনিতে নাই।' প্রবন্ধ লিখকও শিশু বিবাহের ঘোরতর বিরোধী, চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ বর্ষীয়া বালিকার বিবাহের পক্ষপাতী। তবে প্রশ্ন হইতে পারে এত আড়ম্বরের সহিত এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করার কারণ কি? কারণ আছে বলিতেছি। প্রাচীন কালে

ঋষিগণ যে বালিকা বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন দেশকালপাত্রভেদে সেই ব্যবস্থা এখন কল্যাণকর নাও হইতে পারে; কিন্তু ঐ উদ্ধৃত বচনটীর মধ্যে যে একটা অমূল্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহা দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের কাছে এত কাল পৌছে নাই। ঋষিগণ ঐ প্রবচনটীর মধ্যে যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এতদিন আমরা তাহা অনুধাবন করি নাই তাই আমাদের এরূপ ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ঋষিগণ বলিয়াছেন পাত্র ও পাত্রীর বয়সের তারতম্য খুব বেশী হওয়া দরকার অর্থাৎ পাত্র পাত্রীহইতে ১৮ বৎসর অধিক বয়সের হওয়া চাই। তাহা হইলে তাহার ফল স্বরূপ পুত্র অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা অনেক কম হইবে। বর্ত্তমান বিপ্লবে ঋষিদিগের নির্দ্ধারিত বয়সের এই তারতম্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আজকাল পাশ্চাত্য মনীষিগণ এই ব্যবস্থা বিশেষ সঙ্গত মনে করিয়া নানা প্রকার সাবধানতা আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা ইতি পূর্ব্বে দেখিয়াছি মহর্ষিগণ পুরুষের বিবাহের বয়স কন্যার বিবাহ বয়সের প্রায় তিন গুণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ প্রতীচ্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে পুরুষের বিবাহের বয়স কন্যার বয়স অপেক্ষা তিনগুণ অধিক হইলে তাহাদের সহযোগে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সংখ্যা প্রায় দেড়গুণ অধিক হইবার সম্ভাবনা। এই সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ডাক্তার ট্যাপার, নেপীয়ার, ট্রল হপকার প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে Statistics প্রদান করিয়াছেন তন্মধ্যে Dr. Wall এর তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

দম্পতি		কন্যা	পুত্র
৩৯০	সমবয়স্ক পিতা মাতা	১০০	৯১·৮
২৭৬	পিতা ১ বৎসরের বেশী	১০০	১০১·৩
৩১২	„ ২।৩ „	১০০	১০১·৮
২১১	„ ৪।৬ „	১০০	১০৮
২০০	„ ৬।১০ „	১০০	১৩০
১৬৮	„ ১০।১৬ „	১০০	১৪৩
১২০	„ ১৭।১৫ „	১০০	১৮৯

দম্পতি				কন্যা	পুত্র
৮৮	মাতা	১।৩	অধিক	১০০	৯৪'৩
৭৭	„	৩।৪	„	১০০	৮৮
৬৬	„	৫।১০	„	১০০	৭৭'১
৪৩	„	১০।১৫	„	১০০	৬০'৬
১৭	„	১৫।১২	„	১১০	৪৮'৩

(See Sexual Physiology and Hygiene) by R. T. Trall, M. D. Page 179.

উদ্ধৃত তালিকা দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে পিতার বয়স যত অধিক পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা তত অধিক। আর্য্য মহর্ষিগণও অতীতের কোন্ যুগে এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বিষয়টী একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও অতি আবশ্যক তথ্য বিবেচনা করিয়া এইস্থানে ইহার অবতারণা করিলাম।

এখন দেখা যাইতেছে মনুর প্রবচন কিম্বা সহৃদয় ব্যক্তিগণের পূর্ব্ব বর্ণিত উপদেশ বরপণরূপ কুপ্রথা দূরীকরণের প্রকৃত ভেষজ নহে। তবে ঋষিদিগের উপদেশ মত সমাজ চলিলে সময়ে ইহার একটা উপায় হইতে পারে। যাঁহারা বরপণ গ্রহণের পক্ষে নানারূপ যুক্তির অবতারণা করেন, প্রবন্ধের প্রারম্ভে যাঁহাদের কয়েকটী প্রতিকৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছি তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, বংশ মর্য্যাদা আত্মসম্মান বোধ না জন্মিলে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে প্রথা গার্হস্থ্য জীবনকে অন্তঃসারশূন্য ও ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে, গৃহে অশান্তির বহ্নি জ্বালিয়া দিয়াছে, পুণ্য ভূমিকে শ্মশানে ও তপোবনকে রাক্ষসের আবাসে পরিণত করিতেছে, কত সোণার সংসারকে ছারখার করিতেছে, আত্ম-বলিদান করিতে না পারিলে এবং দেশের লোকের বিশেষতঃ যুবকদিগের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত করিতে না পারিলে ইহার কল্যাণ সুদূরপরাহত।

এই দেশ আমাদের জন্মভূমি—জন্মভূমি ধাত্রী, সাক্ষাৎ মাতৃরূপিণী, হায় কত দুঃখ দুর্দ্দিন ইহার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। আমাদের হাতে মাতৃভূমির কালিমা বিমোচনের ভার। শত অমান্য হই, আমরা পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে কেন? যে প্রকারেই হউক এই তমিস্রা রজনীর অবসান করিতে হইবে।

সামান্য অর্থের লালসায় যদি আমারা আত্ম বিক্রয় করি আমাদের হস্তে অর্পিত ভগবানের আশীর্ব্বাদীয় সদ্যজাত প্রসূনগুলিকে যদি হতাদর করি আমাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে। অর্থলোভটা যদি একটু সংযত না করিতে পারি তবে আমরা কি প্রকারে মাতৃভূমির বিন্দুমাত্র ঋণশোধেও সমর্থ হইব?

ত্যাগই আমাদের জীবনের প্রতিষ্ঠা হউক, কাহারও নিকট হইতে যেন অর্থ কামনা না করি, ঈশোপনিষদের এই মন্ত্র যেন আমাদের সমস্ত কার্য্যের নিয়ামক হয়।

ঈশ্বর আমাদিগকে বলিষ্ঠ ও দৃঢ়চিত্ত করুন। আমাদের বাক্য সত্য হউক, মতি গতি বিশুদ্ধ হউক, আমরা শত দুর্ব্বলতা সত্বেও যেন এই কুপ্রথা নিবারণ ও মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হই।

শ্রীউমাচরণ সেন।

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ

সিংপাড়া

সিংপাড়া বা সিংহপাড়া বিক্রমপুরের মধ্যে একটি অখ্যাত ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহা শ্রীনগর থানার তিন মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। কেন যে এ গ্রামের এইরূপ অদ্ভুত নামাকরণ হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারেন না। কিংবদন্তী এইরূপ এখানে 'সিংহ' উপাধিধারী কোন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি বাস করিতেন, তাঁহার প্রতাপে "বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খাইত"। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বকালে এখানে অনেক হিংস্র জন্তু বাস করিত। এখন তাহার কোনও চিহ্ন বিদ্যমান নাই।

এই গ্রামের লোক সংখ্যা বিগত লোকগণনায় দেখা যায় আড়াই হাজারেরও অধিক। অর্দ্ধেকের বেশীই মুসলমান। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কায়স্থ, স্বর্ণবণিক্য মালাকার, কুম্ভকার, ধোপা, নাপিত, ভুঁইমালী, বারুই ইত্যাদি অনেক জাতীয় লোক বাস করে। এই গ্রামের ভদ্রলোকদিগের মধ্যে "লস্কর" ও "ঘটক" বংশই সুবিখ্যাত। এক সময়ে ইঁহাদের অবস্থা ভাল ছিল কিন্তু কালচক্রের

আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন কেবল ইঁহাদের পূর্ব্বনামই ইঁহাদের অস্তিত্ব জানাইয়া দিতেছে। এখনো অনেকে এই গ্রামকে "ঘটকের" কোলা বলিয়া থাকে। কুলীন ব্রাহ্মণ এই গ্রামে অতি বিরল। যে কয় ঘর আছেন তাঁহারাও হয় "ঘটক" না হয় "লস্কর" বংশের স্থাপিত কুলীন। কায়স্থদিগের মধ্যে ৺অক্ষয়কুমার বসু মহোদয়ের নাম প্রায় প্রত্যেক বিক্রমপুরবাসীই জানেন। কেন না, মুন্সীগঞ্জ হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত যে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তাটী আছে, তিনিই তাহা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়া মধ্য-বিক্রমপুরবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এখন তাঁহার বিধবা পত্নী ও একমাত্র ছয় সাত বৎসরের একটি পৌত্র জীবিত আছে। সে অবস্থা আর এখন নাই। মুসলমানদিগের মধ্যে সেখ মাইনদ্দিন ও পীরবক্স মিঞা উন্নত। আর সকলেই দরিদ্র।

এই গ্রাম ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত; কতকটা অংশ উত্তর দিকেও পড়িয়াছে। রাস্তার পার্শ্বেই অনতিপ্রশস্ত খাল। আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাসের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত এই খাল দিয়া নৌকা চলাচল করিতে পারে। ইহা ব্যতীত গ্রামে অন্য কোন প্রশস্ত রাস্তা নাই। বড় রাস্তাটী বর্ষাকালে স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে পথিকের বিশেষ অসুবিধা হয়। ভরা বর্ষার সময় স্থানে স্থানে রাস্তার উপরও জল উঠে। পুলগুলি সংস্কার অভাবে জীর্ণ শীর্ণ। একবাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইতে হইলে কাহারো বাড়ীর সম্মুখ দিয়া কাহারো বাড়ীর পেছন দিক দিয়া যাইতে হয়। গ্রাম্য রাস্তা অপ্রশস্ত ও আকা বাঁকা। তদ্দ্বারাই লোকে চলাফেরা করে। গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে কতকগুলি ক্ষেতের পরই মুসলমান পল্লী। অধিকাংশই দীন দরিদ্র, "দিন আনে দিন খায়" গোছের। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তার পার্শ্বেই বাজার অবস্থিত। বাজারের উত্তর দিকে একটি অনতিদীর্ঘ পুষ্করিণী। ইহার উত্তর পারেই "বেলতলী গঙ্গাপ্রসাদ জগন্নাথ" উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টী গত ১৯০১ খ্রীঃ বেলতলী নিবাসী শ্রীযুক্তবিনোদ বিহারী পাল মহোদয় প্রতিষ্ঠাপিত করেন। বিগত ১৯১১ খ্রীঃ অগ্নি-সংযোগে এই স্কুলের যাবতীয় আসবাব পত্র ও সৌন্দর্য্য ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। অনেক দিন হইতে এই বিদ্যালয় ইষ্টক নির্ম্মিত হওয়ার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে।

বর্ত্তমান স্কুলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশেষ ভাল নহে, তবে প্রতি বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তম ফল হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে কোন কোন স্থানে মেলা বসিয়া থাকে। তাহাতে নানাবিধ সৌখিন দ্রব্য, মিঠাই, ধনিয়া সরিষা প্রভৃতি মসলা বিক্রীত হয়। এই সময় প্রত্যেক পল্লীবাসী বৎসরের জন্য মসলা কিনিয়া রাখে। কোন কোন মেলায় নানা কৌতুকজনক তামাসা, বহুরূপী ইত্যাদি আইসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা আজ কাল উচ্চশিক্ষিত হইয়া এই সব নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদকে অসভ্যতার অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হই না। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সাহায্যে একটী বালকবালিকা বিদ্যালয় চলিতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিদ্যালয়টীকে রক্ষা করিতে গ্রামস্থ ভদ্রমহোদয়গণ একেবারে উদাসীন। সুযোগ্য শিক্ষক মহাশয়, সাদাসিদা, সে কালের লোক। এই বিদ্যালয়ের আয় হইতেই পরিবারের ভরণ-পোষণ করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ২০।২৫ টীর অধিক নহে, ছাত্রী সংখ্যাও ১০।১২টীর অধিক নহে। দেশবাসী ভদ্রমহোদয়গণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে শুভ ফলের প্রত্যাশা করা যায়। এতদ্ব্যতীত বাজারে একটি পাঠশালা আছে, কাহারো অধীন নহে। ছাত্র সংখ্যা ৪০।৫০ হইবে। ছাত্র বেতন হইতেই পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। কিন্তু শিক্ষা-প্রণালী ও বিদ্যালয়ের অবস্থা মঙ্গলজনক নহে।

বাজারে চাউল, ডাল, মৎস্য, দুগ্ধ, তরকারী প্রভৃতি গৃহীর নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই প্রতিদিন ভোর ৭ টা হইতে ১১ টা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। দুইখানা মিঠাইয়ের দোকান, দুইখানা কাপড়ের দোকান, চারিখানা ষ্টেশনারী দোকান, ৮।৯ খানা মুদী দোকান, দুইখানা দরজীর দোকান আছে। সর্ব্বদাই এই সকল দোকান হইতে দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

এখানে চিকিৎসকের একান্ত অভাব। বাজারে তিনটী ডিস্‌পেন্‌সারী আছে। একটির অবস্থা উন্নত। একজন গবর্ণমেণ্ট পাশকরা ডাক্তার আছেন। ডাক্তার ত্রয়ের কেহই গ্রামবাসী না হইলেও নিকটবর্ত্তী গ্রামের। গ্রামের অনতিদূরে বেলতলী গ্রামে কয়েকটী সুযোগ্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক আছেন। গ্রামের স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ নহে। তবে কোন কোন সময় কলেরা, বসন্ত, জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। উহার প্রধান কারণ উত্তম পানীয় জলের অভাব।

এই গ্রামে সাধারণের পাঠের জন্য কোন পাঠাগার নাই। একবার কতিপয় যুবকের উদ্যমে একটী ক্ষুদ্র পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অনতিকাল পরেই জলবুদ্বুদের ন্যায় নষ্ট হইয়া গেল। একটি পাঠাগার স্থাপিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। পুনরায় কতিপয় যুবক চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গ্রামের ভদ্রলোকদের সহানুভূতির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়।

গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে রাস্তার অনতিদূরে ৺অক্ষয়কুমার বসু মহাশয়ের বাড়ীতে "কোলা" সব পোষ্টআফিশ ও টেলিগ্রাম আফিশ অবস্থিত। অনেক দিন হইতেই এই পোষ্ট আফিশটীকে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব চলিতেছে। কিন্তু এই পোষ্ট আফিশ ঘরের মাসিক আয় ৭৲ টাকা ভাড়া হইতেই ৺বসু মহোদয়ের অনাথা পত্নীর ভরণ পোষণ চলিতেছে। আফিশ স্থানান্তরিত হইলে উক্ত বিধবার কি উপায় হইবে তাহা কি কেহ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন?

গ্রামে ভদ্র-পল্লীতে ৫।৬টীর অধিক ভাল পুষ্করিণী নাই। কিন্তু প্রত্যেকেরই একটী কি দুইটী পুকুর আছে, যাহা সংস্কার করিলে গ্রামের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। দলাদলি, ঝগড়া কলহ লইয়াই সকলে বিব্রত,—গ্রামের কিসে উপকার হইবে, না হইবে সে বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য নাই। অথচ প্রতি বৎসরই সামান্য সামান্য ঘটনায় উকীল মোক্তারকে অর্থশালী করা হয়। যেখানে গ্রাম্য পঞ্চায়েত বিবাদ মীমাংসা করিতেন এখন সে স্থান বিচারালয় অধিকার করিয়াছেন! গ্রামে "প্রকৃত শিক্ষিত" লোকের একান্ত অভাব। কবে যে এ অভাব পূর্ণ হইবে তাহা কে জানে? মুসলমান পল্লীতে একটি মাত্র পুকুর আছে, এতদ্ব্যতীত ডোবার অপরিষ্কৃত জল পান করিয়া বৎসর বৎসর বহু লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। কিন্তু অশিক্ষিত নিরন্ন দরিদ্র কৃষকদের এই অভাব কেহই পূর্ণ করিতে অগ্রসর হন না।

পূর্ব্বে এই গ্রামে হাডুডু, দাইরাবান্দা, বুদ্ধিমন্ত প্রভৃতি গ্রাম্য খেলা হইত। এখন যদিও উল্লেখযোগ্য কোন খেলার মাঠ বা দল নাই তথাপি কোলা গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্রিকেট, ফুটবল খেলা খুব হয়। যাহাতে বালকগণ বলিষ্ঠ ও নীরোগ হয় এরূপ ক্রীড়া আজকাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। পূর্ব্বে গ্রামে হরিসংকীর্ত্তন হইত, গ্রাম-

বাসীরা সেই মধুর হরিনামের সঙ্গে সৎ শিক্ষা লাভ করিত। কিন্তু এখন তাহা লুপ্তপ্রায়।

এই গ্রামের উৎপন্ন শস্তের মধ্যে পাট ও ধান্যই প্রধান। এতদ্ব্যতীত, তিল, সরিষা, মটর, মুগ, কলাই, প্রভৃতি শস্যও উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে পাটই বার আনা।

এই গ্রামের ৺শ্রীকান্ত লস্কর মহাশয়ের পুষ্করিণীর দক্ষিণ পূর্ব্ব পারে এক অত্যুচ্চ অশ্বত্থ বৃক্ষ সমুন্নত বক্ষে অতীত কালের কত স্মৃতির সাক্ষ্য দিতেছে। এই বৃক্ষে ৺শ্রীশ্রীকালীমাতা অধিষ্ঠিতা। দেবী বড় জাগ্রতা। নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোক প্রায়ই ছাগবলি দিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। প্রায় প্রত্যেক শনিবার, হিন্দুললনাগণ এখানে তেল সিন্দুর দেন। অধিকারী বাড়ীতে ৺শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর যুগলমূর্ত্তি অনেক দিন হইতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। ৺শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে অহোরাত্র সংকীর্ত্তন প্রভৃতি অনেক আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সুবর্ণ-বণিকগণ রাস পূর্ণিমায় 'রাসলীলা' করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে অনেক ব্যয় হইত। গ্রামে কয়েক বাড়ীতে ৺শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা হইয়া থাকে।

গ্রামের কল্যাণকামনায় প্রত্যেক গ্রামবাসীর সচেষ্ট হওয়া উচিত। দলাদলি, হিংসা, দ্বেষ ভুলিয়া দেশের ও দশের হিতকল্পে জীবন মন ঢালিয়া দিউন। জগৎ-পাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আমারা যেন চিরজীবন উচ্চাদর্শে সমাজকে চালিত করিতে পারি। দেশকে আপনার করিয়া আত্মবোধে তাহার অভাব অভিযোগ পূরণ করিতে সমর্থ হই।

শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

সংস্কৃত-শাস্ত্রে বাঙ্গালী

জগদীশ তর্কালঙ্কার

"নব্যন্যায়" নামধেয় ন্যায়-দর্শনের চর্চ্চায় যে সমুদয় মহাপুরুষ ব্রতী হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। মৈথিলী পণ্ডিত গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত "চিন্তামণি" নামক গ্রন্থ নব্যন্যায়ের বীজ স্বরূপ। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমানাচার্য্য খণ্ডনখাদ্য-প্রকাশ, তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ, ন্যায়-কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ, ন্যায়-নিবন্ধপ্রকাশ এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের ছাত্র পক্ষধর মিশ্র তত্ত্বচিন্তা-মণ্যালোক, ন্যায়-লীলাবতী প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া মৈথিলী পণ্ডিতগণের ন্যায়চর্চ্চার বিশেষ সুবিধা করিয়া দেন। পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমই বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম নব্যন্যায়ের গ্রন্থ লিখেন; তৎকৃত সমাসবদ্ধতত্ত্ব-চিন্তামণিব্যাখ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালীকৃত নব্য-ন্যায়ের প্রথম গ্রন্থ। আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবেই দেখাইয়াছি যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম-ছাত্র সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলায় গমন করিয়া প্রোক্ত পক্ষধর মিশ্রের শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক ন্যায় দর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যলাভ করেন এবং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চিন্তামণি-দীধিতি, নানার্থবাদ, পদার্থ-খণ্ডন, আখ্যাত-বাদ প্রভৃতি নব্য-ন্যায়ের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার শিক্ষা প্রভাবে ও সামাজিকের উৎসাহে বাঙ্গালা দেশের রাঢ়ীবারেন্দ্রবৈদিক ব্রাহ্মণের ঘরে ঘরে ন্যায়-দর্শনের বিশেষ শিক্ষা ও দীক্ষা হইতে থাকে। এই দর্শন শাস্ত্র-অধ্যয়নের বন্যা বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ-সমাজকে প্লাবিত করিয়া দেয়। শত শত ন্যায়ের গ্রন্থকার সহস্র সহস্র ন্যায়ের পণ্ডিত ধ্যানস্তিমিত যোগীর ন্যায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগে ধ্যেয়শাস্ত্র অধ্যয়ন ব্রতে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করেন। শিরোমণির তিরোভাবের কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পরে বাঙ্গালা দেশে একটী বারেন্দ্র ও একটী বৈদিক ব্রাহ্মণ, দর্শন-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যলাভ করেন। ইঁহাদের প্রণীত নব্য-ন্যায়ের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ন্যায়দর্শনশিক্ষার্থী ধন্য হইতেছেন। ইঁহাদের প্রথমটীর নাম গদাধর ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয়ের নাম জগদীশ তর্কালঙ্কার।

জগদীশ তর্কালঙ্কার কাশ্যপ-গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশ-সম্ভূত। ইনি প্রসিদ্ধ বৈদিক রাম মিশ্রের বংশ-সম্ভূত। রাম মিশ্রের সপ্তম পুরুষ সুপ্রসিদ্ধ পুরন্দরাচার্য্য নামে এক মহাপুরুষের জন্ম হয়। এই পুরন্দরাচার্য্যের পুত্র যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্য ও অবধূত মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি। মধুসূদন ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত ও গ্রন্থকর্ত্তা। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। এই যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্যের পুত্র রঘুনাথ তৎপুত্র মহেশ্বর তৎপুত্র শ্রীকণ্ঠ তৎপুত্র রামহরি পঞ্চানন। এই রামহরি পঞ্চাননের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার। খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জগদীশ কোটালীপাড়ার অন্তর্গত মাণিকহার গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কোটালীপাড়ার ঐ সমুদয় স্থান বর্ত্তমান সময়ে বরিশাল ও ফরিদপুর জিলার অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও পূর্ব্বকালে উহা বিক্রমপুরেরই একাংশ স্বরূপ ছিল। জগদীশ স্বদেশে ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। ন্যায়-শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান জন্মে। তৎসময়ে নবদ্বীপ ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল। নবদ্বীপে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ নব্য-ন্যায়ের শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী ছিলেন। বিশেষতঃ গঙ্গাতীরবর্ত্তী বলিয়া নানা দেশ হইতে প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণ নবদ্বীপে বাস উপলক্ষে টোল করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হইতেন। ফলে একদিন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভিক্ষা করিয়াও অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। অধ্যাপনা-কার্য্য পরম পুণ্যজনক বলিয়া সকলেই মনে করিতেন। অধিকন্তু কোন চিন্তাশীল সূক্ষ্মধী ছাত্র পাঠার্থী হইলে তজ্জন্য অধ্যাপকের আর আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। জগদীশের জ্ঞান-তৃষ্ণা স্বদেশে নিবারিত হইল না। তিনি শুনিতে পাইলেন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও ন্যায়-গ্রন্থের টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশের ছাত্র ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ নবদ্বীপে একজন প্রথিত-নামা দার্শনিক শিষ্যদিগকে ন্যায়-শাস্ত্র পড়াইতেছেন। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি "গূঢ়ার্থ-প্রকাশিকা" নাম্নী তত্ত্ব-চিন্তামণি-দীধিতির টীকা ও শব্দার্থ-সার-মঞ্জরী প্রভৃতি ন্যায়ের বহু গ্রন্থ ও পাতড়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। শত শত ন্যায় পাঠার্থী তাঁহার পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিল। জগদীশ ন্যায়-শাস্ত্র পাঠার্থী হইয়া নবদ্বীপে ভবানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণত হইলেন। তৎকালে গদাধর ভট্টাচার্য্যও ভবানন্দের

নিকট পাঠার্থী। অধ্যাপক উভয় ছাত্রের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইলেন এবং কতিপয় দিবস অধ্যাপনার পরই বুঝিতে পারিলেন এই নবাগত ছাত্রদ্বয়কে পাঠ দিতে তাঁহার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কথিত আছে এই ছাত্রদ্বয় যখন গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন তৎসময়ে অনেক দিন গুরুশিষ্যের শাস্ত্রাধ্যয়ন, অধ্যাপনায় এইরূপ তন্ময়তা হইত যে তাহাতে কাহারও আর বাহ্য জ্ঞান থাকিত না। কত দিন তর্কযুদ্ধে প্রাতঃ সময় হইতে আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়াছে, কোন দিন বা সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ভোর পর্য্যন্ত অজস্র চিন্তা চলিয়াছে, বিশ্রাম নাই আলস্য বা ঔদাস্য নাই। এইরূপে একাগ্র সারস্বত ধ্যানে, নিয়ত সারস্বত সেবায় জগদীশ কৃতার্থতা লাভ করিলেন। গুরু বলিলেন 'বৎস তোমার পাঠ সম্পূর্ণ হইয়াছে, আর আমার নিকট তোমার পাঠ নিষ্প্রয়োজন, তুমি তর্কালঙ্কার উপাধি গ্রহণ কর এবং অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হও।'

জগদীশ গুরু ও গুরুপত্নীর চরণে প্রণত হইলেন এবং তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণে নবদ্বীপেই টোল করিলেন এবং নবদ্বীপেই তাঁহার বাসস্থল হইল। জন্মভূমিতে তাঁহার একটা বাড়ী থাকিল বটে কিন্তু তিনি সপরিবারে গঙ্গাবাসী হইয়া নবদ্বীপেই নিয়ত বাসস্থান নির্ম্মাণপূর্ব্বক অধ্যাপনা কার্য্যে মনোযোগ বিধান করিলেন। ক্রমে বহু পাঠার্থী জগদীশের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। জগদীশ ন্যায়-দর্শনে যেরূপ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তদ্রূপ অধ্যাপনা কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত, অথচ ন্যায়-শাস্ত্র পাঠের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য, বাঙ্গালীর নাম ভারতে গৌরবান্বিত করিবার জন্য, সর্ব্বদা চিন্তাতৎপর। তিনি ন্যায়-দর্শনের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া, ন্যায়-দর্শনপাঠার্থীদের সুবিধার জন্য ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন মন্থন পূর্ব্বক নব্য ন্যায়ের বহু গ্রন্থ লিখেন। তৎকৃত গ্রন্থ মধ্যে "জাগদীশী" ও "শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকা" সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। 'জাগদীশীর' প্রকৃত নাম 'তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশিকা'। রঘুনাথ শিরোমণি, গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত "চিন্তামণির" যে বিখ্যাত টীকা লিখেন উক্ত টীকার নাম "তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি"। বাস্তব পক্ষে তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি একখানা বিস্তৃত মৌলিক গ্রন্থ; দর্শন সম্বন্ধে বিবিধ মৌলিক চিন্তা ইহাতে সন্নিবেশিত। তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতির বহু টীকা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে জগদীশ তর্কালঙ্কারকৃত জাগদীশী বা তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা অমূল্য গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন জগদীশ, বল্লভাচার্য্য কৃত ন্যায়লীলাবতী গ্রন্থের এক বিশদ টীকা লিখেন, উক্ত টীকার নাম ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশিকা-দীধিতি। কেশব ভট্ট কৃত "তর্কদীপিকা" নাম্নী নব্যন্যায়ের টীকা গ্রন্থের একখানা সুন্দর ব্যাখ্যা গ্রন্থ জগদীশ কর্ত্তৃক লিখিত হয়। উক্ত গ্রন্থের নাম তর্কদীপিকা-ব্যাখ্যা। সুপ্রসিদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ "তর্কামৃত" জগদীশের লিখিত। জগদীশ প্রথমে কতকগুলি "পত্রিকা" বা "পাৎরা" নামধেয় ন্যায় শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ছাত্রদিগের উপদেশ দেওয়ার সুবিধার জন্য প্রথমে ঐ সমুদয় গ্রন্থ লিখিত হয়, ঐ পাত্‌রাগ্রন্থ অন্যূন পঞ্চাশ খানা হইবে। ঐ সমুদয় পত্রিকা গ্রন্থ একত্র করিয়া এবং অন্যান্য বহু দার্শনিক অবার্থ তত্ত্ব একত্র সমাবেশিত করিয়াই "জাগদীশী" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐ সমুদয় পত্রিকা গ্রন্থের কয়েক খানার নাম আমরা নিম্নে নির্দ্দেশ করিলাম, যথা ঃ—অনুমিতিরহস্য, আখ্যাতবাদ, আগতি-বিচার, সিংহ-ব্যাঘ্র-টিপ্পনী, হেত্বাভাস, পঞ্চ লক্ষণী, পূর্ব্বপক্ষরহস্য, ব্যতিরেকীরহস্যটীকা, অন্বয়ীরহস্যটীকা, চতুর্দ্দশ লক্ষণী, বিশেষব্যাপ্তিরহস্য, ভূয়োদর্শন, বিশেষ নিরুক্তি, ব্যাপ্তিবাদ, সব্যভিচারগ্রন্থরহস্য, উপনয়নদীধিতিটীকা, পুচ্ছলক্ষণটীকা, অবয়ব-গ্রন্থরহস্য, তর্করহস্য প্রভৃতি।

অন্যান্য দৈবশক্তিসম্পন্ন সূক্ষ্মধী ব্যক্তির ন্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় সম্বন্ধেও নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত জগদীশ একেবারে বর্ণজ্ঞান বিহীন ছিলেন। পক্ষীশাবক নিয়া ক্রীড়া করা তাঁহার এক মাত্র কার্য্য ছিল। একদিন একটী বৃহৎ তালবৃক্ষের শীর্ষদেশে পক্ষীশাবক আহরণ জন্য আরোহণ করিলে এক ফণাধারী কালসর্প জগদীশকে আক্রমণ করে। মূর্খ অথচ তীক্ষ্ণবুদ্ধি জগদীশ কলে সর্পের মস্তক দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ করিলেন; সর্প আততায়ীকে দংশনে অক্ষম হইয়া তাহার হস্ত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ফেলিল। অসীম সাহসী ও বলীয়ান্ জগদীশ এক হস্তে তালবৃক্ষ ধরিলেন এবং তালবৃক্ষশাখার তীক্ষ্ণধারে ক্রমশঃ কালকূটধারী ফণীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন পক্ষী শাবক ধৃত করারূপ দুষ্কর্ম্মে আর লিপ্ত হইবেন না। একটী মহাপুরুষ সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে আসীন থাকিয়া এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন। জগদীশ ভূতলে অবতরণ করিলে সন্ন্যাসী জগদীশকে বলিলেন "বাপু, তুমি বুদ্ধিমান, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম ধারণ

করিয়াছ—তোমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি আছে—তুমি অপকার্য্যে লিপ্ত কেন? বৎস! চেষ্টা কর, লেখাপড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ কর, তুমি পরম পাণ্ডিত্য লাভ করিবে।” জগদীশ সে দিন হইতে ধ্যাননিরত যোগীর ন্যায় সারস্বতারাধনায় ব্রতী হইলেন। অন্য ব্যক্তি দ্বাদশবর্ষ পরিশ্রমে যে বিদ্যা আয়ত্ত করিতে অসমর্থ জগদীশ একৈক বর্ষে তাহা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। যাহারা শিক্ষা কার্য্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন বয়োবার্দ্ধক্য বা অন্য কোনও কারণ তাহাদের শিক্ষার পরিপন্থী হইতে পারে না। তিন শত বর্ষের উর্দ্ধকাল জগদীশ পরম পদ লাভ করিয়া পরমাত্মাতে বিলীন হইয়াছেন কিন্তু আজিও যেন নব্যন্যায়পাঠার্থী তাঁহার পদতলে বসিয়া ন্যায়ের অগাধ তত্ত্ব সমূহের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছে। আজিও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে তাঁহার বংশধরগণ বাস করিয়া আসিতেছেন এবং স্বনামধন্য মহাপুরুষের বংশধর বলিয়া গৌরবান্বিত হইতেছেন।

শ্রীকামিনীকুমার ঘটক।

প্রহেলিকা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আরও কতক্ষণ গেল। মোক্ষদাসুন্দরী আসিয়া নগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবি এসেছে। আসে নি? কোথায় গিয়েছে? খাবারটা রান্না হয়ে পড়ে রইলো। যা, ওকে খুঁজে নিয়ে আয় তো।

‘যাই’ বলিয়া, নগেন্দ্র তাহার উদ্দেশে চলিয়া গেল। এবাড়ী, সেবাড়ী করিয়া সে অনেক বাড়ী খুঁজিল কিন্তু কোথায়ও তাহাকে পাওয়া গেল না। অবশেষে ভাবিল, এতক্ষণ হয়তো সে বাড়ী ফিরিয়াছে।

এদিকে, মোক্ষদাসুন্দরী নগেন্দ্রের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন! সে ফিরিয়া, আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবি কি মা! ফিরে এসেছে?

মোক্ষদাসুন্দরী। কৈ, না।

নগেন্দ্র। ওকে তো সব বাড়ীই খুঁজলেম, কোথাও পেলেম না।

মোক্ষদাসুন্দরী। বলিস্ কি? আঁ, ও আমাকে জ্বালিয়ে খেলে। দেখ্ কোথায় গেল। বলিতে বলিতে তিনি ঘরের বাহিরে আসিলেন।

তখন,—তিনি, নগেন্দ্র, খগেন্দ্র ও বৃদ্ধা আমা তবুর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। নানাদিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া, আবার তাহারা কয়জন বাহির বাটীতে একত্রিত হইল। নগেন্দ্র একবার দৌড়াইয়া গিয়া দীঘির ঘাটলার উপর দাঁড়াইয়া 'তবি, তবি' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। নৈশ-সমীরণ সেই শব্দ বহন করিয়া দূর হইতে দূরান্তরে লইয়া গেল। তবুকে পাওয়া গেল না। কোথায় তবু? কোথায়!

মোক্ষাদাসুন্দরী তখন পাগলিনী প্রায় হইয়া 'তবি, তবি' করিয়া চীৎকার করিতে করিতে, এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু, তবুকে কিছুতেই পাওয়া গেল না। রজনী অন্ধকার হইয়া আসিল। সন্ধ্যা-সমাগমে আকাশে মেঘ দেখা দিয়াছিল, এক্ষণে বাতাস আরম্ভ হইল; কিন্তু তবু কোথায়?

হঠাৎ, নগেন্দ্রের মনে একটা কথার উদয় হওয়ায় সে মাঠের দিকে দৌড়াইয়া গেল। চারিদিক অন্ধকার, নির্জ্জন। তবু সেই মাঠের ভিতর বসিয়া গুণ্‌গুণ্ করিয়া কাঁদিতেছিল। ক্ষুদ্র বালিকার কোমল-প্রাণ শোকে, দুঃখে ও ভয়ে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

নগেন্দ্র 'তবি, তবি' করিয়া চীৎকার করিতেই, 'যাই বড় দা' বলিতে বলিতে সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখভার করিয়া দাঁড়াইল। নগেন্দ্র তাহাকে হাত ধরিয়া হর্ হর্ করিয়া টানিতে টানিতে লইয়া চলিল।

সেদিন তাহার কপাল বড়ই মন্দ। যখন সে বাড়ী পৌছিল, তখন, 'রাখ্, লক্ষীছাড়িটাকে বেঁধে রাখ, আজ রাত্রিতে ওর কপালে ভাত নেই, আমার হাড় জ্বালাতন কল্লে' ইত্যাদি বলিতে বলিতে, মোক্ষদাসুন্দরী তাহার পৃষ্ঠে ও গণ্ডস্থলে গোটা কয়েক চড় মারিলেন।

বালিকা মাতার কঠোর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষোভে, দুঃখে ও মানে আবার কান্না জুড়িয়া দিল। ক্রমে, তাহা উচ্চ হইতে নীচ গ্রামে নামিতে লাগিল কিন্তু একেবারে থামিল না।

এমন সময়, রমাপ্রসাদ বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। কন্যার ক্রন্দনধ্বনি কর্ণে পৌছিতে না পৌছিতেই "মা! কে মেরেছে তোমায়? কাঁদ্‌ছ কেন মা?"

বলিতে বলিতে তিনি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কাপড় দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিলেন। সুযোগ বুঝিয়া, তবুও ক্রন্দনের সুরের মাত্রা একটু চড়াইয়া দিল।

মস্তক ও কপোলোপরি হাত বুলাইতে বুলাইতে ও নানাপ্রকার সোহাগ করিয়া পিতা কন্যাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, তোমায় কে মেরেছে?

তবু কাঁদ কাঁদ স্বরে উত্তর করিল 'মা।'

রমাপ্রসাদ বাবু। কেন মেরেছে?

তবু। কমলাদের সঙ্গে আমি খেলা কচ্ছিলাম। সে আমায় মেরেছিল। তাই, আমি তাকে একটা চড় দিয়েছিলাম। এই জন্য, বড় দা আমায় মেরেছিল তাই, ভয়ে আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাড়ী আসিনি বলে মা আমায় মেরেছে। এই দেখো বাবা! মা আমায় কেমন মেরেছে?

এই বলিয়া বালিকা তাহার কোমল হস্ত দ্বারা পিতার হাতখানি ধরিয়া পৃষ্ঠের একটা স্থান দেখাইল।

তিনি তাহার প্রতি একটু সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া শেষে বলিলেন, তুমি মা! কমলাকে মেরেছিলে কেন? আমি না মা! তোমায় বার বার বলেছি, পরের গায় হাত তুল্‌তে নেই।

তবু। হাঁ বাবা! তুমি তো অম্‌নিই বলো। আমার মাথায় যে ঘা মেরেছিল, তা তুমি বুঝ্‌বে কি বাবা! এই দেখো বাবা! সে জায়গাটা এখনও ফুলে রয়েছে। এই বলিয়া সে পিতার হাতখানি তাহার মাথার উপর নিয়া বেদনার স্থান দেখাইল।

তিনি মেয়ের মন রাখিবার জন্য তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, হাঁ তাইতো বটে। আচ্ছা! আমি কমলের বাবাকে কাল বলে দোবো। সে যা হোক্, তুমি সন্ধ্যাবেলা বাড়ী এস নি কেন? তোমায় না দেখ্‌লে, তোমার মা কত ভাবেন, তা কি তুমি জান?

তবু। মা আবার আমার জন্য ভাবে? তা হ'লে এমন মার্‌বে কেন? মা আমায় একটুও ভালবাসে না।

পিতা। ছি মা! ছি! বল কি? মা তোমায় ভালবাসেন না? ওকথা মুখে এনো না, অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই। মাও আবার সন্তানকে ভাল-

বাসেন না! আচ্ছা, আরবার পূজর সময় যে তোমার ব্যারাম হয়েছিল, তখন তোমায় বুকে করে সারাদিন শুয়ে থাক্‌তেন কে ?

তবু অতি ধীরে ধীরে বলিল, মা।

পিতা। কে তোমায় ঔষধ খাওয়াতেন, খাবারটা দিতেন ?

কন্যা। মা।

পিতা। তুমি যখন রোগযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে, বিছানায় পড়ে, ছট্‌ফট্‌ করে কাঁদতে, তখন কে তোমার গায় হাত বুলিয়ে দিতেন ?

তবু অতি কোমল স্বরে বলিল, মা।

পিতা। আর যে দিন তোমার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল, সে দিন আহার নিদ্রা ভুলে, তোমার বিছানার পাশে বসে, তোমার মুখের উপর মুখ রেখে 'তবু! তবু!' করে কে কেঁদেছিলেন ?

কন্যা। মা।

বালিকা আর সহ্য করিতে পারিল না। মাতার প্রতি ভালবাসারূপিণী অমৃত-ধারা তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটুকুকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। 'বাবা! তুমি অম্‌নি করে মার কথা বলো না, মার কথা অম্‌নি করে বল না', বলিতে বলিতে বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল।

রমাপ্রসাদ বাবু কন্যার হৃদয়টুকুর পরিচয় পাইয়া বড়ই সুখী হইলেন। তাহার চোখের জল মোছাইয়া বলিলেন, তবু! তবে বলতো তোমার মা তোমায় ভাল-বাসেন কি না ?

কন্যা। হাঁ, বাসে।

পিতা। তবে বলতো তিনি তোমায় মেরেছিলেন কেন ?

কন্যা। তা আমি জানি কি ? মা তো আমায় প্রায়ই অম্‌নি মারে।' কেন মারে, আমি কেমন করে বলব ?

পিতা। এই তো তুমি আবার বোকা মেয়ের মত কথা বল্লে। তোমার মা কি অন্য কারও ছেলে পেলেকে মারেন ?

কন্যা। না। অন্য কারও ছেলে পেলেকে মার্‌তে দেবে কেন ? আমায় মাল্লে তো বলবার কেউ নেই, তাই মারে।

পিতা। আমাদের বাড়ীর পাশে যে বিন্দি আছে, তাকে তো তোমার মা

মারেন না ; তার তো সংসারে কেউ নেই। তাকে মাল্লে তো, কেও কিছু বল্‌বে না। আচ্ছা, সেদিন তুমি খুকীকে মেরেছিলে কেন ?

তবু গর্জ্জিয়া উঠিল। আমি হাত ছুঁইলেই বুঝি দোষ, আর মা মাল্লে দোষ নেই। বুঝেছি বাবা ! তোমরা সবাই এক জোট। খুকীর পেটে অসুখ হয়েছিল, তাতো জানই। ভোর বেলা উঠেই ভারি কান্না জুড়ে দিলে। তাই, মাকে না জানিয়ে একখানা বাতাসা দিয়েছিলেম। সেটুক খেয়ে, আরও খাবার জন্য কাঁদতে লাগ্‌লো। তাই, আমি মেরেছিলাম। আচ্ছা, বাবা ! অত মিষ্ট খেলে ওর অসুখ আরও বাড়তো না ?

পিতা। তাতো ঠিক, অসুখ বাড়তো। কিন্তু তাতে তোমার কি ?

বাবা ! তুমি যেন কেমন কেমন বল, ইহা বলিয়া তবু আধ কাঁদস্বরে, আধ আহ্লাদ ভরে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, খুকীর ব্যারাম হলে আমার যে বড় কষ্ট হয়, তাই তাকে মেরেছিলেম। তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, বাবা ! খুকী এখনই এমন অবাধ্য হয়েছে, যে ওকে যদি এখন থেকে একটু কিছু না বল, তা হলে শেষে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

পিতা। নষ্ট হোক্, তাতে তোমার কি ?

কন্যা। ঐ তো বাবা ! তোমার যেন কেমন কেমন কথা। খুকী খারাপ হলে যে আমার প্রাণে ব্যথা লাগে।

পিতা। কেন লাগে ? তাকে ভালবাস, তাই কি কষ্ট বোধ হয় ?

কন্যা। হাঁ বাবা, তাই।

পিতা। খুকী খারাপ হলে, তাকে মন্দ বল্লে, তার ব্যারাম হলে তোমার যেমন কষ্ট হয়, তোমার ব্যারাম হলে, তোমায় লোকে মন্দ বল্লে, তোমার মার মনেও তেমনি কষ্ট হয়।

তবু। হতে পারে।

পিতা। 'হতে পারে' না, হয়ই। মা যেমন ছেলেপেলেকে ভালবাসে, এ সংসারে এমন কেউকে কেউ তেমন ভালবাসে না। তোমাদের জন্য তোমাদের মা কত ভাবেন, তা কি তুমি বোঝ ? খাইয়ে পরিয়ে তোমাদের সুখী রাখ্‌তে পাল্লেই তিনি সুখী। সারাদিনরাত্রি তোমাদের চিন্তা ভাবনাতেই তিনি সময় কাটান। কেন ? তোমরা ভাল হবে, তোমরা সুখে থাকবে, লোকে তোমাদিগকে

ভাল বলবে এই জন্য। ভাল কিছু খাবার পেলে যত্ন করে তুলে রেখে দেন। কেন? তোমারা খাবে। কিছু পরতে পেলে, রেখে দেন। কেন? তোমাদের তাহা পরতে দিবেন। এখন বুঝলে মা তোমায় কেন মেরেছিলেন? তুমি খারাপ হলে, তোমায় লোকে মন্দ বল্লে, তার প্রাণে কষ্ট হয়, তাই ভবিষ্যতে যাতে তুমি ভাল হও, লোকে তোমায় মন্দ না বলতে পারে এই জন্য মনের দুঃখে তোমায় মেরেছিলেন। (কন্যার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে) এখন থেকে সব বিষয়ে মার কথা শুন্‌বে, বল? কেমন, লক্ষ্মী মা আমার?

প্রেমপুলকিতচিত্তে বালিকা উত্তর করিল, শুন্‌ব। এখন আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, মার কথা না শুন্‌লে মা মনে ব্যথা পায়। বাবা! তোমার মাও কি তোমায় এম্‌নি ভালবাসতো?

পিতা। বাসতো না! সকলের মায়ই তার ছেলেপেলেকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তোমাদের মা যেমন, তোমাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য অস্থির, আমাদের মাও আমাদের সুখের জন্য তেমনি ব্যস্ত ছিলেন। তুমি যেমন আজ বাড়ীতে দেরি করে এসেছিলে বলে, তোমার মা পাগলের ন্যায় হয়ে পড়েছিলেন আমিও যদি কাজ কর্ম্মের জন্য বাড়ীতে আস্‌তে কোনও দিন বিলম্ব করেছি, তা হলে তিনিও সেই প্রকার আত্মহারা হয়ে পড়্‌তেন। যার মা নাই, সেই জানে মা কি জিনিস!

তাহার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না, তিনি তখন সংসারের কথা ভুলিয়া গেলেন। কন্যা, পুত্র, স্ত্রী মুহূর্ত্তে তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইল। তাহার নয়ন কোণে অশ্রু দেখা দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার স্বর্গীয় মাতৃদেবীর স্নেহময়ী মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। "মা, মা" বলিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। কতদিন হইল মা-হারা হইয়াছেন, বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন ভাবে, তাহার প্রাণ কখনও আলোড়িত হয় নাই। আজ, এই বালিকা কন্যার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু জানিতে যাইয়া সংসারের কত অতীত সুখদুঃখের কথা নিমিষে তাহার হৃদয় মথিত করিয়া ফেলিল। এই প্রকার নানাসময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় প্রাণকে যে কোথায় লইয়া যায়, তাহা কে বলিবে?

শিশুকন্যা পিতার দিকে ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া বলিল, বাবা! তুমি

কাঁদছ ? আমি বুঝি তোমায় মনে ব্যথা দিয়েছি ? বাবা ! আমি তো বলেছি, আর মার অবাধ্য হব না। মা যখন যা বলবে, তাই করবো।

বলিতে বলিতে কন্যা পিতার গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহার নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া উঠিল। বালকবালিকার প্রাণ, পরের দুঃখে যেমন কাঁদিয়া ওঠে, এমন কাহার প্রাণ কাঁদে ?

পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া, কন্যা আবার বলিল, তুমি চুপ করে রইলে যে বাবা ? আমার মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। বাবা ! আমি তো বলেছি, আমি মার কথা শুনে চলব।

মূঢ়া, সরলা বালিকা ! পিতার প্রাণ যে এসংসার ছাড়িয়া, বর্ত্তমানের মোহ আবরণ ভেদ করিয়া, অতীতের কোন্ সুখস্বর্গে যাইয়া কোন্ দেবীর স্নেহসিঞ্চিত কোলে লুটাইয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে ?

রমাপ্রসাদ বাবু চক্ষের জল সংবরণ করিয়া বলিলেন, না মা ! তোমার উপর আমি অসন্তুষ্ট হই নাই। তুমি যে তোমার মার কথা শুনে চলবে বলেছ, এতে আমি বড়ই সুখী হয়েছি। দেখো মা ! তোমার কথা যেন ঠিক থাকে।

ভাগ্যকূলের কুণ্ডু-পরিবার। (১)

পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ত্রিপুরা রাজবংশের পরেই ভাগ্যকূলের কুণ্ডু-পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য। কুণ্ডুবংশ চারিশাখায় বিভক্ত।

এই বংশের সর্ব্বপ্রধান খ্যাতিমান ব্যক্তির নাম জগন্নাথ কুণ্ডুরায়। ইঁহাকেই এই বংশের সৌভাগ্যের মূল পুরুষ বলা যাইতে পারে। ইঁহার পৈত্রিক নিবাস পূর্ব্বে লৌহজঙ্গ গ্রামে ছিল। বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নাজিম সিরাজদ্দৌলার অধীনে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ যখন ঢাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন সেই সময়ে জগন্নাথ রাজবল্লভের জমিদারীর দেওয়ানী কার্য্য করিয়া প্রভূত ধন-সম্পত্তি ও সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করেন। জগন্নাথ রাজবল্লভের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁহার কার্য্যকুশলতায় প্রীতিলাভ করিয়া তিনি তাঁহাকে 'রায়' এই

সম্মান জনক উপাধি-ভূষণে ভূষিত করেন—সেকালে দানশীল এবং বিচক্ষণ-ব্যক্তি ব্যতীত অপরের ভাগ্যে এইরূপ গৌরবজনক উপাধি লাভ ঘটিত না।

সেকালে জগন্নাথ কুণ্ডুর ন্যায় সাঁতরা-পাড়ার কৃষ্ণরাম কুণ্ডুর নামও বিশেষ বিখ্যাত ছিল। সাঁতরাপাড়া বহুদিন হইল পদ্মাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উহা বর্ত্তমান ভাগ্যকূল গ্রামের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। জগন্নাথ হইতেও কৃষ্ণরামের 'ধনী' খ্যাতি সেকালে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কথিত আছে যে তাহার স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, তাম্রমুদ্রা ও কড়ি এত অধিক ছিল যে একটী বেতের বটুয়ার সাহায্যে সে সকল ওজন করিতে হইত। তখন চুরী ডাকাইতি রাহাজানি ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে ছিল, কৃষ্ণরামের জীবদ্দশায় তাঁহার বাড়ীতে চারিবার ডাকাইতি হয়। এখানে ইহা উল্লেখ করা উচিত যে উপরোক্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদ্বয় কুণ্ডু-বংশোদ্ভব হইলেও বর্ত্তমানের খ্যাতিমান রায় বংশের ইঁহারা প্রকৃত আদিপুরুষ নহেন, তবে ইঁহারা যে এক সময়ে কুণ্ডুবংশের গৌরব স্বরূপ ছিলেন তাহার উল্লেখ করাও একান্ত প্রয়োজন।

ভাগ্যকূলের রায়-বংশের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কৃষ্ণজীবন রায়ের নাম বিশেষ-রূপে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহার দ্বারাই ভাগ্যকূল রায়-বংশের ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। ইনি ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন ও যৎ-কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি করেন। সহস্র সহস্র কুলীন-ব্রাহ্মণ নিবসিত সুপ্রসিদ্ধ কালী-পাড়া বা কাউলীপাড়ার দক্ষিণাংশে নূরপুর নামক গ্রামে ইঁহার বাসস্থান ছিল, তথায় ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অর্চ্চনা করিতে থাকেন। লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর সেবার সঙ্গে সঙ্গেই ইঁহার ধনৈশ্বর্য্য অত্যধিক পরিমাণে বাড়িতে থাকে। কৃষ্ণজীবন রায় চারি পুত্র ও প্রচুর নগদ ধন-সম্পত্তি রাখিয়া কাল-কবলে নিপতিত হ'ন। তন্মধ্যে কৃষ্ণজীবনের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র হইতেই ভাগ্যকূলের বর্ত্তমান কুণ্ডুবংশের উৎপত্তি। রামচন্দ্র রায় অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি পার্থিব ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা পরম-পিতার চিন্তাতেই অধিকাংশ সময় নিমগ্ন থাকিতেন। ব্যবসা বাণিজ্য বা ভূসম্পত্তি এসকলের তত্ত্বাবধানের দিকে মোটেই লক্ষ্য রাখিতেন না। এইরূপ ধর্ম্মানু-রাগের জন্য তিনি দেশ বিদেশে সর্ব্বত্র রামচন্দ্র বৈরাগী বা সন্ন্যাসী রামচন্দ্র নামে অভিহিত হইতেন। বিষয়কর্ম্মে অমনোযোগী থাকিলেও লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি

সুপ্রসন্ন ছিলেন। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার ভূসম্পত্তি অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপায় এবং তিনি অন্যান্য ভ্রাতৃগণকেও নগদ অর্থে ও ভূসম্পত্তিতে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই একমাত্র পুত্র গঙ্গা-প্রসাদকে রাখিয়া তাঁহার পত্নী পরলোকগত হন। পরে পিতার মৃত্যু হইলে গঙ্গাপ্রসাদ তাঁহার খুড়ীমাতার স্নেহাঞ্চলে পালিত হ'ন। গঙ্গাপ্রসাদ ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা কেবল বিক্রমপুরে কেন, ঢাকার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই প্রসিদ্ধি ও উন্নতির মূল কারণ গঙ্গাপ্রসাদের তৎকালীন ঢাকার প্রসিদ্ধ ভূম্যধি-কারী জীবন বাবুর সহিত মিলিত হওয়া। সে সময়ে জীবন বাবুর নাম সমগ্র বাঙ্গালা দেশেই বিশেষ খ্যাতিমান ছিল। তিনি একবার কলিকাতা আসিলে প্রত্যেক মজ্‌লিসে প্রত্যেক সভাসমিতিতেই তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। এহেন জীবন বাবুর লবণ ব্যবসায়ের অংশীদার হইতে পারায় সত্য সত্যই গঙ্গাপ্রসাদ আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম অবস্থায় এদেশে লবণের ব্যবসায় একটী বিশেষ লাভ-জনক কারবার ছিল, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিই এই ব্যবসা করিতে চাহিতেন এবং অনেকে এ ব্যবসা করিয়াই পরিশেষে বিশেষ ধনশালী হইয়াছিলেন। গঙ্গা-প্রসাদও জীবন বাবুর সহকারী হইয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। কয়েক বৎসর এক যোগে ব্যবসা চলিয়াছিল, পরে জীবন বাবুর অনু-মত্যনুসারে গঙ্গাপ্রসাদ স্বতন্ত্ররূপে নিজ নামে ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন। এবং কলিকাতা, নলচিটি, সৈদপুর, বাখরগঞ্জের অন্তর্গত নানা স্থানে ও নারায়ণগঞ্জে ব্যবসা চালাইবার সুবিধার জন্য কলিকাতায় এক বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। এইরূপ বিচক্ষণতার সহিত ব্যবসা চালাইবার ব্যবস্থা করায় তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল, অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভূসম্পত্তিও ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্থশালী হইয়া তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য এবং দানশীলতাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল—তিনি বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং দরিদ্রদিগকে প্রচুর অর্থদান করিতেন।

এই সময়ে তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস নূরপুর গ্রাম পদ্মার কুক্ষিগত হয়। সেজন্য ১২১৩ সালে আত্মীয় স্বজনবর্গ সহ আওয়াল নামক গ্রামে যাইয়া বাসবাটী নির্ম্মাণ করেন। এই সময় হইতে কুণ্ডুবংশ আওয়ালের কুণ্ডুবংশ নামে সর্ব্বত্র সুপরিচিত

হয়। বঙ্গীয় ১২১৪ সালের প্রারম্ভে গঙ্গাপ্রসাদ বহসংখ্যক অনুচর সহ অনেক তরণী সহযোগে গয়া, কাশী, এবং বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ বৃন্দাবন ধামে তীর্থ-যাত্রা করেন। তৎকালে তীর্থযাত্রা নিরাপদ ছিল না, পথে ঘাটে প্রায়ই বিপদ ঘটিত। তীর্থযাত্রীদিগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করাই এসময়ে গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রামবাসিগণের অর্থাগমের প্রধান উপায় ছিল। কাজেই গঙ্গাপ্রসাদ তিন চারি মাসের খাদ্য দ্রব্যাদির সংস্থান এবং উপযুক্তরূপ লোকজন ও নৌবহর লইয়া বৃন্দাবন-ধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেই সময়ে তিন চারি মাসের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশ হইতে বৃন্দাবন যাওয়া যাইত না।

গঙ্গাপ্রসাদ নিরাপদে বৃন্দাবনে পৌছিয়া তথায় যমুনার তীরে একটী সুন্দর বাটী ক্রয় করিয়া ৺রাধামাধবজীউর প্রতিষ্ঠা করেন এবং উক্ত বাড়ী দেবতার নামে উৎসর্গ করেন। কলিকাতাস্থিত একখানা মাজারি রকমের অট্টালিকাও উক্ত বিগ্রহের সেবাকার্য্য নির্ব্বাহার্থ অর্পণ করেন। তৎপর তিনি জয়পুরে ৺গোবিন্দজীকে দর্শন করিয়া ও অন্যান্য তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া প্রায় একবৎসর পরে দেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার গুরুপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ, চৈতন্য দাস এবং প্রেমচাঁদ নামে চারি পুত্র এবং সত্যবতী নামে এক কন্যা যথাক্রমে জন্ম গ্রহণ করে। গঙ্গাপ্রসাদের পত্নী রত্নতুল্য পুত্র কন্যা প্রসবের নিমিত্ত সর্ব্বত্র রত্নগর্ভা বলিয়া সম্মানিত হইতেন। কন্যা সত্যবতীও উত্তরকালে স্বামী গৃহে যাইয়া প্রচুর সুখ-শান্তি উপভোগ করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ রায় নিত্যানন্দ রায় বাহাদুরের পিতামহী ছিলেন। পক্ষান্তরে তারামণির পুত্র-কন্যা-গণের মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠ গুরুপ্রসাদ, চৈতন্য দাস ও প্রেমচাঁদ বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করেন।

কয়েক বৎসর পরে গঙ্গাপ্রসাদ দ্বিতীয় বার বৃন্দাবন ধামে তীর্থযাত্রা করিয়া তথায় কয়েক মাস অবস্থানের পর বঙ্গীয় ১২২৭ সালে চারি পুত্র ও কন্যা রাখিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করেন। তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল যে তিনি একদিকে যেমন প্রকৃত বৈষয়িক পণ্ডিত ছিলেন তদ্রূপ উদারচরিত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। এইরূপ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁহাদের বংশের পরম হিতৈষী জীবন বাবুকে কখনও বিস্মৃত হন নাই। জীবন বাবুর প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা অসাধারণ ছিল। (ক্রমশঃ)
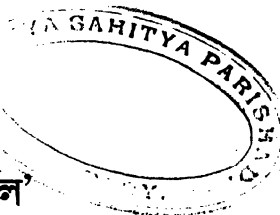
‘গীতাঞ্জলি’

সমুদ্র-মথিত সদ্যঃ সুধার লাগিয়া
সুরাসুরে হুড়াহুড়ি!—দ্বন্দ্ব অবিরল
নীলকণ্ঠ সে অমৃত রাখে লুকাইয়া
কবিকলকণ্ঠে (নিজে ভখিলা গরল)
গীতিছন্দে; পেয়ে সুধী সুধার সন্ধান
মত্ত আজি। নৃত্য করে মনীষি-মণ্ডলী
“গৌড়জন” যত আনন্দে করিছে পান
অপূর্ব্ব সে গীতামৃত ভরিয়া অঞ্জলি!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

বিক্রমপুরের শব্দ-সম্পদ।

‘নানান দেশে নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা পোরে কি আশা?’

একথাটি অতি সত্য। আমরা বিক্রমপুরবাসী কথোপকথনের সময় এমন অনেক প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করি যাহা অভিধানে নাই, অথচ কোনও প্রতিশব্দ ব্যতিরেকেই আমাদের নিকট তাহার অর্থ সুস্পষ্ট এবং সহজ বোধগম্য হয়। এই প্রাদেশিক শব্দগুলি পূর্ব্ববঙ্গের একরূপ নিজস্ব সম্পত্তি। উহার কতকগুলি যে অন্যত্র প্রচলিত নাই সে কথা বলিতে পারা যায় না।

‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ বহুদিন হইল নানা জেলার কথিত ভাষা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম, এ, মহাশয়ও এ সকল প্রাদেশিক শব্দের সংগ্রহ এবং তৎসঙ্গে তাহাদের ধাতুগত ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইয়া যে কোষ-অভিধান প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃই বঙ্গভাষার গৌরব স্বরূপ হইয়াছে। ‘প্রবাসী’ পত্রেও এসম্বন্ধে

অনেক লেখক এবং উহার সহকারী সম্পাদক চারুবাবু বিশেষরূপে আলোচনা করিতেছেন।

বিক্রমপুর বাঙ্গালার একটী অতি প্রাচীন স্থান, এক সময়ে ইহার ভাষা সমগ্র বঙ্গের আদর্শ ভাষা স্বরূপ বিবেচিত হইত, কাল-প্রভাবে তাহা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও প্রাচীন সাহিত্যে তাহার প্রভাব চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। 'একদেশের বুলি আর দেশের গালি' কথাটা সকলেই জানেন, কাজেই নানাদিক্ দিয়াই বঙ্গভাষার এমন একখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান সঙ্কলিত হওয়া প্রয়োজন যাহার সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন জেলার লোকের সহিত ভাষার ব্যবহারে একটা গুরুতর বাধা উপস্থিত না হয়।

আমরা এখানে বর্ণানুক্রমে বিক্রমপুরের প্রাদেশিক কথিত শব্দাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম। অতঃপর ডাকের বচন, ঘুম পাড়ানি ছড়া, কথা-প্রবচন ইত্যাদিও প্রকাশ করিব।

অ।—অল্কা-হল্কা—কচিডগা।

অলকইলা—থন্-থনে; ঝাঁকড়া; ফল-পুষ্প-সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

অদল বদল—বিনিময়।

অচ্যু / অচ্চু } আশ্চর্য্য ও ব্যঙ্গপ্রকাশক উক্তি।

অলা-গলা—ঢেঙ্গা; অস্বাভাবিক লম্বা ব্যক্তিকেই সাধারণতঃ 'অলা-গলা' পুরুষ বলা হয়।

অক্যের ধন—সত্যের ধন

আ।—আইলা—অগ্নি-পাত্র। কৃষকেরাই এ শব্দটী বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে।

আধার—মৎস্যের খাদ্য দ্রব্য; যথা—
'বেয়াইন গো! মাছে আধার নিল, তম উঠ্‌ল না।'

আউকৃড়া—আঁকড়া। আমরা এ শব্দ প্রয়োগে সুধু বেতের আঁকড়াই বুঝি।

আগৈল—টুকৃড়ি; ঝাঁকা।

আ-তাই জল—সাঁতার জল।

আখা—চুল্লী।

আগোন মাস—অগ্রহায়ণ মাস।

আবল্-তাবল্—যদৃচ্ছাক্রমে; যা' তা'।

আগল-পাগল—উন্মাদ; উল্টা-পাল্টা।

আগর-নাগর—সর্ব্বশুদ্ধ; একেবারে সব। যথা—
'আগর-নাগর পুইড়া,
এলা মর্ নিজেই পুইড়া'।

আতাইল—আ'ল; দুই ক্ষেত্রের মধ্য-বর্ত্তী রাস্তা।

আথাল—পুকুরে মৎস্যের থাকিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান।

আধা—ষোল সের চাউল ধরে এইরূপ বেতের তৈরী পাত্রকে কহে। বটুয়া।

আনঘট—আন্দোলন।

আকোন্দা—অচল, ব্যায়াকুব।

আখর—অক্ষরের অপভ্রংশ মাত্র। যথা—
'লেইখা পইড়া এক আখর—
অখনই বোলে বিয়া কর!'

আটাশ—আশ্চর্য্য।

আবাইতা—লোভী।

ই।—ইচর—কাঁচা কাঁটাল। "ইঁচড়ে পাকা"—অর্থাৎ অকালে পাকা। ইহা একটি ব্যঙ্গ উক্তি।

ঈ।—ঈল্‌কি-ঝিল্‌কি—বিদ্যুল্লতার ন্যায় প্রকাশ ও বিলয়।

উ।—উইট্‌কা—আটং-টং; উইট্‌-কাপড়া—বিপর্য্যস্ত হওয়া, উল্টিয়া পড়া; উইট্‌কা-উঠা—উথলিয়া উঠা।

উপ্‌ড়া—গুড়-মাখানো খৈ (মুড়্‌কি)।

উড়ি—মাড়ান ধানগাছ।

উলি—উইপোকা।

উলুক-বুলুক—উঁকিমারা। হঠাৎ উপস্থিত হইয়া পলাইয়া যাওয়া।

উবুৎ-বাবুৎ—উল্‌টা পাল্‌টা; উপর-নীচ।

উল্টা-পাল্টা—ঐ

উবুর-চুবুর—কানায়-কানায় পূর্ণ।

উদ্‌লা—উদ্দাম; ঢাকনিবিহীন।

উদ্‌লা-বাদ্‌লা—উলঙ্গ; উদ্দাম।

উক্কুর—হঠাৎ। যথা—
'মেঘ দেইখা হকাল হকাল
আইলাম ওপার থনে—
পোলা যে মোর ওপারে রইছে!
পড়্‌ল 'উক্কুরাইয়া' মনে।

এ।—এলা—এখন।

এদ—হ্যাদে; ওগো।

এন্দল—পঙ্ক; কর্দ্দম।

ও।—ওটা—ঘরে উঠিবার সিঁড়ি।

ওকর-দোকর—বিরক্তিসূচক উক্তি।

ক।—কম্‌চি—কঞ্চি; বাঁশের শাখা।

করুল—বাঁশের নবোদ্গত পাতা; কচি বাঁশ।

কাণ্টু—পক্ষপাতী।

কাচা—সঙ্কীর্ণ ও অগভীর খাই বিশেষ।

কুইড়া—কুড়ে; অলস।

কোষ-নাও—ছোট ডিঙি।

কইচা—ঝরা ধানের গাছ।

কাইজা—ঝগড়া, কলহ।

কেরামত—বীরত্ব সূচক বাক্য।

খ।—খল্‌পা—বাঁশের চাটাই।

খিজলান—খ্যাপান; উপহাস করা।

খাইটা—গুরুভার কাষ্ঠখণ্ড।

খাসী-করা কলাগাছ—কলা গাছের জোর বাঁধিবার জন্য কলাচারার মাঝ খানে কাটিয়া দেওয়া হয়,—তাহা-

কেহ 'খাসী করা কলাগাছ' বলে; ষণ্ডা প্রকৃতির লোকদিগকে বৃদ্ধগণ খাসী করা কলাগাছ বলিয়া থাকেন।

খেকুর—গলায় "খেক্" শব্দ করা। কাশ দেওয়া।

খব্বিশ—অপরিষ্কার।

খান্দাইরা—কলহপ্রিয়।

খুয়া—কুয়াসা, কুহেলিকা।

গ।—গইয়া—পেয়ারা।

গইঠা—গোবরের ঘুটে।

গামুর-গুমুর—ঘুষি ইত্যাদির শব্দ বিশেষ। যথা—

'গামুর-গুমুর মারে কিল—
চালতা যেন পড়ে।'

গেউতা—তোষামুদে; যে এক কথা বার বার বলিয়া বিরক্ত করে অথবা, যে শতবার বলিলেও—কোন কার্য্য করিতে চাহে না—তাহাকেও "গেউতা" বলা হয়।

গোয়ার-গোবিন্দ—একগুঁয়ে; নির্ব্বোধ অথচ ক্রোধী।

গাদি—'পেটে নাই গাদি—ভাতেরে কয় হারামজাদি'।

ঘ।—ঘসি—পাথুরিয়া কয়লার গুঁড়া ও গোবর জড়িত জ্বালানী দ্রব্য।

ঘুট-ঘুইটা—ঘুট-ঘুটে; ঘন; নিবিড়। যথা—ঘুটঘুইটা অন্ধকার।

ঘাগী—পুরাণো; যথা—'ও ত চিরকালের ঘাগী!

চ।—চৈর—চিকণ বাঁশের নৌকাচালানের যন্ত্র বিশেষ।

চলা—কুঠার-বিদীর্ণ কাষ্ঠ খণ্ডকেই সাধারণতঃ 'চলা' বলা হয়; চেড়া কাষ্ঠ।

চান্দর—ঘরের সম্মুখ ও পশ্চাৎ ব্যতীত পার্শ্বদ্বয়।

চাকৃদা—ঘূর্ণী।

চাইমসা—পচা, দুর্গন্ধ।

চারাট্—নৌকার গলুই এর নিকটস্থ বসিবার ত্রিভুজাকার তক্তা।

চোপাকরা—গালিগালাজ পাড়া।

চোপা—মুখ।

চাট্—লোভ; স্ফূর্ত্তি; ধাঁচ;—ইহা আরও অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

চাখা—স্বাদ-গ্রহণ করা; কোন দ্রব্যের তারতম্য নির্দ্ধারণ করা।

চ্যাগা—নিষ্পেষিত।

ছ।—ছন্‌ছা—চালের কিনারা।

ছই—নৌকার ছাউনি।

ছালি—ছাই; ভস্ম।

ছাব্‌নি—মুড়ি-ভাজা ঝাঁঝরের নীচের পাত্র।

ছিটাল—আস্তাকুঁড়।

ছেব্‌রি—ছেপ্; নিষ্ঠীবন; থুথু।

ছেব্‌লান্—স্ত্রীলোকের কথা অনুকরণ

করিয়া কথা কহা। অনেকের "ছেব্লান" শব্দার্থের এরূপ ধারণা; কিন্তু ইহা জ্ঞানহীন বহুভাষীর প্রতিই ভাল খাটে—অনেকে এই অর্থে প্রয়োগ করিয়াও থাকেন।

জ।—জিঙ্গইল—কঞ্চি; বংশ-শাখা।

জলসই—মৃতব্যক্তির নাভি।

ঝ।—ঝিম্‌ –স্থির; মৎস্য যখন ঝিম ধরে তখন জলের নীচ হইতে বুদ্‌-বুদ্‌ উঠিতে থাকে—আমরা তাহা-কেই ঝিম্‌-ধরা বলি। বাস্তবিক তাহা নহে; বুদ্‌বুদ ঝিম্‌ধরার চিহ্ন মাত্র।

ঝাগুর মাছ—মগুর মাছ।

ঝাণ্টু—পাকা; যথা—'ও—একাজে একেবারে ঝাণ্টু।'

ট।—টুই—চার কি দুই চালের সম্মি-লন স্থান।

টোপা—ছোট ঘট।

টিপ্‌—বড়শীর ছিপের অগ্রভাগ দ্বারা জলে আঘাত করার নাম 'টিপ্‌'।

টোম—তরঙ্গ।

টাকুর-টুকুর—যথা—

'না যাইও মনার বাপ, না যাইও মাঠে'
দেখ আইসা 'মনা' তোমার টাকুর-টুকুর হাটে।'

ঠ।—ঠিক্‌করা—যো'-টোনা করা। কাহাকেও বশীভূত কিম্বা কাহারও ভালমন্দ করিবার জন্য ঐন্দ্রজালিক উপায় অবলম্বন করা।

ঠুরি—একপোয়া চাল ধরে এমন ধরণের বেতের ডালা।

ঠোঙ্গা—পত্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ডালা।

ঠ'—শূন্য; ফাঁকা; যথা—

'লাভের ঘরে ঠ'।'

ঠর্‌কা—বাগিয়ে বসা।

ড। ডাটি—ধানগাছের গোড়।

ডেকৃড়া—তীব্র ভর্ৎসনা বাক্য।

ডেক্—বড় কড়ি; এই শব্দটী কড়ি খেলার সময় হরদম্‌ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ড়ুলা—মৎস্য রাখিবার পাত্র; ইহা সাধারণতঃ বাঁশের চটা দ্বারাই তৈরী হইয়া থাকে।

ডোঙ্গা—শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে যে খণ্ড কলার পাট ব্যবহৃত হয়—তাহাকে ডোঙ্গা বলে।

ডোস্কা—স্থূল; অতিরিক্ত মোটা। *

ঢ।—ঢাকি—চুপ্‌ড়ী; টুক্‌রী।

ঢেগুরা—ঢেড়্‌ড়া; ঢক্কা।

ঢেপ্পা—হঠাৎ পতন।

ত।—ত'—কল্‌কির ছিদ্র বন্ধ করি-বার গুলি।

* ভিতরে ফাঁপা—এমন জিনিসকেই ডোস্কা বলা হয়।

তল্‌পি-বোস্কা—লকট্‌-পকট্‌ গাঠ্‌ঠি বোস্কা।

তাহুত—পরিশ্রম।

তোপা—স্তূপ; উচ্চভূমি।

তেন্দর, বান্দর—ফাজিল।

তুম্বা, তোপা—উচ্চভূমি।

তুইয়া-মুইয়া—যেন তেন; ছোট খাট।

তাত্তরুম্বা—কূট অর্থে মজা। তাত্তরুম্বা ছেলেপিলেদিগের এক প্রকার খেলা, তাহাতে কেবল ঘুষা-ঘুষিই হইয়া থাকে। তাই কাহাকেও ভয় দেখা-ইতে হইলে, লোকে—"যে সে নই—এক দিনে "তাত্তরুম্বা" দেখা-ইতে পারি' বলিয়া থাকে।

তাইস—তিয়াস।

থ।—থল—স্থান; কাঠের থল—যেখানে কাঠ মজুত থাকে।

থোয়া—রাখা।

থেতা—ভোতা, যাহা সহজে কর্ত্তন করা যায় না।

থেতা—নাছোড়বান্দা।

থৈ-থৈ—স্তূপাকার।

থুবরা—জড়সর।

দ।—দশায় পড়া—কোন কিছুর জন্য বায়না ধরিতে ধরিতে তন্ময় হইয়া যাওয়া।

দশি—সলিতা।

দাউদ্‌রা—কর্কশ; খস্‌খসে।

দাওয়াল—ইতর; চাষা।

দাপান—ধরফর করা।

দাবান—শাসন করা।

ধ। ধর-পহরে—খুব সকালে; প্রত্যুষে। ইহা মুসলমানেরাই বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে।

ধন্নি—ধরণীর অপভ্রংশ। *

ধোকর—দুত্তোর; বিরক্তিসূচক উক্তি। 'একদিন যখন দুত্তোর বলে'।'

ধামা-ধরা—অলস; ভোতা।

ন।—নাদান—আনাড়ী।

নাড়া—খড়।

নালী—নর্দ্দামা; পয়ঃ-প্রণালী।

নিপরতাশী—(কথাটি বোধ হয় নিপ্র-ত্যাশী) অবিশ্বাসী।

প। পোয়া—অঙ্কুর।

পোল্‌টা—পুটুলী।

পালা—স্তূপ; যথা—ছনের পালা।

পনা—পানা।

পনা—মাছের বাচ্চা; যথা—"টাকির পনা"।

পোলা—পুত্র।

ফ।—ফাত্‌রা—কলাগাছের শুক্‌না পাতা। ফাতরা—ফাজিল।

---

* ধরণীর অর্থ এখানে পৃথিবী নহে। ইহার অর্থ অবলম্ব্য; যদিও ধরণী ও অবলম্ব্য তুল্যার্থেরই অনুগমন করিয়াছে।

ফাউল্কা—চঞ্চল ; ফাজিল।
ফাউপা-রাঙ্গা—কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় ; ফাঁপর।
ফেদ্‌লা—নিরর্থক কথা।
ফেদ্‌লা—যে নিরর্থক বহু কথা বলে।
ফইস্‌কা যাওয়া—পিছ্‌লাইয়া যাওয়া।
ব।—বৌল—আম্র-মুকুল।
বৌল—মুকুল। (বৌল বলিলে বিক্রমপুরবাসীর মনে আম্র-মুকুলই যেন আসিয়া পড়ে)
বোকল—পাশ, ধার, কাছ, কিনারা।
বাইটা—সুতা।
বালা—চড়ক পূজার সেবায়ৎদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি।
বালাগাছ—চড়কগাছ।
বাইল—সুপারীর খোল।
বাউগ্‌রা তাল বা খেজুরের ডিগ্‌।
বাইতা—ছোট ইঁদুর।
বাখা—বাঁশের চটা।
বেতাসী—বেতস-বল্কল।
বেব্‌লা—নির্ব্বোধ।
বেচ্‌কি—মুখভঙ্গী।
বেবাক, বিলকুল—সকল।
বড়াইল ছনের আটির বন্ধন।
ভ।—ভুল্‌কি—পোকা, পচা।
ভুল্‌কি আম—যে আমের নিম্নভাগ পচা
ভেল্কি—গোড়ের বেড়ার উপরের বেড়া।

ভারালী—কলাগাছের শাঁস।
ম।—মচ্‌কা—ঘরের থাম ও আড়ার সহিত যে বন্ধন—তাহাই মচ্‌কা। আড়াকে নাকি পাইরও বলে।
মাত্‌লা—কৃষকদিগের পত্র নির্ম্মিত ছাতা বিশেষ।
মেচা—অবর্দ্ধিত ফলফলাদি।
মেচা-মেচি—ঐ
মেকুর—বিড়াল
য।—যুলি—ঝোঁপের ভিতর পশুদিগের থাকিবার আড্ডা।
যো-টোনা—কাহাকেও বশীভূত কিংবা কাহারও ভালমন্দ করিবার জন্য ঐন্দ্রজালিক উপায় অবলম্বন করা। বশীকরণ উচাটন-স্তম্ভন-মন্ত্রাদি অবলম্বন করা।
র।—রাইং—পাতিল ; মৃৎ-পাত্র ; হাঁড়ি।
রাউয়া—হাবাতে ; নির্লজ্জ ; পেটুক।
ল।—লুটি—সুপারীর খোলের টুক্‌রা।
লুড়ি—মুড়ি ; ক্ষেত্রের শুষ্কঘাস ইত্যাদি।
লাদ—গোমেষাদির মল।
লাক্‌রি—জ্বালানি কাষ্ঠ।
লেছুর—অপরিষ্কার। হেঁচ্‌কাটান।
লুন্তি—হাম।
লক্কা—থাম ও পাইর এর সহিত যে বন্ধন তাহাকে লক্কা বলে।
লোরা, লোরন—উঞ্ছ-বৃত্তি।

স।—সাতলান—ছেঁই দেওয়া—মৎস্য পচিতে না পারে তজ্জন্য অল্প ভাজিয়া রাখা।
সান্ধান—প্রবেশ করান।
সুমৈর—উত্তর।
শ।—শবোকে তৃপ্তির সহিত।
শাওন মাস—শাওন, শ্রাবণ মাস।
হ।—হবিরে—(মুসলমানি শব্দ) সকালে।
হটক—সাজ সজ্জা।
হালু—শালুক; হালুয়া।
হাকৃরাইঙ্—সংক্রান্তি।
হামু—শম্বুক; শামুক।
হাপুর-হুপুর—বেত্রাঘাত ধ্বনি।
পান্থা ভাত খাওয়ার শব্দ।
হাটর—লেঠা; কষ্ট।
হাবা-জাবা—অপরিষ্কার।
হাউতা—মৃৎ-পাত্র; পাতিল।
হাতাইল—ক্ষেতের আল।
হাজীব—সস্তা।
হচর বচর—খাতির, তোষামোদী।

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিক্রমপুর-প্রসঙ্গ

মহামহোপাধ্যায় প্রসন্ন চন্দ্র—আর ইহ জগতে নাই। ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক, পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের সম্পাদক, পূর্ব্ব-বঙ্গ সাহিত্য সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রসন্ন চন্দ্র বিগত ২২শে কার্ত্তিক রবিবার রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় আত্মীয় স্বজনগণকে ও দেশবাসীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অনন্ত লোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৩ তিয়াত্তর বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি স্বকীয় উদ্যমশীলতা ও অধ্যবসায় প্রভাবে গভর্মেণ্টের প্রথম শ্রেণীর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। গভর্মেণ্ট তাঁহার বিদ্যাবত্তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়া মহামহোপাধ্যায় এই শ্লাঘ্য উপাধিতে তাঁহাকে ভূষিত করেন। তাঁহার রচিত 'সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণকে' বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও অনেক পাঠ্য পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বীণা-পাণির শুভ দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মাতা কমলার প্রীতি কটাক্ষ হইতেও বঞ্চিত হন নাই। আমরা শীঘ্রই তাঁহার সচিত্র জীবন কথা প্রকাশ করিব।

বিক্রমপুর

২য় বর্ষ | পৌষ ও মাঘ ; ১৩২১ | ৯ম ও ১০ম সংখ্যা

বিজয়-গীতি

(১)

বিশ্বজগত গাহিছে সতত বন্দন-গীতি যাঁররে
তাঁহারি চরণে ব্রিটিশ বিজয় আমরা সকলে চাহিরে!
যে জাতি গৌরবে অতুল ধরায় সূর্য্য অস্ত নাহি যায়,
হিমাদ্রি যাহার গর্ব্ব পতাকা জলধি বিজয় গাহেরে!
ধর্ম্মেরই জন্য গৌরব পুণ্য হৃদয়-শোণিত ঢালেরে।
(আজি) গাহ সে রাজার বিজয় গান
পঞ্চম-সুরে উঠুক তান!
গগনে পবনে রাজার জয় ভৈরব রব তোলরে!
(কোরাস্) বিশ্বজগত ইত্যাদি—

(২)

প্রজারঞ্জন নৃপতি জর্জ্জ জননী সমানা রাণী,
কল্যাণে দানে সুধা ঢালে প্রাণে দৈবতার মত গণি।
পরের তরে আপনা ভুলি ব্রিটিশ-বাহিনী যোঝেরে।
ভীরুতা জানেনা বেদনা মানেনা বিজয় গৌরব ঘোষেরে!

ভারত সৈন্য মিলেছে সঙ্গে প্রমত্ত গৌরব রঙ্গেরে !
রাখিতে সর্ব্ব দেশের গর্ব্ব অকাতরে প্রাণ দেয়রে !
(আজি) সকল কণ্ঠে তোলরে ধ্বনি, জয় জয় জয় বাণী
দয়াল প্রভু ! করুণা বলে ব্রিটিশ বিজ গাহিরে ;
(কোরাস্) বিশ্বজগত ইত্যাদি।

১৩২১ সন, ১৯শা পৌষ।

আর্য্যঋষির ব্রহ্মজ্ঞানের ক্রম বিকাশ

শ্রদ্ধা আর্য্যঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম স্তর ; শ্রদ্ধায়ই অনুরাগের উন্মেষ, আর অনুরাগে জ্ঞানের বিকাশ হয়। লোকে কথায় বলে—'যথা জ্ঞান তথা ভক্তি, ভক্তিতে নির্ব্বাণ মুক্তি, কথাটি ধ্রুব সত্য। ভক্তি যেন জ্ঞানের সহধর্ম্মিণী, আর প্রেম যেন তাহাদের সুযোগ্য সুসন্তান। প্রেমই মাতৃপিতৃ জ্ঞানে—জ্ঞান-ভক্তির চরণে, ব্রহ্মানুরাগ, এমন কি ব্রহ্মসম্মিলন পর্য্যন্ত প্রদান করে। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ে উভয়ের সংযোগে পূর্ণ। সুতরাং একের আহ্বানে অপরের উপস্থিতি স্বাভাবিক। জ্ঞান ও ভক্তির কাহাকেও প্রথমাসনে বসান অযৌক্তিক নয়। স্থূল কথা অহেতুকী ভক্তি-স্রোতে জ্ঞান ডুবিয়া গেলে, আমিত্ব লোপ পাইলে, দিকানুরাগে যে অলৌকিক প্রেম সমুৎপন্ন হয়—সেই অলৌকিক প্রেমই আত্মার পরিমার্জ্জক। প্রেমে আত্মা পরিমার্জ্জিত হইলে, পরিমার্জ্জিত আত্মায় ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃই প্রতিভাত হয়।

আর্য্যঋষিগণ জ্ঞানের প্রথম স্তরে লীলাময়ী প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ ক্রীড়াগুলি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেন। দ্বিতীয় স্তরে, স্বভাবজ ঘটাবলীর কারণান্বেষণে ব্যস্ত হইতেন। তৃতীয় স্তরে কারণের কারণ জানিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িতেন। তখনই ভক্তিরসের উদ্রেক হইত ; ভক্তিতে একেবারে ডুবিয়া যাইতেন। ক্রমে প্রেম বিবৃদ্ধি হইত ; জ্বলন্ত প্রেম সঞ্চারে আত্মা পরিষ্কৃত,

পরিমার্জ্জিত ও বিষয় বাসনা বিরহিত হওয়ায়, ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা হইতেন। তখন কেহ পরমানন্দে বলিতেন :—

"ব্রহ্মানন্দং পরমং সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্॥" যোঃ বাঃ

কোন জ্ঞানী সাধক বলিতেন :—

মৌনং স্বাধ্যায়নং ধ্যানং ধ্যেয় ব্রহ্মানুচিন্তনম্।
জ্ঞানেনেতি তয়োঃ সম্যগ্ অন্তর্দ্দেবস্য দর্শনম্॥" শঃ

কোন আত্মবিদ্ উপাসক মানবমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন :—

"হে জনা অপরিজ্ঞাত আত্মাবো দুঃখ সিদ্ধয়ে।
পরিজ্ঞাত স্বনন্তায় সুখায়োপশমায় চ॥" যোঃ বাঃ

'হে জনগণ! অজ্ঞানতাই সর্ব্বদুঃখের কারণ এবং আত্মবিজ্ঞানই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তির উপায়।'

কোন সিদ্ধ পুরুষ বা আক্ষেপ করিয়া বলিতেন :—

"পৃথগাত্মা পৃথগ্ দেহী জলপদ্মলবোপমৌ।
ঊর্দ্ধবাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিৎ শৃণোতি মে।"

'পদ্মাধার মহাসলিল এবং পদ্মপত্রস্থিত সলিল বিন্দু পৃথক্; উপাধিরূপ পদ্মপত্র ভেদ জন্মাইতেছে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন; শুধু অন্তঃকরণরূপ উপাধি ভেদ জন্মাইতেছে, আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতেছি। কেহই শুনিতেছে না।'

কোন বেদবিদ্ মহর্ষি বা ভগবানের নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিয়া বলিতেন :—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং,
স্তুত্যা নির্ব্বাচনীয়তাহখিলগুরো দূরীকৃতা যথয়া।
ব্যাপিতঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্‌বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥" ব্যাঃ

হে প্রভো, হে ভর্গোদেব, তুমি রূপ বিবর্জ্জিত, আমি ধ্যানে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি, তুমি অখিল গুরু ও বাক্যের অতীত, আমি স্তবদ্বারা তোমার

সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি ; তুমি সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু আমি তীর্থযাত্রাদিদ্বারা তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নিরাকৃত করিয়াছি। অতএব হে জগদীশ! তুমি আমার এই বিকলতা দোষের ক্ষমা কর।

এইরূপে ব্রহ্মবাদীগণ ব্রহ্মসম্মিলন সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়া গিয়াছেন,—যতই আলোচনা করা যায়, ততই দেখা যায় মন যেন স্বতঃই ভক্তিরসে ডুবিয়া যায় ; মনে পরমানন্দের উদ্ভব হয় ; প্রাণের অন্তস্থলে সচ্চিদানন্দের সত্ত্বা অনুভূত হয়।

আর্য্যঋষিগণ জ্ঞানের প্রথম স্তরে, ভয়-যুক্ত হইবার জন্য, ভয়বিহ্বল প্রাণে ঝড়ের প্রচণ্ড শক্তি দেখিয়া পবন দেবতার, জলের অসামান্য শক্তি দেখিয়া বরুণ দেবতার, মেঘ-বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের বিভীষিকাময়ী লীলা দেখিয়া ইন্দ্র দেবতার, অর্থের কার্য্যকরী শক্তি দেখিয়া কুবেরের, বিষধরের কালান্তক শক্তি দেখিয়া নাগরাজ বাসুকীর, তেজের দাহিকা শক্তি দেখিয়া অগ্নির, ক্ষেত্রে সুন্দর শস্য দেখিয়া শ্রী বা লক্ষ্মীর, জলের শংকর শক্তি দেখিয়া নারায়ণের, বিদ্যার মোহিনী শক্তি দেখিয়া সরস্বতীর, প্রকৃতির কাল বা সংহার শক্তি দেখিয়া কালীর অর্চ্চনা করিতেন। এইরূপে জ্ঞানের প্রথম স্তরে আর্য্যঋষির বিপন্নিবারক উপাসনার সৃষ্টি হয়।

ইহার পর জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তরে, স্বভাবজ ঘটনাবলীর করণান্বেষণে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন—সর্ব্বত্র, সর্ব্বসময়, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বঘটনায় একটি মঙ্গল চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন কালচক্রের আবর্ত্তনে যেন মঙ্গলধারা ক্ষরিতেছে, কিছুই যেন নিরর্থক, নিষ্ক্রিয় নহে। প্রকৃতি যেন জননীর আনন্দময়ী মূর্ত্তি। তাঁহারা দেখিলেন, প্রকৃতির আনন্দময়ী মূর্ত্তির কারণ সূর্য্য। তাঁহারা বুঝিলেন,—সূর্য্যের সত্ত্বায় জগতের সত্ত্বা ; আর সূর্য্যের বিলোপে জগতের বিলোপ। তাঁহারা চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ সুবিমল কিরণের পশ্চাতে সূর্য্যতেজ, জীবমাতা ধরিত্রীর উৎপাদিকা শক্তির পশ্চাতে সূর্য্যতেজ, অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠাভ্যন্তরে সূর্য্যতেজ, মহাসাগরের জলরাশির শক্তির অভ্যন্তরেও সূর্য্যতেজ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, সূর্য্যতাপে মহাসাগরের জলরাশি বাষ্প হইয়া, অনন্ত অম্বর পথে প্রথমতঃ পর্ব্বত শৃঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। তৎপর তরঙ্গায়িত নদীরূপে বন্যায় দেশ প্লাবিত করিয়া, প্রাণীদিগকে সুশীতল পানীয় জল প্রদান করিয়া, পুনরায়

সমুদ্রে নিপতিত হয়। লোক-ভয়প্রদ বন্যাস্রোত, অনর্গলবর্ষী মেঘপ্রপাত ও ভয়ঙ্কর ঝরের প্রচণ্ডাঘাত যেন প্রকৃতি দেবীর স্নানোপকরণ, প্রকৃতি যেন স্নাত হইয়া স্বাস্থ্যপ্রদ মূর্ত্তি ও ফল-ফুল-সমন্বিত শস্য বহুল কান্তিতে শোভিতা হয়। প্রবল ঝড়ে বায়ু রাশির আবর্জ্জনা তটিনীর তুঙ্গ তরঙ্গে, আর ধরিত্রীর আবর্জ্জনা পুঞ্জ বিপুল জলরাশির সহিত বিমিশ্রিত হইয়া খরস্রোত বেগে সমুদ্রে পতিত হয়, এবং সমুদ্রের লবণাক্ত অম্বুরাশি সেই সমস্ত আবর্জ্জনা ক্রমে ধ্বংস করিয়া ফেলে। প্রকৃতি গাত্রমল কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, বরাহ, জম্বুক, সারমেয় প্রভৃতি পশু, শকুনী, গৃধিনী, বায়সাদি পক্ষী. পিপীলিকা, কর্কটাদি ক্ষুদ্র প্রাণী নিচয় ও উদ্ভিদ কুল তাহা নির্ম্মূল করিতে নিরন্তর ব্যস্ত। সকলেই যেন শঙ্করের ইচ্ছায় শুভকর্ম্মে নিযুক্ত।

আবার দেখুন যে তাপ জগতের প্রাণ, সূর্য্য হইতেই তাহার উৎপত্তি; যে বায়ু, যে জল জগতের জীবন, সূর্য্যই তাহাদের ক্রিয়াশক্তি; সুতরাং ঋষিগণ যেন বুঝিয়া লইলেন, সূর্য্যের সত্ত্বায়, জগতের সত্ত্বা সুনিশ্চয়, আর সূর্য্যের বিলোপে জগতের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। যেই বুঝিলেন—অমনি গাহিলেন,—এইবার মঙ্গলদাতার মঙ্গলকর কার্য্যের জন্য কৃতজ্ঞ অন্তরে সুতরাং ভক্তি বিমিশ্র হৃদয়ে গাহিলেন :—

১

"নমঃ সবিত্রে জগদেক চক্ষুষে
জগৎ প্রসূতি স্থিতি নাশ হেতবে
ত্রয়ী ময়ায় ত্রিগুণাত্ম ধারিণে
বিরিঞ্চি নারায়ণ শঙ্করাত্মনে।"

২

"যন্মণ্ডলং ব্রহ্মবিদো বদন্তি
গায়ন্তি যচ্চারণ সিদ্ধ সংঘাঃ।
যন্মণ্ডলং বেদবিদঃ স্মরন্তি
পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥"

৩

যন্মণ্ডলং বেদবিদোপগীতং
যৎ যোগিনাং যোগপথানুগম্যম্।
তৎসর্ব্ব বেদং প্রণমামি সূর্য্যং
পুনাতু মাং তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্॥

আর্য্যঋষিগণ যখন জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তরে বিরাজ করিতেন, তখনই তাঁহাদের উপাধি হইয়াছিল ব্রাহ্মণ। আচার, বিনয় বিদ্যাদিরূপে, যেরূপ কুলীনের লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—লক্ষণভ্রষ্ট হইলে, যেরূপ কৌলীন্য মর্য্যাদার আসনচ্যুত হইতে হইত, ব্রাহ্মণেরও সেইরূপ যোগঃ তপঃ আদি লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; লক্ষণভ্রষ্ট হইলে ব্রাহ্মণেরও ব্রাহ্মণত্ব লোপ পাইত। শাস্ত্র বলে:—

"যোগস্তপো দমোদানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা।
বিদ্যা বিজ্ঞান মাস্তিক্য মেতৎব্রাহ্মণ-লক্ষণং॥"

কিন্তু "যুক্তঃ সাৎ সর্ব্ব সংস্কারৈ র্দ্বিজস্তু নিয়মব্রতৈঃ।
কর্ম্ম কিঞ্চিন্নকুরুতে বেদোক্তং ব্রাহ্মণ ব্রুবঃ॥"

ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য না করিলে, ব্রাহ্মণ—'ব্রাহ্মণব্রুবঃ' অর্থাৎ পদভ্রষ্ট হয়। শাস্ত্রজ্ঞের পুত্র হইলেই 'শাস্ত্রজ্ঞ হইবে,' ইহা ন্যায় ও যুক্তির বহিশ্চক্রের কথা।

জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তরে ভক্তির উন্মেষ হয় সত্য, কিন্তু জ্ঞানের তৃতীয় স্তরেই ভক্ত্যুদ্ভব প্রেমের জন্ম হয়। ঋষিগণ জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তরে অনন্ত নভোমণ্ডলে রাশিচক্রের সত্যতা মাত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এবং রাশিচক্রের মধ্যে সূর্য্যকেই সর্ব্ব মূলাধার বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা জ্ঞানের তৃতীয় স্তরে বিশুদ্ধ বিচারে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে পাইলেন,—তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু পূর্ণ বিকশিত হইল। তাঁহারা দেখিলেন—এক একটি দ্যুঃলোকে সৌরজগৎসমন্বিত অনন্ত কোটি সূর্য্য বর্ত্তমান। একটি দেহের প্রতি লোমকূপে এক একটি দ্যুঃলোক কল্পনা করিলেও, সেই বিরাট দেহের অনন্ততা স্বীকার করিতে হয়। সেই বিরাট অনন্তের কথা যতই চিন্তা করা যায়, ততই দেখা যায়, তাঁহার প্রতি কণা হইতে, অজস্র অমৃত স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। জগতের সর্ব্ব জাতীয় সর্ব্ব শ্রেণীর সাধকগণ তচ্চিন্তায় বিভোর হইয়া, সেই অমৃতরাশি পান করিতেছেন, তাঁহাদের মন অবারিত প্রধাবিত চিন্তায় ভাবে বিভোর ও ইন্দ্রিয়গুলি অবসন্ন

হইয়া পড়িতেছে। যিনি সাধকরূপে প্রেমোন্মত্ত হইয়া দেখেন, প্রেমে বিভোর হইয়া ভাবেন তিনিই বলেন—"এই যে আমার সন্নিকটে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি, এই যে আমার প্রত্যক্ষে বিশ্বনাথের বিশ্বরূপ, এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডময় তাঁহারই গৃহ; এই যে সকল গৃহেই তিনি বর্ত্তমান, আমরা যে তাঁহারই সুমধুর মোহন বংশী-ধ্বনি শ্রুত হইতেছি।" কি আনন্দ, কি সুখ; কি দিব্য আরাম, কি দিব্য শান্তি! যিনি সে দিব্য শান্তি ভোগ করেন, যিনি তাঁহাকে জানেন, যিনি সে মোহন বংশীর মোহন ধ্বনি শ্রুত হন, তিনিই ব্রহ্মর্ষি, তাঁহার আরাধ্য দেবতাই ব্রহ্ম। "প্রেম" ব্রহ্মর্ষির ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সুপরিচিত সুপ্রশস্ত পন্থা। প্রেমের পূর্ব্বে—"শুধু তর্ক, শুধু সিদ্ধান্ত, শুধু ভ্রম, শুধু অন্ধকার।" প্রেমে "তর্ক নীরবে অস্তমিত ও অন্ধকার সভয়ে বিদূরীত হয়"; সাধক "ব্রহ্মর্ষি হইয়া যান"।

আর্য্যঋষিগণ বহুকাল বহু ভ্রম-বর্ত্মে পরিভ্রমণ করিয়া, জ্ঞানের প্রথমাবস্থায় ক্রমে রজঃ ও তমের, বিধির (সৃষ্টি দেবতার) ও শিবের (মঙ্গল দেবতার) হ্রীঁ, ঐঁ, হূঁ, ঐঁ, হ্রীঁ, হ্রীঁ, ঐঁ, ঐঁ, হ্রীঁ রব্যাদি নবগ্রহের এবং এইরূপ অন্যান্য দেবতার বীজ মন্ত্রের পরে চিৎ ও সতের (জ্ঞানের ও সত্যের) আরাধনা করিয়া চরমে আত্মোদ্ভব অনন্তের, ভগ—অর্থাৎ "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব" এই ষড়্গুণবিশিষ্ট আনন্দময় ভগবানের, প্রকৃতি-মূল-শক্তি আদি কারণ ব্রহ্মের, সচ্চিদানন্দস্বরূপ মহান্ ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবোধিত হইয়াছিলেন। এবং প্রবলা সাধনায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত লাভ করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া,—প্রেমভরে, কৃতজ্ঞঅন্তরে, আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে গাহিয়া-ছিলেন:—

"ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্ব লোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়।
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎ কারণং বিশ্বরূপং।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥"

কোন সাধক বা মনে প্রাণে বলিয়াছিলেন :—

"ওঁ পরমেশ্বরায় বিদ্মহে, পর তত্বায় ধীমহি তন্নোব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ।"

কোন সাধক বা প্রেমভরে গাহিয়াছিলেন :—

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।"

'তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার হৃদয়, তুমিই আমার নয়নের কৌমুদী, তুমিই আমার অঙ্গে অমৃত।'

কোন জ্ঞানী কবি প্রেমপ্লুত হৃদয়ে যুক্তকরে বলিয়াছিলেন :—

"জগত কারণ যিনি পতিতপাবন,
অনাদি অনন্ত দেব জীবন-জীবন,
নিরাকার নির্ব্বিকার বিপদভঞ্জন,
স্মরণ কররে মন তাঁহার চরণ।"

এইরূপে ক্রমস্তরে জগতে ব্রহ্মোপাসনা প্রচারিত হইয়াছিল। ধন্য সে যে ব্রহ্মস্বরূপ প্রচারক ; আর ধন্য সে যে ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মোপাসক।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বসন্ত আগমনী

এস বসন্ত! বনশ্রীমন্ত! স্নিগ্ধ সুন্দর ঠাম!
শষ্প আসন! পুষ্প ভূষণ! কান্ত কিশোর শ্যাম!
আন—আনন্দ, মারুত মন্দ, নন্দন-গন্ধ-গীতি ;
লাস্যবন্ধন, হাস্যক্রন্দন, ইন্ধন ভস্ম—স্মৃতি!
পদ্মপরাগ অলক্তরাগ রক্ত চরণে চিন্
গুপ্ত মন্তরে মন যন্তরে ঝঙ্কার সুপ্তবীণ্!
হে বন-বল্লভ! সঞ্চারি' পল্লব এস গো কুটীরে মোর
রঞ্জিত কর মুঞ্জিত কর চিত্ত তিমির ঘোর!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

বিক্রমপুরের জলপ্রণালী

পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে উত্তর বিক্রমপুরের প্রধান কৃত্রিম জলপ্রণালী তিনটি। যথা, মিরকাদিমের খাল, তালতলার খাল ও শ্রীনগরের খাল ; এবং স্বাভাবিক জলপ্রণালীও তিনটি ; যথা—সেরাজদিখাঁর নীচে লুপ্তাবশিষ্ট ইচ্ছামতী নদী ; লৌহজং ও বহর সংযোজক ধানকুনিয়ার খাল এবং বিক্রমপুরের পূর্ব্বাংশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদ। এই সকল কৃত্রিম ও স্বাভাবিক জলপ্রণালী হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্রতর জলপ্রণালী বাহির হইয়া বিক্রমপুর ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমরা একটি একটি করিয়া এই গুলির পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা পাইব। প্রারম্ভেই একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই। সুশৃঙ্খলভাবে এবং সুবিশুদ্ধভাবে এই গুলির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিব এই উদ্দেশ্যে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি লইয়া এই গুলি দেখিতে কখনও বাহির হইবার সুযোগ আমার ঘটে নাই। অন্যান্য সকল পান্থের মত আমিও এই গুলি দিয়া অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি এবং তাহাতেই মনের মধ্যে যে একটি অস্পষ্ট ধারণা হইয়াছে এবং কাল্পনিক মানচিত্র মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে তাহাই সম্বল করিয়া আজ ইহাদের বিষয় কিছু লিখিতে বসিয়াছি। এই রকম বর্ণনায় ভুল ভ্রান্তি ঘটিবার খুবই সম্ভাবনা। পাঠকগণ ভুল দেখাইয়া দিলে আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইব।

মিরকাদিমের খাল। মিরকাদিমের খালের বিষয় বিস্তৃতভাবে বিক্রমপুর, ১ম বর্ষ দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যায় লিখিয়াছি। তথায় আমরা এই সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে মিরকাদিমের খাল প্রায় ৮০০ বৎসর হয় বর্ম্মা-বংশের শেষদিকের কোন রাজা অথবা সেনবংশের প্রথম দিকের কোন রাজা খনিত করিয়াছিলেন। টঙ্গিবাড়ীর মাইল খানিক দক্ষিণে মিরকাদিমের খাল এক প্রশস্ততর খালের সহিত প্রায় সমকোণে মিশিয়াছে। এই খালকে মাকুহাটির খাল বলে। এই খাল মাকুহাটি গ্রাম ভেদ করিয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্র

নদে মিশিয়াছে। মাকুহাটির খাল স্থানে স্থানে এত প্রশস্ত ও গভীর যে দেখিয়া বোধ হয় যে পূরাকালে এই পথে সম্ভবতঃ কোন নদী প্রবাহিত ছিল।

মিরকাদিমে খালের শাখা প্রশাখা অনেক গুলি। উত্তরদিক হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

১ নং। একটি শাখা মিরকাদিমের হাটের ঠিক উত্তরদিক ঘেসিয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। এই শাখাটি দিয়া রামপাল ও তৎসন্নিহিত সমস্ত স্থানে যাওয়া যায়। এই খাল দিয়া নৌকা লইয়া রামপালের কোদাল ধোয়া দীঘির মধ্যে পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। প্রাচীন রামপাল সহরের আশে পাশে অসংখ্য চৌগাড়া বেষ্টিত উচু ভিটি আছে। ইহাদের মধ্যের অনেক চৌগাড়ার সহিত এই খালের যোগ আছে।

২ নং। আবদুল্লাপুরের খাল। আবদুল্লাপুর গ্রামের উত্তরে সীমাবদ্ধ করিয়া এই খাল যাইয়া তালতলায় ধলেশ্বরীর সহিত মিশিয়াছে। ইহাই লুপ্তা ইচ্ছামতী নদীর প্রাচীন খাত। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইলেও এই খাল বালুকাময়, পঙ্কময় নহে। ইহা হইতে ছটফটিয়া গ্রামের নিকট এক খাল বাহির হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইয়া বেতকার খালে পড়িয়া তালতলার খালের সঙ্গে মিশিয়াছে।

৩ নং। আবদুল্লাপুর ও পাইকপাড়া গ্রামের সীমানায় ইটের পোলের ঠিক উত্তর দিক ঘেসিয়া একটী ক্ষুদ্র খাল আবদুল্লাপুর গ্রামের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক বেষ্টন করিয়া আবদুল্লাপুরের বাজারের পশ্চিম প্রান্তে ২নং খালের সহিত মিশিয়াছে। আবদুল্লাপুর গ্রামটি এইরূপে চারিদিকেই জল বেষ্টিত।

৪ নং। জোড়া দেউলের দেউল স্পর্শকারী ক্ষুদ্র খাল। ইটের পোলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ হইতে আরব্ধ হইয়া অর্দ্ধবৃত্তাকারে দেউল স্পর্শ করিয়া আবার বড় খালেই আসিয়া পড়িয়াছে। এইটি দেউলের বর্ষাকালের নির্গম পথ।

৫ নং। পাইকপাড়ার দেউল বেষ্টনকারী খাল। বড় খালের পশ্চিম পারে ফাঁইসা তলার ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে আরব্ধ হইয়া পাইকপাড়া গ্রামের প্রায় চতুর্থাংশ বেষ্টন করিয়া দইধারমা'র বাজারের উত্তর দিক ঘেসিয়া আবার বড় খালে পড়িয়াছে। পাইকপাড়ার দেউলের নিম্নস্থ অনতিবৃহৎ পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ মঘাদীঘি এই খালের সহিত যুক্ত।

৬ নং। বৃহৎ খাল। ইহাকে আট পাড়ার খাল বা বজ্রযোগিনীর খাল বলে।

বড় খালের পূর্ব্বপারে দইধার মা'র বাজারের কিঞ্চিৎ উত্তরে আরব্ধ হইয়া বজ্র-যোগিনী, আটপাড়া, রঘুরামপুর, নাহাপাড়া, মহাকালী, কেওয়ার ইত্যাদি গ্রামে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। এই সকল গ্রামস্থিত দেউলগুলি হয় এই খালের পারে অবস্থিত না হয় ক্ষুদ্রতর জলপ্রণালী দিয়া এই খালের সহিত সংযুক্ত। এই খাল প্রচীন কালে সর্ব্বদা তরণী সমাকীর্ণ থাকিত বলিয়া বোধ হইতেছে; কারণ বিক্রমপুরের অনেক গুলি প্রধান প্রধান ধর্ম্মস্থলীকে পরস্পরের সহিত এবং বড় খালের সহিত ইহা সংযুক্ত করিয়াছে।

৭ নং। বেতকার খাল। নাটেশ্বর দেউলকে বেষ্টন করিয়া যেখানে বড়-খাল অর্দ্ধবৃত্তাকারে প্রবাহিত সেই খানে সেই অর্দ্ধবৃত্তের প্রায় মধ্যদেশে পশ্চিম পার হইতে এই খালের আরম্ভ হইয়াছে। এই খাল হাসকিরা, খিলপাড়া, বেতকা, রান্ধুণীবাড়ী, কান্দাপাড়া, দ্বিপাড়া ইত্যাদি গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তালতলার খালে যাইয়া মিশিয়াছে। ইহার পারে অনেক গুলি দেউল অবস্থিত।

৮ নং। বালিয়াভাঙ্গা। বড় খালের পূর্ব্ব পার হইতে আরব্ধ হইয়া নাটেশ্বর দেউলের দক্ষিণ প্রান্ত ঘেসিয়া আটপাড়ার দেউলের পাদমূল ধৌত করিয়া মেদিনী-মণ্ডলের প্রকাণ্ড দীঘির সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। বালিয়াভাঙ্গার বিশেষত্ব এই যে ইহার তলদেশ বালুকাময়। এই সঙ্কীর্ণ জলপ্রণালীটিতে এত বালুকা কোথা হইতে আসিল তাহা এক আশ্চর্য্যের বিষয়। এই খালটির পারে প্রায় চারিশত গজের মধ্যে দুইটি দেউল অবস্থিত; যথা, নাটেশ্বরের দেউল এবং আটপাড়ার দেউল। পুরাকালে খুব প্রকাণ্ড দেবালয়াদির নির্ম্মাণ করিতে ভিতরের প্রকোষ্ঠ বালুকাতে পূর্ণ করিয়া পরে সেই বালুকার উপর বিষম ভারী ছাদ স্থাপিত হইত। ছাদের, গাথুনী শুষ্ক হইয়া শক্ত হইয়া গেলে পরে বালুকা সরাইয়া ফেলা হইত। বোধ হয় নাটেশ্বর দেউলের মন্দির এবং আটপাড়া দেউলের মন্দির গড়িতে যে বালুকা ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহার কতক অংশ এখনও বালিয়াভাঙ্গার গর্ভে পড়িয়া রহিয়াছে।

৯ নং। সোণারঙের খাল। এই খালটি নূতন কাটা বলিয়া বোধ হয়।

১০ নং। আমতলির খাল। টঙ্গিবাড়ীর হাটের ঠিক দক্ষিণ হইতে আরব্ধ হইয়া এক শাখা যাইয়া নয়নন্দের খালের সহিত মিশিয়াছে আর এক শাখা আমতলি গ্রাম ভেদ করিয়া পুরাপাড়া গ্রামের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এক

অতি বৃদ্ধ মুসলমানের নিকট অবগত হইয়াছিলাম যে টঙ্গিবাড়ীর দীঘির মধ্যে নাকি লক্ষ্মণসেনের জলটঙ্গ অবস্থিত ছিল। সাধারণতঃ লোকে বল্লালসেনের নামই জানে এবং বলে, কিন্তু এই বৃদ্ধ মুসলমানের মুখে লক্ষ্মণসেনের নাম শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। লক্ষ্মণসেন পরম নারসিংহ বলিয়া তাঁহার একখানা তাম্রশাসনে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। টঙ্গীবাড়ীর দীঘি হইতে 'একখানা সুন্দর নরসিংহ মূর্ত্তি প্রায় ৭০ বৎসর হয় উঠিয়াছে তাহা এখন হাটের উপর এক বটগাছ তলায় পূজা পাইতেছে। টঙ্গিবাড়ীর দীঘি হইতে নরসিংহমূর্ত্তির আবিষ্কার দেখিয়া লক্ষ্মণসেনের এক গ্রীষ্মাবাস সত্যই এখানে ছিল বলিয়া বোধ হয়। টঙ্গিবাড়ীর পশ্চিম দিকে স্থিত আমতলি, পুরাপাড়া, নেত্রবতী, দ্বারাবতী ইত্যাদি গ্রামগুলি লইয়া এখানে একটী উপরাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল বোধ হইতেছে। রামপালের চারিদিকে গড়খাই ঘেরা অসংখ্য উচু ভিটি দেখা যায়, এই গ্রামগুলিতেও বিশেষতঃ আমতলি ও পুরাপাড়ায় সে রকম প্রাচীন সুরক্ষিত বাস্তুভিটার অভাব নাই। পুরাপাড়া, আমতলি, নেত্রবতী, দ্বারাবতী এই সকল গ্রামগুলি-তেই প্রাচীন দেউলের চিহ্ন দেখা যায়। হিন্দুরাজাদের আমলে এই দেউল ও ভিটিগুলিকে আমতলির খালই বড়খালের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিল।

১১ নং। নয়নন্দের খাল। মিরকাদিমের খাল যেখানে মাকুহাটির খালে মিশিয়াছে সেই সঙ্গমস্থলটিকে মোকাম খোলা বলে। নয়নন্দের খাল এই মোকাম খোলা হইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চিমদিকে নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। এক শাখা নয়নন্দ গ্রাম ভেদ করিয়া নয়নন্দ, আরিয়ল, দ্বারাবতী ইত্যাদি গ্রামের মধ্যস্থিত বিলের মধ্যে যাইয়া পড়িয়াছে। আর এক শাখা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মটুকপুরের প্রাচীন দরজা অভিমুখে গিয়াছে। ইহা হইতে আবার একটী শাখা বাহির হইয়া পুরাপাড়া গ্রামের দিকে চলিয়া গিয়াছে। নয়নন্দ গ্রামে একটী বৃহৎ পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ মঘা দীঘি আছে। সেই দীঘির 'খাল' এই প্রশাখাটির সহিত সংযুক্ত। বারান্তরে অন্যান্য জলপ্রণালী-গুলির কথা বলিব।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

সার্থক

বিজন গৃহমাঝে সাঁঝের বাতি রেখা
নিভিয়া আঁকি' দিল নিবিড় মসীলেখা।
প্রণাম আজি মোর
উছল আঁখি লোর
ভাসিয়ে নিয়ে গেল কোথায় জানে কে ?
চরণ পরশিল প্রবোধ মনেকে।

অতীত পথ প'রে সুখের স্মৃতি খানি
ঝরিয়া পড়িয়াছে কখন্ নাহি জানি।
হৃদয়ে চিন্তা শত
জ্বলিছে অবিরত,—
সমুখে চেয়ে আছি সাহস নাহি চিতে
মরুভূ বুকে মোর তাহারে টেনে নিতে।

শ্মশান চিতানল নিভিয়া গেছে কবে।—
হৃদয়ে তুষানল নিভে না কেন তবে ?
জ্বালাবে তুমি তারে
তোমার পুরদ্বারে ?
তোমার পদতলে আমার ধূপ হিয়া
সার্থক হবে কিগো আপনা বিকীরিয়া ?

শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী।

ইছাপুরা গ্রামের পঞ্চরত্ন মঠ

ইছাপুরা বা ঈশাপুরা বিক্রমপুরের একটী প্রাচীন পল্লী। গ্রামের নাম পূর্ব্বে ঈশাপুরা ছিল বলিয়া মনে হয়, নবাবী আমলে এ গ্রামটি যে মুসলমানপ্রধান পল্লী ছিল তাহা উহার নাম হইতেই সূচিত হইতেছে। অদ্যাপি চলবলখাঁর বাড়ীর চিহ্ন দেদীপ্যমান। এই চলবলখাঁ কে ছিলেন সে প্রাচীন ইতিহাস অজ্ঞাত, জনপ্রবাদ ব্যতীত প্রকৃতরূপে অন্য কিছুই জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে এ গ্রামের পূর্ব্ব নাম ঈশাপুরা পরিবর্ত্তিত হইয়া ইছাপুরা হইয়াছে। অধুনা এক্ষণে বহু হিন্দুর বসতি, অধিকাংশই কুলীন ব্রাহ্মণ। বিক্রমপুরের মধ্যে ইহা একটী সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপ্রধান পল্লী।

এ গ্রামে একটী পঞ্চরত্ন মঠ আছে। মঠটী একশত ছাপান্ন বৎসরের প্রাচীন। বঙ্গাব্দ ১১৬৫ সনে প্রতিষ্ঠাপিত। এই মঠটি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় গঙ্গাধর তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বংশ প্রায় দুইশত বৎসর যাবৎ ইছা-পুরা গ্রামে বাস করিতেছেন। গঙ্গাধর তর্কালঙ্কারের পিতা স্বর্গীয় মণিরাম বন্দ্যো-পাধ্যায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইছাপুরা আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ইঁহাদের আদি নিবাস কাউলীপাড়ায় ছিল। এ বংশের পূর্ব্ব-পুরুষগণ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করায় ভট্টাচার্য্য এই আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় তৎকালে ন্যায় শাস্ত্রে বিক্রমপুরের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। মহারাজা রাজবল্লভের তখন অখণ্ড প্রতাপ, সর্ব্বোপরি তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। দেশের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, বহু পণ্ডিতই তাঁহার অর্থ সাহায্যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন এবং ধনে জনে সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাজা রাজবল্লভ পণ্ডিত মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞানে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহার বাস্তু বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য বহু জমি এবং প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বিঘা নাল জমি ব্রহ্মোত্তর নিষ্কর দান করেন। পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী-গণকেও একটী চতুষ্পাঠি বাটী নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত দশ খানা বাড়ী ও পাঁচ-

খানা নাল জমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দান করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি মহারাজ রাজবল্লভের এইরূপ শ্রদ্ধার ভাব ছিল যে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তৎকালীন মাসিক ৩০০৲ তিনশত টাকা আয়ের সম্পত্তি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দিতে চাহিয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় মহারাজের এই দানের কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যদি আমি এইরূপ দান গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য ধন সম্পত্তি রাখিয়া যাই তাহা হইলে তাহারা ঐশর্য্য গর্ব্বে স্ফীত হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় মনোযোগী হইবে না।' অপর একজন প্রখ্যাতনামা ধনীও পণ্ডিতমহাশয়ের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বাটীতে একখানা দালান নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, তদুত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত ব্যক্তির রাজসিক ঐশ্বর্য্যের কোনও প্রয়োজন নাই, পর্ণকুটীরই উপযুক্ত স্থান। আপনি দালান নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন বটে কিন্তু আমার মৃত্যুর পর যখন বংশধরগণের মধ্যে উহা লইয়া বিষম কলহ বাঁধিবে তখন সে গোলযোগ কে নিষ্পত্তি করিবে। ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন বড় ভয়ঙ্কর; আপনার এ মহত্ত্বের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্রাহ্মণপণ্ডিতরূপে থাকাই ভাল।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় এক দিকে যেমন মহাসাধু পণ্ডিত ছিলেন, তদ্রূপ চরিত্রগুণেও অতিশয় আদর্শ পুরুষ ছিলেন। একবার তাঁহার বাড়ী ডাকাইতে আক্রমণ করে, সে সময়ে তিনি পঞ্চরত্ন মঠটি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। ডাকাতদল কোনরূপেই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, যে দিকে যায় সেই দিকেই কণ্টকময় বদ্ধ পথ। পরদিন রাত্রি প্রভাত হইলে ডাকাতগণ ডাকিয়া বলিয়া গেল, "তোদের দেবতাসাধন আছে, তাই আজ রক্ষা পাইলি, চাল, ডাল দান করিস। ঐ সময় হইতেই তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বোপার্জ্জিত "নাগর ডাল", "বাইর গাঁও" প্রভৃতি মহাল বার্ষিক অতিথিসেবা ও দেবদেবীর পূজার জন্য নির্দ্দেশ করিয়া যান।

গঙ্গাধরের পুত্র গৌরীকান্ত তর্কবাগীশ ন্যায়শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত ও তৎপুত্র কমলাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত ও রুক্মিণীকান্ত তর্কচূড়ামণি ও কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন ন্যায়শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত ছিলেন। কাশীকান্তের পুত্র হরিপ্রসাদ ন্যায়রত্ন ও কাশীকান্তের অপর ভ্রাতা গোপীকান্তের পুত্র রজনীকুমার তর্করত্ন ন্যায়শাস্ত্রে

একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। উক্ত রজনীকুমার তর্করত্ন মহাশয়ের ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মাদারীপুরের উকীল ছিলেন। তৎপুত্র রায় কুমুদিনী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বাহাদুর রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ। আর হরিপ্রসাদ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দুই পুত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠ পুত্র সূর্য্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার।

৺ গঙ্গাধরের ভ্রাতা রামশঙ্করের এক পুত্র রামদাস বিদ্যালঙ্কার ও অপর পুত্র প্রাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র রঘুপতি শিরোমণি ; জগন্নাথ তর্কভূষণ। ইঁহাদের বংশাবলী এইরূপ।
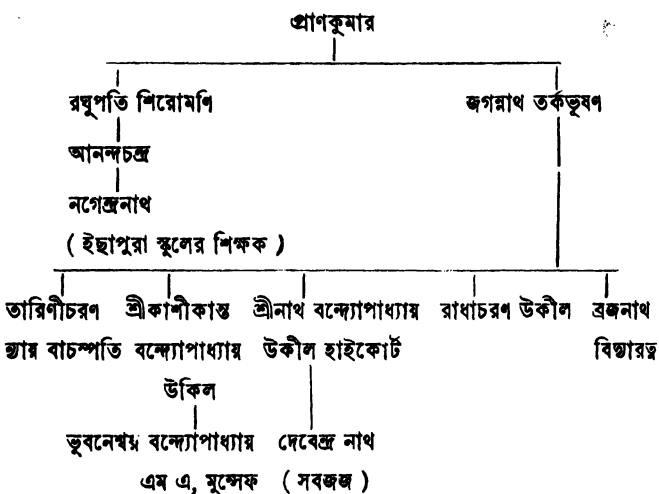
এখন মঠটির কথা বলা যাউক। এই মঠটির চারিদিকে চারিটি চূড়া ও মধ্য খানে একটি উচ্চ চূড়া বর্ত্তমান আছে বলিয়াই ইহা পঞ্চরত্ন মঠ নামে অভিহিত। ইহা আসল স্থাপত্যানুকরণে গঠিত। মন্দিরগাত্রে একটী খোদিত লিপি আছে, তাহাতে মন্দির প্রতিষ্ঠার সন ও তারিখ উল্লিখিত আছে।

সংস্কৃত-শাস্ত্রে বাঙ্গালী

জীমূতবাহন

ইনি রাঢ়ী শ্রেণীয় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ। ভট্ট নারায়ণের মেল সন্তানের মধ্যে "বটু" অন্যতম। বটু পারিহাল গ্রামবাসী ছিলেন। পারিহাল গ্রামের সংক্ষেপ নাম পারি বা পালি। ঐ পারিগ্রাম রাঢ়দেশে অজয় নদীর সমীপবর্ত্তী। বটু বেদ-প্রচারর্থে বেদবেদাঙ্গের বিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন এবং রাজসরকার হইতে বৃত্তিস্বরূপ পারিহাল গ্রাম প্রাপ্ত হন। পারিহাল গ্রাম-বাসী বলিয়া বটুর সন্তানগণ পারিহাল শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত। বটুর বহু পুরুষ পরে যখন রাঢ়ীশ্রেণী ব্রহ্মাণদিগের কৌলিন্য প্রথা প্রচারিত হয় তৎ-সময়েও পারিহালগ্রামী ব্রাহ্মণগণ প্রধান কুলীন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। পরে সামাজিক প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া তদ্বংশীয়গণ শ্রোত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হন এবং তৎপরে উহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সমাজকে একেবারে অগ্রাহ্য করায় এবং শাস্ত্রাদি অধ্যাপনায় অমনোযোগী হওয়ায় পারিহাল বংশীয় শ্রোত্রিয়গণ "কষ্ট শ্রোত্রিয়" বলিয়া আখ্যাত ও গণ্য হইলেও একদিন পারিহাল গাঞি শ্রোত্রিয়গণ বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ছিলেন।

পূর্ব্ব কথিত পারিহাল গ্রামী বটুর এক পুত্রের নাম মণি ভদ্র, মণি ভদ্রের পুত্রের নাম ধনঞ্জয়, ইনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন, তৎপুত্র শুদ্ধবুদ্ধি। শুদ্ধ-বুদ্ধির পুত্র কবি শিরোমণি বিধু, ইহার পুত্র হলধর রাঢ়দেশ হইতে বঙ্গে আগমন করেন। পারিহাল বংশে হলধর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পূজিত হন। হল-ধরের পুত্রের নাম চতুর্ভুজ এবং চতুর্ভুজের পুত্র জীমূত বাহন ও বিল্লমঙ্গল। বর্ত্তমান প্রস্তাবে জীমূত বাহনই আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ। জীমূত বাহনের বংশ সম্বন্ধে বেদগর্ভ বংশসম্ভূত এড়ুমিশ্র ঘটককৃত মহাবংশাবলী নামা গ্রন্থে পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ বংশলতা বর্ণনা আছে। পাঠকমহাশয়গণ অবগত আছেন, আদিশূরকর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে ভট্ট নারায়ণ ও বেদগর্ভ দুই জন প্রধান ব্যক্তি, সুতরাং উভয়ে সমসাময়িক। ভট্ট নারায়ণ হইতে ৯ম পুরুষে

জীমূত বাহন এবং বেদগর্ভ হইতে দশম কি একাদশ পুরুষে এড়ুমিশ্র। সুতরাং এড়ুমিশ্র জীমূত বাহনের অব্যবহিত পরেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং এড়ুমিশ্র, জীমূত বাহনের যে বংশ লিখিয়াছেন তাহাতে ভ্রম প্রমাদ সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর নহে। মহাবংশাবলীতে লিখিত আছে।

"তস্যান্বয়ে বিধুর্জ্জাতে কবিনাঞ্চ শিরোমণিঃ।
তস্য পুত্রো হলোনাম বঙ্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
পারিকুলে মুনি-শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বত্র বুধপূজিতঃ।
তস্য পুত্রঃ সুধীঃ শ্রীমান্ চতুর্ভুজঃ সদাশুচিঃ।
বিল্বমঙ্গল-জীমূতৌ চতুর্ভুজ সুতা বুভৌ।
গৌরভূমৌ তদা খ্যাতো জীমূত শ্চতুরঃ শ্রধীঃ।
পঞ্চগৌড়ে তদা সম্রাট্ বিশ্বক্‌সেনো মহাব্রতঃ।
জীমূতোহপি নৃপাসাত্যঃ স প্রাড়বিরাট ঈরিতঃ। ইত্যাদি।

পাঠক দেখিতেছেন জীমূত বাহন বল্লাল সেনের পিতা বিশ্বক সেনের রাজ-সভাসদ্ ছিলেন। তিনি বিশ্বক্ সেনের প্রধানতম বিচারালয়ের প্রধানতম বিচারপতি ছিলেন। জীমূত বাহনের নিজ গ্রন্থ আলোচনা কলিলে দেখা যায় ১০১৪ শকে অর্থাৎ খৃঃ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি গ্রন্থাদিরচনা করেন। সম্ভবতঃ তিনি বিশ্বক্ সেন ও বল্লাল সেন উভয়ের রাজত্ব সময়েই সভাসদ্ ছিলেন সুতরাং জীমূত বাহন খৃঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্ম ধারণ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। জীমূতের পিতামহ হলধর বঙ্গরাজ্যে অর্থাৎ বিক্রমপুরে প্রথম আগমন করেন। জীমূত বাহনের পিতামহের ও পিতার ও জীমূত বাহনের বাসস্থান রামপাল বা তৎসন্নিহিত পঞ্চসার কি বজ্রযোগিনী গ্রামে বর্ত্তমান থাকাই সম্ভব, কারণ হলধর বঙ্গরাজ্যে আসিয়া রাজধানী রামপাল বা তৎসন্নিহিত রাজধানীর উপকণ্ঠেই বাস করা সম্ভব। পঞ্চসার গ্রামে বাস্তব পক্ষে রামপালেরই একটী অংশ। বজ্রযোগিনী রাজধানীর উপকণ্ঠ। পঞ্চ-সার ও বজ্রযোগিনী রাঢ়ীশ্রেণীয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থান সুতরাং জীমূত বাহন রামপাল বা পঞ্চসার অথবা বজ্রযোগিনী বাসী থাকাই সম্ভবপর।

জীমূত বাহন বহুবিদ্যাবিশারদ হইলেও জ্যোতিষ্, স্মৃতি ও ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে তৎকৃত গ্রন্থাদি দৃষ্ট হয়। তিনি একটী বৃহৎ রাজ্যের প্রধানতম

আদালতের প্রধান বিচারপতি সুতরাং আইন সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা। বাস্তবপক্ষে তিনি একজন বিশেষ আইনজ্ঞ ছিলেন। তৎকৃত দায়ভাগ গ্রন্থই তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দায়ভাগ লিখিত হইবার পূর্ব্বে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্যের স্মৃতি ও ব্যবহারশাস্ত্রের নিবন্ধ গ্রন্থানুসারে বাঙ্গালাদেশের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। মিতাক্ষরাই দায়াধিকার সম্বন্ধে প্রধান অবলম্বনীয় গ্রন্থ ছিল। জীমূত বাহন মিতাক্ষরাদি গ্রন্থের মত খণ্ডন পূর্ব্বক প্রাচীন মন্বত্রি প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র প্রণেতা ঋষিদের সংহিতা ও স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করতঃ স্বীয় অকাট্য যুক্তিদ্বারা স্বমত স্থাপন পূর্ব্বক প্রসিদ্ধ দায়ভাগ গ্রন্থ লিখেন। সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে দায়ভাগ লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে, এই সহস্র বর্ষ মধ্যে বাঙ্গালায় হিন্দুর সিংহাসন ধূলিসাৎ হইয়াছে, মুসলমান রাজ্য যেন স্বপ্নের রাজত্বের ন্যায় কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইংরেজরাজ্য দেড় শত বর্ষ যাবৎ বাঙ্গালায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু জীমূত বাহনের দায়ভাগ অনুসারে আজিও বাঙ্গালার সমস্ত হিন্দুর ধনাধিকারীত্বের, ধনবিভাগের এবং উত্তরাধিকারীত্ব স্বত্বের বিচার হইতেছে এবং প্রধান প্রধান প্রাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দায়ভাগের বৈজ্ঞানিকত্ব দর্শন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

জীমূত বাহন স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখেন ঐ গ্রন্থের নাম ধর্ম্মরত্ন। ইহা স্মৃতিশাস্ত্রের একখানা নিবন্ধ গ্রন্থ। স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থগুলিতে হিন্দুসমাজ কিরূপে চালিত হইবে হিন্দুর প্রত্যেক দিনের ধর্ম্ম নিধি কর্ম্ম বিধি কিরূপ হইবে, হিন্দুর খাদ্যাখাদ্য হিন্দুর জীবনের আদর্শ যেমন এক দিকে লিখিত হইত অন্য দিকে ধর্ম্মাধিকরণের বিধিসমূহ লিপিবদ্ধ হইত এবং তাহাই রাজবিধি বলিয়া গণ্য হইত। জীমূতবাহনের "ধর্ম্মরত্ন" সেই সময়ের প্রধান সমাজ বিধি ও রাজবিধি বলিয়া গণ্য হয়। ধর্ম্মরত্নের এক প্রধান অংশই প্রসিদ্ধ "দায় ভাগ।" জীমূত বাহন কালবিবেক নামক একখানা জ্যোতিষ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ঐ সমুদয় গ্রন্থ আলোচনা করিলে জীমূত বাহন যে নানা শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়।

অধ্যাপক মেকডনেলের মতে জীমূত বাহনের ধর্ম্মরত্ন, দায়ভাগ খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হয় কিন্তু ঐ মত সমীচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশ্বক্ সেনের অপর নাম বিজয় সেন। জীমূত বাহন যে বিশ্বক্ সেনের সভাসদ

ছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। বিজয় সেন যে খৃঃ একাদশ শতাব্দীর কি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে বহুল প্রমাণ আছে সুতরাং জীমূত বাহন খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর ব্যক্তি হইতে পারেন না। মাননীয় অধ্যাপক মেকডনেলের ঐরূপ উক্তি আনুমানিক ও ভ্রম বলিয়া স্পষ্ট দেখা যায়।

শ্রীকামিনী কুমার ঘটক।

সুসঙ্গ পাহাড়

দূর হ'তে দেখা যায় সুসঙ্গ পাহাড়,
তরঙ্গে তরঙ্গ তুলি
উঠিয়াছে চূড়াগুলি,
খুলিয়াছে কিবা নীল রঙ্গের বাহার।

আমার নয়ন পথে সুসঙ্গ পাহাড়,
পূরবে পশ্চিমে তায়
সীমা নাহি দেখা যায়,
দাঁড়ায়ে আগুলি দুই দিক বসুধার,

বিস্তীর্ণ বিশাল রাজ্য করি অধিকার
বাহুযুগ প্রসারিয়া
আছে ওই দাঁড়াইয়া
মহাদম্ভে উচ্চে শির তুলি আপনার।

পদতল মিশিয়াছে ধরণীর গায়;
সেথা যেন মনে হয়
মাটিতে পেয়েছে লয়,—
ধরা চুমি ঘুম যায় গাছের ছায়ায়।

কোথা বা খসিয়া গেছে অঙ্গের বসন,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা, ফাটা ফাটা,
যেন কোদালের কাটা,
(সেথা) উছলে সোণার রঙ্গে রবির কিরণ।

অভ্রভেদি চূড় অই সুসঙ্গ পাহাড়
অনন্ত গগন গায়
মিশায়ে আপন কায়
লভিছে বিশ্রাম সুখে বর অঙ্কে তার।

লাবণ্য উছলি পড়ে ঘন নীলিমায়,
মুগ্ধ করে মোর মন
কেড়ে লয় দুনয়ন,
হৃদয় জুড়ায় তার রূপ সুষমায়।

এ যেন বিরাট এক সাজ দেবতার,
কত ভাবে আঁকা বাঁকা,
নিপুণ গণকে আঁকা,
অথবা আপন হাতে সে বিশ্বকর্ম্মার।

ব্যাপি ব্যোম হের তায় কিবা চমৎকার—
এলায়ে কুন্তল রাজি
বিশ্বের জননী আজি
দুই হাতে বিতরিছে আশীষ সম্ভার।

প্রসাদ লভিবে যদি এস একবার,
করি তাঁরে দরশন
তৃপ্ত কর দুনয়ন,
এ জীবন কর দান চরণে তাঁহার।

শ্রীনলিনী কান্ত দাশগুপ্ত।

"সুখবিন্দু"-স্মৃতি

১৩১৬ সনের ২৮ আশ্বিন বৃহস্পতিবার এই পরিবারের পক্ষে ভোলা যেরূপ অসম্ভব, আমার পক্ষেও তেমনি। অনেকেরই বন্ধু থাকে, আমার এখনও অনেক আছে; কিন্তু জীবনের সকল স্মৃতি জড়িয়া কেহই এমন ভাবে আসিয়া আমার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। কাহাকেও আমি এমন আপনার করিয়া লইতে পারি নাই। সুখতে আমি যে কি হারাইয়াছি তাহা অন্যের বুঝা অসম্ভব। যে তাহা বোঝে না তাহার নিকট দুঃখ প্রকাশে সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। এজন্য কাহারও নিকট সুখর কথা উত্থাপন করিয়া শোক প্রকাশ আমি কখনও করিতে পারি নাই। যাহারা তাহাকে ঠিক বোঝে তাদের নিকট তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপনে বিরত থাকিলেও তাহার কথা কখনও ভুলে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

যখনই যে কোন শুভানুষ্ঠানে যোগদান করি, মনে হয় সুখ থাকিলে হয়ত ইহা অপেক্ষা অধিক উৎসাহ পাইতাম। যখনই কোন বন্ধুসঙ্গ হইতে ফিরিয়া তখনই আমার প্রতি তাদের প্রভাব ও আব্দার আর সুখর প্রভাব ও আব্দারের প্রভেদ চিন্তা করি; এ প্রভেদে শুধুই পীড়া দেয়—একটা নিরাশার দীর্ঘশ্বাস অজ্ঞাতে পড়িয়া যায়। একদিন অতি দুঃখে ডায়েরীর এক কোণায় লিখিয়াছিলাম জিনিষ না হারাইলে জিনিষের মূল্য কেহ বোঝে না, সুখ যে আমার কি ছিল আরও অসহ্য বেদনায় অন্তরে উহা অনুভব করিতেছি; একটি শুভাকাঙ্ক্ষী চরিত্রবান বন্ধুজীবনকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে কি ভাবে সাহায্য করে আজ তাহা বুঝিতেছি। আমার চরিত্রের উপর তাহার কতটা আধিপত্য ছিল আমার চরিত্রের প্রতি কণায় কি করিয়া যেন শক্তি আনিয়া দিত আজ তাহার অভাবে সম্যক উপলব্ধি করিতেছি। আজ এই বিবদমান চিন্তার মধ্য দিয়া তাহাকেই শুধু মনে হইতেছে—আজ বুঝিতেছি তাহাকে বুঝি ততটা ভালবাসিতে পারি নাই যতটা শ্রদ্ধা করিতাম। যে একবার সুখর হৃদয়ের আস্বাদ পাইয়াছে সে অন্যের ভালবাসায় কি করিয়া তৃপ্ত হইবে? কিন্তু আমি হতভাগ্য সেরূপ একটি অমূল্য জীবনের অকুণ্ঠিত ভালবাসায় চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইলাম।

সুখর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল। আর যাকে সে ভালবাসিত একেবারে আত্মহারা হইয়া ভালবাসিত। আমাদের মধ্যে যখন সুখর বিষয়ের উত্থাপন হইত—তাহার বিশেষত্ব যে ঐ খানেই ছিল ইহা সকলেই স্বীকার করিত। আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে সুখর মত কোমলহৃদয় ও ভাবপ্রবণ আর কেহই ছিল না। হয়ত এই ভাব-প্রবণতাই ইহার অসাময়িক মৃত্যুর একমাত্র কারণ। আমাদের পরিচিত এমন কেহই ছিল না যে সুখর মত ভাই ভগ্নী আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুদের ভালবাসিত। ১৩১৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে উহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর মৃত্যু হয়। অনেকেরই বোন্ মারা যায়। কিন্তু কয়েক দিনেই সেই দুঃসহ শোকভার কার্য্যবন্ধন সংসারের আহ্বানে দূরে সরাইয়া রাখিতে হয়। কিন্তু সুখর বিষয়ে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছিল। যাহারা সুখর কোমলতার বিষয় জ্ঞাত আছেন তাহারা সহজেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। রজীর মৃত্যুর পর সে আমাকে যে কয়েকখানা চিঠি লিখে তাহার মধ্যে অন্য কোন সংবাদই প্রায় থাকিত না। রজীর জন্য তার প্রাণটা কেমন করে। আর কারো কথা ভাল লাগে না; রজীর কথায় সারাদিন কাটাইতে ইচ্ছা হয়। সকল কাজের মধ্যে রজীর ভাবনা উকি মারে। বিষণ্ণ দেখিলে মেছের ছেলেরা ও আত্মীয় কেহ কেহ সে বিষয় না ভাবিতে উপদেশ দিতেন, কেহ কেহ নাকি দু একটু বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন নাই। তদবস্থায় সুখ রাত্রিতে কাঁদিত। তাহার শেষ পত্রে সে লিখিয়াছিল, "রাত্রিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার বালিশ ভিজিয়া যায়। কিন্তু আমার কষ্ট কে বুঝিবে। আমি অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। কোন কাজেই আর উৎসাহ পাই না। শরীর মন উভয়ই অবসন্ন। এরূপ হইলে আমারও অধিক দিন বাঁচিবার আশা নাই।

কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াই আমার কলেরার কথা শুনে। শুনিবা-মাত্রই আমাকে দেখিতে ঢাকা যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। পূর্ব্ব রাত্রি জাগিয়া আসিয়াছে, শরীর দুর্ব্বল আর আমিও কতকটা ভাল হইয়াছি—এ অবস্থায় তখনই যাইতে মা নিষেধ করেন। কিন্তু তাহার উত্তরের পর কেহই তাহাকে নিষেধ করিতে পারিল না। "রবির অসুখ তুমি কেমন ক'রে আমাকে যাইতে নিষেধ কর? আপন ভাই কাহারো যদি এ অসুখ হইত তুমি কি নিষেধ করিতে পারিতে, তুমি নিষেধ করিও না।" কিন্তু ইহাই তাহার কাল হইল। আমাকে

বাঁচাইবার অভিলাষ করিয়া নিজেই সে মৃত্যুকে বরণ করিয়া নিয়া আসিল। সেই কলেরা রোগে তৎপর দিবস নিজেই আত্মবিসর্জ্জন করিল।

যার প্রাণদেয়া স্বভাব বুঝিতেই হইবে সে কেবল এক যায়গায় প্রাণপণ করে না, তাহার সকল অনুষ্ঠানে সকল প্রয়াসে প্রাণটীকেই সে সবার আগে দিয়ে বসে। সুখবিন্দুর সম্বন্ধেও ইহার অন্যথা কোন কালেও হয় নাই।

নিজের আত্মীয়দিগকে যেমন প্রাণ দিয়া ভালবাসিত, তাহার দুঃস্থ দেশবাসীর জন্যও তেমনই হৃদয় করুণাপূর্ণ ছিল। তাহার দেশচর্য্যা ও কোন শুভানুষ্ঠান অকৃত্রিম ও অন্তরতম ছিল। তাহার অধিকাংশ চিঠিই দেশের কল্যাণকর প্রস্তাবে পূর্ণ থাকিত। জীবনের পরিণতাবস্থায় দেশহিতকর অনুষ্ঠানগুলিকে পূর্ণাবয়ব করিতে কি ভাবে চেষ্টা করিবে তাহার কল্পনায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়া যাইত।

সেবারকার দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবনে দেশের গরিবদের কষ্টে সে যে খুব কষ্ট অনুভব করিত তাহার কয়েকখানা চিঠিতে তাহা বেশ বুঝা গিয়াছিল।

এখানে বালকদের চরিত্রোৎকর্ষ সাধন জন্য সুখর বেশ একটু চেষ্টা দেখা গিয়াছিল। তাহারই উদ্যোগে প্রথমে এখানে Literary association গঠিত হয়। তাহার স্থান পরে Sunday moral class অধিকার করে। উহা কয়েক বৎসর থাকে ও পরিচালকের অভাবে উহা school এর Debating club এ যাইয়া মিশে।

এখন কোনও শুভানুষ্ঠানে সকলেই আমরা সুখর অভাব বোধ করি। উহার মত উৎসাহী আমাদের মধ্যে আর একটীকে এখনও পাই নাই।

শ্রদ্ধা ও শুভকামনাই বন্ধুত্বের ভিত্তি। উহার শ্রদ্ধেয় চরিত্র, গভীর ভালবাসা, অসীম শুভকামনা আমাকে অনেক দুর্ব্বলতায় শক্তি দিয়াছে। হৃদয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে সুখ অনেক চেষ্টা পাইয়াছে। এজন্য সুখর স্মৃতি আমার নিকট সর্ব্বদাই মধুর মত হইয়া থাকিবে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ গুহ বি, এ।

বল্লালসেনের রাজধানী

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের আবিষ্কৃত।

"বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন" তাহাকে "মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি" বলিয়া অবনত কন্ধরে গ্রহণ করিবার সময় তিরোহিত হইয়াছে। এখন ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণগুলিকে বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাহা সাধারণের গোচরীভূত করিলে বিপদের আশঙ্কা আছে।

সম্প্রতি, গত ২১শে ফাল্গুন তারিখের হিতবাদী পত্রিকায় "বল্লাল সেনের রাজধানী" শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে "রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে কাটোয়ায় গিয়াছিলেন। তথায় তিনি গদাধর ও গৌরাঙ্গদেবের স্মৃতিচিহ্ন ও কীর্ত্তিসমূহের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বেগে দেবগ্রামে গমন করেন। বেগের নিকট সাঁওতা নামক স্থানে মহারাজ বল্লাল সেনের গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। তিনি দেবগ্রামে বল্লালসেনপ্রতিষ্ঠিত কুলইচণ্ডী মূর্ত্তি এবং বল্লালের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী সীতাহাটী গ্রামে বল্লালসেনের তাম্রশাসন সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে বল্লাল রাজধানীর দূরত্ব ৭ মাইল। দেবগ্রামের পার্শ্বস্থ সাঁওতা গ্রামেই যে বল্লাল সেনের রাজধানী ছিল, তৎসম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবু প্রচুর তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। অদ্যাবধি লোকে ঢাকা বিক্রমপুরে বল্লালের রাজধানী ছিল বলিয়া জানিত, রাঢ়ে কাটোয়ার একটা নগণ্য পল্লীতে যে বিক্রমপুরের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে, এ কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। নগেন্দ্র বাবুর অনুসন্ধানে রাঢ়ে বিক্রমপুরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে নূতন আলোক প্রতিফলিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে রাঢ় অনুসন্ধান সমিতি এবং নগেন্দ্র বাবু ধন্য এবং স্বদেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। অদ্য বাঙ্গলায় যে অমৃতবাজার, বেহার হেরল্ড, প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদপত্রেও এই আবিষ্কারের কাহিনী ধ্বনিত হইয়াছে।

বৎসরাধিককাল গত হইল এক বার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে আমার নিকট বলিয়াছিলেন যে, চন্দ্র বর্ম্ম ও সেন রাজগণের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণা নহে, এই বিক্রমপুর নদীয়া জেলায় অবস্থিত এবং উহা একটি গ্রাম মাত্র। এই শেষোক্ত বিক্রমপুরে সেন রাজগণের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তিনি শীঘ্রই উহা পরিদর্শন করিবার জন্য তথায় যাইবেন। তৎকালে আমি তাঁহাকে বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়ে তাম্রশাসনোক্ত "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতিবঙ্গে বিক্রম-ভাগে" এবং কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনোল্লিখিত "পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি-বঙ্গে বিক্রমপুর-ভাগ-প্রদেশে" প্রভৃতি স্থান প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলাম যে, তাম্র-শাসনে লিখিত "বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার" "বিক্রমপুর প্রদেশেরই" কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল, এই অর্থ গ্রহণ না করিলে "বিক্রমপুরভাগে" বা "বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশের" উল্লেখ নিরর্থক হয় এবং উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই সময় তিনি ইহার কোনও সদুত্তর প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি দেবগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিলে পরে পুনরায় এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং ইহা যে তাঁহার সিদ্ধান্তের একটি অন্তরায় তাহা স্বীকার করেন। সেন রাজগণের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃ-পাতী, পক্ষান্তরে নগেন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত বল্লাল সেনের রাজধানী বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত প্রবল এবং বংশপরম্পরাগত প্রাচীন কিংবদন্তীর বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিতে হইলে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করাই সঙ্গত এবং প্রমাণ ও তথ্য-গুলি বিশেষ বিবেচনা করিয়াই গ্রহণ করা সমীচীন। সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি এখনও সাধারণের নিকট অজ্ঞাত রহিয়াছে, সুতরাং তাহার বিচার করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

সংবাদপত্রের স্তম্ভে নগেন্দ্র বাবুর প্রচুর তথ্য ও প্রমাণসংগ্রহের বিবরণ পাঠ করিয়া নদীয়ার বিক্রমপুর এবং বল্লাল সেনের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ সন্দর্শন করিবার স্পৃহা বলবতী হওয়ায় আমি দেবগ্রাম গমন করিয়াছিলাম। সুতরাং দেবগ্রাম এবং তৎসন্নিহিত দমদমা, সাঁওতা, বেগে, বিক্রমপুর পাথর জোনায়গড়, দেবগ্রামের কুলাইচণ্ডী ও দেবকুণ্ড প্রভৃতি যাবতীয় প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। আমার

অনুসন্ধানের ফল সাধারণের গোচরীভূত করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

সাঁওতা, বিক্রমপুর ও দেবগ্রাম কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত এবং রাঢ় প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ঐই সমুদয় স্থান নদীয়া জেলায় অবস্থিত এবং সদর মহকুমার অন্তর্গত এবং প্রাচীন বাগড়ী বিভাগে ভুক্ত। সাঁওতা ও বেগে সংলগ্ন গ্রাম নহে, উভয়ের ব্যবধান প্রায় ২॥০ মাইল। সাঁওতা দেবগ্রামেরই সামিল। সাঁওতাতে প্রাচীন রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ কিছুই নাই। সাঁওতার নিকটবর্ত্তী দমদমাতে দেবল রাজার বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে বলিয়া স্থানীয় প্রবাদ।

দেবগ্রাম এবং বিক্রমপুরে গমন করিয়া জানিতে পারিলাম যে নগেন বাবু দেবগ্রামে মাত্র ২।৩ ঘণ্টাকাল কুলইচণ্ডীর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী কোনও দোকানে বসিয়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, স্থানীয় প্রাচীন কোনও ভদ্রলোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই, অথবা তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করাও সঙ্গত জ্ঞান করেন নাই। বিক্রমপুরে তিনি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন কিন্তু স্থানীয় অনুসন্ধানের জন্য করি পৃষ্ঠ হইতে অবতরণও করেন নাই। ইহা সত্য হইলে রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটনের প্রত্যাশা করা যায় না।

বিক্রমপুর।

ঐই গ্রাম কলিকাতা মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে লাইনের সোনাডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে ১ মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে এবং দেবগ্রাম হইতে প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। রেণেলের মানচিত্রে এই স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। এই মানচিত্রে কৃষ্ণনগর হইতে একটি প্রাচীন রাস্তা বেলিয়া বিক্রমপুর পানঘাটা, পলাসী, দাউদপুর, বেলডাঙ্গা হইয়া কাশিমবাজার অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এই রাস্তার চিহ্ন এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বিক্রমপুরে এই রাস্তা "বেনে রাস্তা" বলিয়া পরিচিত। গঙ্গা এই স্থান হইতে ২ মাইল সরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে গ্রামের পার্শ্ব দিয়াই প্রবাহিত হইত।

বিক্রমপুরের হাট প্রসিদ্ধ। হাটের সন্নিকটে সকালীপাড়ার জমিদার বাবুদিগের একটি কাছারী বাড়ী আছে। এইস্থানে পূর্ব্বে একটি রেশমের কুঠী বিদ্যমান ছিল, এই কুঠীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বিক্রমপুর পল্লীর মধ্যে একটি এবং হাটে দুইটি দরগা রহিয়াছে। বিক্রমপুরে প্রাচীন কীর্ত্তির ইহাই নিদর্শন, এতদ্ব্যতীত পুরাকীর্ত্তির চিহ্ন স্বরূপ একখণ্ড ইষ্টক অথবা উচ্চটিপিও তথায় বিদ্যমান নাই। বল্লাল সেন সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি স্থানীয় বৃদ্ধদিগের অজ্ঞাত। এখানকার লোকেও ঢাকা বিক্রমপুরেই বল্লালের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া প্রাচীন সুপরিচিত কিংবদন্তীর উল্লেখ করিল। বিক্রমপুরের ডোম জাতীয় ডাকাত দেবী সর্দ্দার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বেও এতদঞ্চলের ভীতি উৎপাদন করিত। দেবী অর্থলোভে স্বীয় পুত্রকেও নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

এই স্থানে ১২ ঘর রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ (তন্মধ্যে ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেঘের গাঙ্গুলী বংশীয় নৈকষ্য কুলীন সন্তানও আছেন ইঁহারা ৩ পুরুষ যাবৎ বেঘে হইতে আসিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন) ২ ঘর চাষী কায়স্থ, কয়েক ঘর নাপিত, গোয়ালা এবং অনেক মোসলমানের বাস।

বিক্রমপুর নিবাসী ৫৩ বৎসর বয়স্ক (ইঁহা অপেক্ষা প্রাচীন ভদ্রলোক এই গ্রামে নাই) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ভদ্রলোক এবং স্থানীয় কতিপয় মোসলমান বৃদ্ধের নিকট হইতে উল্লিখিত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, এবং স্বয়ং গ্রামের যাবতীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

সাঁওতা।

দেবগ্রামেরই অংশবিশেষ। এইস্থান দমদমার সন্নিকটবর্ত্তী। সাঁওতার দীঘির পরিমাণ ফল স্থানীয় জমীদারের কাগজ পত্রে ২০ বিঘা বলিয়া লিখিত আছে। এখন এই দীঘি প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে। সাঁওতার দীঘি বল্লালের দীঘি বলিয়া পরিচিত নহে। কেহ কেহ ইহাকে দেঘল রাজার দীঘি বলিয়া পরিচিত করে। সাঁওতাতে কোনও বসতি নাই। একটি প্রান্তরের মধ্যে এই দীঘি বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানে আর কোনও প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন নাই।

বেঘে।

দেবগ্রাম হইতে এই স্থান প্রায় ২॥০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বেঘেগ্রাম চিনিমিনি বেঘে চকবেঘে, গড়ের বেঘে, আপন বেঘে, আড়ার বেঘে, খোঁদ্র (খর্দ্দ ?) বেঘে, পালিত বেগে, এই সাত ভাগে বিভক্ত। বেঘের কালী প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে গঙ্গার প্রবাহ এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া দেবগ্রামের উত্তরাংশ স্পর্শ করিয়া পানঘাটা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। অদ্যাপি ইহার চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী চৌমোহনী গ্রামের নামও ইহার অন্যতম প্রমাণ। গড়ের বেঘের একটি পুষ্করিণীর ধারে দুইটি উচ্চ ঢিপি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ দিকের ঢিপিটি "নমাজতলা" নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানের মৃত্তিকা গর্ভে ইষ্টকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই সমুদয় ইষ্টক প্রাচীন নহে। দেবগ্রাম হইতে বেঘে যাইবার রাস্তার পার্শ্বে একটি দীর্ঘিকার তীরদেশে নীল কুঠীর ধ্বংস চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

দমদমা।

দমদমা এৎবারপুর মহালের অন্তর্গত হইলেও দেবগ্রামেরই সামিল। এই-স্থানে একটি ঢিপি আছে, তাহাই দমদমা নামে পরিচিত। ঢিপিটির উচ্চতা প্রায় ৫ হাত। উপরের ব্যাস প্রায় ২০ হাত নীচের ব্যাস প্রায় ৫০ হাত। দমদমাতে দেবল রাজার বাড়ী ছিল বলিয়া স্থানীয় প্রবাদ। দেবগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় (বয়স ৭২ বৎসর), শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (বয়স ৭২ বৎসর), শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বয়স ৬৪ বৎসর, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৬০ বৎসর), প্রভৃতি দেবগ্রামের প্রাচীন অধিবাসি-বৃন্দ বলেন যে, এই দেবল রাজার নাম হইতেই দেবগ্রাম এবং দেবকুণ্ডের নাম-করণ হইয়াছে। প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে কাটোয়ার ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় দেবগ্রামের অন্যতম জমিদার ৺বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে দমদমার ঢিপি খনন করিয়াছেন। খননের চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। ফলে একখানি প্রস্তর নির্ম্মিত রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি, একখানি গোপালমূর্ত্তি; শুণ্ড সমেত একটি প্রস্তর নির্ম্মিত হস্তীর মুণ্ডদেশ, অনেকগুলি কড়ি এবং গোলাকার ডেপু (পয়সা) ক্ষোদিত লিপিযুক্ত প্রস্তর পাওয়া

যায়। ঐ প্রস্তর লিপিতে যে দেবল রাজার নাম ক্ষোদিত ছিল, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত মহোদয়গণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া অবগত হওয়া গেল। দমদমায় প্রাপ্ত প্রস্তরাদি রামদাস বাবু মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত তাঁহার রেশমের কুঠীতে লইয়া যান। এখন একখণ্ড প্রস্তর দমদমার টিপির উপর, একখানি দেবগ্রামে কুলইচণ্ডী মূর্ত্তির মন্দিরের দ্বারদেশে এবং অপর একখণ্ড শ্রীযুক্ত উমাপদ বাবুর বাড়ীতে পড়িয়া রহিয়াছে। উমাপদ বাবুর বাড়ীর প্রস্তর খণ্ড একটী স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ মাত্র।

১৩২০ সনের আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যার সাধক পত্রিকায় দেবগ্রাম নিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, দমদমাতে মহারাজ বল্লাল সেন মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। তিনি দেবল রাজার নামোল্লেখ করেন নাই। যতীন্দ্র বাবু কোথায় এই প্রবাদ সংগ্রহ করিলেন তাহা জানি না, অথচ আমার তথ্যানুসন্ধানকালে তিনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় বৃদ্ধগণ দেবল রাজার সম্বন্ধে যে প্রবাদের কথা আমার নিকট বলিয়াছিলেন তাহাও শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও তৎকালে বল্লাল সম্বন্ধীয় প্রবাদের কথা কিছুই বলেন নাই। যতীন্দ্র বাবুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই।

দেবগ্রাম।

দেবগ্রাম কলিকাতা-মুর্শিদাবাদ লাইনের একটী ষ্টেশন। স্থানটী প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এখানে প্রায় ৮০ ঘর রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণের বাস। কলিকাতার স্বনামপ্রসিদ্ধ ডাঃ M. D. Banerjee এই গ্রামেরই অধিবাসী। দেবগ্রামের একটি প্রকাণ্ড জলাশয় দেবকুণ্ড নামে পরিচিত। বর্ত্তমানে এই দেবকুণ্ড ত্রিধাবিভক্ত হইয়া তিনটী পুষ্করিণীতে পরিণত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি পুষ্করিণী পচা দীঘি (আধুনিক লাল দীঘি) নামে পরিচিত। লালদীঘি খননকালে অনেক প্রস্তর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এখন তাহা আবার বিলুপ্ত হইয়াছে। ৺রামদাস বাবুর বাড়ীর একটি কূপ খনন কালে একখণ্ড প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে, ইহার দুইপ্রান্তে দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি ক্ষোদিত। এই বাড়ীটিই গ্রামের মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন বলিয়া "পুরাণ বাড়ী" নামে পরিচিত। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে

নির্ম্মিত একটি চণ্ডীমণ্ডপ অদ্যাপি ৺বামনদাস বাবুর বাড়ীতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কুলইচণ্ডী।—দেবগ্রামের কুইলচণ্ডী প্রাচীন বিগ্রহ। মন্দিরটি প্রায় ৫০ বৎসর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী কোনও বটবৃক্ষমূলে পতিত ছিল, পরে বর্ত্তমান স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে সাঁওতার দীঘিতে এই মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইলেই বটবৃক্ষমূলে রক্ষিত হইয়াছিল। বল্লাল সেনের স্থাপিত বলিয়া কোনও কিংবদন্তী প্রচলিত নাই। ইহার সেবার জন্য পাটুলি নারায়ণপুরের রাজা এবং কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভূমি দান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি বর্ত্তমান সেবাইতগণ উহা ভোগদখল করিতেছেন। নিম্নলিখিত ধ্যানে কুলইচণ্ডীর পূজা হইয়া থাকে :—

"যৈষা ললিতকান্ত্যাখ্যা দেবী কুলইচণ্ডী দায়িকা।
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটজ্বলিতপ্রভা॥"

কালিকা পুরাণে ললিতকান্তা বা মঙ্গলচণ্ডিকার ধ্যানে লিখিত আছে :—

"যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা॥
রক্তপদ্মাসনস্থা চ রত্নকুণ্ডলমাণ্ডতা।
রক্তকোষেয়বস্ত্রা চ স্মিতবক্ত্রা শুভাননা।
নবযৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা॥"

সুতরাং ললিতকান্তা বা মঙ্গলচণ্ডিকা দেবীই দেবগ্রামে কুলইচণ্ডী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু এই মূর্ত্তিটি মহাদেব বা ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। ইনি দ্বিভুজ এবং প্রস্ফুটিত শতদলোপরি ধ্যানস্তিমিতলোচনে বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট। চাল চিত্রের মধ্যভাগে এবং মূর্ত্তির মস্তকের সোজাসুজি উপরে একটি পদ্ম ক্ষোদিত রহিয়াছে। মূর্ত্তিটির কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে উপবীত এবং মালায় পরিশোভিত বামাঙ্গে ন্যস্ত দণ্ডের ন্যায় পদার্থটি ত্রিশূলও হইতে পারে।

প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় মন্দির সংলগ্ন বৃক্ষমূল হইতে একটী মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া তাহাকেই নাকি প্রকৃত কুলইচণ্ডী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে-

ছেন। নগেন বাবুর সংগৃহীত মূর্ত্তির সহিত বল্লালের কোনও সংস্রব থাকার প্রবাদও গ্রামে শুনিতে পাইলাম না।

এইত গেল, দেবগ্রাম, বিক্রমপুর, বেঘে, সাঁওতা, দমদমা প্রভৃতি স্থানের পুরাকীর্ত্তির পরিচয়। ইহার মধ্যে বল্লালের নামগন্ধও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সংবাদপত্রের স্তম্ভে দমদমা বল্লালের রাজধানী বলিয়া উল্লিখিত হইবার পর যদি কোনও কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয় তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা। নামের সাদৃশ্য বশতঃ ঢাকা-বিক্রমপুরের অতীত গৌরব-রেখা নদীয়া বিক্রমপুরের মস্তকে অঙ্কিত করিয়া দিলে কলিকাতা এবং হুগলীকেও ফরিদপুর জেলার নগণ্য পল্লী বলিয়া নির্দ্দেশিত করা ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের পক্ষে অন্যায় হইবে না।

পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি। তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির সহিত সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের অদ্ভুত সিদ্ধান্তের অথবা তাঁহার এই প্রত্ন-তত্ত্বাভিযানের কোনই সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সংবাদপত্রে এই অভিনব তথ্যাবিষ্কারের যশোমাল্য রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে কেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। যাহা হউক, সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের অনুসৃত পন্থা অবলম্বন করিয়া "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" চাপাইয়া দেশের বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য তথ্য উদ্ধারে চেষ্টা করিলে যে যথাযোগ্য ভাবে ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় "রাঢ়ে কাটোয়ার নগণ্য পল্লীতে" বল্লাল সেনের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন কি না, তাহার বিচার ভার অতঃপর বঙ্গের ঐতিহাসিকবর্গের হস্তে ন্যস্ত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

প্রহেলিকা

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে ঘরের বারেন্দায় পাটীর উপর বসিয়া, নগেন্দ্র, খগেন্দ্র ও তবু লেখাপড়া করিতেছিল। রমাপ্রসাদ বাবু সম্মুখস্থ একখানা পিড়ীর উপর উপবেশন করিয়া, জায়গা-জমী সম্বন্ধীয় কাগজ পত্রাদি দেখিতেছিলেন ও মাঝে মাঝে তাহাদের পাঠ বলিয়া দিতেছিলেন। মোক্ষদাসুন্দরী গৃহকার্য্যে অন্যত্র নিযুক্ত ছিলেন। নদীরাম গরু দুটীকে গোয়ালঘর হইতে বাহির করিয়া, বাহির বাটীর সিঁদুরে আম গাছের সম্মুখস্থ সুপারী গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া, তাহাদিগকে দোহন করিবার যোগাড় করিতেছিল।

তখনও, ভাল করিয়া রৌদ্র ওঠে নাই। কেবল, সিঁদুরে আমগাছের পাতার ভিতর দিয়া, কয়েকটী সূর্য্যরশ্মি আসিয়া ভিতর বাটীর আঙ্গিনার উপর ও বারেন্দায় যেখানে নগেন্দ্র, খগেন্দ্র ও তবু পড়িতেছিল, সেখানে পতিত হইয়াছিল। সেই রশ্মিসম্পাতে নগেন্দ্রের উজ্জ্বল নয়নদ্বয় আরও উজ্জ্বলতর এবং তাহার ভগ্নীর ফুল্লমলিকাসদৃশ মুখখানি আরও ফুট্‌ফুটে দেখা যাইতেছিল। ঝির্ ঝির্ করিয়া প্রাতঃ সমীরণ আসিয়া, নারিকেল গাছের পাতা নাড়িয়া, বেলফুলের সুগন্ধ লইয়া, খগেন্দ্রের বহির খাতা কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া, তবুর কেশকলাপ ঈষৎ দোলাইয়া মাঝে মাঝে বহিয়া যাইতেছিল। খুকীকে কোলে লইয়া 'আমা' উত্তরের ঘরের বারেন্দায় বসিয়া খেলা দিতেছিলেন। সে সময়, সে বাটীর সকলেই যে যাহার কাজে ব্যাপৃত ছিল, সুখও যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

রমাপ্রসাদ বাবু নগেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমার আজকের শ্লোকটী বল তো।

নগেন্দ্র আবৃত্তি করিল,

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।

তখন তিনি খগেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমার শ্লোকটী বল তো।

সে বলিতে লাগিল,

বরমেকো গুণী পুত্রো নচ মূর্খশতৈরপি
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি নচ তারাগণৈরপি।

তিনি তখন উদাহরণ দ্বারা শ্লোকদ্বয়ের অর্থ ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, তোমরা খুব যত্ন করে লেখা পড়া করবে। কেমন?

তাহারা উভয়েই সমস্বরে বলিল, হাঁ, করব।

রমাপ্রসাদ বাবু। বেশ, তোমরা এখন মন দিয়ে তোমাদের বই পড়।

বালকদুটী হৃষ্ট চিত্তে পাঠে মনোনিবেশ করিল। তিনি তাহাদের দিকে গর্ব্বভরে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! তুমি লেখা পড়া করবে তো? শুন্‌লে তো তোমার দাদারা কি বল্লে?

সে মাথা ঈষৎ নীচু করিয়া শিশুশিক্ষা তৃতীয়ভাগখানা হাতের ভিতর মোচড়াইতে মোচড়াইতে বলিল, হাঁ বাবা! কর্‌ব।

রমাপ্রসাদ বাবু। এখন বল তো তোমার শ্লোকটী।

তবু তাহার শ্লোকটীর দুই একটী কথা বলিয়া, শেষে আর না বলিতে পাড়িয়া লজ্জাবনত মুখে কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল, বাবা! আমি ভুলে গেছি।

তিনি তাহার গায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, তাতে দুঃখ কি? চেষ্টা কল্লে একবারে, না হয় দুবারে শিখ্‌তে পারবে। আমি শ্লোকটী আবার বলি, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে বল।

তখন তিনি শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাহার স্বরের সহিত বালিকা তাহার ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর মিশ্রিত করিয়া, তাহা উচ্চারণ করিতে লাগিল। বড়ই সুন্দর শুনা যাইতে লাগিল।

তিনি বলিতে লাগিলেন, দেখ মা! তোমাকে দাদাদের চেয়েও এখন বেশী করে পড়্‌তে হবে। এখন লেখা পড়া না শিখ্‌লে, শেষে আর সময় পাবে না। যে মেয়ে লেখা পড়া করে, তার যেমন বুদ্ধি ভাল হয়, তেমন সুন্দর চরিত্র হয়। তাকে সকলেই ভালবাসে। কেমন, মন দিয়ে লেখা পড়া কর্‌বে তো?

তবু (ঘাড় নীচু করিয়া) বলিল, করব। ইহার পর, বালকদ্বয় ও বালিকা উচ্চৈঃস্বরে স্ব স্ব পাঠ পড়িতে লাগিল। তিনিও নিজের কাজে মন দিলেন।

এখন, লেখা পড়া জিনিসটা বড়ই বিরক্তিকর। কতকটুকু পড়ার পরেই

তবুর শরীরটা যেন কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। বানানগুলিও যেন সেদিন বড়ই শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। শব্দের অর্থগুলিও হঠাৎ এত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে কিছুতেই মনে রাখা যাইতেছে না। পিতা বসিয়া আছেন, যাইতেও পারিতেছে না। দুবার পড়া দিল, একবারও পারিল না। বড়ই বিশ্রী লাগিতে লাগিল।

এদিকে তাহার ঈদৃশ অবস্থা, অন্যদিকে তাহার খেলার সাথী বিনোদিনী, শরৎকুমারী, নির্ম্মলা, অণু, সরু, চারু ইত্যাদি আসিয়া উঠানের কোণায় দেখা দিয়া উকিঝুঁকি মারিয়া চলিয়া যাইতেছে। হঠাৎ একবার সরোজকে দেখিয়া তাহার মনে হইল, কাল তাহার পুতুলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আজ বাসি বিবাহ। বর কন্যা কাল রাত্রিতে যে ফুলশয্যায় গিয়া শুইয়াছে আজ এ পর্য্যন্ত তাহা তোলা হয় নাই। হায়! হায়! সব মাটী হইয়া গেল! পিতা বসিয়া আছেন, যাইবারও উপায় নাই। কি যে করিবে, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া, সাহসে ভর করিয়া বলিল, বাবা! আজ বেলা হয়েছে। এখন আর পড়্‌তে ইচ্ছে করে না। রাত্রিতে পড়াটুকু শিখে রাখবো।

ততক্ষণ, নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র পড়া শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। রমাপ্রসাদ বাবু দেখিলেন, এক্ষণে কন্যার মন পাঠে আর বসিবে না, তাই বলিলেন, আজ তোমায় ছুটী দিলেম। কাল থেকে, পড়া না শিখ্‌লে কিন্তু আর কিছুতেই ছুটী পাবে না।

'আচ্ছা' বলিয়া, তবু বইখানা তাড়াতাড়ি উঠাইয়া লইয়া ও ঘরের ভিতর তাহা কোনও প্রকারে রাখিয়া, এক লম্ফে আঙ্গিনায় পড়িয়া 'সরু' 'সরু' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাহির বাটীর দিকে দৌড়াইয়া গেল।

তখনও মেয়েরা বাটীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

তবুকে দেখিয়া শরৎকুমারী বলিল, হাঁ তবি! তুই দেখি ভারি লেখা পড়ায় মন দিয়াছিস্। মেম সাহেব হবি নাকি?

তবু। কি করব ভাই?—আমার কি ইচ্ছে। বাবা বসে আছে, কেমন করে উঠে আসি? তার পর, মা কাল থেকে যে রেগে আছে, আজ যদি না পড়্‌তেম তা হলে মেরেই শেষ করতো। (সরোজের দিকে চাহিয়া) এখনও

শয্যা তুলিস্ নি? সেই যে কাল বর, কন্যা নিয়ে শুয়েছে, এ পর্য্যন্ত শুয়েই আছে, তোদের সে দিকে একটুও দৃষ্টি নেই।

সরোজ মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, আমি কি করবো। তুই বসে বসে কেবলই পড়্ছিস। আমরা সেই ভোর থেকে তোর জন্যি ঘুরে ঘুরে মচ্ছি। আর ভাই! শয্যা তুলবার টাকা না দিলে কেনই বা তুলব। তোমার ছেলে হতে, আমার মেয়ে যে বংশে বড়, তাতো জানই। তাও, বরের মন রাখার জন্যে আমি এক মোহর দক্ষিণা দিয়েছি। এখন, তার ডবল না পেলে কেমন করে শয্যা তোলা যায়। তা দেও, ভালই। না দেও, তোমারই ছেলে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে থাক্‌বে, আমার কি?

ইহার পর, বর ও কন্যা পক্ষ মধ্যে শয্যা তোলার টাকা লইয়া বড় রকমের বাদানুবাদ চলিল। শেষে, বরপক্ষ হইতে কন্যাপক্ষকে নগদ কুড়িটী টাকা দেওয়া হইল। তৎপরে, মহাসমারোহের সহিত, উলু উলু করিয়া, পাঁচ ঝাঁক জোকার দিয়া বরকন্যার শয্যা তোলা হইল।

কতকক্ষণ পরে, বড় গোছের একটা ভোজন ব্যাপার সমাধা হইয়া গেল। কোন গাছের পাতা হইল লুচি, কোন গাছের ডাল হইল তরকারী, কোনও পাতার রসে দধি প্রস্তুত হইল, সুরকীর সাহায্যে অতি উপাদেয় ডাইল রান্না হইল। শেষে, বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষীয়গণ আহারে বসিয়া গেলেন।

এমন সময়, কোথা হইতে কমলার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সুশীলা তবুর নিকটে আসিয়া, অঞ্চল হইতে কয়েকটা পুতুল খুলিয়া, তাহার কাছে ধীরে ধীরে রাখিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, এই নেও তবু! তোমার পুতুল নেও।

তবুর মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। অন্যান্য মেয়েরা কিছু না বুঝিতে পারিয়া, ফেল্ ফেল্ করিয়া তাহার দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার চোক ছল ছল করিতে লাগিল। আজ তাহার ছেলের বিবাহ। এ সুখের সময়, অকস্মাৎ ঈদৃশ দুঃখের আবির্ভাবে, তাহার ক্ষুদ্র প্রাণখানি যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল! কাঁদ কাঁদ স্বরে সুশীলার দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'সুশী! তুই বড় কুটিল। কাল ব্যথা পেয়েছিলেম বলে, রাগের মাথায় কমলাকে গোটা দুই চড় মেরেছিলেম। তা তুই আজও মনে করে রেখেছিস্। আমি তো ভাই! সব ভুলে গেছি। সুশী! তুই না আমাকে ভালবাসিস্?' তাহার এতদিনের আদরের সখী,

তাহাকে এ সময় ছাড়িয়া যাইবে, ভাবিতে সরলা বালিকার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

সুশীলাও কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তোর পুতুল তুই নিয়ে যা। চাইনে তোর পুতুল।

তবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল সুশী! আমি আর কমলার গায় কখনও হাত তুল্‌ব না। কাল বড় লেগেছিল, তাই এমন করেছিলাম। তোর পায়ে পড়ি, আমায় মাপ করবি নি ভাই?

বলিতে বলিতে সে সুশীলার আঁচলে আবার পুতুল কয়টী বাঁধিয়া দিল। এদিকে বিনোদিনী, নির্ম্মলা ও শরৎকুমারী আবার তাহাদের পুনর্মিলন করিয়া দিল।

তখন সুশীলার আহারের জন্যও একখানা জায়গা করিয়া দিবার হুকুম হইল। কিন্তু সে তখন আহার করিতে সম্মত হইল না। সে পরিবেশনের জন্য রহিয়া গেল।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ চপাচপ্ টপাটপ্ শব্দ উত্থিত করিয়া আহার করিতে লাগিলেন এবং সকলেই একবাক্যে প্রকাশ করিলেন, রান্না অতি চমৎকার হইয়াছে।

তবুর পুত্রের বিবাহ। তাহার সে সময়ের হর্ষোৎফুল্ল মুখ দেখিলে. সত্যই মনে হইত যে সে দিন তাহার কি এক মহানন্দের দিন!

"অ সুশী, এদিকে মাছ নিয়ে আয়। দেখ্‌ছিস না বেহাইর পাত একেবারে খালি?" এই বলিয়া সে সুশীলাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল।

সুশীলা অতি ব্যস্ততার সহিত মৎস্যের ভাণ্ড হইতে কয়েকখানি বড় বড় মাছ তুলিয়া লইয়া, একেবারে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত।

"কি করব ভাই। একা কয়দিকে যাব," বলিতে বলিতে সে বেহাই বিমলার পাতে তিন চারি খানা মৎস্যখণ্ড ঢালিয়া দিল। তিনি অতি দীনতার সহিত বলিলেন, না, এমন হলে আর পারা যায় না। এত মাছ কি খাওয়া যায়?

এদিকে নির্ম্মলা আসিয়া দৌড়াইয়া বলিল, তবি! তুই তো কেবল এদিক নিয়েই ব্যস্ত। ওদিকে চেয়ে দেখ, ওপাড়ার স্বর্ণ কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে।

তবু। তাই তো। আমার পোড়াকপাল! সব মাটী হলো। একা আমি কদিকে যাব। ভাই! হরে আর কেব্‌লাকে পাত ফেলে, নূতন জায়গা করে দিতে বল্‌।

নির্ম্মলা হরে ও হরে, কেব্‌লা ও কেব্‌লা বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

এখানে হরে ও কেবলার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

হরে ওরফে হরিনাথ, রায় চৌধুরী বাবুদের বংশ সম্ভূত ব্রজকান্ত বাবুর পুত্র। বয়স অনুমান নয় দশ। লেখা পড়ায় বিদ্যাদিগ্‌গজ। এতখানি বয়স হইয়াছে, তথাপি কাপড়ের সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক নাই। সমবয়স্ক বালকদের সঙ্গে খেলাতে বড় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাই, মেয়েদের খেলায় কখনও চাকর, কখনও পাল্কীর বেহারা সাজিতেন। পাতকাটা, মোসল্লা বাটা কার্য্যে তিনি প্রায়ই নিযুক্ত হইতেন।

কেব্‌লা ওরফে লক্ষ্মীকান্ত তাহারই গুণধর প্রতিবাসী। বয়সে প্রায় হরেরই সমান। রূপেগুণেও তাহারই সহিত সমান আসন পাইবার উপযুক্ত। একই ভাবে দুইজনে জীবন যাপন করিতেছেন।

হরে ও কেব্‌লা আজ্ঞামত পাত পাতিয়া দিল। ক্রমে ক্রমে, সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে, তবু, সুশীলা, বিনোদিনী, নির্ম্মলা ইত্যাদি বরপক্ষের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি কিছু মুখে গুঁজিয়া দিতে বসিলেন।

নেও বালিকাগণ! মনের আনন্দে খেলিয়া নেও। নেও তবু, নেও সুশীলা, নেও বিনোদিনী, ছেলেবেলার ধূলা খেলার ভিতর ভবিষ্য জীবনের সমস্ত সুখের আকাঙ্খা চরিতার্থ করিয়া নেও। নিজ নিজকে আদরের পুত্রবধূরূপে কল্পনা করিয়া, স্বামী সোহাগিনী স্ত্রীরূপে অঙ্কিত করিয়া, সুসন্তানের সৌভাগ্যবতী মাতারূপে মনে করিয়া, সম্পদশালিনী গৃহিনীর পদে বরণ করিয়া, নেও সরলা বালিকাগণ! প্রাণের সুখতৃষ্ণা মিটাইয়া নেও। বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর বার্দ্ধক্যে পুত্রের,—তোমরা আজীবন পরমুখাপেক্ষী। হিন্দুবালিকাগণ! তোমা-দের মত জগতে এমন দুঃখ কাহার? পুরুষের সুখের জন্যই তোমরা গঠিত। তোমাদের নিজের অস্তিত্ব কোথায়? কে জানে, ভবিষ্যতে কাহাদের জীবনের সহিত জড়িত হইয়া তোমাদের জীবন কি ভাবে ধারণ করিবে? নেও তাই, আজ জীবনের শুভ্রপ্রভাতে প্রাণের সমস্ত পিপাসা মিটাইয়া নেও!

বালিকাগণ খেলায় মত্ত, এমন সময় মোক্ষদাসুন্দরী কলসী কক্ষে মিঠাদীঘির ঘাটে যাইতে যাইতে তবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, তবি স্নান কত্তে যাবি নি? বেলা হল যে। তোর জন্যে আবার ভাত নিয়ে কে বসে থাক্‌বে? যা স্নান কত্তে যা।

তখন বেলা হইয়াছে। রৌদ্র কন্ কন্ করিতেছে। তবুর সাদা কঁচি মুখখানা রৌদ্রক্লিষ্ট হইয়া লাল ডগ্‌ডগ্ হইয়া উঠিয়াছে। মোক্ষদাসুন্দরীর কথা শ্রবণে বালিকাগণ ভয়গ্রস্তা হইয়া খেলাভঙ্গ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। সে দিনকার মত খেলা শেষ হইয়া গেল।

রমাপ্রসাদ বাবু বারেন্দায় বসিয়া তবু ও তাহার সখীগণের খেলা দেখিতে-ছিলেন। মোক্ষদাসুন্দরীর কথায় হঠাৎ তাহাদের খেলাভঙ্গ হইয়া গেল দেখিয়া, তিনিও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্নানাহার করিবার জন্য গাত্রোত্থান করি-লেন। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার প্রাণটা বড়ই কঠিন। ওরা খেল্‌ছিল, ওদের এমন বিয়ের নেমন্তন্‌টা তুমি কোন্ প্রাণে ভেঙ্গে দিলে?

তিনি তদুত্তরে, 'তোমার কথা রাখ। এম্‌নি করেই তো মেয়েটার মাথা খেলে। বেলা হয়েছে, খাওয়া দাওয়া নেই, কেবলি খেলা'—বলিতে বলিতে, ঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন।

নিবেদন।

তুমি চাও না আমার
বীণার মোহন সুরের মধুর তান,
মম হৃদয় উঠিছে
আকুলি বিকুলি শুনিয়া যাহার গান;

মোর কোমল সুরেতে
পারি না বাজাতে
তুরী ভেরী শিঙ্গা গভীর রবেতে,

পারি না গাহিতে
তুলসী তলাতে
মাতাতে ভকত প্রাণ ;
আনি দেও বীণা
সেতার বেহালা জুড়াইয়া দিব কান।

আমি শিখেছি কেবল
নয়নের জল
আধ ভাষা দিয়ে করিতে পাগল
জোর কর যদি
ফুটিবে না হৃদি
ভেঙ্গে হবে দুইখান,
আমি হৃদয়ের ভাষা
রাখিয়াছি পুষে
চাও যদি করি দান।

শ্রীকুমুদকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

স্বর্গীয় নীলকান্ত সরকার এম, এ, ষ্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত কুকুটীয়া গ্রামে ১২৫৯সনে উচ্চ ব্রাহ্মণ পরিবারে স্বর্গীয় নীলকান্ত সরকার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺কালীকান্ত সরকার বিশেষ সঙ্গতি সম্পন্ন লোক ছিলেন না। নীলকান্ত শৈশবে দারিদ্র্যের ক্রোড়েই প্রতি-পালিত হন ; কিন্তু দারিদ্র্য-প্রপীড়ন উপেক্ষা করিয়া দুর্দ্দমনীয় অধ্যবসায়ের সহিত বাগ্দেবীর অর্চ্চনায় নিরত থাকেন এবং উত্তর কালে একমাত্র স্বাবলম্বন প্রভাবেই উন্নতির শৃঙ্গে আরোহণ করেন। ছাত্র-জীবনের প্রারম্ভেই ইঁহার অসাধারণ ধী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি কুকুটীয়া মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয় হইতে

মুটে পঞ্চাশটি থলিয়া ভরা টাকা লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সকলে ভাবিল তত সহজ ব্যাপার নয়, দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য এবং মাম্‌লা মোকদ্দমার জন্য যে প্রথমেই এক লক্ষ টাকা সহ কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়াছে, এ ত বড় সহজ ব্যাপার নয়, কাজেই সকলে ভয়ে ভয়ে দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল। প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় নিরাপদে কাছারী দখল করিলেন। ঐ সকল থলিয়া মধ্যে মাত্র একটীতে টাকা ছিল, বাকী সব কয়টিতেই ইট পাট্‌কেল মাত্র ভরা ছিল, এমনি করিয়া কৌশলে কাজ হইয়া গেল।

অতঃপর কুণ্ডুবাবুরা বাংলা ১২৪২ সালে নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মগঞ্জ এবং কাশীপুর নামক দুইটী স্থান ক্রয় করেন। এই সম্পত্তি লইয়া বালিয়াটির বাবুদের সহিত বহু বার কলহ ইত্যাদি হইয়াছে--ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে কোন কোন বৎসর উভয় পক্ষের প্রায় দুই লক্ষ আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, দাঙ্গা হাঙ্গামায় দুই চারি বার রক্তপাতও ঘটিয়াছে। দেশে জমিদারী ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা কলিকাতা সহরের ও নানা স্থানে বিবিধ অট্টালিকা ক্রয় করেন। তন্মধ্যে ২০, ২১, ২২ নং লাউডনষ্ট্রীটের বাড়ী গুলি, ২২ ও ১১ নম্বর পার্কষ্ট্রীটের ও পার্ক লেনের বাড়ী প্রত্যেকটী ৬০,০০০ হাজার টাকা মূল্যে ক্রীত হয়। এখন ইহার প্রত্যেকটীর মূল্য ৮০,০০০, ৯০,০০০ টাকার ন্যূন নহে।

এই সময়ে কুণ্ডু বাবুরা খিদিরপুর, সার্কুলার রোড্, গার্ডেন রিচ প্রভৃতি স্থানে বহু জমি ইত্যাদি ১০,০০০ দশহাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। সে সকলের মূল্য এখন প্রায় লক্ষাধিক টাকা হইবে। সর্ব্বকনিষ্ঠ প্রেমচাঁদ সে সময়ের ধনীবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। প্রেমচাঁদ রায় সুবিখ্যাত রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর, জানকী নাথ এবং অনারেবল রায় সীতানাথ বাহাদুরের পিতা। সে কালে পার্শীভাষার সর্ব্বত্র আদর ছিল। আদালত প্রভৃতি সর্ব্বত্রই পার্শীভাষা প্রচলিত থাকায় সকলেই নিজ নিজ সন্তানদিগকে পার্শীভাষায় শিক্ষা দিতেন। গঙ্গাপ্রসাদ বালক প্রেমচাঁদকে পার্শীভাষায় সুশিক্ষিত করিবার জন্য ঢাকায় প্রেরণ করেন এবং যাহাতে কোনও ভাল মক্তবে তাহার পড়িবার ব্যবস্থা হয় সে জন্য জীবন বাবুকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করেন।

জীবন বাবু নিজে পারস্যভাষায় একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রেমচাঁদের পড়াশুনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন; তাহার কিরূপ শিক্ষা হইতেছে, মাঝে মাঝে সে বিষয়ের পরীক্ষা লইয়া উপযুক্ত রূপ পুরস্কার ইত্যাদি দিয়া প্রায়ই বিশেষ রকমে উৎসাহ দিতেন। প্রেমচাঁদ পারস্য ভাষায় বিশেষ রূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে দুইবার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তৎ-কালে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদের ন্যায় সম্মানজনক পদ আর কিছুই ছিল না। সে সময়ে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোনরূপ প্রতিযোগী পরীক্ষা ছিল না। সাধা-রণতঃ ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশ হইতেই সেকালে যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে ঐ সকল পদে নিযুক্ত করা হইত। গুরুপ্রসাদ প্রেমচাঁদের চাকরীর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না, তিনি তাঁহাকে পৈত্রিক ব্যবসায়ে নিযুক্ত করাই যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। সরকার বাহাদুরের এইরূপ অনুগ্রহ প্রস্তাবের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া তিনি প্রেমচাঁদকে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনের জন্য নিযুক্ত করি-লেন। গুরুপ্রসাদ ও প্রেমচাঁদের চেষ্টা যত্ন ও আন্তরিক অধ্যবসায়ের ফলেই বর্ত্তমান সময়ে রায় পরিবার দেশে বিদেশে এত বড় খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। ১২৪৬ সালে কুণ্ডু পরিবারের পৈত্রিক বাসগ্রাম পদ্মা নদীর কুক্ষি-গত হইল। প্রাচীন রেণেলের মানচিত্র দেখিলেই পদ্মার প্রাচীন অবস্থার সহিত বর্ত্তমানের যে কত প্রভেদ তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। ইহার পূর্ব্বে পদ্মা নদী খালের মত একটী শীর্ণকায়া মাত্র ছিল। আড়িয়াল প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ ধ্বংস হইলে কুণ্ডু বাবুগণ আড়িয়ালের উত্তর-পূর্ব্ব-বর্ত্তী ভাগ্যকূল নামক গ্রামে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার সকলেই ভাগ্যকূলের নাম বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছেন। ভাগ্যকূলে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া এত বড় পরিবারের পক্ষে উপযুক্ত রূপ বাস অট্টালিকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে বহু সময়ের প্রয়োজন বিধায় তৎকালে কুণ্ডু পরিবারের অনেকেই সপরি-বারে ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে বাস করিতেছিলেন। ভাগ্যকূলে বাসস্থান ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দুই বৎসর কাল লাগিয়াছিল। এখানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা অতিথিশালা, দেবালয় প্রভৃতি প্রস্তুত করেন।

বর্ত্তমান কুণ্ডু পরিবারের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি খ্যাতনামা রাজা শ্রীনাথ রায়

বাহাদুর ভাগ্যকূলের বাড়ীতে বাঙ্গালা ১২৪৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রেমচাঁদ রায়ের অপর দুই পুত্র রায় বাহাদুর জানকী নাথ এবং সীতানাথও এই বাড়ীতে যথাক্রমে বঙ্গীয় ১২৫৫ ও ১২৬০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। গুরুপ্রসাদ রায়ের দ্বিতীয় ভ্রাতা হরিপ্রসাদ রায়ের মৌখিক অনুমত্যনুসারে হরিপ্রসাদ রায়ের বিধবা পত্নী গুরুপ্রসাদের তৃতীয় বা সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র হরলাল রায়কে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

এখন গুরুপ্রসাদ রায়ের জীবনী সম্পর্কে গুটিকতক কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গুরুপ্রসাদ দেখিতে দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ এবং সর্ব্ব প্রকারেই অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। সে সময়ে দেশে রেল ও ষ্টীমার না থাকায় লোকে সদা সর্ব্বদা নৌকা পথেই যাতায়াত করিত। ভাগ্যকুল হইতে কলিকাতা পঁহুছিতে তথন এক পক্ষ কালের কমে হইত না। ঢাকা হইতে কলিকাতা যাইতে হইলে সুন্দর বনের মধ্যবর্ত্তী নদীর ভিতর দিয়া ভিন্ন অন্য কোন পথ ছিল না। একবার গুরুপ্রসাদ নৌকাযোগে ঢাকা হইতে কলিকাতা চলিয়াছেন, রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহারা সুন্দর বনের মধ্যে আসিয়া পঁহুছিলেন, গুরুপ্রসাদ নিদ্রিত, মাঝিরা নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে, এরূপ সময় পশ্চাৎ হইতে অতি দ্রুত একখানা ছিপ নৌকা আসিয়া তাঁহার নৌকার সহিত সংযুক্ত হইল—ঐ ছিপ নৌকায় প্রায় বারজন ডাকাত ছিল। গুরুপ্রসাদের নৌকার সহিত তাহাদের ক্ষুদ্র তরী সংযুক্ত করিয়া ছিপ হইতে কয়েকজন দস্যু তাঁহার বড় নৌকার উপর লাফাইয়া পড়িয়া যে দুইজন দ্বারবান গুরুপ্রসাদের শয়নপ্রকোষ্ঠের বাহিরে উপবিষ্ট হইয়া পাহারা দিতেছিল তাহাদিগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিল, দ্বারবানদের চীৎকারে গুরুপ্রসাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল, তিনি জাগরিত হইয়া শয্যায় উপবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দুইজন দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল,—গুরুপ্রসাদ অমনি তাহাদের একজনকে গলায় ধরিয়া এমন করিয়া ঠেলিয়া দিলেন যে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আর এক জন দস্যু অগ্রসর হইল, এইরূপ ভাবে রীতিমত তাঁহার লোকজনের সহিত ডাকাতদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দস্যুগণ অবশেষে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল. কিন্তু গুরুপ্রসাদ ললাটদেশে গুরুতররূপ আহত হইলেন, তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধভাগে বরাবর সেই আঘাতচিহ্ন বিদ্যমান ছিল। দস্যুগণ চলিয়া

যাইবার সময় চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল—গুরুপ্রসাদ তোর বরাত ভাল তাই এ যাত্রা রক্ষা পেলি, আর একবার দেখা যাবে, দেখবো, সেবার কেমন করে রক্ষা পাস্। এ ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পরে গুরুপ্রসাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চৈতন্য-প্রসাদও সুন্দরবনে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তিনিও সামান্যরূপ আহত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গুরুপ্রসাদ রায় পরিণত বয়সে হাঁফানী রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলেন, কিন্তু দৈবানুগ্রহে ঐ রোগের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করেন। তাঁহাদের ভাগ্যকূলস্থ অতিথিশালায় একজন সন্ন্যাসী অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রিয় ভৃত্য মোহন সিকৃদারের নিকট ঔষধ দিয়া প্রস্থান করে। পরে বহু অনুসন্ধানেও আর সেই সন্ন্যাসীর সন্ধান মিলিল না। সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে লোকজন প্রেরিত হইল, অভুক্ত অতিথিও ফিরিয়া যাওয়ায় স্বয়ং গুরুপ্রসাদ অনাহারী রহিলেন; কিন্তু সেই অতিথির আর খোঁজ পাওয়া গেল না. সন্ন্যাসীপ্রদত্ত ঔষধ সেবনে, তাহার ব্যাধি একেবারেই দূর হইয়া গেল।

সিংপাড়ার বাজার সৃষ্টিও তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। ১২৫১ সালে গুরুপ্রসাদ এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ধর্ম্মে কর্ম্মে কিছু অর্থব্যয় করা স্থির করিয়া বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল হইতে কীর্ত্তনীয়ার দল আনয়ন করিয়া এক মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। শান্তিপুর, খর্দ্দ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বৈষ্ণব গোস্বামীগণ নিমন্ত্রিত হইয়া একে একে আসিয়া ভাগ্যকূলে সমবেত হইলেন। প্রায় একমাস কাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তনীয়ার দল ও বৈষ্ণব গোস্বামীগণ ভাগ্যকূলে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক গোস্বামী মহাশয়কে শালের জোর, গরদের জোর এবং নগদ ২০৲ বিশ টাকা করিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। নানাস্থানের টোলের পণ্ডিতেরাও ঐরূপ ভাবে বিদায় পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যে মহোৎসব করিয়াছিলেন ঐরূপ মহোৎসব এপর্য্যন্ত বিক্রম-পুরে আর কেহই করেন নাই। এইরূপ মহোৎসবকে চৌদ্দমাদল মহোৎসব কহে।

ক্রমশঃ

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় চারি বৎসরের জন্য মাসিক চারি টাকা বৃত্তি লাভ করেন এবং বরিশালে কোনও এক আত্মীয়ের বাসায় বাসস্থান ও আহারের সংস্থান করিয়া বরিশাল জিলাস্কুলে অধ্যয়ন করেন ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৪৲ টাকা বৃত্তি ও স্কুল হইতে একটী স্বর্ণপদক লাভ করেন। অতঃপর নীলকান্ত অধ্যয়নের জন্য কলিকাতায় গমন করেন ও কুকুটীয়ার স্বর্গীয় আনন্দনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় আহার ও বাসস্থানের সংস্থান করিয়া উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। অচিরেই অধ্যাপকগণ গণিত-শাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচয় পান। ইনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এফ্, এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি ও গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করায় ডাফ্ বৃত্তি (Duff scholarship) প্রাপ্ত হন এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঈশান বৃত্তি (Eshan scholarship) লাভ করেন। ইনি এই সময়ে বৃত্তিপ্রাপ্ত অর্থ হইতে স্বপরিবারেরও সাহায্য করিতেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নীলকান্ত এম, এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ও কয়েকবৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজ, বেনারেস কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন ও পরে প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। ইহার কিছুকাল পরে Statutory Civil Service পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর নীলকান্তের যশঃপ্রভা বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং ইনি বঙ্গের তৎকালীন সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্যগণের নিকট সুপরিচিত হন। কিন্তু নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ উজ্জ্বলতার ন্যায় ইঁহার যশঃপ্রভা অতীব ক্ষণস্থায়ী হইল। কিয়ৎকাল আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কাজ করিয়া ইনি বীরভূমে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে গমন করেন এবং সেখানে বিষমজ্বরে আক্রান্ত হন। এই জ্বরেই ইঁহার মানবলীলার অবসান হয়। জ্বর ভীষণ রূপ ধারণ করিলে ইনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় গমন করেন। সেখানে অনারেবল সীতানাথ রায় মহোদয় ইঁহার সুচিকিৎসার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করেন এবং সার চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রমুখ বিক্রমপুরের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি ইঁহার শারীরিক অবস্থা অবগতির জন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে রোগ অচিরেই দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে এবং ১২৯৭ সনের ১৬ই বৈশাখ মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে

কলিকাতা হাটখোলায় বৃদ্ধা মাতা, একমাত্র ভ্রাতা, স্ত্রী ও ভগ্নীদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া নীলকান্ত পরলোকে গমন করেন।

নীলকান্ত বিক্রমপুরের এক অত্যুজ্জ্বল রত্ন। ইনি অতি নির্ম্মল-চরিত্র, আড়ম্বরশূন্য নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। উচ্চপদ লাভ করিয়াও কদাপি আহ্নিকাদি ব্রাহ্মণের নিত্যকৃত্য সমাপন করিতে ত্রুটি করেন নাই। দাতব্য চিকিৎসালয় ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া নিজ গ্রামের উন্নতির জন্য ইঁহার কত আশাই ছিল। কিন্তু অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় কোন আশাই ফলবতী হয় নাই। প্রতিভা ও স্বাবলম্বন প্রভাবে সংসার-ক্ষেত্রে কিরূপে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিতে হয়, নীলকান্ত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই মহারত্ন হারাইয়া আজ ইঁহার পরিবার ও গ্রাম হাহাকার করিতেছে। মঙ্গলময় বিশ্বপাতা ইঁহার আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার বি এ।

ভাগ্যকূলের কুণ্ডুপরিবার (২)

গঙ্গাপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুপ্রসাদ সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। গুরুপ্রসাদ, স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় প্রেমচাঁদ এবং চৈতন্য দাসের সহায়তায় সমাজে অল্পকাল মধ্যেই রায়-পরিবারের সবিশেষ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করেন। এ সময়ে রায় ভ্রাতৃগণ ধানকুনিয়া প্রভৃতি কয়েকটী গ্রাম ক্রয় করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ধানকুনিয়ার হাট প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গাপ্রসাদের মৃত্যুর অল্প কয়েক বৎসর পর তাহার দ্বিতীয় পুত্র ওলাউঠা রোগে হঠাৎ লোকান্তরিত হন, তিনি মৃত্যু সময়ে তদীয় পত্নীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া গিয়াছিলেন। এ সময়ে ইঁহারা কলিকাতা, নারায়ণগঞ্জ, সৈদপুর, নলচিঠি প্রভৃতি অঞ্চলে লবণের কারবার করিতেন।

সে সময়ে কলিকাতা বোর্ড অব্ রেভিনিউ আফিসে সহস্র সহস্র মণ লবণ নীলামে বিক্রীত হইত, নানা স্থানের বণিক ও অর্থশালী ব্যক্তিগণ উহা ডাকিয়া

লইতেন। রায়-ভ্রাতৃগণ প্রতি বৎসর উচ্চ হারে লবণ খরিদ করিয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র তাহা চালান দিয়া লাভবান হইতেন। বরিশালে চাউলের কারবারও এ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। একবার গুরুপ্রসাদ রায় ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ তের লক্ষ টাকার লবণ নীলামে খরিদ করেন, রেভিন্যিউ আফিসের প্রধান কার্য্যকারক গুরুপ্রসাদের এই ডাকে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার যে যথেষ্ট সন্দেহ হইয়াছিল তাহাও বলা বাহুল্য, কিন্তু গুরুপ্রসাদ যখন তন্মুহূর্ত্তেই উক্ত কর্ম্মচারীর নিকট নগদ তের লক্ষ টাকা মজুত করিলেন, তখন আর কাহারও বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এই একটী ঘটনার পর হইতেই গুরুপ্রসাদের নাম কেবল যে কলিকাতা তাহা নহে, বঙ্গের সর্ব্বত্রই সুপ্রসিদ্ধ ধনী বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িল। সে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে আউয়ালের কুণ্ডু-পরিবার, ঢাকার মথুর পোদ্দার (রূপবাবু ও রঘু বাবুর পূর্ব্বপুরুষ), লৌহজঙ্গের পালবাবু এবং বালিয়াটির জমিদারেরাই সুপ্রসিদ্ধ ধনী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু আড়া আড়ি বা দ্বেষের ভাব ছিল, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই কুণ্ডু-পরিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন।

বাঙ্গালা ১২২৮ সালে গুরুপ্রসাদ প্রভৃতির মাতা ইঁহাদের কলিকাতাস্থিত বাসভবনে নব্বই বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। মাতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষে ইঁহারা বহু অর্থ ব্যয় করেন। বঙ্গের নানাস্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যেককে উপযুক্তরূপ বিদায় ইত্যাদি প্রদান করেন। ব্রাহ্মণগণ গরদের ধূতি চাদর এবং উপযুক্তরূপ দক্ষিণা পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত যোলটি সোণার কলস, সোণার প্রদীপ, সোণার গ্লাস, সোণার থালা ইত্যাদি ইঁহাদের গুরুবংশকে উপহৃত হয়। দীন দরিদ্রগণের মধ্যেও অবস্থা বিবেচনায় ১৲, ২৲ টাকা করিয়া চল্লিশ হাজার টাকা বিতরিত হয়।

এই দানসাগরশ্রাদ্ধে কুণ্ডু-পরিবারের নগদ ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ইহার পর হইতে রায় পরিবারের ধনগৌরব এবং রায় গুরুপ্রসাদের দানশীলতার কথা বঙ্গের সর্ব্বত্র গৌরবের সহিত উচ্চারিত হইতে থাকে। অতঃপর তিনি কলিকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে জমিদারী এবং বাড়ী ইত্যাদি ক্রয়ে মনোনিবেশ করেন। রায় ভ্রাতৃগণ বিখ্যাত রসুলপুর পরগণার পাচ আনা

অংশ ক্রয় করেন। ঢাকা, বরিশাল, ত্রিপুরা এবং ময়মনসিংহ জেলায় জমিদারীর বিভিন্ন অংশ অবস্থিত। কার্ত্তিকপুরের মুসলমান জমিদারবংশ বিখ্যাত। ইঁহারা উপযুক্ত সময়ে সদর খাজানা দিতে না পারায় সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়— রায়-ভ্রাতৃগণ সেই সম্পত্তি বিশ হাজার টাকা দিয়া ক্রয় করেন, সে সময়ে উহার তাদৃশ আয় না থাকিলেও বর্ত্তমান সময়ে উহার আয়ই ত্রিশ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে। এ সম্পত্তি ক্রয় ব্যাপারে গুরুপ্রসাদ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় যে মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, মর্ম্মপীড়িত বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী মুন্সী জহরুদ্দিন চৌধুরী মুন্সীসম্পত্তির নবীন মালিক গুরুপ্রসাদ ও তাহার ভ্রাতাদের সহিত নারায়ণগঞ্জ আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন যে যদি তিনি এক বৎসরের মধ্যে যে মূল্যে রায়-ভ্রাতৃগণ সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন তাহা দিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা সম্পত্তি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন কি না। রায়-ভ্রাতৃগণ বলিলেন যে, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা এক বৎসরের মধ্যে সম্পত্তি দখল করিব না, আপনার নিকট আমরা সুদ চাহি না, কেবল মাত্র টাকাটা দিতে পারিলেই সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিব। হায়! বৃদ্ধের আশা সফল হইল না। জহরুদ্দিন চৌধুরী টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, সম্পত্তি রায়-ভ্রাতৃগণেরই রহিয়া গেল। বিক্রমপুরের মধ্যস্থিত, সেরাজদিখাঁ, সিংপাড়া, ইমামগঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামগুলি এই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত।

সে কালে জমিদারী পরিচালন করা বিষম ঝঞ্জাটের বিষয় ছিল। নবক্রীত জমিদারী দখল করা আরও বিপজ্জনক হইল, সামান্য ব্যাপারেই দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিয়া যাইত। ইহারা প্রথম যে দিন সেরাজদিখাঁর কাছারী দখল করিতে যান, তখন এক অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিয়া যান। রায় বাবুরা যে দিন কাছারী দখল করিতে প্রধান কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন, সে দিন নানা স্থান হইতে বহু দুষ্ট লোক তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সকলে দেখিল কর্ম্মচারী মহাশয় খুব বৃহৎ এক বজরায় আসিয়াছেন, আর সঙ্গে বহু ছোট বড় নৌকা, সে সব নৌকায় শত শত লাঠিয়ালের দল লাঠি হস্তে বসিয়া আছে। বজরা তীরে লাগিল। কর্ম্মচারী মহাশয় লাঠিয়ালগণ পরিবেষ্টিত হইয়া ধীরে ধীরে কাছারী গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাহার পশ্চাতে পঞ্চাশ জন

বিক্রমপুর প্রসঙ্গ

স্বর্গীয় ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন। ডাক্তার অঘোরনাথ কেবল বিক্রমপুরের নহে সমস্ত বঙ্গের একজন সুসন্তান ছিলেন। ইনি হায়দারাবাদের নিজামের শিক্ষাবিভাগে বহু বৎসর উচ্চপদে নিযুক্ত থাকিয়া ও তৎপরে অবসর গ্রহণ করিয়া গত কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি হঠাৎ হৃদ্ রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমরা যতদূর জানি ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথমে বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস্‌সী, অর্থাৎ বিজ্ঞানাচার্য্য উপাধি লাভ করেন। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ইংরাজি ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া এবং বাগ্মিতার জন্য যশস্বিনী হইয়াছেন।

ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব্বপুরুষদের বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান জেলার পাটুলিগ্রামে, তাহার পর তাঁহারা বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁয়ে গিয়া বসবাস করেন। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে সুপণ্ডিত ছিলেন। অঘোরনাথ চারি ভ্রাতার মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন। সকলেই শিক্ষাদানকার্য্যে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় ভ্রাতা ঢাকায় গণিতের অধ্যাপক ছিলেন এবং পরে স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্‌টার হইয়াছিলেন। অঘোরনাথ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে খ্যাতির সহিত এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে তিনি শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, ৺রজনীনাথ রায়, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত প্রভৃতির সহপাঠী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই কৃতীছাত্র ছিলেন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী হইতে অঘোরনাথ ও শ্রীনাথ গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত যান, অঘোরনাথ সিবিল সার্বিস পরীক্ষা এবং কূপার্স্‌ হিলের এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দেন। কিন্তু প্রস্তুত হইতে কয়েক মাস মাত্র সময় পাইয়াছিলেন বলিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। তথাপি সিবিল সার্বিসে সংস্কৃতে প্রথম স্থান এবং কূপার্স্‌ হিলের পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার পর তিনি

রসায়ন পড়িবার জন্য এডিনবরা যান। তাঁহার অন্যতম অধ্যাপক ক্রামব্রাউন এখনও বাঁচিয়া আছেন, এবং প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া ভারতীয়দের নিকট এখনও তাঁহার গল্প করেন। অঘোরনাথের দ্বিতীয় কন্যা মৃণালিনী এখন বি, এস্‌সী, পরীক্ষার জন্য কেম্ব্রিজে পড়িতেছেন। তিনি যখন পিতৃশিক্ষাক্ষেত্র ও পিতৃগুরু দর্শনার্থ এডিনবরায় তীর্থযাত্রা করেন তখন বৃদ্ধ অধ্যাপক ক্রামব্রাউন তাঁহার সহিত অতিশয় সস্নেহ ব্যবহার করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এডিনবরায় বি, এস্‌সী পরীক্ষায় গুণানুসারে প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং পদার্থ বিজ্ঞানে ব্যাক্‌সটার বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাহার পর তিনি কিছু গবেষণা করেন, এবং রসায়নের এক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া হোপ পুরস্কার (Hope Prize) প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষায় তাঁহার প্রতিযোগীদের মধ্যে এডিনবরা ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। অতঃপর তিনি জার্ম্মণীতে নানা বিজ্ঞান শিক্ষা করেন এবং বেঞ্জিন যৌগিক পদার্থ সমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করেন, জার্ম্মণীতে আঠার মাস থাকিয়া এডিনবরা প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তথাকার ডি এস্‌সী উপাধি লাভ করেন।

ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার পরই তিনি হায়দরাবাদ রাজ্যের শিক্ষার উন্নতির জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহার উদ্যোগে নিজাম কলেজ এবং বালক ও বালিকাদিগের নিমিত্ত অনেকগুলি স্কুল স্থাপিত হয়। তিনি পেশী দপ্তরেও (Pashi office) কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। হায়দরাবাদে কয়েক বৎসর যাপিত হইবার পর কতকগুলি লোক তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তথা হইতে তাঁহার নির্ব্বাসন ঘটায়। কিন্তু তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে সমর্থ হন। ষড়যন্ত্রকারীরা হায়দরাবাদ" হইতে তাড়িত হয়, এবং তিনি সাদরে নিজামের রাজধানীতে পুনরাহূত হন। তাঁহার পুনরাগমনে তথায় একটা উৎসবের মত ব্যাপার হয়।

কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে ডাক্তার অঘোরনাথ হায়দরাবাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া যখন কলিকাতা আগমন করেন, তখন এখানে গ্রেষ্ট্রীটে ইউনিভার্সিটী স্কুল স্থাপন করেন। উহা পরে ইউনিভার্সিটী কলেজে পরিণত হয়। অঘোরনাথ নিজামকর্ত্তৃক পুনরাহূত হওয়ায় ইউনিভার্সিটী কলেজটী বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিক্রয় করিয়া যান, এবং তাহা মেট্রোপলিটান কলেজের সহিত একীভূত হয়।

হায়দরাবাদ হইতে পেন্স্যান লইয়া তিনি কলিকাতায় অবস্থিতি করেন। এখানে তিনি কিছুকাল সিটি কলেজে অবৈতনিক বিজ্ঞানাধ্যাপকের কাজ করেন।

ইউরোপে সে কালে কোন কোন অনুসন্ধিৎসুলোক নিকৃষ্ট ধাতু সকলকে কিরূপে স্বর্ণে পরিণত করা যায়, তাঁহার উপায় আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের শ্রম ব্যর্থ হয় নাই। কারণ, উহা হইতে অনেক রাসায়নিক আবিষ্কার হইয়াছিল। নব্য রসায়নী বিদ্যার পূর্ব্বগামিনী এই বিদ্যা ইংরেজিতে আলকেমী নামে পরিচিত। যাঁহারা এই বিদ্যার অনুশীলন করিতেন তাঁহাদিগকে আল্‌কেমিষ্ট্‌ বলা হইত। ডাক্তার অঘোরনাথ আধুনিক রসায়নী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াও আলকেমীর চর্চ্চা করিতেন।

অন্যান্য ধাতুকে সোণা করিবার নূতন কোন একটা প্রক্রিয়ার কথা যে কেহ বলিত, সেই তাঁহার নিকট আদৃত হইত। এই সব প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বরাবর তাঁহার গৃহে হইত। এইজন্য অনেক বৈজ্ঞানিক তাঁহাকে পরিহাস করিতেন, এবং তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃতি হইয়াছে মনে করিতেন; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস অটল ছিল। আমাদের দেশের অনেক সাধু সন্ন্যাসীর এইরূপ বিশ্বাস আছে, এবং কোন কোন শিক্ষিত লোক এরূপ গল্প করেন যে তাঁহারা স্বচক্ষে সন্ন্যাসী বিশেষকে সোণা প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছেন। আমরা বৈজ্ঞানিক নহি। আমাদের নিকট ব্যাপারটি অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এখনও উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই, এই যা।

ডাক্তার অঘোরনাথ যৌবনে কেশবচন্দ্র সেনের চরিত্র ও উপদেশের প্রভাবে তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত সহপাঠীদিগের সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তিনি স্বাধীনচেতা মনখোলা সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। ছেঁড়া নেকড়াপরা ভিখারীকেও তিনি নিজের সঙ্গে এক টেবিলে খাওয়াইতেন। হায়-দরাবাদে তাঁহার গৃহে নিত্য এক দরবারের মত হইত। তাহাতে হিন্দু মুসলমান, রাজা ও ভিখারী, সাধু ও দুর্বৃত্ত সকলের সঙ্গে সমান ভাবে বৈঠক চলিত, জীবনের বহু বৎসর মুসলমান রাজ্যে যাপিত হওয়ায় তাঁহার পোষাক ও আদবকায়দা মুসলমানী ধরণের হইয়া গিয়াছিল। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত

ছিলেন, এবং দাক্ষিণাত্যের শিবগঙ্গা সমাস্থান হইতে বিদ্যারত্ন উপাধি পাইয়াছিলেন। (প্রবাসী)

সমাজ সেবা—মানুষ ইচ্ছা করিলে নানা ভাবে সমাজের সেবা করিতে পারে। পল্লীগ্রাম হইতেই সমাজ সেবার আয়োজন করা কর্ত্তব্য। কলিকাতা প্রভৃতির ন্যায় বড় সহরে যাহারা থাকে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসা অতি অল্প স্থলেই জন্মিতে দেখা যায়। যাহা জন্মে তাহা মৌখিক, আন্তরিক নহে। অনেক সময় পাশের বাড়ীর লোকের সন্ধান রাখিবার সুযোগও অনেকেরই ঘটে না। কিন্তু গ্রামে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। ক্ষুদ্র স্থান—জনসংখ্যা অল্প, প্রতিদিন শোকে দুঃখে সম্পদে বিপদে পরস্পরে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা এবং সমবেদনার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয় বলিয়া—প্রণয় গাঢ় হয়। সহরে বহুজনতার মাঝখানে তাহা হইতে পারে না, তাই পল্লী ও সহরে এত প্রভেদ। তারপর সহর অপেক্ষা পল্লীতেই বেশী লোক বাস করে, হাজার মধ্যে ৯৬০ জন লোকই পল্লীর অধিবাসী। কাজেই যিনি যাহাই বলুন না কেন পল্লীসমাজ কোন রূপেই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। গ্রামের প্রতি অধিকাংশ স্থলেই অর্থশালী গ্রামবাসার তাদৃশ মনোযোগ দেখা যায় না। তাঁহারা সহরে থাকিয়াই দেশের অবস্থা বুঝিতে চাহেন। ওদিকে দেশ যত্নাভাবে জঙ্গলাকীর্ণ, ওলাউঠা ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত, দেশের লোক মৃতপ্রায়। কিন্তু সে কথা কে শোনে? অধিকাংশ স্থলেই অর্থশালী ভূম্যধিকারী আত্মসুখ লইয়া ব্যস্ত, জমিদারের কর্ম্মচারী স্বার্থ-সাধনে উন্মত্ত, পল্লীর কথা কে ভাবিবে? তাই দীন দরিদ্র পল্লীবাসী কৃষক ও মধ্যবিত্তাবস্থাপন্ন ব্যক্তিবর্গের হাহাকারে পল্লীগ্রাম মুখরিত। বাঙ্গালার পল্লীর সহিত দিন দিন বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। যাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে সরকার বাহাদুরের সহিত ঘনিষ্ঠ-রূপে পরিচিত, যাঁহারা আট কোটী বাঙ্গালীর প্রতিনিধি তাঁহারাও পল্লীর স্বরূপ জ্ঞাত নহেন। তাঁহারা ভ্রমেও কখন পল্লীতে পদার্পণ করেন না। তাঁহারা কংগ্রেস্ করেন, কন্‌ফারেন্স করেন. মফস্বল ও সহরে যাইয়া বক্তৃতা করেন; ঐখানেই তাঁহাদের পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে সন্ধান ও অভিজ্ঞতার শেষ। তাঁহারা পল্লীর অবস্থা প্রত্যক্ষ না করিয়া পল্লীর সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশ করেন

তাহা কার্য্যকরী না হইয়া শুধু কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হয়। সৌভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে রাজপুরুষগণ বিশেষরূপে পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য বিষয়ে মন দিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

গভর্মেণ্ট সব করিবেন আর আমরা নীরব থাকিব—আলস্য-স্রোতে গা ঢালিয়া দিব এ কেমন কথা? পল্লীগ্রামবাসীর শতক্রটি, শত দলাদলি, শত সঙ্কীর্ণতা, শত পরপীড়াজনক কার্য্য সব প্রকৃত কর্ম্মবীর যিনি তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে হইবে। সব সমাজেই ভাল এবং মন্দ এই দুইশ্রেণীর লোক থাকিবে।

যাহারা মন্দ তাহাদের উপদ্রব, অশান্তি, জাল জালিয়াত ও মিথ্যা সাক্ষ্য মোকদ্দমার ভয়ে ভীত হইলে চলিবে না। অনেক সময় গ্রাম্য নিরীহ ভদ্রলোকেরা ঐরূপশ্রেণীর লোকের ভয়ে কোনও মহৎকার্য্য করিতে সাহস পান না। আবার এমনি বিচিত্র যে যাহাদের গ্রামে সামান্যমাত্র প্রতিপত্তি আছে তাহারা অধিকাংশ স্থলেই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐরূপ শ্রেণীর লোকের সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকেন; তাহারি ফলে ঐসমস্ত বদমায়েসের দল নির্ভিকভাবে নানাবিধ অসৎ কার্য্য করিতে সাহস পায়। গ্রাম্য মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা এইজন্যই শঙ্কিতচিত্তে কালাতিপাত করেন। তাহাদের এই ভয়ের ভাব দূর করিবার জন্য শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের বিভিন্ন জেলার ও সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষগণের গ্রামে গ্রামে প্রচারক পাঠাইয়া গভর্মেণ্টের সহযোগিতায় কার্য্য করিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

গ্রামের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, আমাদের বিশ্বাস তাহারা ঐ সকল কার্য্য সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহায়তায় অতি সহজেই নিষ্পন্ন করিতে পারেন। (ক) গ্রামে এক শ্রেণীর যুবক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে জীবন যাপন করে, পিতামাতা কিম্বা অন্য কোনও অভি-ভাবকের শাসন-বাক্য গ্রাহ্য করে না, তুচ্ছ আমোদ প্রমোদ, তাস পাশা, গাঁজা তামাকের আড্ডা কিম্বা পুষ্করিণীতে মৎস্যশিকার করিয়াই জীবনের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করে। ইহাদের এইরূপ নৈতিক অবনতির প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব। কাজে কর্ম্মে না থাকিলেই মানুষের মন বিবিধ অসৎ চিন্তায় ব্যস্ত রহিয়া বিবিধ অনর্থের সৃষ্টি করে। এসকল যুবক ও বালকদের যদি কোনরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহাহইলে একটী মহদুপকার সাধিত হয়।

প্রতিদিন দুই এক ঘণ্টা করিয়া ইহাদের শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে অত্যন্ত কল্যাণ হয়। নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে কেবল যে এই শ্রেণীর যুবকগণেরই শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে তাহা নহে। পরন্তু কৃষকগণেরও শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যদি মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়গণের নিকট সরকারী সাহাযোর জন্য প্রার্থনা করা যায় তাহা হইলে সরকারী সাহায্য পাইবার আশাও একরূপ করা যাইতে পারে।

(খ) আমাদের পল্লীগ্রামের মহিলারা অধিকাংশ স্থলেই নিরক্ষর, স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধেও অনভিজ্ঞা। এই জন্যই পল্লীগ্রামে এক বাড়ীতে কাহারও কোন সংক্রামক পীড়া হইলে অতি অল্প সময় মধ্যে সারাগ্রামে ছড়াইয়া পড়ে। এসকলের প্রতিষেধক উপায় শিক্ষা। ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের ন্যায় পারিবারিক শিক্ষা দান প্রণালী পল্লীগ্রামে অনুসৃত হইতে পারে কি না তাহাও বিবেচ্য বিষয়। এসম্বন্ধে একটি উপায় অবলম্বন করিলে কতকটা সাফল্যের আশা করা যায়। সাধারণতঃ পল্লীবাসিনী মহিলারা আহারাদির পর বিবিধ কল্পনা জল্পনা, এবং অনাবশ্যক গাল গল্পে সময় অতিবাহিত করেন। সে সময়ে যদি তাহাদের একটা মিলনের ব্যবস্থা করা যায় এবং কোনও শিক্ষিতা মহিলা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ কিম্বা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া সাস্থ্যরক্ষার স্থূল তত্ত্বগুপি বর্ষীয়সী রমণীগণকে বুঝাইয়া দেন এবং তাহারা যাহাতে প্রকৃত পক্ষে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে সেই নিয়ম গুলি দৈনন্দিন গৃহ কার্য্য করিবার সময় অনুসরণ করে তাহা হইলে ক্রমশঃ অতি সহজেই পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য এবং নৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবার সম্ভাবনা জন্মে। একদিনে দুইদিনে এসব কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার আশা বাতুলতা মাত্র। স্ত্রীলোকদিগকে অশিক্ষিতা রাখিলে আমাদের পদে পদে নানা বিপদ, কাজেই এবিষয়ে আমাদের দীর্ঘকাল নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। গ্রামের উন্নতির জন্য চেষ্টিত না হইলে আমাদের রক্ষা নাই, অতএব যাহাতে পল্লীগ্রামের অভাব অভিযোগ দূর হয়, পল্লীবাসিগণ সাধারণ শিক্ষার গুণে স্বাস্থ্য রক্ষার উপকারিতা বুঝিতে পারে এবং বৃথা কলহ দ্বারা আত্মশক্তিক্ষয় না করিয়া পরস্পরে দেশের হিতার্থে নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী দেশহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় সে বিষয়ে প্রত্যেকের মনযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

বিক্রমপুর তেলিরবাগনিবাসী সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, বি, এ, বার এট্ ল মহাশয় বিগত অগ্রহায়ণ মাস হইতে "নারায়ণ" নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেছেন। নারায়ণ যেরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে আশা করা যায় উহা শীঘ্রই বাঙ্গালা সাহিত্যের মাসিক সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই কাগজের সাফল্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু সি, আই, ই মহোদয় আগামী জুন মাসে বিলাত হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

কতকগুলি অনিবার্য্য কারণে বিক্রমপুর রীতিমত সময়ে প্রকাশিত হইতে পারে নাই, সে জন্য আমরা গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও বন্ধুবর্গের নিকট সবিশেষ লজ্জিত আছি। দৈবদুর্বিপাকই আমাদের অনিয়মিত প্রকাশের প্রধানতম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাসিক কাগজ নিয়মিত সময়ে প্রকাশ না হইলে গ্রাহকগণের পক্ষে যে কতদূর অসুবিধার কারণ হয় তাহা আমরা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও, কোনরূপ সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারি নাই, সেজন্য আমরা একান্ত লজ্জা অনুভব করিতেছি।

যাহাতে শীঘ্রই এই ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করিয়া গ্রাহকগণের মনস্তুষ্টি করিতে পারি, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। সুধীবৃন্দ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে বিক্রমপুরের প্রতি গ্রামেই ওলাউঠা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। মৃত্যুসংখ্যাও নেহাৎ কম হয় নাই। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি ঔদাসীন্যই ইহার প্রধান হেতু বলিয়া মনে করি। বর্ষার জল যখন সমগ্রবর্ষের সঞ্চিত বিবিধ আবর্জ্জনা নদী নালা খাল বিল দিয়া অপসারিত করিতে থাকে, তখন দেশের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। সে সময়ের দূষিত জল সেবনেই বিবিধ পীড়ার উৎপত্তি হয়। ওলাউঠা রোগ সাধারণতঃ জলের দ্বারাই সংক্রামিত হয়। বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করিলে এবং কতকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়ম পালন করিয়া চলিলে ওলাউঠা, রক্তামাশয় প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের হস্ত হইতে অনায়াসে রক্ষা পাওয়া যায়। "বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা" ওলাউঠা, রক্তামাশয়, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে কিরূপ ভাবে চলা উচিত, তৎসম্পর্কে এক খানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিনা-

মূল্যে বিতরণ করিতেছেন। 'বিক্রমপুর' পত্রেও এ সম্বন্ধে বিশেষ রূপে আলোচনা করা হইয়াছে। যাঁহারা সম্মিলনী সভার প্রচারিত পুস্তিকা পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন এম, এ, বি, এল, ৫৯ নং হ্যারিসন রোড, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে পাইতে পারেন।

পৌষ ও মাঘ এ দু'মাসের "বিক্রমপুরের" স্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল ছিল। এবার দেশে দুগ্ধ ও মৎস্য অত্যন্ত সুলভ গিয়াছে। এরূপ সুলভ দরে শীঘ্র দুগ্ধ মৎস্যাদি বিক্রয় হয় নাই। পৌষ ও মাঘ এ দুই মাসে বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ বরাবরই ভাল থাকে। কিন্তু এবৎসর বিক্রমপুরের কোন কোন গ্রামে বসন্ত রোগেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। মা শীতলা দেবী কোন বারই বিক্রমপুরে এবারকার ন্যায় অত্যধিক পরিমাণে অনুগ্রহ-দৃষ্টি করেন নাই। কলিকাতা হইতে অনেকে রোগগ্রস্ত হইয়া দেশে আসিয়াই উহার বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া দেন।

সে সময়ে খাদ্য দ্রব্যাদিও সুলভ হয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও নয়নরঞ্জক হয়। যাহারা সামান্য একটু অজীর্ণ রোগ বা জ্বর জ্বালার জন্য গিরিডি, দেওঘর, পুরী বা পশ্চিমের অন্য কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গমন করেন, তাঁহারা যদি সেই সময়ে দেশে আসিয়া খোলা মাঠের খোলাবাতাস সেবন করেন ও দেশজাত শাক্ সবজী, মাছ, অকৃত্রিম ঘৃত দুগ্ধ ও পল্লীজননীর স্নেহশীতল কোলে বিরাম সুখ উপভোগ করেন, তাহা হইলে আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও চিত্ত-প্রসাদ উভয়ই লাভ হয়। কিন্তু হায়!

এরা পরকে আপন করে আপনারে পর
বাহিরে বাঁশীর রবে ছেড়ে যায় ঘর।

আমরা নানাকারণে এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত পুস্তকাদির নিয়মিত সময়ে সমালোচনা করিয়া উঠিতে পারি নাই। আগামী বর্ষ হইতে প্রাপ্ত গ্রন্থাদির নিয়মিতরূপ সমালোচনাদি প্রকাশিত হইবে।

অধ্যাপক শ্রীযুত শশিভূষণ দত্ত এম, এ, মহোদয় এখন গিরিডি অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত সতীশ রঞ্জন দাশ বার-এট-ল,

ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল ও বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার সহযোগী সভাপতি।

বিক্রমপুর

২য় বর্ষ	ফাল্গুন ও চৈত্র ; ১৩২১	১১শ ও ১২ সংখ্যা

বিশ্ব-প্রেম

তাঁর পানে চেয়ে আমি,
সেকি কভু মোর পানে চায়,
কাছে যাই ধরি ধরি,
সে যে হায় ! ছুটিয়া পালায় ;—

সান্ত এ হৃদয়-মাঝে
অনন্তের কিসে হবে স্থান ?
একবার নাহি ভাবে
আমার এ অশান্ত পরাণ।

সঙ্কীর্ণ পিঞ্জরে তাঁরে
পুষিবারে মনের বাসনা,
সঙ্কীর্ণতা নহে প্রিয় তাঁর,
মন মম বুঝেও বুঝে না ;—

বুঝে না বলিয়া এই
সঙ্কীর্ণতা নিয়ে চিরদিন
অনন্ত বিপুলে চায়
করিবারে ইহার অধীন ;

মৃগ-তৃষ্ণিকায় মুগ্ধ
দুরাকাঙ্ক্ষ মৃগের সমান
মত্ত তুমি, তবু বল,
সে তোমারে করে প্রত্যাখ্যান !

চাহিলে তাঁহারে মন,
বুঝ তাঁর অনন্ত স্বরূপ,
বিশ্বময় করিছে বিরাজ
মোহন রূপেতে বিশ্বরূপ,

অনন্ত বিশ্বের এই
অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারে,
নির্লিপ্ত নির্গুণ নিজে,
তবু প্রকাশিছে আপনারে।

প্রকটিত রূপে তাঁর
মনঃ প্রাণ কর সমর্পণ,
ক্রমে প্রতিভাত হবে
মনোমাঝে সে চিন্ময় ধন ;—

অন্য পরিশ্রম বৃথা
বাধ তাঁরে বিশ্ব-প্রেম-ডোরে,
সে ডোর ছিঁড়িয়া যাবে
এত বল সে তো নাহি ধরে !

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী

সংস্কৃতশাস্ত্রে বাঙ্গালী

কবিকর্ণপূর

নদীয়া জিলার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ১৫২৪ খৃঃ অব্দে (কাহারও মতে ১৫২৭ খৃঃ অব্দে) বৈদ্যবংশে কবিকর্ণপূরের জন্ম হয়। কবিকর্ণপূরের পিতা প্রসিদ্ধ শিবানন্দ সেন। কবিকর্ণপূরের প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। কবিকর্ণপূর উপাধি মাত্র। কবিকর্ণপূর যখন ৭।৮ বর্ষের শিশু তৎকালে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে বাৎসল্য বশতঃ কবিকর্ণপূর বলিয়া আহ্বান করেন। পরে পরমানন্দকে সকলেই এই ঔপাধিক নামে ডাকিতেন। কালে গৌরাঙ্গ প্রভুর প্রদত্ত "কবি" উপাধির সার্থকতা হইয়াছিল। খৃঃ ১৫৯৪ অব্দে কবিকর্ণপূর স্বর্গস্থ হন।

কবিকর্ণপূর যে সমুদয় সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন তন্মধ্যে "চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক" ও "আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ" সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন তিনি, অলঙ্কার কৌস্তুভ, চৈতন্য শতক, বৃহৎ-গণোদ্দেশ-দীপিকা, শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকা, স্তবাবলী, চৈতন্য-চরিত-কাব্য, কেশবাষ্টক প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

কবিকর্ণপূর লিখিত গ্রন্থাবলী মধ্যে "আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ" সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎগ্রন্থ। ইহার শ্লোক-সংখ্যা কিঞ্চিন্ন্যূন পঞ্চ সহস্র হইবে; তৎ ভিন্ন গদ্য ভাগও ক্ষুদ্র নহে। এই গ্রন্থখানি দ্বাবিংশ স্তবকে (অধ্যায়ে) সম্পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা-বর্ণনায়, এই গ্রন্থ পরম ভাগবত কবিকর্ণপূর কর্ত্তৃক লিখিত হয়। গ্রন্থের পংক্তিতে পংক্তিতে ভক্তিরস যেন উচ্ছ্বসিত হইতেছে। ভাষা প্রাঞ্জল এবং সহজ-বোধ্য। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী "সুখ বর্দ্ধিনী" নামে ইহার একখানা টীকা লিখিয়াছেন। গৌড়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বিগণের সংখ্যা অধিক ছিল না। বৈষ্ণবগণও একটুকু বেশী বেশী ধর্ম্মোন্মাদকতা দেখাইতেছিলেন, সুতরাং শাক্ত, শৈব ও দার্শনিক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এবং তৎকালীয় সাধারণ বাঙ্গালী সমাজ, বৈষ্ণব

সমাজকে নানারূপ বিদ্রূপ করিতেন। কবিবর্ণপুর নাট্যশালায় ভক্তি ও ভক্তের আদর্শ, অবৈষ্ণবদিগের দুর্দ্দশা, ভগবৎ প্রেমের শান্তিময়ী মূর্ত্তি, সর্ব্বসমক্ষে দর্শান জন্যই এই অভিনব নাট্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১০টী অঙ্কে এই নাটকের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। প্রত্যেক অঙ্কের শেষেই অভিনয় শব্দ যোজিত হইয়াছে, যথা কল্যধর্ম্ম অভিনয়, প্রেমমৈত্রী অভিনয় ইত্যাদি। অলঙ্কারকৌস্তুভ একখানা অলঙ্কার শাস্ত্র। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে গৌরাঙ্গদেব ও তৎ-পারিষদ্‌বর্গের বর্ণনা ও সংক্ষেপ ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থগুলি সমুদয়ই ভক্তি-গ্রন্থ।

শিবানন্দ সেন চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পার্শ্বচর ও ভক্ত ছিলেন। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণাবতারে বৃন্দাবনধামে শ্রীরাধিকার যে প্রধানা অষ্ট সখী ছিলেন তন্মধ্যে সুমিত্রা একজন প্রবীণা। এবং গোপলী অন্য একজন সখী ছিলেন; ইঁহারা সমুদয়েই কৃষ্ণ-গত-প্রাণা, সকলেই মধুর ভাবে শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গভক্তগণ গৌরাঙ্গ অবতারে শিবানন্দ সেনকে সুমিত্রা দেবীর এবং কবিকর্ণপূরকে গোপালী দেবীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস ও পূজা করিতেন। মহাপ্রভু যখন সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ সহ দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, শিবানন্দ সেন তখন চৈতন্য প্রভুর সহচর হন এবং এই বহু-জন-পূর্ণ ভক্ত-মণ্ডলীর চালকত্বের ভার শিবানন্দের হস্তে অর্পিত হয়। যখন নীলাচলে পিতা শিবানন্দ সেন সহ কবিকর্ণপূর চৈতন্যপ্রভুর পদারবিন্দে প্রণত হন তখন কবিকর্ণপূরের বয়স সাত কি আট বর্ষ মাত্র, কিন্তু সেই শিশুর ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিই মহাপ্রভু সাদরে গ্রহণ করেন।

শ্রীকামিনীকুমার ঘটক।

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ

ঘোষের কোলাপাড়া (১)

ঘোষের কোলাপাড়া, ভাগ্যকুল হইতে ২½ মাইল পূর্ব্বে এবং শ্রীনগর হইতে ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

ঘোষ বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামটি কোলাপাড়া নামে অভিহিত হইতেছে, প্রবাদ আছে স্বর্গীয় রামেশ্বর ঘোষ মহাশয় পুণ্যতোয়া ব্রহ্মপুত্রে স্নান করার জন্য যশোহর জিলার অধীন বনগাঁ হইতে লাঙ্গলবন্ধ তীর্থে যাইবার সময় পথে বিলপাগলা গ্রামের ঐশ্বর্য্যশালী করবংশের একটি রূপলাবণ্যবতী কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর তিনি সস্ত্রীক দেশে গিয়াছিলেন; কিন্তু সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় শ্বশুরের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

রামেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের তৃতীয় পুরুষ দেওয়ান গৌরীপ্রসাদ ঘোষ নামে বিদ্বান, পরাক্রমশালী, ধর্ম্মপ্রাণ, জ্ঞানদীপ্ত এক পুরুষের জন্ম হয়। এই দেওয়ান গৌরীপ্রসাদ কাহার দেওয়ান ছিলেন তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাঁহার সময়ের দলীল পত্রের সন তারিখ দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় তিনি বাঙ্গালার নবাব মিরজুমলার সমসাময়িক লোক।

এই দেওয়ান গৌরীপ্রসাদ ঘোষ, ঘোষের কোলাপাড়ার সৃষ্টিকর্ত্তা। খুব নিম্ন স্থান বাঁধিয়া গ্রামটী বসাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম ঘোষের কোলাপাড়া রাখা হইয়াছিল। কোল হইতেই কোলাপাড়া নামের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এই গ্রামের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড কাইলানী নামক বিল আছে। এখনও ঐ বিলে বারমাস জল থাকে। গ্রামটি যে এক সময়ে গভীর জলাশয় ছিল ইহা হইতেই তাহা প্রতীয়মান হয়। সে যাহা হউক গ্রামটি বসাইতে নানা স্থান হইতে নানা সম্প্রদায়ের লোক আনাইতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, গোয়াল, কৈবর্ত্ত, ভুঁইমালী, বণিক্য, সাহা, ধোপা, নাপিত, বেলদার, কাচারু প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের লোক বসাইয়া গ্রামটির সৌষ্ঠব সম্পাদন করা

হইয়াছিল। গ্রামের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করান; এবং প্রচুর নানকার ভূমি-দান করিয়া দস্যু, তস্কর হইতে গ্রাম রক্ষার জন্য বেলদারদিগকে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

গ্রামের মধ্য দিয়া একটা খাল পশ্চিমদিকের বিল হইতে লৌহজঙ্গ পর্য্যন্ত বহিয়া গিয়াছে। 'খরা'র দিনে এই খালে সামান্যমাত্র জল থাকে। তখন নৌকা চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। শ্রীনগর হইতে ভাগ্যকুল পর্য্যন্ত লম্বা লম্বি একটা প্রশস্ত হালট গ্রামটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই হালটের দক্ষিণ দিক ঘোষের কোলাপাড়া এবং উত্তর দিক উত্তর কোলাপাড়া নামে কথিত হইতেছে। ঘোষের কোলাপাড়ায় হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক আছে। ইহার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উত্তর কোলাপাড়ায় কেবল মুসল-মানেরই বাস।

এই মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই কাচারু নামে অভিহিত। মুসলমান-দের মধ্যে ইহাদের প্রাধান্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই কাচারুগণ পূর্ব্বে মেয়েদের চুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহার আয়েই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু বিদেশীর কৃপায় এ দেশে নানা প্রকার চাক্‌চিক্যশালী চুড়ি ইত্যাদি আমদানী হওয়ায় তাহাদের ব্যবসাটি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কাচারুদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই দূর দেশ হইতে কড়াই ও চিনা বাসনের বিনিময়ে ভাঙ্গা পিতল কাঁসা ও তামার জিনিষপত্র আনিয়া তাহার লাভে অবস্থা অনেক ভাল করিয়াছে। কতক কতক কাচারু তরিতরকারি ও ষ্টেশনারী দ্রব্যের ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

এটি হিন্দুপ্রধান গ্রাম। ঘোষবংশই সম্মানিত। মুসলমানেরা ঘোষদিগকে ভূঁইয়া বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। হিন্দুর মধ্যে ঘোষবংশ ব্যতীত দুই ঘর গুহবংশ ও ১৫।২০ ঘর নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু আছে। এই গুহবংশের মধ্যে স্বর্গীয় দুর্গাচরণ গুহ মহাশয় ঘোষেদের স্থাপিত। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুহ মহাশয়-দের বংশ পূর্ব্বে বিলপাগলা ছিল, পরে তাঁহারা ঘোষের কোলাপাড়া আসিয়া বসত করিতেছেন। বিলপাগলা গ্রাম ঘোষের কোলাপাড়ার লাগ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এখন ঐ গ্রামে আর হিন্দুর বাস নাই। গুহবংশের মধ্যে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুহ মহাশয়ের বংশই বিদ্যা ও বড় বড় চাকুরিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার

করিয়া রহিয়াছে। সিং ও দত্ত বংশ ব্যবসায় আর্থিক অবস্থায় খুব উন্নত হইয়াছিল। কিন্তু গৃহ বিবাদে সিং বংশ ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে, ধার কর্জ্জও প্রচুর আছে। এই দেনার জন্যই বোধ হয় ইহারা সর্ব্বস্বান্ত হইবে, দত্তদেরও এখন কোন বড় কারবার নাই। তৈল, লবণ ইত্যাদির সামান্য ব্যবসা চালাইতেছে। সাহাদের মধ্যে মধুসূদন সাহার নাম উল্লেখযোগ্য, গ্রামের মধ্যে সে-ই প্রধান ধনী। মুসলমানদের মধ্যে সিদ্দিক মুন্সীর বংশই সম্মানিত, মৌলবী মহম্মদ আরব্য ও পারশ্য ভাষায় সুপণ্ডিত, ইহাদের বাড়ীর অধিকাংশ ব্যক্তিই পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষিত। ব্রাহ্মণ এই গ্রামে ১০।১২ ঘর আছেন। পণ্ডিত শ্রীযুত প্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে চক্রবর্ত্তী বংশ ঘোষেদের পুরোহিত এবং স্বর্গীয় পূজ্য পণ্ডিত-প্রবর আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশ ঘোষেদের ইষ্টদেবতার বংশ। ভট্টাচার্য্য বংশ ঘোষের কোলাপাড়া হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই স্থানে শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন গাঙ্গুলী মহাশয় ইষ্টদেবতা হইয়াছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন উকিল ব্যতীত আর বড় দরের চাকুরী কেহ করেন না।

গ্রামের মধ্যে একটী হালট ব্যতীত আর কোন ভাল রাস্তা নাই, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কোন দিকে যাইতে হইলে সরু সরু আঁকা বাকা হাতালের উপর দিয়া ঘুড়িয়া ফিরিয়া চলিতে হয়। গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল। কিন্তু সময় সময় কলেরার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, সাধারণতঃ নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই কলেরার প্রকোপ দৃষ্ট হয়।

আন্দিপুকুরের ও শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের, বাধা পুকুরের জল গ্রামবাসী অধিকাংশ লোকেই পান করিয়া থাকে। আন্দিপুকুর খুব বড়; ঘোষপাড়ার মধ্যে অবস্থিত; 'উন্নার' দিনেও ইহাতে ১০।১২ হাত জল থাকে। ঘোষের দীঘি প্রায় ¼ মাইল স্থান নিয়া বিস্তৃত, এই দীঘি দত্ত, গোপ, সাহা ও কৈবর্ত্তপাড়ার মধ্যে থাকিয়া আপন অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছে। এই দীঘিটীর পাড়ের বা কান্দার প্রতি বাড়ীর পায়খানাই দীঘির উপর নির্ম্মিত, সুতরাং ইহার জল সম্পূর্ণ পানের অনুপযোগী। দীঘিটির বর্ত্তমান অবস্থা ভাল নয়, সংস্কারের অভাবে ভরিয়া উঠিতেছে। গ্রামে দুইটি হাট আছে। সপ্তাহে তিন দিন করিয়া বসে। হাটে আবশ্যকীয় নিত্য-প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকারের জিনিষই আমদানী হইয়া থাকে। হাটের

বিক্রেতা প্রায় সকলেই ঘোষের কোলাপাড়ার লোক, গ্রামে কোন বাজার নাই। বাজার না থাকিলেও গ্রামবাসীর কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। গ্রামখানাকে একটা প্রকাণ্ড সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাজার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রামে প্রায় ১০০ ঘর গোয়াল ও ৮০।৯০ ঘর কৈবর্ত্ত বাস করে। প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যবসায় করিয়া থাকে। রাত দুপ্রহরের সময়ও প্রচুর মৎস্য, দধি, ক্ষীর, তরিতরকারি অনায়াসে সংগ্রহ করা যায়।

এখানে ৫০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবত একটী সার্কেল স্কুল আছে, স্বর্গীয় রাধা কিশোর ঘোষ মহাশয় ইহার স্থাপয়িতা। এক সময় ঢাকা ডিভিসনের মধ্যে এই স্কুলটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্কুল রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ইংরাজি পড়ার উপর লোকের ঝোঁক পড়ায় এবং গ্রামের নিকটবর্ত্তী 'কাজিরপাগলা' একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় সার্কেল স্কুল খুব শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কর্ম্মবীর স্বার্থত্যাগী শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সার্কেল স্কুলটির পতনদশা দর্শনে গ্রামের কয়েকটী উৎসাহী কর্ম্মীর সাহায্যে সর্ব্বসাধারণের চাঁদায় তাঁহার বাড়ীর পুকুরের পাড়ে একখানা টিনের ঘরে একটী মাইনার স্কুল বসাইয়াছেন। আনন্দ বাবু এই স্কুলটির জন্য যেরূপ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য গ্রামবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। স্কুলটি নিয়মিতরূপেই চলিতেছে। ইহা ভিন্ন দুইটী বালিকা বিদ্যালয় আছে। একটি ৪৫ বৎসর যাবত ঘোষপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বিদ্যালয়ে একজন গুরু ও একটি শিক্ষয়িত্রী আছেন। গুরু ও শিক্ষয়িত্রীর যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটীতে বালিকা বিদ্যালয়টী খুব খারাপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। অপর বালিকা বিদ্যালয় ৩।৪ বৎসর যাবত ব্রাহ্মণপাড়ায় বসিতেছে; তাহার অবস্থাও বড় ভাল নয়।

ঘোষপাড়া "ফ্রেণ্ড ইউনিয়ন ক্লাব" নামে একটি পাঠাগার আছে। অর্থের অভাবে ইহার কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে না। গ্রামের অর্থশালী ব্যক্তিরা ক্ষুদ্র গ্রাম্য দলাদলী নিয়াই ব্যস্ত। মোকদ্দমায় টাকা জলের ন্যায় নষ্ট করিতেছে। দেশের কাজে তাহারা একেবারেই অন্ধ। কমলার বরপুত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, মধুসূদন সাহা প্রভৃতি যদি এদিকে একটুমাত্র দৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে পাঠাগারটী উৎকৃষ্ট পাঠাগাররূপে পরিণত হইত। স্কুলের অবস্থাও অন্যরূপ দাঁড়াইত।

ঘোষপাড়ায় শ্রীশ্রী৺কাত্যায়নী একখানা খুব পুরাতন অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিতা আছেন। দৈনিক মার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। পূজার ব্যয়ের জন্য দেবোত্তর ভূমি আছে। কিংবদন্তি আছে রামকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় অত্যন্ত সুরাসক্ত ছিলেন। নিশার ঝোঁকে অধিবাসের দিন দশহরা মনে করিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন করেন। ইহাতে ধর্ম্মপ্রাণ গৌরীপ্রসাদ ঘোষবংশের অমঙ্গল হইবে ভয়ে তাহা নিবারণ কল্পে দুই হস্ত পরিমিত উচ্চ পিতল মূর্ত্তি শ্রীশ্রী৺কাত্যায়নী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূজার সময় ও অন্যান্য পর্ব্বে এখানে খুব ধূমধামের সহিত পূজা হইয়া থাকে। ঘোষেদের ইষ্টদেবতা শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ী শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বরী ও পুরোহিত শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীও দৈনিক শ্রীশ্রী৺দধিমঙ্গলঠাকুরের সেবা হয়। ঘোষবংশ শ্রীশ্রী৺ বিশ্বেশ্বরীর অর্চ্চনার জন্য প্রচুর দেবোত্তর ভূমি ইষ্টদেবতাকে দান করিয়াছিলেন।

ঘোষপাড়ায় বহু প্রাচীন বাংলা ইট মাটির নীচে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখনও বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ স্বর্গীয় বঙ্গচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে পড়িয়া রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত কালীকিশোর ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণদিকের প্রাচীন বাংলা ইটের ভগ্ন প্রাচীর দেখিবার জিনিষ। এই প্রাচীর কি ভগ্ন অট্টালিকা কে কখন প্রস্তুত করিয়াছিলেন কেহ বলিতে পারে না।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে সাড়ে তিনি শত বৎসরের বহু প্রাচীন দলীল আছে। স্বর্গীয় ব্রজলাল ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে ৩৬০ বৎসরের দুই খানা দাসখত পাওয়া গিয়াছে, অত্যন্ত পুরাতন ঘোষবংশের এক খানা বংশাবলী আছে। পুস্তকখানা এত পুরাতন যে ধরিয়া উঠাইতে ছিড়িবার আশঙ্কা হয়। অনেক স্থান কীট-দষ্ট। এই পুস্তকে গ্রামের অনেক পুরাতন কাহিনী আছে। *

---

* এই গ্রাম্য বিবরণীটি শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ মহাশয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণী প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আশা করি প্রত্যেকে নিজ নিজ গ্রাম্য বিবরণী লিখিয়া পাঠাইবেন।

কনকসার (২)

"কনকসার" উত্তর বিক্রমপুরান্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-প্রধান পল্লী। এই নাম কখন কি সূত্রে প্রথম সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই, তবে "সার" শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় এখানে গ্রামের নাম-করণ সময় হইতেই ব্রাহ্মণমণ্ডলীর বিশেষ প্রাধান্য ছিল। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে সমস্ত গ্রামের পশ্চাতে "সার" শব্দ সংযুক্ত আছে, সেই সকল গ্রামে ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত অধিক। যথা, পঞ্চসার, ডোমসার, তুলাসার ইত্যাদি। ইদানীং কোন কোন সারযুক্ত গ্রামে ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের পরিবর্ত্তে মুসলমান সম্প্রদায়ের আধিপত্য দৃষ্ট হয় বটে, তাহা কালের পরিবর্ত্তনে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। "কনকসার" গ্রামটী প্রথম নামকরণ সময়ে ব্রাহ্মণ-প্রধান বলিয়া অনুমান করা যায়, বর্ত্তমান সময়েও ইহা সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণপ্রধান। যদিও এ গ্রামে সামান্য কয়েক ঘর কায়স্থ, শূদ্র, কৈবর্ত্ত, ভূঁইমালী, চাড়াল আছে। ইহারা যে গ্রামনামকরণের বহু পরে ব্রাহ্মণমণ্ডলী কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন রূপ সন্দেহ করার কারণ নাই। এই অপর হিন্দু শ্রেণীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এই গ্রামে মুসলমান মাত্র নাই। গ্রামের পূর্ব্বদিকে "ধীতপুর" নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে; সেকানে মুসলমান ভিন্ন অন্য জাতি নাই। কনকসারের আর একটী বিশেষত্ব এই, এস্থান সম্পূর্ণ বৈদ্য শূন্য। এই গ্রামের বিশেষ পরিচয় "পরগণে বিক্রমপুর অধীন পরগণা মকীমাবাদ কিশমত দেউল ভোগ প্রকাশ্য কনকসার" এই পরিচয় পুরাতন ও অধুনাতন দলিলাদিতে প্রচুর কল্পে দৃষ্ট হয়।

"কনকসারের" উত্তর সীমা নাগের হাট, দক্ষিণ সীমা ঝাউটীয়া, পাঁইকাড়া ও ব্রাহ্মণগাও, পূর্ব্বসীমা মসাদগাও ধীতপুর ও বেজগাও এবং পশ্চিম সীমা হলদিয়া। অধিবাসী সংখ্যা অনুমান ২০০০।

গ্রামটী কয়েকটী পাড়ায় বিভক্ত। যথা, দিঘীর পাড়, মঠবাড়ী, উত্তরপাড়া পুরাণপাড়া, নয়াপাড়া এবং জ্যোতিষাপাড়া। প্রত্যেক পাড়াই ব্রাহ্মণ বহুল সমাকীর্ণ, মধ্যে মধ্যে দুই চারি ঘর ইতর শ্রেণী হিন্দু আছে। নিম্নে প্রত্যেক পাড়ার যথাসাধ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

দিঘীর পাড় এই নামকরণ একটী অতি বৃহৎ দীঘি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। দীঘিটী পূর্ব্ব পশ্চিম দৈর্ঘ্য, উত্তর দক্ষিণ প্রশস্তে। ইহার আকার ও পরিমাণ এত বৃহৎ যে উত্তর তীর হইতে দক্ষিণ তীরস্থ লোক নির্ণয় করা দূরে থাকুক, এক পাড় হইতে অত্যুচ্চ চীৎকার অপর পাড় শ্রুতিগোচর হয় না। জনশ্রুতি এই কোন ধনবান মগ অথবা মুসলমান কর্ত্তৃক এই সুবৃহৎ জলাশয় অতি পূর্ব্বকালে খনিত হইয়াছিল। এই জনশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অসঙ্গত বোধ হয় না ; কারণ কোন হিন্দুকর্ত্তৃক ইহা খনিত হইয়া থাকিলে উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘে না হইয়া পূর্ব্ব পশ্চিম দীর্ঘে খনিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। দীঘিটী কোন সময়ে খনিত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করার সাধ্য নাই ; তবে ইহার পুরাতনত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। ইহার অনেকাংশ ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং চতুঃপাড়স্থ অধিবাসীবৃন্দ আপন আপন সুখ সুবিধার জন্য অন্যান্য ২0টী অনতি বৃহৎ পুকুর ইহার মধ্যে খনন করিয়া লইয়াছে। এই সুবিশাল জলাশয়ের মধ্য ভাগ পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। তাহাতে ইহা সর্ব্বতোভাবে জলমগ্ন থাকে, তবে বর্ষাকালে জলের গভীরতা অধিক ন্যুন হইয়া যায়। ইহার দক্ষিণ পশ্চিম পাড়ে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বাস, কেবল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে কয়েক ঘর ইতর হিন্দু বাস করিতেছে। উত্তর পাড় ২।৩ ঘর কায়স্থ ও কয়েক ঘর নমশূদ্র কর্ত্তৃক অধিকৃত। পূর্ব্ব পাড়ের দক্ষিণ অংশে ইদানীং ২।৩ ঘর মুসলমান বাসস্থান স্থাপন করিয়াছে। পূর্ব্ব উত্তর ভাগে কোন বসত নাই। এই ভাগ জলপ্রবেশ ও নিঃসারণের স্থান। এই স্থানদ্বারা বর্ষাকালে বহুল পরিমাণে মৎস্যাদি দীর্ঘিকায় প্রবেশ করিয়া থাকে এবং বর্ষান্তে জালজীবী ও অন্যান্য লোক কর্ত্তৃক প্রচুর পরিমাণে মৎস্য ধৃত হয়। এই দীঘির দক্ষিণ পাড়স্থ অধিবাসের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে বর্ষব্যাপি বহমান একটী খাল বর্ত্তমান আছে। এই খাল দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ বোঝাই নৌকা এবং বর্ষাকালে ছোট ছোট বাষ্পযান গমনাগমন করিয়া থাকে। এই খালটী পদ্মা নদী হইতে লৌহজঙ্গ বন্দরের পূর্ব্ব পার্শ্ব হইয়া উত্তর মুখ চলিয়া কনকসারের সংলগ্ন দক্ষিণ ভাগ দিয়া পশ্চিম মুখ চলিয়া গিয়াছে। এই খালের বর্ত্তমানতা প্রযুক্ত বারমাস নৌকা পথে কনকসার গমনাগমনের বড়ই সুবিধা। সংক্ষেপতঃ কনকসারের সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব এই খালটী দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হইতেছে। দূরত্ব সম্বন্ধে

লৌহজঙ্গ ষ্টিমার ষ্টেশন হইতে ঠিক উত্তর দিকে, কণকসার ৩ মাইলের অধিক হইবে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত দীঘি হইতেই "দীঘির পাড়" নামাকরণ হইয়াছে। দক্ষিণ পাড়ে দক্ষিণ পশ্চিম অংশ ভিন্ন, কেবল ব্রাহ্মণের বাস। এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে "আশ্চর্য্য সাগড়ী" মেল ভুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ প্রধান, তদ্ভিন্ন "চট্টোপাধ্যায়" গাঙ্গোপাধ্যায় বংশও আছে। এই "আচার্য্য সাগড়ী" গাঙ্গোপাধ্যায় বংশ বেল পুকুরের ইষ্ট দেবতা বংশের অতি পূর্ব্ব পুরুষ সিদ্ধ ঠাকুর রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সন্তান। জনপ্রবাদ এই ঠাকুর প্রথমতঃ কনকসারেই বাস করিতেন এবং এখানেই দেবারাধনা ও কষ্টসাধ্য ব্রতাদি আচরণ করিয়া "সিদ্ধি" প্রাপ্ত হন এবং স্বর্গারোহণ করেন। কণকসারের পূর্ব্বভাগে "বনবাসীর" বাড়ী নামে একটী বাড়ী আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানে একটা সুবৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ বর্ত্তমান ছিল। ঐ বৃক্ষটী জরা-জীর্ণ অবস্থায় প্রবল ব্যাত্যা তাড়নে ভূপতিত ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে এই স্থানেই ঠাকুর রামচন্দ্র সিদ্ধি লাভ করেন। এই বনবাসীর বাড়ী সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ এই,—আচার্য্য বংশসম্ভূত "নয়া পাড়া" বা "নয়া বাড়ী" নিবাসী কোন এক মহাত্মার সহধর্ম্মিণী গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন এবং অনেক দিন রোগ-ভোগের পর হঠাৎ এক দিন জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়েন। তথ্যাবধানকারিগণ তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার মানসে পূর্ব্বোক্ত অশ্বত্থ তলে আনয়ন করতঃ চিতাশায়িনী করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দেয়। কিছুকাল পরে দেহ অগ্নি সংযুক্ত হইবা মাত্র স্ত্রী লোকটী অগ্নি সন্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সবলে চিতা হইতে পতিত হইয়া যায়। শ্মশান গমনকারি লোকেরা মৃত দেহ ভূতাশ্রিত হইয়াছে ভাবিয়া ভয়ে তথা হইতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে চলিয়া যায়। এ দিকে স্ত্রী লোকটী বহিস্থ শীতল বাতাসে সম্পূর্ণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া গভীর রাত্রে শ্মশান হইতে আপন গৃহ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া "আমি আসিয়াছি, আমার মৃত্যু হয় নাই, আমাকে গৃহে নেও" ইত্যাদি বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে থাকে। গৃহবাসিগণ একে শ্মশানের ঘটনায় ভয়ে একান্ত বিব্রত তাহাতে আবার এই গভীর রাত্রে এই চীৎকার শুনিয়া আরো ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে এবং গৃহদ্বার অতি দৃঢ় ভাবে অর্গল বদ্ধ

করিয়া দেয়। রাত্রি অবসান্ হইলে সকলে দেখিতে পায় স্ত্রী লোকটী সশরীরে বর্ত্তমান, তাহার মৃত্যু ঘটে নাই। বাস্তবিক তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল না, রোগের প্রকোপে তাহার "কুম্ভক" অবস্থা ঘটিয়াছিল, লোকে ঐ অবস্থাকেই মৃত্যু মনে করিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন করিয়াছিল। শাস্ত্র ও প্রচলিত প্রথানুসারে দেহ শ্মশানক্ষেত্রে নীত হইলে, বিশেষতঃ চিতাস্থ হইলে ঐ দেহ পুনঃ গ্রহণ করিলে, বাড়ী, গৃহ সমস্ত অপবিত্র হয়। সুতরাং সর্ব্ববাদীসম্মতি অনুসারে ঐ স্ত্রী লোকটীকে আর গৃহে গ্রহণ না করিয়া তাহার আজীবন বাস করিবার জন্য শ্মশান ক্ষেত্রের এক কোণে একখানি কুটীর নির্ম্মিত হয়। ঐ কুটীরেই সে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল। এই কারণেই শ্মশান ক্ষেত্রটী "বনবাসীর ভীটা" নামে খ্যাত। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি বনবাসীর ভীটাস্থিত অশ্বত্থ বৃক্ষটী কয়েক বৎসর হইল বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ঐ ভীটায় এক ঘর মুসলমান বাস করিতেছে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঞ্চনা

সূর্য্য কহে বসুধারে হের সখি আমি
আসিয়াছি নাশিতে আঁধার,
ভোল এবে অকরুণ তমিস্রা রজনী
দুঃখ তোমা দেছে যা অপার!
বসুন্ধরা কহে প্রিয় এ শুধু বঞ্চনা
অমৃত এ কিম্বা হলাহল,
ঢালি জ্যোতি কর মোরে আলোক পিপাসী
দহ মোরে জ্বালি তৃষানল!

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

প্রহেলিকা

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আমার বর্ণিত গ্রাম্যজীবনের এসকল সরল কাহিনী, বোধ হয়, তোমাদের প্রীতিপদ হইতেছে না। কি করিব? আমি শক্তিহীন, উপায়বিহীন লেখক। তবুও আমার সরলা গ্রাম্য বালিকা। সোণার বাঙ্গলার শত সহস্র নির্জ্জনপল্লীতে, গৃহস্থের গৃহোদ্যানে, প্রতি নিয়ত ফুল্লমল্লিকাসদৃশা যে সকল বালিকাগণ প্রস্ফুটিত হইয়া, চরিত্রের সৌরভে ও মাধুর্য্যে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণেকে মুগ্ধ করিয়া, নীরব নিশীথে ঝরিয়া পড়িয়া যায়, আমি তোমাদের নিকটে তাহাদেরই একটী ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র কাহিনী বলিতে বসিয়াছি। অতি সাধারণ সকল কথা লইয়া আমার এ আখ্যায়িকা গঠিত। যদি তোমাদের শুনিতে ইচ্ছা হয়, আমি ধীরে ধীরে আড়ম্বরবিহীন এ কাহিনী তোমাদের কাছে বিবৃত করিব। আর যদি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পার, তাহা হইলে আমার এ উপাখ্যানকে বরুণ অথবা অগ্নিদেবতার হস্তে সমর্পণ করিও। তবে এটী বলিয়া রাখি, তবু কোনও কবিতারাজ্যের কল্পনা-কন্যা নহে। সে তোমাদের একজন, তোমাদেরই ভগ্নী।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বড়ই গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। যে যাহার মনে ঘরের বাহিরে বসিয়া হাওয়া খাইতেছে।

জজবাবুর বাড়ীর সন্মুখস্থ মাঠে তেমন বালক দেখিতেছি না। কিন্তু, 'পালি-মেণ্ট হাউসে' এমন সময় কিসের গোলমাল? এস, ভিতরে প্রবেশ করা যাকৃ।

বৈকালের ডাকের বেগ, এইমাত্র লইয়া রানার চলিয়া গেল। কলমদানে কলম রাখিয়া, ক্ষুদ্র মোচ জোড়াকে দুর্ব্বল কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গুলিদ্বয়ের সাহায্যে একবার পালিস করিয়া, পোষ্টমাষ্টার রাইমোহন বাবু টেবিলের উপর উঠিয়া বসিলেন। তাহার দুই ধারে দেয়ালের কাছে, পোষ্টাফিসের কাগজ ও ফরমের বাক্সের উপর গ্রামের যুবক ও বালকবৃন্দ পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিল। দুই চারিজন স্থানাভাব-বশতঃ কোণায় দাঁড়াইয়া আছে।

এ কয়দিন দুবেলাই পার্লিমেণ্ট বসিতেছে। সভার বিবেচ্য বিষয়, এবার গ্রামের মেলা কোন্ দিন বসিবে এবং সেই উপলক্ষে কি কি তামাসা করা হইবে। কেহ বলিতেছে থিয়েটার হউক, কেহ বলিতেছে যাত্রা হউক, কেহ আবার তাহাদিগকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে, তাই বা কেন, খেম্‌টা নাচ্ হোক্, সখ্‌ও তো।

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে মায়াময়ীর মেলা বসিত। সে মাসের প্রথমদিন হইতে আরম্ভ করিয়া, আজ এ গ্রামে কাল ও গ্রামে এই প্রকার সকল গ্রামেই একে একে মেলা হইত। এই সকল মেলাগুলি কাহার দ্বারা, কোন্ সময় যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলা দুষ্কর। বাঙ্গালার গ্রাম্যজীবনের অন্যান্য সুখ সম্ভোগ, আমোদ আহ্লাদের সহিত ইহাদের অস্তিত্ব এমন ভাবে জড়িত, যে মনে হয়, গ্রাম সমূহের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদেরও উদ্ভব হইয়াছে।

অনেক বাদানুবাদের পর স্থিরীকৃত হইলে যে সাতাশে বৈশাখ মেলা হইবে। মায়াময়ীয় মেলা, প্রতিবৎসরই একটু বিলম্বে বসিত। কারণ, তাহা না হইলে বিদেশে যে সকল ছেলেরা স্কুলে কলেজে পড়িত, তাহারা আসিয়া যোগদান করিতে পারিত না। ক্ষুদ্র গ্রাম। লোকসংখ্যা অল্প। সকলের ভিতর এসব বিষয়ে বেশ একটু সদ্ভাব ছিল। কেহ মেলায় আসিতে না পারিলে, অন্যান্য সকলে তাহার অভাব অনুভব করিত ও দুঃখিত হইত।

সম্মুখে আর মাত্র চারি দিন বাকী। পরদিবস, প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই, মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরিয়া চাঁদা আদায় করিতে লাগিল ও মেলা কমিটীর সভাপতি পোষ্টমাষ্টার বাবুর কাছে আনিয়া জমা দিতে লাগিল। এ চাঁদা দিতে কেহ কখনও আপত্তি করিয়াছে, শুনা যায় নাই। যে দুআনা পারিত, দুআনা দিত। যে দুটাকা পারিত, সে দুটাকা দিত। এমন কি, গ্রামের নব বধূগণ ও স্বামীদত্ত দুই একটাকা হইতে কিছু বাচাইয়া, মেলা উপলক্ষে কিছু সাহায্য করিয়া, তাহার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে ভুলিত না। মেলা সকলেরই নিতান্ত আদরের জিনিস, গ্রামের সম্মান তাহার উৎকর্ষানুৎকর্ষের সহিত জড়িত, তাই যাহাতে ব্যাপারটী সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে যাহা পারিত, দিত। মেলা সেই ক্ষুদ্র গ্রাম্যজীবনের মূর্ত্তিমান আনন্দ স্বরূপ ছিল। সেই জন্য, কেহ বিষণ্ণবদনে বসিয়া থাকিবে ইহা

ভাবিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া কাহারও নিকট হইতে কখনও চাঁদা আদায় করা হইত না।

চাঁদা আদায় করিতে দুই তিন দিন চলিয়া গেল। গ্রামে অনেক দরিদ্র পরিবারের বাস। সকলে, সময় মত, পয়সা দিয়া উঠিতে পারিত না। তাই, চাঁদা তুলিতে এই প্রকার প্রায়ই বিলম্ব হইত।

চাঁদা আদায় চলিতে লাগিল। ওদিকে, পার্লিমেণ্ট হাউসে ঘন ঘন সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। কি কি সং দেওয়া হইবে, কোন্ কোন্ নাটকের কোন্ কোন্ অংশের অভিনয় করা হইবে, ম্যাজিক, ভোজবাজী এবং বহুরূপীর সাজ ইত্যাদি দেখাইয়া যাহাতে লোকসমাগম বৃদ্ধি করা যায়, তাহার চেষ্টা করা হইবে কি না, পার্শ্ববর্ত্তী রাজাপুর গ্রামের মেলা অপেক্ষা, যাহাতে মায়াময়ীর মেলা প্রতিবৎসরের ন্যায় এবার ও সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তজ্জন্য কি কি করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি নানাবিষয়ের জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। গ্রামের যুবক ও বালক সমূহ এবং তাহাদের জনপ্রিয় সভাপতি কয়েকদিনের জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, 'মেলা মেলা' করিয়া পাগল হইয়া উঠিল। কেহ কোনও নাটকের অংশ হইতে তাহার পার্ট মুখস্থ করিতে লাগিল। কেহ গান অভ্যস্ত করিতে লাগিল। কেহ বা সাজিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। এদিকে হাটে হাটে, বাজারে বাজারে, গ্রামে গ্রামে ঢোল দেওয়া হইল।

ক্রমে মেলার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের আবাল বৃদ্ধবনিতা, সে দিন অতি প্রত্যুষেই গাত্রোত্থান করিল। বালক ও যুবকের দল, মেলার বন্দো-বস্তের জন্য পোষ্টাফিসের দিকে ছুটিল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইল, কুলবধূগণ শীঘ্র শীঘ্র অন্যান্য কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া রন্ধনের যোগাড়ে নামিল।

সে দিন প্রভাত হইতে না হইতেই ঢাক ঢোল বাজাইয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ভিতর মেলার সংবাদ প্রচার করা হইতেছিল। খালের ধারে, হাটখালি রাস্তার উপর যে অশ্বত্থ গাছ দণ্ডায়মান, তাহার সর্ব্বোচ্চ ডালে লাল পতাকাবিশিষ্ট বংশদণ্ড সংযোজিত হইল। বায়ুভরে তড়্ তড়্ ফড়্ ফড়্ শব্দ উত্থিত করিয়া, মায়াময়ীর বিজয়নিশান স্বরূপে উহা উড়িতে লাগিল।

বেলা দ্বিপ্রহর হইতে না হইতেই, ক্রমে ক্রমে প্রথমে দুই একটী, তৎপরে পাঁচ সাতটী, তার পর দশ পনরটী এই ভাবে মেলায় লোক আসিতে লাগিল। ঝুড়ি মাথায় করিয়া দোকানদারগণও একে একে দর্শন দিতে লাগিল। মিঠা দীঘির পশ্চিম ও দক্ষিণ পার জুড়িয়া ঝাউ ও বাদাম গাছের নীচে মেলা বসিয়াছে। বেলা পড়িয়া আসিতে না আসিতেই লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল।

তখন সেখানে যেন এক প্রলয় কাণ্ড আরম্ভ হইল। লোকগুলি যে যাহার গা ঠেলিয়া চলিয়াছে, ছেলেগুলি বাঁশী বাজাইতেছে, কোন ছেলে বাঁশী কিনিয়া দিবার জন্য পিতার পাছে পাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতেছে, কেহ বিন্নি, জিলাপী ও বাতাসা কিনিতেছে, কেহ হয়তো তাহা কিনিবার জন্য দোকানদারের সহিত দামাদামি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, কোনও বালিকা বেলওয়ারী চুড়ি কিনিতেছে, কেহ হয়তো ছোট ভাইটীর জন্য পুতুল কিনিতেছে, কোনও দরিদ্র কৃষক নবপরিণীতা প্রেয়সীর জন্য আয়না ও চিরুণী কিনিতেছে এবং আয়নার ভিতর সে চারুবদন ভাল দেখা যাইবে কিনা ঠিক করিবার জন্য, দাড়ি ও গোঁফ তাওয়াইতে তাওয়াইতে নিজের মুখ দেখিয়া সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়া মুচ্কি মুচ্কি হাসিতেছে, কেহ ছোট মেয়ের জন্য পুঁতির মালা কিনিতেছে, ছেলে সন্দেশ সন্দেশ করিয়া সুর ধরিয়াছে, কৃপণ পিতা আধা পয়সার বাতাসা কিনিয়া দিয়াই তাহাকে বুঝাইতেছে সন্দেশ অপেক্ষা বাতাসা অনেক ভাল, কারণ সন্দেশ খেলে পেটে অসুখ করে, কোনও বালক ঘুড়ী কিনিয়া উড়াইতেছে, কেহ টক্ টক্ শব্দ উত্থিত করিয়া ছোট ঢোল বাজাইতেছে, কোনও স্থানে অদ্ধাহারক্লিষ্ট দরিদ্র কৃষকেরা লাভের আশায় মত্ত হইয়া জুয়া খেলায় মাতিয়া গিয়াছে এবং অবশেষে সর্ব্বস্ব হারাইয়া রিক্তহস্তে মেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং আর এক মেলায় সুধে আসলে সমস্ত পয়সা আদায় করিবে, এই প্রকার মনে মনে মতলব আঁটিতেছে, যাহারা বুনিয়াদি তাহারা সস্তায় মাছ তরকারী কিনিতেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। বস্তুতঃ, সেই সময় ঢাক ঢোলের বাজনার সহিত লোকের হৈ হৈ রৈ রৈ, বাঁশীর পোঁ পোঁ ভোঁ ভোঁ স্বর এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ঢোলের টক্‌টকি ঠক্‌ঠকি রব মিলিয়া, এমন একটা শব্দ উত্থিত হইতেছিল, যে দূর হইতে মনে হইতেছিল, সেখানে কি যেন একটা ভীষণ কাণ্ড চলিতেছে।

কিন্তু, যদি কেহ একটু বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে অবলোকন করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, যেন সুখ সেখানে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে। এত লোকের ভিতর, এমন একটী লোকও নাই যে আনন্দ মাতিয়া না উঠিয়াছে। সকলের মুখেই হাসি, সকলেই আনন্দ-বিভোর।

দেশে মায়াময়ীর মেলার খুব নাম ছিল। অন্যান্য মেলায় যে সকল জিনিস পত্রাদি উঠিত, ইহাতে যে তাহা অপেক্ষা নূতন কিছু আসিত এমত নহে। তবে পরিমাণে যে বেশী উঠিত তাহা ঠিক, কারণ এ মেলায় লোকসমাগম বেশী হইত এবং তজ্জন্য জিনিসের কাটতিও বেশী হইত। এত আমোদ প্রমোদ, রংতামাসা পার্শ্ববর্ত্তী কোনও গ্রামের মেলায় হইত না। তাই মায়াময়ীর মেলার নামে লোক সমূহ যেন ঝুঁকিয়া পড়িত। মেলার প্রধান সামগ্রী, কতকগুলি মাটির পুতুল, ঘোড়া, টিয়া, বিড়াল, ইঁদুর, মহিষ ইত্যাদি। দ্বিতীয় জিনিস, বাতাসা, মুড়ি, বিন্নি, তেলেভাজা জিলাপী ইত্যাদি। মাঝে মাঝে যে দুই একখানা মিঠাইর দোকান না আসিয়াছে, এমন নয়। মেলায় আর উঠিয়াছে, ধনিয়া, সরিষা, তেজপাতা এবং ছুরী ও কতকগুলি মনোহারী জিনিস।

মেলার এককোণে, যেখানে শেষোক্ত জিনীসগুলি বিক্রয় হইতেছে, সেখানে গ্রামের বয়স্থা স্ত্রীলোকগণ দোকানদারদের হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া রাখিতেছেন। কুলবধূগণ, তাহাদের পশ্চাতে একটু দূরে গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া নিজ নিজ দেবর, ভাসুরপুত্র, কিম্বা বাড়ীর চাকরাণীর হাতে তাহাদের মনোমত জিনীস ফরমাইস করিয়া আনাইতেছে। বস্তুতঃ, সেদিন মায়ামযীর অতি বৃদ্ধা ঠাকুরমাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ঘরের বধূটী পর্য্যন্ত, সকলেই যেন লজ্জাশীলতা অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছে। বধূদের মধ্যে, কেহ ছেলের জন্য বাঁশী কিনিতেছে, কেহ আয়না, কেহ জলেভাসা সাবান, ফিতা, কেহ মেয়ের মাজার তাগা, কেহ কাঁচী, কেহ চিরুণী, কেহ চিঠির কাগজ, কেহ বা ছেলেমেয়ের জন্য পুতুল ইত্যাদি যাহার যেমন ইচ্ছা কিনিতেছে।

একস্থানে, লোকের বড়ই ভিড়। সকলেই সে দিকে ছুটিয়াছে। ওদিকে অত লোক যাইতেছে কেন?

জজবাবুর বাটীর বাহিরের প্রাঙ্গণে কতকটা জায়গা লইয়া একটী ষ্টেজ করা হইয়াছে। খান তিন চারি তক্তপোষ, তাহার চারিপাশে পর্দ্দা টাঙ্গান, সম্মুখ

ভাগে গ্রামের থিয়েটার পার্টির বহুবৎসরের জীর্ণ দুইটা উইঙ্গস্, উপরে অনন্ত নীল আকাশ,—এই হইল ষ্টেজ।

তাহার উপরে দাঁড়াইয়া, কয়েকটী বালক 'মেঘনাদবধ' হইতে প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশের অংশটা অভিনয় করিতেছে। সম্মুখে, কেহ কেহ সতরঞ্চির উপর বসিয়া, কেহ কেহ বা কোণায় কি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিতেছে। সম্মুখের দালানের বারেন্দায়, চিকের আড়ালে, বেঞ্চের উপর রমণীদের বসিবার স্থান। দর্শকবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর গ্রাম্যলোক, দুই চারিটী শিক্ষিত ভদ্রলোক ও দৃষ্ট হইতেছে। তাহারা বসিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন, তাই দাঁড়াইয়াই অভিনয় দর্শন করিতেছেন। একটীও বড় একটা শ্রুতিগোচর হইতেছে না, গোলমালের ভিতর অনেক কথাই ডুবিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে, কেহ দাঁড়াইয়া বলিতেছে, চুপ্, চুপ্। তাহাতে একটু গোলমাল কমিতেছে, আবার মিনিট পরে যে গোলমাল সে গোলমাল। এ সকল গোলমালকে অভিনয়-কারিগণ বিশেষ গ্রাহ্য করিতেছে না, তাহারা অভিনয় করিতেছে।

অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই নব্যশিক্ষিত যুবক ও বালক। রাম, লক্ষণ, প্রমীলা ইত্যাদি সকলের পার্টই বেশ সুন্দর ও স্বাভাবিক হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের সেই সুমার্জ্জিত ও সুন্দর অভিনয় দেখিয়া যেন কেহই বড় বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না, কারণ অনেকেরই তাহা বোধগম্য হইল না। তবে হনুমান যখন কাঁচাকলা চিবাইতে চিবাইতে, দশহস্ত পরিমিত লম্বা লাঙ্গুল নাড়িতে নাড়িতে, হুঙ্কার সহকারে ষ্টেইজে প্রবেশ করিল, তখন একটা হাসির হো হো ধ্বনি পড়িয়া গেল। কিন্তু সেও ক্ষণিক। হনুমান যেই মানুষের মত কথা বলিতে লাগিল, তখন হইতেই তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ, তাহার উচ্চারিত বাক্যাবলী অপেক্ষা, তাহার কৃত কিচির মিচির শব্দ ও তাহার মুখের নানাবিধ ভঙ্গিমাই দর্শকবৃন্দের অধিকতর প্রীতি উৎপাদন করিতেছিল। মায়াময়ীর মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলেই বলিত, মেলায় তাহারা থিয়েটার কখনও জমাইয়া উঠাইতে পারে নাই।

তাহার পর, দুটী পশ্চিমদেশীয় দোকানদার গান গাহিতে গাহিতে ষ্টেইজে প্রবেশ করিল। তাহাদের পর, সাত আটজন রাখালবালক বীণাহস্তে দর্শন দিল। তাহাদের কোমল মুখ, হলদে রঙের পোষাক পরিচ্ছদ, এবং মিষ্টি কণ্ঠে

সকলেই পরিতৃপ্ত হইল। তাহারা ষ্টেইজ হইতে বাহির হইয়া, মেলার চতুর্দ্দিকে গান গাহিয়া গাহিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদের অন্তর্ধানের পর এক বহুরূপী আসিয়া নানাবিধ সাজ গোজ দিয়া, একটা হাসির তরঙ্গ উত্থিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তৎপরে, রাজপুত বীরদিগের আহোরিয়া উৎসব সম্বন্ধীয় একটী উদ্দীপনা পূর্ণ গান করিতে করিতে একদল যুবক ষ্টেইজের ভিতর আবির্ভূত হইল। তাহাদের চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে পোষাক, তাহাদের বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি দর্শনে সকলেই আনন্দিত হইল। ইহার পর, ছোট খাটো আরও অনেক রকমের অভিনয় হইয়া গেল।

সর্ব্বশেষে, একজন পাগল সাজিয়া ষ্টেইজে প্রবেশ করিল। তাহার মুখে চূণ, হাতে কালী, গায় ছিন্ন কন্থা, পেট পর্য্যন্ত বিলম্বিত দাড়ি, আকর্ণ বিস্তৃত গোঁফ। তাহাকে দেখিবামাত্রই দর্শকবৃন্দ মধ্যে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল।

একটী রমণী হাসিয়া বলিলেন, দেখ, চেহারা দেখ। লজ্জাও নেই। কপালে ঝাঁটার বাড়ি।

আর একজন বলিল, এ কে লো?

তৃতীয়া বলিলেন, চিনিস্‌না, পোড়াকপাল! দুলাল।

হঠাৎ তবু এক কোণা হইতে বলিয়া উঠিল, বল কি খুড়ী মা! এ কি আমাদের দুলাল দাদা? আচ্ছা, আমি যাই। এখনি যেয়ে বৌঠানকে বলে দি।

তবুর বৌঠাকুরাণী অর্থাৎ শ্রীযুক্ত নন্দদুলাল মহাশয়ের স্ত্রী ততক্ষণ এক-কোণায় বসিয়া স্বামীর কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছিলেন এবং বাড়ীতে গেলে তাহাকে কি প্রকার অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে নিবেন, তাহার সম্বন্ধে মনে মনে জল্পনা করিতেছিলেন।

তবুকে উঠিতে দেখিয়া সহর হইতে নবাগতা গম্ভীরস্বভাবা একজন যুবতী বলিলেন, "আমোদে নিয়মং নাস্তি', বসো তবু।" তবুর আর যাওয়া হইল না। সেই এক কথায়, সব চুপ হইয়া গেল।

যুবতী ও বালিকাগণ পুলকিতচিত্তে পাগলের কাণ্ডকলাপ দেখিতে লাগিল। তাহারা দেখিতে থাকুক্, আমি এই সুযোগে তোমাদের নিকট পাগলের একটু পরিচয় দিয়া নেই।

তাহার নাম নন্দদুলাল, ডাক নাম দুলাল। পিতার নাম রামসুন্দর সেন। বাড়ী মায়াময়ীর পার্শ্ববর্ত্তী বিশালী গ্রামে।

রামসুন্দর সেকালের সরল সাদাসিধা লোক। বড় বিশেষ প্যাঁচ ঘোঁচ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাহার অনেকটী সন্তান হইয়াছিল কিন্তু তাহার উপর বিধাতার কি একটা অভিসম্পাত ছিল, যে প্রত্যেকটী সন্তানই বাল্যকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল! অবশেষে, অনেক চেষ্টায়, অনেক সন্ন্যাসী ও অবধৌতের ঔষধ খাওয়াইয়া নন্দদুলালকে বাঁচাইলেন। বাল্যকালে তাই নন্দদুলালের বাহুতে ও কণ্ঠে এত মাদুলি ঝুলিত, যে বালকসকল তাহাকে "মাদুলি, মাদুলি" বলিয়া ডাকিত।

যাহা হউক, কোনও প্রকারে যমের হাত এড়াইয়া, নন্দদুলাল সাত আট বৎসর বয়সের সময় মায়াময়ীর মাইনার স্কুলে ভর্ত্তি হইল। তখন, দেশে ইংরাজী পড়ার একটা ধুম্ পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই যার যার ছেলেকে ইংরাজী পড়িবার জন্য মায়াময়ীর স্কুলে পাঠাইতেছে। রামসুন্দর সেন মহাশয়ও তাহার পুত্রকে সেখানে পাঠাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি এতদিন পর ভগবান কৃপা করিয়া বংশ উজ্জ্বল করিতে চলিলেন।

নন্দদুলালের সহিত কিন্তু সরস্বতীর প্রথমদিন হইতেই বিবাদ চলিতে লাগিল। এদিকে, পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্যও এমন সজোরে বেত চালাইতে লাগিলেন, যে স্কুলে অধিষ্ঠান করা কষ্টকর হইয়া উঠিল। যাহা হউক, বর্ষা-কালের কৈমাছের মত কাঁতরাইতে কাঁতরাইতে সাত আট বৎসরে সে স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু, সেখানে আরও বিপদ! পণ্ডিতের সঙ্গে মাষ্টার মহেশ বাবুও তাহার বিরুদ্ধে যোগ দিলেন। তখন তাহার বয়স অনুমান ষোল সতর।

একদিন সে স্কুল হইতে আসিয়া, পিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, বাবা! আমি আর পড়ব না। আমার চৌদ্দপুরুষ যে কাজ করে নাই, আমার দ্বারা তা হবে না। কবিরাজের ছেলে, কবিরাজই থাকব। ইংরাজী পড়ে জাত দিতে পারব না। ইংরেজী পড়বও না। কালথেকে আমা দ্বারা আর স্কুলে যাওয়া হবে না।

কথা শুনিয়া, সেন মহাশয় একেবারে অবাক্। হঠাৎ যেন তাহার মাথায়

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, শুনেছ দুলাল কি বলে? সে নাকি আর পড়বে না?

তখন স্বামী স্ত্রী দুইজনে কত করিয়া পুত্রকে বুঝাইলেন। তাহাদের সব আশা নির্ম্মূল হইতে চলিল। পুত্র জজ হইবে, হাকিম হইবে, উকীল হইবে কত কি আশা করিয়াছিলেন, সব মাটি হইতে চলিল। কিন্তু পুত্র কিছুতেই বুঝিল না, কথায় কথায় চটিয়া উঠিতে লাগিল।

নন্দদুলাল অচল, অটল। অবশেষে অনন্যোপায় পিতা পুত্ররত্নের ইচ্ছানুসারে, তাহাকে সংস্কৃত পড়িবার জন্য গ্রামের রামনিধি তর্করত্নের টোলে পাঠাইয়া দিলেন।

কে জানিত সংস্কৃত এত কঠিন ভাষা? মুগ্ধবোধের দুই এক শ্লোক পড়িতে না পড়িতেই, নন্দদুলালের মুখ চোক লাল হইয়া উঠিল। পেটে অসুখ ও পেটে বেদনার ভাণ করিয়া কয়েকদিন পরেই টোলে যাওয়া এক প্রকার বন্ধ করিল। মাঝে মাঝে ফাঁকী দিয়া, পাড়ার ভিতর, কাহারও গৃহে লুকাইয়া থাকিতে লাগিল। একদিন তর্করত্ন মহাশয় স্বয়ং নন্দদুলালের অনুসন্ধানে সেন মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সে দিন মাষ্টার মহেশ বাবুও ছেলেকে স্কুলে পাঠাইবার জন্য সেন মহাশয়কে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন। মাষ্টার ও তর্করত্ন মহাশয়ের উভয়ের যুগপৎ দর্শনে, তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। সেই দিবস শেষ রাত্রিতে সে বাড়ী হইতে অন্তর্ধান হইল!

একমাত্র পুত্ররত্নকে হারাইয়া স্বামী স্ত্রী অস্থির হইয়া পড়িলেন। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, কত জায়গায় তাহার অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না।

সেন মহাশয়ের কষ্টের আর এক কারণ হইল, তাহার স্ত্রী। তিনি তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তুমি পড়া, পড়া করেই আমার বাছাকে খেলে গো! তুমিই তার সর্ব্বনাশ কল্লে!

তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তোমার বাছা আর আমার কেউ নয়? (কাঁদিতে কাঁদিতে) দেখ, তুমি আর আমার কাটা ঘাঁয়ে নুণ দিও না।

ওদিকে, নন্দদুলালেরও বড় সুখে দিন যাইতেছিল না। বাড়ী হইতে পালাইয়া সে একেবারে—সহরে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে, নাম ও

জাতি ভাড়াইয়া এক বাসায় ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। কিন্তু দুই একদিন যাইতে না যাইতেই, সেখানকার জীবন বড় অসহনীয় হইয়া উঠিল। পিতা মাতার ভালবাসার এবং আদর-যত্নের স্মৃতি তাহার প্রাণটীকে বড়ই মথিত করিতে লাগিল। রাত্রি হইলে, সে একাকী বিছানায়, 'বাবা, মা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শেষে, আর থাকিতে না পারিয়া হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাকালে সে কোথা হইতে বাটীতে আসিয়া দর্শন দিল।

ইহার পর, তাহার সংসারে মন বসাইবার জন্য দেশ প্রচলিত মহৌষধ প্রয়োগ করা হইল অর্থাৎ কয়েক মাস মধ্যেই পিতামাতা তাহার কণ্ঠে এক স্ত্রীরত্ন ঝুলাইয়া দিলেন। নন্দদুলালের ঘূর্ণায়মান মস্তিষ্ক এতদিন পরে যেন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইল। বেশ আমোদ আহ্লাদে তাহার দিন যাইতে লাগিল।

উপরোক্ত ঘটনার বৎসর দুই পরে, তাহার মাতৃবিয়োগ হইল। দরিদ্র হিন্দু পরিবারের পক্ষে স্ত্রী যে কি অমূল্য নিধি, তাহা তাহার অন্তর্ধান না হইলে বুঝা যায় না। কথায় বলে, মা শত মুখের আহার যোগাইতে পারেন, পিতা এক-মুখেরও পারেন না। স্ত্রীর অবর্ত্তমানে দরিদ্র বৃদ্ধ সেন মহাশয়ের সংসার চালান দুষ্কর হইয়া উঠিল।

তিনি কবিরাজী করিতেন কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তেমন পারদর্শী ছিলেন না। বাল্যকালে এক কবিরাজের কাছে কিছু টোট্‌কা টাট্‌কি ঔষধপত্র শিখিয়াছিলেন। তাহার সাহায্যে সামান্য কিছু রোজগার করিয়া সংসার চালাইতেন। এখন গ্রামে গ্রামে নানা ডাক্তার কবিরাজ হইয়াছে, তাহা ছাড়া মায়াময়ীতে দাতব্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে, লোকে তাহাকে বড় ডাকিত না। যতদিন স্ত্রী জীবিত ছিল, যাহা কিছু পাইতেন, তাহার দ্বারাই কোনও প্রকারে সংসার চলিত। যখন অভাব হইত, তিনিই চাউলটা, বেগুনটা ধার করিয়া কোনও প্রকারে চালাইয়া লইতেন। কিন্তু, এক্ষণে বালিকা পুত্রবধূ সংসার সামাল দিয়া উঠিতে পারিল না। সেন মহাশয় মহা বিপদে পতিত হইলেন।

এমন সময়, একদিন নন্দদুলাল পিতার দুঃখ দেখিয়া বলিল, বাবা! আমি বিদেশে চাকরীর যোগাড়ে যাব। সংসার চলা যে দুষ্কর!

সেন মহাশয় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, তাতো বুঝি। কিন্তু,

তুই কি কোন্ কাজের জন্য উপযুক্ত? আর, তোকে বিদেশে পাঠিয়ে, আমি কেমন করে বাড়ী থাকব? না, না, তুমি বাছা বাড়ী থাক। এখানে ব্যবসা চল্‌ছেনা, আমি বিদেশে যাব, সেখানে কবিরাজী করে যা পাব তাই বাড়ীর খরচের জন্যে পাঠাব।

পুত্র প্রথমতঃ কিছুতেই সম্মত হইল না। বৃদ্ধ পিতার জন্য তাহার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইতেছিল। ওদিকে ভীষণ অন্নাভাব। নিজেও কোন কাজের যোগ্য নহে। তদোপরি, সে অনেক দিন হইতেই হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিল। মাঝে মাঝে, যখন বুকের ভিতর বেদনা উঠিত, তখন মনে হইত যেন তখনই মরিয়া যাইবে। সেন মহাশয় সে বিষয় উল্লেখ করিয়াও প্রাণপ্রিয় পুত্রকে বিদেশে যাইতে দিলেন না।

ইহার পর, একদিন রাত্রে বধূমাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ও পাড়া প্রতিবাসিদিগকে তাহার অসহায় নির্ব্বোধ পুত্রের দিকে একটু দৃষ্টি রাখিতে বারংবার অনুরোধ করিয়া, সেন মহাশয় অর্থের অন্বেষণে পঞ্চষষ্টি বৎসর বয়সে প্রথম বিদেশ যাত্রা করিলেন।

নন্দদুলাল তাহাকে হাট খালির বন্দর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিতে গেল। নৌকা ভাড়া করিয়া, পিতাকে তাহার ভিতর লইয়া বসাইল। ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহ, বৃদ্ধের মাথা ঈষৎ কাঁপিতেছিল। পুত্র পিতার পা'র ধূলা মাথায় নিল। "বেঁচে থাক, বেঁচে থাক। ভগবান তোমায় ভাল রাখুন, সুখে রাখুন," এই বলিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বৃদ্ধ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নন্দদুলাল চক্ষে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল। পাছে সে মনে ব্যথা পায়, এই জন্য চক্ষের জল কোনও প্রকারে সম্বরণ করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, বাবা! কেঁদ না। আমি তো আবার কয়দিন পরেই ফিরে আস্‌ব।

তার পর, পিতা পুত্রে বিদায় হইল। মাঝি 'বদর, বদর' করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদের ক্ষীণ আলো নদীর উপর ক্রীড়া করিতেছিল। যতক্ষণ নৌকার মাস্তল দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ নন্দদুলাল নদীর পারে দাঁড়াইয়া, তাহার দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে যখন তাহাও অদৃশ্য হইল, তখন একবার সজোরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হঠাৎ "বাবা! বাবা! কোথায় যাও" বলিতে বলিতে নৌকার দিক লক্ষ্য করিয়া নদীর তীরের উপর

দিয়া কয়েক পদ দৌড়াইয়া গেল। কিন্তু বাবাকে আর দেখিতে পাইল না। এ জন্মে, আর দেখিতে পাইবে কি ?

উপরোক্ত ঘটনার পর, বৎসর তিন চারি চলিয়া গিয়াছে। নন্দদুলাল এক্ষণে দ্বাবিংশ বর্ষের যুবক কিন্তু তাহাকে দেখিতে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর বয়স্ক বলিয়া বোধ হইত। বাল্যকাল হইতেই, সে বড় রোগাটে। রংটা কাল, মুখখানা চেপ্টা, গাল দুটী ভাঙ্গা, কোটরগত চক্ষুদুটী সকল সময়েই কি একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিতে জ্বলিতেছে। হাত পা সরু সরু। চুলগুলি অনেকটা লম্বা লম্বা, গোঁফদাড়িতে ভাঙ্গা গাল দুটী ভরিয়া রহিয়াছে। এ বয়সেই শরীরটা ধনুকের মত বাঁকা হইয়া পড়িয়াছে।

পিতা মাসে দশ বার টাকা যাহা পাঠাইতেন এবং জমী হইতে যাহা কিছু ধান পাইত, তাহা হইতেই কোন প্রকারে স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণ হইত। মাঝে মাঝে, অর্থাভাব হইত কিন্তু জানিলে পিতা পাছে মনে কষ্ট পান, এই জন্য কাহাকেও বলিত না। সেন মহাশয় প্রায়ই মাঝে মাঝে পাড়াপ্রতিবেশীদিগকে তাহার নির্ব্বোধ ছেলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতেন। কিন্তু, তাহার পত্রের কেহ বড় একটা উত্তর দিত না। দরিদ্রের অনুরোধ, কে কবে রাখে ? যাহা হউক, পুত্রের পত্রে সে ভাল আছে জানিয়াই বৃদ্ধ অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

সংসারে মাঝে মাঝে এমন দুই একটী লোক দেখা যায়, যেন তাহারা হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দুঃখ কি, তাহারা জানে না। পদ্মপত্রের জলটুকুর মত, তাহা যেন তাহাদের প্রাণকে কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারে না। শত ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর, দুঃখদারিদ্র্যের তীব্র তাড়নার মধ্যেও তাহাদের মুখখানি সদা হাস্যময়। নন্দদুলাল এই শ্রেণীর লোক। বাল্যকাল হইতে, সে আমোদ আহ্লাদেই দিন কাটাইতেছে। কেহ কখনও তাহার মুখে একটী কষ্টের রেখা অঙ্কিত হইতে দেখে নাই। সে গ্রামের বৃদ্ধদের সহিত ইয়ারকি দিয়া বেড়াইত, যুবকদের সহিত তাস পাশা খেলিত কিন্তু খেলিতে বড় জানিত না, ছেলেদিগকে চিম্‌টী কাটিয়া পাগল করিয়া তুলিত। সে বহুরূপী সাজিয়া বৌদের হইতে পয়সা আদায় করিত। সং সাজিয়া তাহাদিগকে হাসাইত।

তাহার মুখটা বড় ধারাল ছিল। লোকের মুখের উপর ঠিকঠাক জবাব দিত, তা সে রাজাই হউক, আর নফরই হউক। কিন্তু, তাহার প্রাণে হিংসা দ্বেষ, রাগ অভিমান ছিল না। তাহার কথায় কেহ দুঃখিত হইত না।

মায়াময়ী গ্রামে যে রংতামাসা হইত, তাহার প্রধান পাণ্ডাই ছিল, সে। সে যাত্রার দলের বায়না করিয়া আসিত, মনসার ভাসানে গান গাহিত, রামায়ণ গান কিম্বা পুরাণ পাঠ হইলে, তাহার আসর সাজাইত। মায়াময়ী মেলার সে একজন প্রধান মোড়ল ছিল। চাঁদা আদায়ে সে অতি দক্ষ ছিল। তাহাকে চাঁদা না দিলে নিস্তার নাই। যে না দিত, সে তাহার পাছে জোঁকের মত লাগিয়া থাকিত। বস্তুতঃ, তাহার উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া বোধ হইত, যেন মেলাটী তাহারই নিজের জিনীস, এমনই ভাবে সে তাহার সাফল্যের জন্য যত্ন করিত। বৈশাখ মাস আসিতে না আসিতেই, সে মেলা মেলা করিয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলিত। মেলার জন্য ঢুলি ঠিক করিত, হাটে হাটে যাইয়া ঢোল দিয়া আসিত। দোকানদারদিগকে বলিয়া কহিয়া মেলায় আনিবার জন্য চেষ্টা করিত, থিয়েটারের ষ্টেইজ তৈয়ার করিত, সং সাজিত। তাহার নিজ গ্রামে সে বড় থাকিত না। তাহাদের বাটীও বিশালীর প্রান্তদেশে অবস্থিত, একপ্রকার মায়াময়ী গ্রামে বলিলেই হয়। বাল্যকাল হইতে মায়াময়ীতেই দিবসের অধিক সময় সে কর্ত্তন করিত। কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, সকলের সঙ্গেই তাহার আলাপ পরিচয়, সকলেই তাহার আত্মীয়বিশেষ। তাহার দাদা, দিদি, পিশী, মাসী, মামা, কাকা ইত্যাদি আত্মীয়ের সংখ্যার অন্ত ছিল না।

নন্দদুলাল সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল। এক্ষণে মেলার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক্।

পাগল আসিয়া গান ধরিয়া দিল। স্বরটী এমন সুমধুর ও কোমল যে সকলেই হাসিয়া কুটকাট্ হইতে লাগিল। কলিকাতা হইতে নূতন প্রত্যাগত একটী ভদ্রলোক সঙ্গে একটী বিলাতী কুকুর আনিয়াছিলেন। গান শ্রবণে কুকুরটা এমন চীৎকার আরম্ভ করিল, যে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিল।

বিশেষতঃ, সে যখন প্রথম গানটী শেষ করিয়া, দ্বিতীয় গানটী ধরিল, তখন

মেয়েমহলে একটা হাসির রোল্ল পড়িয়া গেল। গানের যেমন পদাবলী, তেমন ভাবের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য। পাগল গাহিতে লাগিল,

বঁধু! আমি তো তোমায় ভুল্‌তে পাল্লেম না।
যেমনি তোমার গায়ের রং, তেমনি তোমার দাঁতের বাহার।
দুপুর রেতে দেখলে পরে, লাগে আমার চমৎকার,
মরি হায় রে, ইত্যাদি।

শ্রোতৃবর্গের আগ্রহাতিশয্যবশতঃ গানটী দুই তিনবার গাহিয়া, সে অবশেষে ষ্টেইজের বাহির হইয়া, নানা ভঙ্গী করিতে করিতে মেলার লোকের ভিতর লাফাইয়া পড়িল। হৈ হৈ করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কৃষকগণ ও বালকগণ ছুটিল।

এদিকে, বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। মেলার লোকসংখ্যাও ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল। দোকানদারগণ একে একে দোকান পাট উঠাইয়া ধীরে ধীরে স্ব স্ব গৃহের দিকে রওয়না হইল। মেলার ঢাক ঢোল সমূহ আর একবার সজোরে বাজিয়া থামিয়া গেল। মেলা ভাঙ্গিয়া গেল!

অসংখ্য নরনারীর মুখে মায়াময়ী মেলার সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। মেলা কমিটীর সভাপতি রাইমোহন বাবুকে স্কন্ধে করিয়া, হাসিতে হাসিতে গর্ব্ব ও মহাউল্লাসভরে যুবকবৃন্দ পোষ্টাফিস গৃহে প্রবেশ করিল। সেখানে রসগোল্লা, জিলাপী, বাতাসা, বিন্নি ইত্যাদি সংযোগে মহানন্দের ভিতর মহাভোজন হইয়া গেল। তখনও অশ্বত্থ বৃক্ষচূড়ার উপরে সগর্ব্বে মায়াময়ীর বিজয় নিশান উড়িতেছে!

* * * *

মেলার জিনীস পত্রাদি গোছাইয়া রাখিয়া বাড়ী ফিরিতে নগেন্দ্র ও খগেন্দ্রের একটু রাত্রি হইল।

. তাহাদিগকে দেখিয়া তবু বলিল, মা! ঐ যে দাদারা এসেছে। খাবারটা দেও।

'দিচ্ছি', বলিয়া মোক্ষদাসুন্দরী একটী থালায় করিয়া গোটাকয়েক সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলাপী ও বাতাসা দিলেন। তবু তাহা লইয়া বড় দাদার হাতে দিল।

তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া নগেন্দ্র বলিল, এসব আর কেন? আমরা তো খেয়েছি।

তবু। না, বড়দা! এসব তোমাদের খেতেই হবে! আমি এত করে রেখে দিয়েছি।

নগেন্দ্র। তুই এত পয়সা পেলি কোথায়?

তবু। কেন দাদা! তোমরা যে আমায় পয়সা দিয়েছিলে, সেই পয়সা।

নগেন্দ্র। (হাসিতে হাসিতে) ভাল, ও পয়সা তুই এতদিনেও খরচ করিস্‌নি? তুই তো ভারি কিপ্পিন। ও পয়সা বুঝি, আমাদের খাওয়ার জন্য তোকে দিয়েছিলেম?

তবু। ভয় নেই তোমার। আমি খেয়েছি, খুকীকেও দিয়েছি, মা ও বাবার জন্য রেখে দিয়েছি।

নগেন্দ্র। আমাদের জন্যে না রাখলেও চলত। পেট্‌টা বড্ড ভরে গেছে। মেলায় সারাটী দিন কেবলই খেয়েছি।

তবু। না, বড়দা! তোমাদের খেতেই হবে। একা একা খেলে যেন কেমন লাগে!

ননীর পুতুল ছোট ভগ্নীটীর কথায় নগেন্দ্রের প্রাণটী আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

সে, খগেন্দ্র ও তবু একত্রে আহার করিতে বসিল। মাঝে মাঝে, তাহারা দুই একটি মিঠাইর টুকরা খুকীর মুখে তুলিয়া দিতে লাগিল। মোক্ষদাসুন্দরী ও আমা কাছে বসিয়া তাহাদের আহার দেখিতে লাগিলেন।

ভ্রাতাভগ্নীর এমন সম্মিলন বড় মধুর। যাহার কপালে জীবন নাটকের অংশের অভিনয়ের সুযোগ হইয়া ওঠে নাই, সে নিতান্তই দুর্ভাগ্য!

আহার করিতে করিতে নগেন্দ্র বলিল, মা! দোকানের সন্দেশগুলি যেন তেমন ভাললাগে না। তুমি যে বাড়ীতে তৈয়ার কর, সে তো এর চেয়ে অনেক ভাল।

মোক্ষদাসুন্দরী। দোকানদারেরা মিঠাই কি তেমন মন দিয়ে তৈয়ার করে, না তেমন ছানা কি ভাল ঘি দেয়? তারা এসব করে, ব্যবসার জন্য। আমরা করি, আমাদের নিজ জনের জন্য।

কথা বলিতে বলিতে তিনি খগেন্দ্রের ঘর্ম্মসিক্ত মুখখানি আঁচল নিয়া মুছাইয়া

পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, খগু! তোমার মুখখানা একবারে শুকিয়ে গেছে। আজ বুঝি, কেবল রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করেছ, খাও। এই বলিয়া, তিনি একটুক্‌রা লুচি আদরভরে তাহার মুখে তুলিয়া দিলেন।

নগেন্দ্র বলিল, মা! সেবারকার মত, এবারও যাবার সময়, আমাদের সঙ্গে সন্দেশ তৈয়ের করে দিও। সেবারকার সন্দেশ খেয়ে, পাড়ার ছেলেরা কত সুখ্যাতি কল্লে। (তবুর দিকে চাহিয়া বলিল) তবু! তুই সন্দেশ তৈয়ার কত্তে জানিস্?

মোক্ষদাসুন্দরী বলিলেন, পোড়াকপাল আমার! ও আবার জান্‌বে! এত বড় হল, ভাল করে ভাত কটাই নামাতে শিখ্‌ল না, ও আবার সন্দেশ তৈয়ার করবে! (তবুর দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে) তোমার কপালে আছে, বুড়ো দিদি শাশুরীর হাতের কিল চড় খাওয়া, তুমি কেন শিখবে?

'যাও' বলিয়া, তবু হাসিতে হাসিতে দুই হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজিল। একটু পরে মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া বলিল, দেখো মা! আমিও ওসব তৈয়ের কত্তে শিখব।

নগেন্দ্র বলিল, দেখ্‌ব। পূজর সময় যখন বাড়ী আস্‌ব, তখন তোর হাতের তৈয়েরী সন্দেশ চাই।

তবু। আচ্ছা দেখো। পূজর সময় না পারি, যখন এবার শীতকালে আমার তারার ব্রত শেষ হবে, তখন নিশ্চয়ই তোমাদিগকে সন্দেশ করে খাওয়াব। বড়দা! তোমরা আমার ব্রত শেষ হওয়ার সময় বাড়ী আস্‌বে না?

খগেন্দ্র। তখন যে আমাদের স্কুলই খোলা থাক্‌বে। কেমন করে আস্‌ব?

তবু। (মুখ ভার করিয়া) না, আস্‌তে হবে। আসবে না বড়দা? এই বলিয়া সে নগেন্দ্রের মুখের দিকে বিষণ্নবদনে চাহিয়া রহিল।

নগেন্দ্র। দেখ্‌ব। তা এখন কি, পূজর বন্ধতো যাক্।

এই প্রকার নানাবিধ আলাপ করিতে করিতে আহার শেষ হইল। মেলা সম্বন্ধে ও নানাপ্রকার গল্প সল্প চলিতে লাগিল।

*   *   *   *   *

আরও কয়েকদিন চলিয়া গেল। সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের বন্ধ ফুরাইয়া আসিল। এখন বিদায়ের পালা। যে যাহার পড়িবার স্থলে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে

লাগিল। আর সে হাসি নাই, সে উৎসাহ নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই। আজ রমেশ গেল, কাল জ্ঞান গেল, তার পর দিন অমূল্য গেল। গ্রামখানি যেন ক্রমে ক্রমে নীরস ও নিষ্প্রভ বোধ হইতে লাগিল।

অবশেষে, নগেন্দ্র ও খগেন্দ্রের যাত্রার দিন উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধা আমা ও অন্যান্য গুরুজনবর্গের আশীর্ব্বাদ লইয়া দুই ভাই রওয়না হইল। তবু আসিয়া দাদাদের প্রণাম করিল।

নগেন্দ্র স্নেহময়ী ভগ্নীর দিকে চাহিয়া বলিল, তবু! এবার তোমাদের জন্য কি আনব? এই বলিয়া খুকীর চিবুক নাড়িয়া একটী চুমা দিল।

তবু উত্তর করিল, তোমার যা ইচ্ছে তাই এন। তোমাদের ওখানে কি বাঁশী পাওয়া যায়? খুকীর জন্য একটা বাঁশী, আর আমার জন্য খুব বড় দেখে একটা পুতুল এন।

নগেন্দ্র। আচ্ছা, আন্‌ব। (একটু পরে) তবু! তা হলে আমরা এখন যাই।

'যাও, এসগে, এসো' কথাটী বলিতে বলিতে মাতার অঞ্চলে যাইয়া সে তাহার অশ্রুসিক্ত বদন লুকাইল। সে যে দাদাদের বড় ভালবাসিত।

দুই ভাই পড়িবার স্থলে চলিয়া গেল। নদীরাম হাটখালি পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

কয়েকদিন পরে, সজীব মায়াময়ী আবার নির্জ্জীব হইয়া পড়িল!

(ক্রমশঃ)

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য-প্রথা

গৌড়াধিপ আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রীয় পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ মধ্যে যাঁহারা রাঢ় দেশে আসিয়া বাস করেন তাঁহারা রাঢ়ী এবং যাঁহারা বরেন্দ্র ভূমে বাস করেন তাঁহারা বারেন্দ্র নামে খ্যাত। কথিত আছে, মুসলমানগণের অত্যাচারে এবং অন্যান্য কারণ প্রযুক্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ পরে নানাস্থানে যাইয়া বাস

করিতে আরম্ভ করেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর অঞ্চলে বহুল পরিমাণে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাস করিতে থাকেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও কুলাচার্য্যগণের মতে আদিশূরের রাজধানী বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানে বিদ্যমান ছিল, এবং সেই স্থানেই কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিল। আদি-শূরানীত পঞ্চ বিপ্রের বংশধর রাঢ়দেশবাসী ৫৬ জনকে আদিশূরের পুত্র ভূশূর ৫৬ খানি গ্রাম দান করেন তাহাতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ৫৬ গাঁঞি কথিত হয়।

শূরবংশের রাজত্বকাল পরিসমাপ্তি হইলে দাক্ষিণাত্য নরেন্দ্রবংশে বল্লালসেন গৌরমণ্ডলের অধীশ্বর হন। তিনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া সেই স্থানেই কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, রামপাল নামক স্থানটী দৃষ্টি করিলেই অনায়াসে উপলব্ধি হয় যে উহা বহু দিন পর্য্যন্ত অনেক সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ পরিবারের বাস-স্থান ছিল। উক্ত গ্রামে 'রামপাল দিঘী' নামক প্রায় এক মাইল বিস্তৃত সরোবরের খাত অদ্যাপি বিদ্যমান আছে এবং তাহার অনতিদূরে পরিখাবেষ্টিত রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, তৎকালে যে সকল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের গুণাবলী পর্য্যালোচনা করণান্তর নবগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে কুলীন বলিয়া বল্লালসেন স্বীকার করেন। নবগুণ এই যে—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিঃ তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

কোন কোন কুলাচার্য্যের কারিকায় বর্ণিত আছে যে তৎকালে ৭৫০ জন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন। যথা,—

"রাঢ়ীয়াস্তু দ্বিজাশ্চাসন্ সার্দ্ধান্তোধি শতানি চ।
(বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা)

মহারাজ বল্লালসেন উক্ত ৭৫০ জনের মধ্যে ৮ গ্রামী সম্ভূত ১৯ জনকে 'মুখ্য কুলীন' এবং ১৪ গ্রামী সম্ভূত ১৪ জনকে 'গৌণকুলীন' বলিয়া স্বীকার করেন। যথা,—

বন্দ্যো মুখৈটী চট্টশ্চ গাঙ্গোলী পূতিরেবচ।
কাঞ্জি ঘোষ স্তথা কুন্দ এতে চাষ্টৌ মহাকুলাঃ॥ (হরিমিশ্র)

হড়ো গড়ঃ কেশর চৌৎখণ্ডী পারিগুড়ং পিপ্পলী পীতমস্তী।
রায়ির্মহিন্ত্যা কুলভীচ ঘাঁটী দিঘাড়ী দিস্তী কথিতাশ্চ গৌণাঃ॥
(রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী)

১৪ গাঁঞি সম্ভূত চতুর্দ্দশ জন নবগুণে কিছু কম ছিলেন বলিয়া তাঁহারা গৌণ কুলীন বলিয়া খ্যাত হন। যথা,—

তে দ্বিধা গৌণা মুখ্যাশ্চ নবধা কুললক্ষণম্।
নবধা স্বল্পভাবেন গৌণত্বমুপজায়তে॥ (কুলরমা)

মহারাজ বল্লালসেন ৫৬ গ্রামীর অবশিষ্ট ৩৪ গ্রামীকে 'সচ্ছ্রোত্রিয়' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের ৫৬ গাঁঞি স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাহার প্রায় ২৫ বৎসর পরে বাচস্পতি মিশ্র কুলরাম ও কুলরমা প্রকাশ করিয়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের ৫৯ গাঁঞি কল্পনা করিয়াছেন। ৩টী গাঁঞি কি কারণে বর্দ্ধিত হইল তৎসম্বন্ধে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক কুলাচার্য্যগণ বাচস্পতি মিশ্রের মতই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা হউক, রাজা বল্লালসেন দেখিতে পাইলেন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনাস্থা প্রকাশ করিতেছেন, উচ্চ নীচ ভেদ উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তন্নিমিত্ত তিনি ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা এবং মানীর মান রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী আহ্বান করিয়া কুলমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কুলীনদিগের আচার ব্যবহারের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি কুলাচার্য্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কি নিয়ম পালন করিলে কৌলীন্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং কিরূপে কুলমর্য্যাদা নষ্ট হইবে তাহার বিধান করেন। তাহার একটি বিধানের উল্লেখ এস্থলে করিতেছি। যথা,—

দানধ্যানপরাঙ্মুখাঃ জিতো লুব্ধশ্চ মূর্খকাঃ।
সদাতস্থ কুলং নাস্তি প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
কুলধ্বংসে কুলং নাস্তি নকুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।
বলাৎকারে কুলং নাস্তি ন কুলং করবর্জ্জিতে॥ (হরিমিশ্র)

অর্থাৎ—যিনি দান কিম্বা ধ্যানে পরাঙ্মুখ, কামক্রোধাদির বশীভূত, লোভী এবং মূর্খ, তাঁহার কখনও কুল থাকিবে না, বংশ লোপ হইলেও কুল যায়, রণ্ড

ও পিণ্ড দোষেও কুল থাকিবে না, বলাৎকার দূষিত এবং পাণিগ্রহণ বর্জ্জিত হইলেও কুল নষ্ট হয়।

রাজা বল্লালসেন সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কুলবিধি প্রবর্ত্তন করেন কিন্তু কালক্রমে তাহা ভিন্ন আকারে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সমাজের মঙ্গলদায়ক না হইয়া বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কৌলীন্যপ্রথা বিধিবদ্ধ হইবার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত কুলীনগণ তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। পরে নানাকারণে শিথিল প্রযত্ন হওয়ায় কুলীনগণ হীনপ্রভ হইয়া পড়েন। ১৩৭৭ শকাব্দার কিছু পূর্ব্বে দত্তখাস উপাধিধারী মুসলমান রাজার একজন মন্ত্রী কুলাচার্য্যগণের সাহায্যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুল বিচারে প্রবৃত্ত হন। গৌণ কুলীনগণ কুলবিধি অনুসারে কার্য্য না করায় তিনি তৎকালে উক্ত চতুর্দ্দশ গ্রামীকে শ্রোত্রিয় মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। য়থা,—

গৌণাঃ শ্রোত্রিয়কর্ম্মেণ কালে শ্রোত্রিয়তাং গতাঃ।" (কুলরাম)

এই সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ ৫৯গাঁঞিতে পরিণত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মুখ্য কুলীনগণের পূর্ব্ব কথিত ৮টী গাঁঞি ব্যতীত ৫১টী গাঁঞি সম্ভূত ব্রাহ্মণগণ শ্রোত্রিয় বলিয়া অভিহিত হন। উক্ত শ্রোত্রিয়গণ সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হন।

যখন পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানের অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল, বিধর্ম্মীর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কুলীনগণ স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিতে বিমুখ হইলেন তখন হইতেই ব্রাহ্মণসমাজের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মুসলমানের সংস্রবেই সেরখানী, পীরালী ও শ্রীমন্তখানী এই তিনটী দলের উৎপত্তি হয়।

এই সময়ে বন্দ্যবংশজাত বিখ্যাত ঘটক দেবীবর মিশ্রের অভ্যুদয় হয়। তিনি অতিশয় বিজ্ঞ ও অতি সুচতুর লোক ছিলেন। তাঁহার বাক্য কুলীন সম্প্রদায় বেদবাক্যের ন্যায় মনে করিতেন। দেবীবর তৎকালে কুলবিচার করিয়া দেখিলেন কুলীনগণ সকলেই নবগুণ বিহীন হইয়াছেন; বাস্তবিক পক্ষে আর কাহারও কৌলীন্য নাই। যদি কৌলীন্য-প্রথা এককালীন উঠাইয়া দেওয়া যায় তবে কুলাচার্য্যগণের সম্মান একেবারে লোপ পাইবে এবং তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের পথ রুদ্ধ হইবে। এই কারণে তিনি ১৪০২ শকে অর্থাৎ

৮৮৭ সালে 'মেল-বিধি' প্রচার করেন। 'মেল-বিধি' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে,—

দোষাহি বিবিধা জ্ঞেয়া মেলস্তেষাঞ্চ মেলনাৎ।
জাতিগঃ কুলগশ্চৈব শ্রোত্রিয়গ ইতি ত্রিধা॥

অর্থাৎ নানা প্রকার দোষের একত্র মিলন হেতু মেলের উৎপত্তি। জাতিগত, কুলগত ও শ্রোত্রিয়গত তিন প্রকার দোষে মেল হয়।

জাতিগত দোষ,—

"কোচ পোদ আর হেড়া হালাও রজক।
কলু হাড়ি বেড়ুয়া সুঁড়ি যবন অন্ত্যজ॥" ইত্যাদি

দেবীবর কুলীন সম্প্রদায়ের দোষ বিচার করিয়া উক্ত তিন প্রকার দোষে ৩৬টী মেল প্রচার করেন। তন্মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ মেলের দোষের কথা উল্লেখ করিয়া মেলকাহিনী বর্ণনা করিতে বিরত হইব। নাঁদা, ধাঁদা, বারুইহাটী ও মুলুকজুড়ী এই চারি প্রকার দোষে 'ফুলিয়া' মেলের উৎপত্তি হয়। ইহার মধ্যে 'ধাঁদা' দোষ কি তাহা লিখিয়া লেখনী অপবিত্র করিতে ইচ্ছা করে না; কিন্তু আমার বিশ্বাস বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে অনেকেই এই সকল ইতিহাসে অনভিজ্ঞ। এজন্য বাধ্য হইয়া 'ধাঁদা' দোষের ইতিবৃত্ত উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"ধাঁদা নামক খালের নিকট হাঁসাই নামে এক থানাদার থাকিত। শ্রীনাথ চট্টের দুই অবিবাহিতা কন্যা সেই খালে জল আনিতে যায়। হাঁসাই থানাদার তাহাদিগকে ধরিয়া বলাৎকার করে। ইহার এক কন্যা কংসারি পূতিতুণ্ড ও অপর কন্যা গঙ্গাধর বঁন্দ্যো বিবাহ করেন। গঙ্গাধরের সহিত নীলকণ্ঠ গাঙ্গের কুল হয়। আবার নীলকণ্ঠ গঙ্গানন্দের সহিত আদান প্রদান করেন। এইরূপে গঙ্গানন্দ ধাঁদা দোষে দূষিত হন।"

এই 'গঙ্গানন্দ মুখ' ফুলিয়া মেলের প্রকৃতি। প্রতি মেলে দুই জনকে দেবীবর প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন। যাঁহা হইতে মেলের উৎপত্তি তিনি প্রকৃতি এবং তাঁহার সহিত কুল করিয়া যিনি সমমর্য্যাদাপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি পালটী বলিয়া কথিত হন।

পাঠক! যদি মেলের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত

করিতে চাহেন তবে তাহা কোন বিজ্ঞ-কুলাচার্য্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। এইপ্রকার ৩৬টী মেলের দোষ বর্ণনা করিয়া কুলাচার্য্যগণ মেলবিধি, মেলমালা, মেলরহস্য, মেলবন্ধ, মেলচন্দ্রিকা, মেল-দোষকারিকা এবং দোষ নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কুলাচার্য্যগণ ঐ সকল গ্রন্থই মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। জাতিসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ ; এবং কুলীনগণ ব্রাহ্মণ-সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ; কিন্তু সেই কুলীনগণের মেলের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। পাশ্চাত্য মনিষিগণ এই সমস্ত ইতিহাস পাঠ করিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিয়া থাকেন। কুলীন সম্প্রদায় স্বীয় বংশের কুৎসিত বর্ণনা শ্রবণ করিয়া কি কারণে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন তাহা বলিতে পারি না। দেবীবরের 'মেলবিধি' প্রচলিত হইবার শতাধিক বর্ষ পরে 'নুলাপঞ্চানন' নামীয় একজন কুলাচার্য্য মেলের অসারতা প্রতিপাদন জন্য তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কারিকায় বর্ণিত আছে,—

"দোষ দেখে করে কুল এ কি চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় সার॥"

কিন্তু তাঁহার এই সকল শ্লেষোক্তি সমাজের কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই। দেবী-বরের মেল বন্ধনের ফলে সমাজ-শরীর কিরূপ ক্ষত বিক্ষত হইতেছে তাহা কেহ দেখিয়াও দেখিতেছেন না। কাহার সহিত কোন্ ব্যক্তির আদান প্রদান হইলে কুল থাকিবে তাহা দেবীবর ঘটক বিধিবদ্ধ করিয়াছেন এবং যে সকল দোষে পূর্ব্বে কুল যাইত তখন হইতে উহাতে কুল না যাইয়া মাত্র দোষ স্পর্শ করিবে বলিয়া তিনি বিধান করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে এই সময় হইতে বরের অল্পতা প্রযুক্ত বহু বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কোন ঘরে কন্যার আধিক্য হেতু এক সময়ে ৮।১০টী কন্যা একটী পাত্রের স্কন্ধেই চাপাইয়া দিতে কেহ কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। শিক্ষার প্রভাবেই হউক কি কালস্রোতেই হউক বহু বিবাহ প্রথা ব্রাহ্মণসমাজ হইতে একপ্রকার দূরীভূত হইতেছে কিন্তু ঘরে পাত্র না থাকায় নিকষ কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে শত শত অনূঢ়া থাকিয়া সমাজে যে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিতেছে তাহা বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় লক্ষ্য করিতেছেন না ইহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার।

কত শত অবিবাহিতা কন্যা আজীবন বিষাদ অন্তঃকরণে কাল অতিবাহিত করিয়া তপ্তশ্বাস নিক্ষেপ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেবীবর ঘটকের পরেও সুবিজ্ঞ কুলাচার্য্য অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কুলীন সমাজে কত খ্যাত-নামা ব্যক্তি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই সমাজের এই ব্যাধি দূরীকরণ করিতে যত্নবান হন নাই। যে মেলকাহিনী শ্রবণ করিলে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিতে ইচ্ছা হয় সেই মেল বন্ধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শত শত সরলা অবলাগণের প্রতি এইরূপ নৃশংস ব্যবহার নিতান্তই দোষাবহ। বর্ত্তমান কালে বাল-বিধবার দুঃখ মোচন কল্পে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। তাহারা উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিত হইয়া বিধিবিড়ম্বনায় বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু যাহারা স্বামীমুখ জীবনে একবার সন্দর্শন করিতে পায় নাই তাহাদের দুর্দ্দশা অপনোদন জন্য কেহই প্রয়াসী হইতেছেন না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। প্রকৃত শিক্ষা প্রভাবে বঙ্গের অধিকাংশ স্থলেই এই সকল কুপ্রথা দূরীভূত হইয়াছে কিন্তু এক্ষণও এই কৌলীন্য-প্রথা স্থানে স্থানে পূর্ণ মূর্ত্তিতে বিরাজমান। যে মেলের ইতিহাস অশ্রাব্য, যাহার কোন সারবত্তা নাই, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই পূর্ব্ববঙ্গীয় মেলী-কুলীনগণ অসীম গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। অচিরে সেই 'মেল' গ্রন্থ পদ্মার প্রখর স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া অনূঢ়াগণকে পাত্রস্থ করা বিধেয়। যদি সমাজ এক্ষণও এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন তবে সেই সংসার-সুখ-বিবর্জ্জিতা ললনাগণের রোষানলে সমাজ শরীর অবশ্য বিদগ্ধ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীরাসমোহন মৌলিক।

ইচ্ছা ও কর্ম্ম

ইচ্ছা কহে, কর্ম্ম তুমি পূর্ণ সফলতা,
তুমি শক্তি, তুমি প্রাণ, হীনতম আমি
নীরবে লুকায়ে রই মরমের মাঝে,
তোমারে জাগ্রত সত্য শ্রেষ্ঠ বলে নমি।
কহে কর্ম্ম কায়া আমি, তুমি তার প্রাণ,
আমারে পূর্ণতা ওগো তুমি কর দান,
বিশ্বের হৃদয়-মণি অনন্ত কালের
দীন ভৃত্য আমি তব চির জনমের।

শ্রীসুধাসিন্ধু সেন গুপ্তা।

ছেলেদের শিক্ষা ও অভিভাবকের কর্ত্তব্য

বালকগণের চরিত্র-সংগঠনে পিতামাতার পরেই আত্মপরিবারস্থ পিতৃব্য, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়। বালকগণ নিজেদের ক্ষুদ্র বিষয় নিয়া পিতার নিকট সর্ব্বদা যাইতে প্রস্তুত হয় না। ঐসকল বিষয় নিয়া পিতৃব্য কি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদির নিকট যাইতে কোন সঙ্কোচ বোধ করে না। ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্য দিয়া, তাহাদিগকে বুঝিতে না দিয়াও, ঠিক পথে চালাইতে বয়স্ক আত্মীয়গণ যে সুযোগ পান, পিতা তাহা পান না। বালকগণ বয়স্কদের মীমাংসা যেরূপ সহজে মানিয়া নেয় বৃদ্ধদের মন্তব্য তত সহজে স্বীকার করে না। তাহারা অতি পূর্ব্ববর্ত্তী বৃদ্ধদের পন্থা নিতান্ত সেকেলে বলিয়া একটু দূরে রাখিতে চায়। কিন্তু তাহাদেরই অগ্রবর্ত্তী যুবকদিগকে তাহাদিগের অবস্থার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বলিয়া সহজেই ধরিয়া নেয়। কাজেই সর্ব্ব বিষয়ে তাহাদিগকে অনুকরণ করিতে চেষ্টিত থাকে। তাহাদিগের মুখে যাহা কিছু নূতন শুনে তাহাই নিতান্ত সত্য, স্বাভাবিক ও অনুকরণযোগ্য বলিয়া মনে করে; তাহারা যাহা

কিছু করে তাহাই নিতান্ত সঙ্গত ও অবস্থোপযোগী বলিয়া তাহার অনুকরণ করে। তাহা ভাল কি মন্দ বিচার করিবার ভাবনা একবারও মনে উদয় হয় না। কোন কোন স্থানে উঠিলেও বয়োজ্যেষ্ঠদিগের গুরুভারে বিচারের দোষ তাহাদের দিকেই নামিয়া পরে। এসকল কারণে অনেক সময়েই আমাদের ভুল ত্রুটিগুলি অনুকৃত হইতে দেখি।

বালকগণের সম্মুখে অনেকেই বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে যথেচ্ছ আলাপ করি। আমরা মনে করি উহারা ইহাতে মন দিবে না বা বুঝিবে না। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, কথোপকথন সময়ে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাই তাহাদের মনে বেশ একটু ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। তাহারাও তদনুরূপ কাজ করিবে বলিয়া সংকল্প করিতেছে। একদিন একটী একাদশবর্ষীয় বালক তার কোন এক সঙ্গীর নিকট নিতান্ত গর্ব্বের সহিত বলিতেছে,—দেখিস্ আমি কখনও এফ-এ পাশ না করে বিবাহ করিব না। ছেলেটী তখন ৪র্থ শ্রেণীতে পড়িতেছে। তার কয়েক কথাতেই বুঝা গেল এ সংকল্প তার নিজের নয়। সেদিন দুপুরে তার বড়দাদার সঙ্গে তার এক বন্ধুর অনেক বিষয়ে আলাপ হইতেছিল। বড় দাদাটী গুটী কয়েকবার এফ-এ ফেল করেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের জন্য খুব আয়োজন হইতেছে। এরূপ সমস্যায় বড়দাদা যদি এরূপ ভীষণ সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই। (আমরা জানি বড়দাদা সেবার সংকল্পচ্যুত হইয়াছিলেন।) বড়দাদা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে তাহার ভ্রাতাটী তাহার সংকল্পকে পরিণতি দিবার জন্য এরূপ দৃঢ় হইয়া উঠিবে। ইহা জানিলে হয়ত তাহার সংকল্পচ্যুতি দরুণ অনুতাপের কিঞ্চিৎ লাঘব হইত।

এরূপ সংকল্পে কোন অনিষ্ট না থাকিলেও, এরূপ অনেক বিষয়ের উত্থাপন হয়, যাহার কল্পনামাত্রে বালকগণের আশু অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে। এমনই নানা ক্ষুদ্র কাজে, তুচ্ছ কথায় আমরা বালকগণের চরিত্র-সৃষ্টির কারণ স্বরূপ হইয়া পড়ি। বিশেষতঃ যাহারা সহর হইতে নবাগত তাহাদের নানা কথা বালক-গণ অতিমাত্র মনোযোগের সহিত শুনিয়া থাকে। তাহাদের নিকট যাহা শুনে সে বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাহারাও সহরে যাইয়া কি করিবে তাহার একটা অনির্দ্দিষ্ট অপরিস্ফুট কল্পনা জল্পনা চলিতে থাকে। যাহারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাহাদের

ভুলিলে চলিবে না যে আর একদল সর্ব্ববিষয়ে তাহাদিগকে অনুকরণ করিবার জন্য অতিমাত্র উৎসুক। তাহাদের অর্থশূন্য উল্লাস, আমোদ, কৌতুক, ক্রীড়াদি সেখানেই পরিসমাপ্ত নহে। সে গুলিও বালক হৃদয়ের তরুণ অনুভূতির নিকট গৌরবপূর্ণ। এ সকলই অনুকরণযোগ্য, ওরূপ করাই একটা স্বার্থকতা, ইহা অকারণ বালকহৃদয়ে জন্মিয়া থাকে।

অনুকরণই স্বভাব। সর্ব্বত্রই এই অনুকরণ চলিতেছে। মানুষ অবাস্তবের অনুসরণ করিতে পারে না। যাহা দৃশ্যমান তাহারই মাত্র অনুসরণ করে। অপরিণতবুদ্ধি কেহ মনঃকল্পিত গুণসমষ্টিকে আদর্শস্বরূপ ধরিয়া লইতে পারে না। যেখানে এ সকল গুণের বিকাশ হয়, তাহাকেই মাত্র অনুকরণ করে। যাহাকে দেখে নাই, তাহাকে কেহ অনুকরণ করিতে যায় না। কাজেই বালকগণ বয়স্ক ভ্রাতা, পিতৃব্য ও প্রতিবেশীকেই আদর্শ বলিয়া স্থির করে। আমরাও যখন তাহাদিগকে ভাল হইতে বলি, তাহাদের বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে চাই, তাহারই পরিচিত কাহাকেও আদর্শ স্থানে ধরি। তাহাদিগের অব্যবহিত পরের অবস্থার জন্য প্রস্তুত করিবার জন্য সচরাচর যুবকগণকেই নির্দ্দেশ করি। তখন কি একবারও ঐ সকল যুবকগণের ভুল ত্রুটীগুলি আমাদের এক অজ্ঞাত আশঙ্কার কারণ হয় না। সকল বিষয়ে 'অমুকের' মত হইয়া উঠ, এরূপ বলিবার মত কত জন যুবককে আমরা সর্ব্বদা দেখি? তাহার মত বিদ্বান হও বলি; কিন্তু দ্বিধা শূন্য হইয়া সকল বিষয়ে তাহার মত হও কখনও বলিবার অবসর পাই কি? আমরা কতজন যুবককে পাই যাহার স্নিগ্ধ ব্যবহার ও চরিত্রের জন্য প্রকৃতই শ্রদ্ধা অনুভব করি? অসঙ্কোচে তাহার বিদ্যা, বিনয়, চরিত্র ও উদারতার প্রশংসা করিয়া বালকগণের সম্মুখে তাহাকে আদর্শস্বরূপ ধরিতে পারি? প্রতিবৎসর উন্নতশিক্ষার গৌরব বহন করিয়া অনেক যুবক ফিরিয়া আসেন, তন্মধ্যে কতজনের শিক্ষা একটী প্রতিবাসীরও কোন উপকারে আসে? তাহার দৃষ্টান্তে তার নিজ পরিবারে একটী শিশুর মনে মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে? শিক্ষালাভ যে শুধুই তার নিজের জন্য নয়, বিলাস-সাধনের উপায় মাত্র নয়, এবং নিজের চতুর্দ্দিকে একটী ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীসৃজন জন্য নয়, আমাদের ক'জনের সে উদারবুদ্ধি আছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা না পাইলেও নীতিবান্ সচ্চরিত্র, উদার, স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি মাত্রকেই সম্মান

করিবার মহত্বে আমাদের কতটী যুবকের চরিত্র অলঙ্কৃত? শিক্ষা যে শুধুই কয়েকখানা পুস্তক কণ্ঠস্থ করিবার মধ্যে আবদ্ধ নয় তাহা আমরা সকলেই জানি; তবু শতত্রুটী সত্বেও আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পড়ুয়া, নামজাদা ছাত্র, কাজেই আমাকে সম্মান করা ইহাদের উচিত, আর আমাদিগকে উপযুক্ত সম্মান না দেখানতে ইহারা যে অশিক্ষিত ইহাই শুধু প্রমাণিত হয় এরূপ একটা উৎকট মনোবিকার যে কেন প্রসার লাভ করিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না। সাধারণতঃ লোকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রশংসিত ছাত্রদিগকে একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। তাহারা বিদ্যালয়ে কৃতকার্য্য; যাহারা কোন এক বিষয়ে দক্ষ চেষ্টা করিলে অন্য সকল বিষয়ও তাহারা সহজেই আয়ত্ত করিতে পারে, সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া ইহাদের পক্ষে অসম্ভব নয়;—এরূপ সকল ভাব দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই লোক তাহাদিগকে একটু সম্মান করে। বস্তুতঃ তাহাদের চরিত্র, ব্যবহার, ও উদারতা—মনুষ্যত্বোপযোগী ভাবসম্পৎ, কিরূপ পুষ্ট তাহা বিচার করিবার অবসর সকল সময়ে হয় না।

অনেকে মনে করেন খারাপ কাজ না করিলেই, তিনি ভাল সংজ্ঞায় আসিয়া পড়িলেন। তাহা নিতান্তই ভুল। কোন মন্দ কাজের জন্য নিশ্চেষ্টতাকেই ভালর সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। যে ভাল তাহাকে ভাল কাজ করিতে হইবে; অন্ততঃ খারাপের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব পোষণ করিতে হইবে। প্রকৃতির নিয়মই এই, কোন এক যায়গায় কেহ স্থির থাকিতে পারে না। তাহাকে হয় পুষ্ট হইয়া উঠিতে হইবে নয় নষ্ট পাইতে হইবে। আবার মনোবৃত্তিগুলি অন্য সমুদয় হইতে অনেক বেশী চঞ্চল। উহারা কিছুতেই একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না। যখন তাহারা ভালরদিকে চালিতে না হয়, তখন মন্দের দিকে চলিতে থাকিবে। কখন তাহাদিগকে না-মন্দ না-ভালর স্থানে ধরিয়া রাখা যায় না। আর আমরা সে সকল কাজ করি তাহার চিন্তা পূর্ব্বেই মনে উদিত হয়। চিন্তার বহিঃস্ফূরণই কাজ। সচ্চিন্তায় অভ্যস্ত হইলে আমাদের সকল কাজই কল্যাণপ্রদ হয়। কুচিন্তা চালিত হইয়া কোন কাজ করিলে চতুর্দ্দিকে শুধু অমঙ্গলেরই সৃজন করি। শুধু তাহাই নহে, আমাদের চিন্তাগুলি কার্য্যে আত্মপ্রকাশ না করিলেও, তাহাদের প্রভাব বিস্তারে কোন বাধা জন্মে না। অনেক সময় চিন্তা-গুলি অবিলম্বে কার্য্যকরী হইয়া উঠে না। দিনের পর দিন একই চিন্তা মনে

উদিত হইলে উহার প্রবলতা সম্পাদিত হয়। সহসা একদিন উহা এরূপ প্রবল হয় যে সকল সঙ্কোচ, দ্বিধা, ভয় উহার বহিঃপ্রকাশে আর বাধা জন্মাইতে পারে না। যে সকল চিন্তার এরূপ বহিঃস্ফূরণ হয় না, তাহা অনেক সময়েই আমাদিগকে সঙ্কোচপরায়ণ করে,—একটু পরীক্ষা করিলেই ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। যে কুচিন্তা আজ মনে উদিত হইতেছে;—তাহাই যদি কেহ কার্য্যে দেখায়,—তখন জোরের সহিত তাহাকে কখনও বলিতে পারিব না, একাজটা করা তোমার অন্যায় হইয়াছে। যদিও কপটাচারীর মত বলি যে ইহা নিতান্তই অন্যায়, তেমন সবল, সহজস্বর কখনও বাহির হইবে না। আমার সে কথায় সে কখনও তাহার অন্যায়কে দেখিতে পাইবে না। যে নিজে চিনি না ছাড়িয়াছে, সে অন্যকে চিনি ছাড়িতে বলিলে উপেক্ষিতই হয়। আবার যে সকল ভাল কাজ করিতে গেলে বুঝিয়া নিতে হয়, আমার মধ্যে অমুক মন্দটুকু নাই, সেরূপ ভাল কাজেও আমি সরলান্তঃকরণে যোগদান করিতে পারি না। সে সকল কাজের জন্য কাহাকেও তেমন উৎসাহিত করিতে পারি না। কাজেই বালকদের চরিত্রসৃষ্টির যে গুরুদায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহা সুন্দররূপে চালাইতে চাহিলে, অন্তরে বাহিরে আমাদের সর্ব্বদাই সতর্কদৃষ্টি রাখিতে হইবে।

মনোবৃত্তির উপর সংযমের মত দুরূহ কথা ছাড়িয়া এখন দু'একটী সামান্য কথার অবতারণা করি। আমরা অল্পবয়স্ক ছোট ভাই, আত্মীয় প্রতিবেশী ছেলে-দের "বথামি"তে অনেক সময় মনঃকষ্ট পাই। কিন্তু আমরা কি একবারও ভাবিয়া দেখি প্রাচীনের প্রতি আমাদের সম্মান কতটুকু! আমরা সহরের সুসভ্য ফ্যাসানে সিগারেট থাওয়াটা শিক্ষার অঙ্গ করিয়া নিয়াছি; কিন্তু আমাদের অনুকরণে ছোট ছেলেপেলেরা যদি কোন ক্রমে একটী পয়সা বাঁচাইয়া সিগারেট কিনে ও কোন এক ঝোপের আড়ালে দল পাকাইয়া সিগারেট থাওয়া অভ্যাস করিতে থাকে; তখন এই বালসুলভ চাপল্যের দরুণ শাস্তি আমরাই হয় ত সর্ব্বাগ্রে দিই। তখন কি একবারও ভাবি, -আমারই ভ্রাতুষ্পুত্রটী যদি জিজ্ঞাসা করে, "কাকা, সিগারেট থাওয়াটা কি খারাপ,"—তখন আমি কি উত্তর দিব?

আমরা আবার অন্যের নিকট হইতে শ্রদ্ধা পাইবার জন্য অতি মাত্র ব্যগ্র। তখন আমাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত শ্রদ্ধার পাত্রদের জন্য আমাদের

হৃদয়ে কতটুকু শ্রদ্ধা সঞ্চিত আছে। যে শ্রদ্ধাবান্ নহে সে অন্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়ের একদিন-কার কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিলে, বিষয়টী হয়ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। অন্যান্য কথার উপর বলিলেন, "তোমরা মনে কর, কোন্ উদ্দেশ্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর তাহা এই শুক্লকেশ প্রাচীন পণ্ডিত বুঝিতে পারিবে না। আমি বুঝিতে পারি আর নাই পারি, তোমাদের এরূপ অসরল, অশ্রদ্ধেয় প্রসঙ্গোত্থাপন করা কখনও উচিত হয় নাই। যখন সামর্থ্য ছিল, উৎসাহ ছিল তখন তোমা-দের মত বালকদের সঙ্গে সর্ব্বদা মিশিয়া, যাহাতে কোনরূপ বিরূপ ভাব তাহাদের চরিত্রাপকর্ষ না ঘটায় তাহার চেষ্টা করিতাম। তাহাদের সকল ক্রীড়া কৌতুকে যোগ দিতাম। তোমাদের মত তাহারা আমাকে সহানু-ভূতিহীন ভাবিতে পারিত না। এখন আমি কিছু বলিলে তোমরা মনে কর তোমাদের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে তোমাদিগকে বঞ্চিত করিতে যাইতেছি। কাজেই এখন তোমাদিগকে কিছুই বলি না। বৃদ্ধ বয়সে যদি দু-একদিন ভক্তির প্রসঙ্গ উঠে,—অসমর্থের কাতরতাই ভক্তি বলিয়া তাহা উপেক্ষা কর। কিন্তু তবু যে প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, সে বিষয়ে তোমা-দিগকে কয়েকটী কথা বলিব। আমার এ কথায় অন্ততঃ দু-একটী ছেলের উপকার হইবে জানি; তা না হ'লে বলিতাম না। অনেকে তোমরা খুব বড় বড় প্রণাম করিয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা কর। কিন্তু কার ভিতরে শ্রদ্ধা আছে, প্রণাম না করিলেও আমি তাহা ধরিতে পারি। শ্রদ্ধার দৃষ্টিই ভিন্ন রকম। অন্তরের ভাব দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। শুধু এ বিষয়ে নয় অনেক সময় তোমাদিগকে পথে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি দৃষ্টি করিতে দেখিয়াছি। কাহারও দৃষ্টি তখনই নত হইয়া গিয়াছে। কাহারও দৃষ্টি ভারি নির্লজ্জ। এ পার্থক্য কেন? স্ত্রীলোক দেখিলে যাহারা মনে ভাবে আমার বোন্, আমার মা, আমার আত্মীয়া কেহ যদি হতেন, তবে কি এরূপ নির্লজ্জ হতে পারিতাম; আর কেহ যদি এরূপ নির্লজ্জ ভাবে চাহিত তখন আমার মনে কিরূপ হইত। আমি নির্লজ্জ হইলে অপরে হইবে না কেন? যে এরূপ ভাবিতে অভ্যস্ত, তাহার দৃষ্টি নম্র না হইয়াই পারে না। মায়ের, বোনের শ্রদ্ধায় সে দৃষ্টি অভিষিক্ত হইয়া নির্ম্মল হইয়া উঠে। সেখানে কলুষ থাকিতে পারে না। সে কখনও তাহাদের চোখে

দৃষ্টি ফেলিয়া তাঁহাদিগকে কাতর করিতে পারে না। অসাবধানে যদিও কাহারও চোখে চোখ পড়ে; অমনি তাহার দৃষ্টি নত হয়। সে দৃষ্টিতে রমণী সঙ্কোচ বোধ করিতে পারেন, কিন্তু অস্বস্তি বোধ করিয়া কণ্টকিত হয়েন না। কিন্তু যেখানে সেই শ্রদ্ধার দৃষ্টি নাই, সেখানে রমণী মাত্রই অতিমাত্র উৎকণ্ঠা বোধ করেন। নির্লজ্জের মত রমণীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন দৃষ্টি কর, তুমি কথনও কাহাকেও এজন্য জোর করিয়া বলিতে পারিবে না, 'এরূপ নির্লজ্জের মত চাহিও না। তুমি যদি এরূপ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে না পার, তোমার কনিষ্ঠগণও ইহাতে কোন অন্যায় আছে বুঝিতে না পারিয়া একটা অশ্রদ্ধেয় অভ্যাসের দাস হইয়া পড়িবে। আর যে স্ত্রীমাত্রকেই মায়ের বোনের শ্রদ্ধার সহিত দেখে, দেখিও তাহার নিকট কোন অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকও ততটা দ্বিধা সঙ্কোচ বোধ করিবেন না। শ্রদ্ধা এমনই সূক্ষ্ম যে কারো মনের কাছে উহা বহুক্ষণ অপরিজ্ঞাত থাকে না।"

এই স্থানে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়ের মৃত ভ্রাতুষ্পুত্রের 'ডায়েরীর' কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। একুশ কি বাইশ বৎসরের সময় একদিন লিখিতেছে—"আজ বাসন্তীপূজা। আজ সারাদিনই কেমন এক অধীর উল্লাসে ভরপুর ছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি ও * * *, প্রতিমা দেখিয়া সহর ছাড়াইয়া অনেক দূর বেড়াইতে গেলাম। মাঠের সবুজ আবরণ এখনও সর্ব্বত্র তেমন সুদৃশ্য হইয়া উঠে নাই। তবু আজ চন্দ্রমার মৃদু-মধুর জ্যোৎস্নায় সবটা যেন কেমন স্বপ্ন লোকের অস্ফুট আলোকের মত প্রহেলিকাচ্ছন্ন বোধ হইতেছিল। হঠাৎ একটী সুন্দর মুখ মনে জাগিয়া উঠিল। প্রতিমা দেখিয়া ফিরিবার সময় যে মেয়েদের দেখিয়াছিলাম, এ তাদেরি একজন। তাহাদের সুন্দর কচি কচি মুখগুলি, বিচিত্র শোভন সাড়ী, সুচারু বেশ ও আনন্দোচ্ছল গমন-ভঙ্গী—কি মনোরম! মনে হইতেছিল পূজার দিনে পাড়ার সব মেয়েদের এমনি সাজতে হবে। আর তথন কেমন যে ভাল লাগিতেছিল, কি যে প্রীতি, আনন্দ অনুভব করিতে-ছিলাম; কি এক মধুর তৃপ্তির আস্বাদ পাইয়াছিলাম, তাহা নিজেই এখন ভাল বুঝিতেছি না। কিন্তু হঠাৎ একখানা মুখ এরূপ বিশেষভাবে মনে জাগিবে কেন? এখন ভাবিয়া দেখি এই আনন্দ ও তৃপ্তির অন্তরালে একটু কামনার ভাব ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। ইহা কি লালসাস্পৃষ্ট নহে? ছি! ইহাদিগকে দেখিবার আনন্দে যদি বিন্দুমাত্রও লালসাস্পর্শ থাকে তবে এ

আনন্দের যে আমি নিতান্তই অনধিকারী। যতদিন না আমার দৃষ্টি লালসা-স্পর্শশূন্য, নিষ্কলুষ ও নির্ম্মল হয় ততদিন যেন আমি আমার দৃষ্টি দ্বারা ইহাদিগকে কলুষিত না করি।" ইহার মত যদি আমাদের সকলের দৃষ্টিই শুভধর্ম্মী হয় তাহা হইলে আমাদের মেয়েদের অবরোধ নিতান্তই অর্থশূন্য হইয়া পড়িবে।

কখনও কখনও নারীবিষয়ক আলাপে, এরূপ অনেক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় যাহাতে নারী-চরিত্রে অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়ে। তরুণমতি বালকগণ যাহাতে এরূপ অশ্রদ্ধার কথা কখনও না শোনে তজ্জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কোন ক্রমে অশ্রদ্ধেয় প্রসঙ্গ শুনিলে নারীর প্রতি সহজ শ্রদ্ধা ক্রমেই কমিতে থাকিবে। শ্রদ্ধা ভিন্ন শ্রদ্ধেয় চরিত্র লাভ করা কঠিন। আর নারীর প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের যত সহজ অন্য কিছুই তত সহজ নহে। যাহারা বাল্যকাল হইতে রমণীর মর্য্যাদার কথা শুনিয়া অভ্যস্ত, তাহারা নারীর সম্মান রক্ষা করিতে সতত প্রস্তুত রহে। আর যাহারা নারী-চরিত্রের ভুল ত্রুটীর দৃষ্টান্ত শুনিয়া শুনিয়া বিশ্বাসপ্রবণতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহারা পরে স্ত্রীলোক-প্রতি অশ্রদ্ধার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। দেখা যায় তাহাদের অধিকাংশই পরে নিজ চরিত্র ঠিক রাখিতে পারে না।

যাহাতে স্ত্রীচরিত্রে শ্রদ্ধা বাড়িতে পারে বালকগণ সমীপে এরূপ প্রসঙ্গই আমাদের করা উচিত। পরন্তু নিজেদের চরিত্র শ্রদ্ধেয় হইলে অপরের মধ্যেও তাহার মর্য্যাদাজ্ঞান জাগাইয়া তোলা সম্ভব। যাহারা শ্রদ্ধাবান্ উন্নত ও সংযত চরিত্র তাহারা লজ্জাহীন স্ত্রীলোক অতি অল্পই দেখিতে পান। আর যাহারা চরিত্রহীন, অবিশ্বাসী, তাহারাই রমণীর করুণার্দ্র দৃষ্টিতে কুটিলতা ও সঙ্কোচ গমনে বিলাসভঙ্গী দেখে।

এখানে রবিবাবুর দুটী কথা স্বতঃই মনে হয়—

—"তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য,
আমি সঁপিতাম স্বর্গের সুধা।"

যখন আমরা শ্রদ্ধার কথা বলি, তাহা বাহিরের দুটী চাটুবাদ মাত্র হইলেই চলিবে না। তাহা হইলে আমাদের এ শ্রদ্ধা রমণীকে তাঁহার মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার উপযুক্ত নহে। সেখানে যেন সে বলিতে পারে "ঋষির নয়ন করে নি ভুল।" তাহা না হইলে চলিবে না।

অন্যান্য বিষয়েও যুবকগণ নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা বালকদিগের শিক্ষকের স্থান অধিকার করেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা, সদোদ্যমে সহায়তা করা, নিকৃষ্টে সদয় ব্যবহার, উৎকৃষ্টে সম্মান, ব্যায়ামে পটুতা, ক্রীড়ায় ক্ষিপ্রতা প্রভৃতি বালকগণ যুবকদিগের নিকট হইতেই শিখিতে আরম্ভ করে। বিশুদ্ধ ক্রীড়া কৌতুকে বালকদিগের সঙ্গে যোগদান করিলে, উহারা শীঘ্রই সমুদয় বিষয়ে যুবকগণকে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে। তখন উহাদিগকে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে চালনা করা সহজ হইয়া পড়ে। বালকদিগের শিক্ষার ভার যে আমাদের যুবকগণের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, ইহা তাহারা অনেক সময়েই ভাবিয়া দেখেন না। তাহাদিগকে এ দায়িত্বের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া প্রবীণদের কর্ম্ম। যাহারা শিক্ষিত তাহাদের নিজেদেরই ইহা বুঝা উচিত।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ গুহ।

বিক্রমপুর প্রসঙ্গ

বিক্রমপুর-ভ্রমণ—বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে আমি বিগত শারদীয় অবকাশোপলক্ষে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে বিক্রমপুরের কতকগুলি গ্রামের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং সেই সকল গ্রামবাসী ভদ্রমহোদয়গণের সহিত সম্মিলনী সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছিলাম—এখানে তাহারই উল্লেখ করা গেল।

বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার মূল উদ্দেশ্য (১) গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান, উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, (২) রাস্তা ঘাট খাল ইত্যাদির সংস্কার, (৩) শিল্প ও ব্যবসার উন্নতি সাধন চেষ্টা, (৪) বিক্রমপুরবাসীদের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধন।

আমিও এই বিষয় গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সকলের মতামত লইয়াছি এবং নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আশা করি আপনারা বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

(১) সর্ব্বাগ্রে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান ও পানীয় জলের আলোচনা করা গেল। আমাদের দেশের লোকের জীবনীশক্তি হ্রাসের প্রধান হেতু, জলের ব্যবহার না জানা। আমি প্রতি গ্রামেই জলের ব্যবহার সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের

অজ্ঞতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এমন কি যাহারা শিক্ষিত বলিয়া গৌরব করেন তাহাদের পর্য্যন্ত সে দিকে লক্ষ্য নাই। বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে জঙ্গল। যেখানে সেখানে আবর্জ্জনার স্তূপ। পুকুর দামে বা পানায় ভরা এবং নানারূপে পানীয় জল দুষিত হইতেছে। কাহারও ভ্রুক্ষেপ নাই! অথচ বাড়ীতে রোগ-জ্বালা ছাড়া নাই। এমন বাড়ী অতি অল্প দেখিলাম, যে বাড়ীতে বাহির বাড়ী একটী এবং পাছদুয়ারে একটী, মোট দুইটী পুকুর নাই। তা ছাড়া কোন কোন বাড়ীতে পাঁচ ছয়টী পুকুরও আছে। অতি ক্ষুদ্র গ্রামেও ন্যূন পক্ষে কুড়িটী হইতে পঞ্চাশটী পর্য্যন্ত পুকুর দেখা যায়। বড় বড় গ্রামে ৩০০। ৪০০ শত পুকুরও আছে। অথচ জলের কষ্ট প্রতি গ্রামেই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। টঙ্গীবাড়ী ও মুন্সীগঞ্জ থানার অধীনস্থ অনেক গ্রামেই পুকুরের সংখ্যা খুব বেশী। নূতন পুষ্করিণী খননের তাদৃশ প্রয়োজন নাই—সংস্কার করিতে পারিলেই সব দিক্ রক্ষা পায়। প্রত্যেক গ্রামে প্রতি বৎসর দুই একটী করিয়া পুষ্করিণীর সংস্কার করা যে খুব আয়াসসাধ্য তাহাও নহে। মোটা-মুটি সাধারণভাবে আপনাদের বুঝিবার জন্য এখানে কতিপয় গ্রামের মোট পুষ্করিণী সংখ্যা ও জলাচরণীয় পুষ্করিণীর বিষয় উল্লেখ করিলাম।

গ্রামের নাম	পুষ্করিণীর সংখ্যা	জল ব্যবহারোপযোগী পুষ্করিণীর সংখ্যা	অব্যবহার্য্য বা সংস্কারোপযোগী
সিংপাড়া	চল্লিশটী হইতে পঞ্চাশটীর মধ্যে।	ভদ্র পল্লীতে মাত্র ৫।৬টীর অধিক ভাল পুষ্করিণী নাই। তাহাদেরও সব কয়টীর জল প্রতি বৎসর ভাল থাকে না। ভাঙ্গ পড়ে কিম্বা পানায় ঢাকিয়া যায়। মুসলমান পল্লীতে একটী মাত্র পুকুর আছে, এতদ্ব্যতীত ডোবার অপরিষ্কৃত জল পান করিয়া বৎসর বৎসর বহু লোক অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয়।	প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই দুই একটী পুষ্করিণী আছে। হয় তাহার পাড়ে পাইখানা নচেৎ উহা জঙ্গলে ঢাকা আবর্জ্জনা পূর্ণ ডোবা।

পশ্চিমপাড়া একটী নাতিবৃহৎ পল্লী। পুষ্করিণীর সংখ্যা মোট পঞ্চাশটী। জল ব্যবহারোপযোগী দুই একটীর বেশী নাই। কলেরা প্রায় প্রতি বৎসরই হয়, তবে সংক্রামক রূপে দেখা দেয় না। বাহেরকুচি একটী অতি ক্ষুদ্র পল্লী। মাত্র কয়েক ঘর বৈদ্য কায়স্থ ও নমঃশূদ্রের বাস। পুষ্করিণীর সংখ্যা মোট ১৩টী। পানীয় জলের উপযোগী মাত্র একটী। অপর সব কয়টীই ব্যবহারের অনুপযুক্ত, দাম ও ভিটে পরিপূর্ণ। এজন্য গ্রীষ্মের সময় এ গ্রামবাসীদের জলের জন্য বিশেষ রূপ ক্লেশ পাইতে হয়। পুষ্করিণী খননের কোনও প্রয়োজন নাই। যদি গ্রাম্য ভদ্র লোকেরা একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া দুই একটীও পুষ্করিণী সংস্কার করেন তাহা হইলেও রক্ষা, কিন্তু তাহার জন্য কাহারও কোন রূপ চেষ্টাই নাই। ফুরসাইল বা ফুল্লশালী পুষ্করিণীর সংখ্যা মোট ২৩ তেইশটী। ব্যবহার্য্য চারিটি, অপর সকল কয়টি অব্যবহার্য্য—বর্ষার সময় ব্যতীত অন্য সময় জল থাকে না। একটী অতি বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে, তাহার অবস্থাও ঐরূপ। গ্রীষ্মকালে এ গ্রামে পানীয় জলের অত্যধিক কষ্ট।

রাউতভোগ—এ গ্রামে সব শুদ্ধ পুরাতন ও নূতন প্রায় ৩০০ তিন শত পুষ্করিণী আছে। আট নয়টি ভাল বাঁধান পুকুরও আছে। কিন্তু তাহা গ্রামের তুলনায় পর্য্যাপ্ত নহে। এখানে অতি পুরাতন দীঘীর সংখ্যাও মন্দ নহে। উহার দুই একটীর জীর্ণ সংস্কার হইলেই হয়। কিন্তু সরিকী গোলমালে তাহা হইতেছে না।

বিবন্দী—মোট আটটী পুষ্করিণী। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের অর্থানুকূল্যে খনিত একটী। উহা Reserve। গ্রামবাসী জল ব্যবহার করিতে পারেন কিন্তু নাবিয়া স্নান ইত্যাদি করিতে পারেন না। গ্রামের তুলনায় এই পুকুরটীর দ্বারা জল কষ্ট নিবারিত হইতেছে না। আরও দুই একটী পুষ্করিণীর প্রয়োজন।

হাঁসাড়া—এ গ্রামেও প্রায় আড়াই শত পুষ্করিণী আছে। দুই তিনটী বড় দীঘীও আছে। কিন্তু সে গুলির অবস্থা ভাল নহে। পুকুরের পারেই পাইখানা! পুষ্করিণী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আছে।

ইছাপুরা—বৃহৎ গ্রাম। বহু শিক্ষিত লোকের ও সঙ্গতিশালী ব্যক্তির বাস। কিন্তু জলের অবস্থা ভাল নহে। বহু পুষ্করিণী আছে,—অতি অল্প কয়েকটীর জল ভাল।

জৈনসার—বহু উচ্চ শিক্ষিত লোকের বাসস্থান। কিন্তু গ্রামে মাত্র একটী পুকুরের অবস্থা ভাল। জলের বিশেষ কষ্ট।

মালপদিয়া—অতি বৃহৎ গ্রাম। বহু ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত। পুষ্করিণীর সংখ্যা ৩৫০ হইতে ৪০০ শতের মধ্যে। কিন্তু ব্যবহারোপযোগী দীঘী বা পুষ্করিণী ৭।৮টী মাত্র।

এইরূপ প্রায় প্রতি গ্রামেই পুষ্করিণীর সংখ্যা বেশ আছে কিন্তু জলাচরণী পুষ্করিণীর সংখ্যা অতি অল্প।

বিক্রমপুরের অধিকাংশ পুকুরের জলই, 'জাগ' দিয়া নৌকা ডুবান, বাঁশ ভিজান, মাছধরা, মুখধোয়া, আবর্জ্জনা নিক্ষেপ, কাপড় কাঁচা, মলমূত্রাদি সংযুক্ত বস্ত্র ধোয়া এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণে দূষিত হয়। তার পর তীরে নানা জাতীয় গাছপালা অন্ধকার করিয়া নাই, এরূপ পুকুরত বিক্রমপুরে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের লোকেরা নিজ নিজ প্রাণ অপেক্ষাও গাছ-পালার প্রতি অত্যধিক আদর বা মমতা প্রকাশ করেন। বিক্রমপুরের প্রতি গ্রামের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণই পুষ্করিণীর সংস্কার কেন হয় না তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

(১) অর্থাভাব

(২) সরিকি কলহ

(৩) জলের ব্যবহারে অনভিজ্ঞতা।

প্রথম দুইটীর সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে অর্থাভাব কথাটা সব সময়েই যে প্রকৃত তাহা নহে—কারণ প্রাচীন পুষ্করিণী সংস্কারে, অবশ্য দীঘীর কথা বলিতেছি না, তেমন বহু ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। তার পর অর্থাভাব হইলে গভর্মেণ্টের নূতন Land improvement Scheme অনুযায়ী সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে শত করা ছয় আনা সুধে টাকা কর্জ্জ লইয়া পুষ্করিণী কাটাইবার ব্যবস্থা হইতে পারে। প্রতি গ্রামের পঞ্চায়েত বা প্রতি ইউনিয়ানের প্রেসিডেণ্টের নিকটই এ বৎসর ঐ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণী সম্বলিত নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ঐরূপ ভাবে পুষ্করিণী সংস্কারের প্রার্থী হইয়া মাত্র চারি খানা আবেদন পত্র মুন্সীগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের দ্বারা অনু-মোদিত হইয়াছিল, যুদ্ধের গোলযোগে আবেদনকারিগণ এবার টাকা পান নাই।

তারপর সরিকি কলহ।* গ্রাম্য ভদ্র মহোদয়গণ নিঃস্বার্থ ভাবে চেষ্টা করিলে উহা অতি সহজেই নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা প্রায়ই নিঃস্বার্থ হয় না। তাহারি ফলে 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যাগ্র মেদিনী' এই নীতি বিক্রমপুরের প্রায় প্রতি ঘরে ঘরেই বিদ্যমান। অনেকেই কলহ নিবারণ করিতে যাইয়া কলহের সৃষ্টি করেন। এইরূপ সরিকি কলহের জন্য অনেক সঙ্গতিশালী ব্যক্তি নিজ বাড়ীর পুষ্করিণীর সংস্কারও করিতে পারেন না। ইহার প্রতিকার কি তৎ সম্বন্ধে আমি একজন অভিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারীর (ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের) সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়ে গভর্মেণ্টের সহিত ইনি গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আছেন তিনি উহার প্রতীকারোপায় নিম্নলিখিত রূপ নির্দ্দেশ করেন।

ক। উত্তম পানীয় জলের ব্যবহারের জন্যই পুষ্করিণী খনিত হইতেছে কিনা ?

খ। খননকারীর সরিকানগণের স্বার্থলোপ করা উদ্দেশ্য কিনা ? তাহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে খনন ব্যয় দিলে খননকারী তাহা গ্রহণ করিবে কিনা ?

গ। যে সকল ফলবান বৃক্ষ পুষ্করিণীর তীরে থাকিলে পানীয় জল নষ্ট হয়, সে সমুদয় কর্ত্তন করিতে যদি সরিকানগণের আপত্তি থাকে, তাহা হইলে তাহাদের আপত্তি কি কি তাহা দেখিতে হইবে। মূল্য দিয়া বৃক্ষ খরিদ করিতে চাহিলেও যদি তাহারা দিতে ইচ্ছা না করেন, অথচ ঐরূপ বৃক্ষ পুষ্করিণীর পাড়ে থাকিলে জল নষ্ট হইবার বিশেষ কারণ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে গ্রাম্য পঞ্চায়েত কিংবা প্রেসিডেণ্ট মহাশয়কে এবং গ্রাম্য কয়েক জন মাতব্বরের সমক্ষে সব বিষয় বলিয়া কহিয়াও যদি আপোষে নিষ্পত্তি না হয় তবে মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট আবেদন করিলে তিনি খননের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। সরিকানগণের সত্ব লোপ পাইবে না, কিন্তু খনন বিষয়ের উপযুক্ত রূপ আপত্তি না থাকিলে গভর্মেণ্ট জনসাধরণের হিত-কল্পে পুষ্করিণী কাটিবার ব্যবস্থা করিবেন।

অতএব আমি যেরূপ অবস্থা দেখিলাম তাহাতে অর্থাভাব এবং সরিকি কলহ অপেক্ষা অধিকাংশ স্থলেই গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে অমনোযোগীতা এবং স্বাভাবিক অলসতাই মূল অন্তরায় বলিয়া বোধ হইল।

জলের ব্যবহার পল্লীর অনেকেই জানেন না। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই এই দোষে দোষী। স্বাস্থ্যতত্ত্বের মোটামুটি নিয়মগুলি মানিয়া চলিলেও সব দিক্ রক্ষা পায়। নচেৎ কেবল পুষ্করিণী খনিত হইলেই যে সুবিধা হইল তাহা নহে। আমাদের দেশস্থ পুরুষ ও স্ত্রী লোকগণ যাহাতে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মোটামুটি নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে শিখিতে পারেন তজ্জন্য আমাদের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ বিবিধ সংক্রামক ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা নাই, মৃত্যু অনিবার্য্য।

ঢাকার উকীল শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল মহাশয় Rural water-supply Conference এর একজন member, তাঁহার সহিত আমার জল এবং পুষ্করিণী সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল, তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করেন কিন্তু তাঁহার একটী কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না—মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় জলের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে এবং পুষ্করিণী ইত্যাদির সংস্কার হইয়াছে—তিনি এইরূপ গভর্ণর বাহাদুরের নিকটও বলিয়াছেন; কিন্তু আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

মোট কথা, বিক্রমপুরের গ্রাম সমূহে নূতন পুষ্করিণী খনন অপেক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাই বেশী। ষোলঘর, হাসাড়া প্রভৃতি গ্রামে পুষ্করিণীর তীরেই পাইখানা এবং পুষ্করিণীগুলি খোলা, ইহাতে স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হয়। যাহাতে ইহা দূর হয় সে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

এখন রাস্তা ঘাট সম্পর্কে বলিতেছি। আমাদের দেশে কার্ত্তিকের মধ্যভাগ বা অগ্রহায়ণের প্রথম হইতে জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্য্যন্ত তরে হাটিয়া চলা ফিরা করা যায়। বাকী চারি মাস বর্ষাকাল। বর্ষার সময়ে দেশের কিরূপ অবস্থা হয় তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। আমার মনে হয় বিক্রমপুরের এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় হেতুই রাস্তা ঘাটের তাদৃশ উন্নতি হইতেছে না। উত্তর বিক্রমপুরে এক হিসাবে মাত্র দুইটী প্রধান রাস্তা আছে। একটী মুন্সীগঞ্জ হইতে শ্রীনগর, অপরটী মুন্সীগঞ্জ হইতে রাজাবাড়ী। মুন্সীগঞ্জ হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী গিয়াছে তাহার অবস্থা অনেকটা ভাল। অন্ততঃ মুন্সীগঞ্জ হইতে ইছাপুরা পর্য্যন্ত বেশ ভালই দেখিলাম। ইছাপুরার পর হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত ইহার অবস্থা তত ভাল নহে মাঝে মাঝে প্রায়ই ভাঙ্গা। এবৎসর ডিঃ বোর্ড হইতে

কাঠের পুল গুলির পরিবর্ত্তে সুন্দর লৌহসেতু নির্ম্মিত হইতেছে। ইহা অবশ্যই একটী সুখবর। ইছাপুরা হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত বাকী রাস্তা টুকুও বোধ হয় শীঘ্রই সংস্কারের ব্যবস্থা হইবে।

(২) অপর মুন্সীগঞ্জ হইতে রাজাবাড়ী পর্য্যন্ত যে পথটি গিয়াছে তাহা কেবল স্থানে স্থানে বাধান হইয়াছে। মূলচর হইতে রাজাবাড়ী এবং কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম) হইতে পুরুয়া পর্য্যন্ত এ সামান্য পথটুকু কতক মাটি ফেলিয়া উঁচু করা হইয়াছে। এরাস্তাটীর দৈর্ঘ্য মাত্র বার মাইল। এইটী বাধান হইলে পূর্ব্বদিগের লোকের যাতায়াতের অত্যন্ত সুবিধা হয় এবং বহু গ্রামবাসী অতি সহজেই নিজ নিজ গ্রাম হইতে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া প্রধান রাস্তার সহিত মিলিত করিয়া দিতে পারেন। এ রাস্তাটী প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু অদ্যাপিও বাধান হইল না। এ পথের পুলগুলি কাঠের তৈরী, সে গুলিও কালবশে জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু গ্রামেই লোকেল বোর্ডের দুই একটী রাস্তা আছে।

(৩) মুকুট বা মুটুকপুরের দরোজা—এক সময়ে এইটী বিক্রমপুরের সর্ব্ব প্রধান রাজপথ ছিল। এ রাস্তাটী রামপাল বল্লাল বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিক্রমপুরের বহু গ্রামের ভিতর দিয়া পদ্মাতীর পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। ইহা কোন কোন স্থানে বল্লালী দর্জা, কোথাও মটুকপুরের দর্জা এবং কোথাও কাচ্‌কীর দর্জা নামে অভিহিত। উপস্থিত এই রাস্তাটীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এক সময়ে ইহার প্রশস্ততা কোন কোন স্থানে ১৫০।২০০ হস্তের ন্যূন ছিল না। এক্ষণে কৃষকগণের স্বার্থপরতায় গ্রামবাসীর অমনোযোগীতায় স্থানে স্থানে সামান্য ক্ষেতের আইলে পরিণত হইয়াছে। কৃষকেরা ইচ্ছানুরূপ নিজ নিজ ক্ষেতের সামিল করায় কোন কোন স্থলে ইহার চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি এ রাস্তাটির প্রতি গভর্মেণ্টের দৃষ্টি ধাবিত হইয়াছে, যাহাতে অন্যায় রূপে কেহ উহা কাটিয়া লইয়া যাইতে না পারে তজ্জন্য গভর্মেণ্ট হইতে রাস্তার দুই পার্শ্বে পিলার গাড়িয়া দিয়াছেন। এ পথটির সংস্কার হইলে বিক্রমপুরের মধ্যবর্ত্তী গ্রামবাসীর অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হয়। গভর্মেণ্ট এ বিষয় কিরূপ ব্যবস্থা করেন আমরা সাগ্রহে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি।

মোট এই তিনটী প্রধান রাস্তা ছাড়া কোন কোন গ্রামে দুই একটী লোকেল বোর্ডের রাস্তা আছে। হাসাড়া, ষোলঘর প্রভৃতি গ্রামে রাস্তা ঘাটের বড়ই দুরবস্থা, এমন কি নাই বলিলেই হয়। ডিঃ বোর্ড বা লোকেল বোর্ডও এদিকে উদাসীন, এ সম্বন্ধেও আমি সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

খালের মধ্যে তালতলার খাল, মিরকাদিমের খাল, পাইকপাড়ার খাল, বহরের খাল, সুবচনীর খাল, পোড়া গঙ্গা, কামারখাড়ার খাল, হাসাইলের খাল, রাজাবাড়ীর খাল, হল্‌দিয়ার খাল, কনকসারের খাল, বিদগাঁর খাল, ধানকুনিয়ার খাল ইত্যাদি বহু খাল বিদ্যমান আছে। কারণ প্রতি গ্রামেই এক একটী করিয়া খাল আছে—সে হিসাবে বিক্রমপুরের খালের সংখ্যা করা বড় সহজ নহে। ঐ গুলিতে বর্ষার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে জল থাকে না, মোটকথা ঐ সমুদয় বর্ষায় খাল, খরার দিনে হালট। তবে দুই একটীকে যে খাল সংজ্ঞার অন্তঃর্ভুক্ত করা না যায় তাহা নহে। এ সমুদয় খালের মধ্যে মিরাকাদিমের খাল, তালতলার খাল, হলদিয়ার খাল, একয়টিতে প্রায় বার-মাসই জল থাকে। কিন্তু এ গুলিও স্থানে স্থানে একেবারে শুকাইয়া যায়। ক্রমশঃ পলি পড়িতে পড়িতে মুখের দিক্‌ও বুঁজিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে মুন্সীগঞ্জ-লোকেলবোর্ড সরকারী সাহায্য লইয়া যদি একটী মাটিকাটা জাহাজ Dredger কিনিয়া যেখানে যেখানে খালের মুখ বন্ধ হইয়া আসিতেছে যদি তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বারমাস খালে জল থাকিতে পারে। বারমাস উপযুক্তরূপ জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকিলে স্বাস্থ্যের পক্ষেও তাহা উত্তম। বড় বড় মহাজনের নৌকাও অনায়াসে বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। তাহাতে ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষেও বিশেষ সুবিধা হয়। মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে বিক্রমপুরে দুই শ্রেণীর লোকের বাস। এক শ্রেণী চাকুরী ব্যবসায়ী—তাহারা অধিকাংশই প্রবাসী। অপর শ্রেণী ব্যবসায়ী—ইহাদের দ্বারাই বিক্রমপুরের আভ্যন্তরিক উন্নতি বা সমৃদ্ধ অবস্থা। তিলি, সাহা, বণিক্যগণ এই শ্রেণীর অন্তঃর্গত। মিরকাদিম, লৌহজঙ্গ, হল্‌দিয়া, ধানকুনিয়া, দীঘিরপাড়, রাজাবাড়ী, হাঁসাইল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হাট বা বন্দরে ইহাঁরা নানারূপ ব্যবসা করিয়া থাকেন। এই মহাজনগণের সুখ-সুবিধার জন্য আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। রাস্তা-

ঘাট ও খাল ইত্যাদির সংস্কার সম্বন্ধে ইহাদের মতামত যে অগ্রগণ্য তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে প্রায় প্রতি গ্রামেরই রাস্তাঘাট খালবিল এবং জলের অবস্থা শোচনীয়। গ্রামে দলাদলি, সামাজিক কলহ, মোকদ্দমা এসমুদয় অত্যধিক মাত্রায় বিদ্যমান। স্থানে স্থানে অতি সামান্য জমির জন্য ফৌজদারী মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। কোনও কোনও গ্রামে পথের জন্য লোকেল-বোর্ডের টাকা মঞ্জুর হইয়াও দলাদলি প্রভাবে কার্য্যতঃ কিছুই হয় না। তারপর গ্রাম্য নৌকা চলাচলের পথের দুই ধারে বউনা, হিজল, বাঁশ, ছিট্‌কি ও বেতের ঝোপ আসিয়া পড়িয়াছে, কাটা হইতেছে না, এরূপ ত প্রায় প্রতি গ্রামেই দেখিলাম। খালের দুই ধারের গাছগাছড়া কাটাইয়া দিলে বর্ষার দিনে নৌকা চলাচলের কোনও অসুবিধা হয় না, পরন্তু খরার দিনে হাঁটারও সুবিধা হয়। এ কার্য্য কঠিনও নহে। পল্লীগ্রামের নৈতিক অবস্থাও দিন দিন হীয়মান হইতেছে, প্রায় প্রতি গ্রামের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন গ্রামে গ্রাম্য-সভা-সমিতি ও লাইব্রেরী আছে। তন্মধ্যে কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম) ও কল্‌মা গ্রামের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। গ্রামের শুভকরি সভার ন্যায় কার্য্যকরী সভা একটীও দেখিলাম না। ইহাদের দ্বারা নিজ গ্রামের রাস্তা-ঘাট, পুল ইত্যাদি আশ্চর্য্য রূপে উন্নতিলাভ করিয়াছে। আউটসাহী গ্রামের বাল্য-সমিতি সাহিত্য ইত্যাদি প্রচারের জন্য ও স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত মনোযোগী গ্রাম্য রাস্তাঘাট ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য নাই। অন্যান্য কতকগুলি গ্রামেও নিজ নিজ গ্রামের উন্নতি-কল্পে চেষ্টা যত্নের অভাব দেখিলাম। গ্রামের উন্নতির জন্য গ্রামের কল্যাণার্থ গ্রামবাসীরা মনোযোগী না হইলে সম্মিলনীর দ্বারা বিশেষ ফলপ্রদ হওয়া সত্বর সম্ভবপর হইবে না। সম্মিলনী কার্য্য-প্রণালী নির্দ্দেশ করিতে পারেন এই মাত্র। গ্রাম্য যুবকগণের এই বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের উপায় নির্দ্দেশ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখিলাম। রমণীগণের সুশিক্ষা না হইলে দেশের কোনও সৎকার্য্যই স্থায়ী হইবে না। সন্তানপালন ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে রমণীগণের শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করা অতীব কর্ত্তব্য। গ্রামে

ওলাউঠা লাগিয়াছে, -যে পুকুরের জল গ্রামবাসিগণ পানীয় রূপে গ্রহণ করেন হয়ত সেখান হইতেই আত্মীয় স্বজনের জন্য পানীয় সংগৃহীত হইতেছে! তাহার ফলে রোগ দেখিতে দেখিতে সংক্রামকরূপে বিস্তার লাভ করে এমন অবস্থা আমি স্বচক্ষে বহু গ্রামে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কাজেই যদি স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া, পারিবারিক সুখ শান্তির দিক্ দিয়া আপনারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ করিতে চাহেন তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার দিকে বিশেষরূপে মনোযোগী হউন। অশিক্ষিতা ভার্য্যাদ্বারা কত অশান্তি সৃষ্টি হইতেছে তাহা প্রায় সকলেই অনুভব করেন, অথচ কন্যা ও ভগিনীগণকে উপযুক্ত রূপ শিক্ষিতা করিবার চেষ্টা আমাদের নাই। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত, সমাজগত সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন। আমার বিবেচনায় আপাততঃ বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার একযোগে কতকগুলি কাজ লইয়া হৈ চৈ করিয়া বিফল মনোরথ হওয়া অপেক্ষা কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করা ভাল।

(১) অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের উপায় নির্দ্ধারণ সম্ভব হইলে এবৎসর হইতেই কোন না কোনরূপ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা। (এ বিষয়টীর দিকে আমাদিগের বিশেষরূপ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন কারণ, গ্রামস্থ বহু ভদ্রলোকই ইহার পক্ষপাতী।)

(২) মুন্সীগঞ্জ হইতে রাজাবাড়ী পর্য্যন্ত ডিঃ বোর্ডের যে রাস্তাটী গিয়াছে তাহা যাহাতে বাধান হয়, তৎসম্বন্ধে ডিঃ বোঃ নিকট আবেদন এবং মটুকপুরের দর্জা সম্বন্ধে গভর্মেণ্ট কি করিবেন তাহা জানিবার ব্যবস্থা করা।

(৩) ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জে দুইটী শাখা সভা সংস্থাপন। তাহাদের সাহায্যে যাহাতে প্রতি গ্রামে গ্রামে কেন্দ্র সভা সংস্থাপিত হয় তাহার ব্যবস্থা। এবং শাখা সভার নিয়মাবলী গঠন।

(৪) এ বৎসর পূজার সময়ে ওলাউঠা রোগের কথা শুনা যায় নাই, কিন্তু পৌষ মাস হইতে নানা গ্রামে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গ্রামবাসীরা জলের ব্যবহার জানেন না, জানিলেও সার্ব্বজনীন রূপে তাহা জানাইবার কেহই চেষ্টা করেন না। আজ কাল দেশের প্রায় পনের আনা লোকই শিক্ষিত, অন্ততঃ মোটা মুটি লেখাপড়া জানে, এমত স্থলে ওলাউঠা ও বসন্ত রোগের প্রতিষেধক

নিয়মাবলী সংযুক্ত ক্ষুদ্র মুদ্রিত পুস্তক গ্রামে গ্রামে বিতরণ করিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

(৫) লোকেল বোর্ড ও ডিঃ বোর্ড যাহাতে বিক্রমপুরের পথ, ঘাট ও পুকুর ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের উন্নতি-কল্পে কার্য্য করেন সে জন্য আবেদন করা। অনেক সময় নিরীহ গ্রামবাসীর আবেদন নিবেদনের প্রতি ঐ সকল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ মনোযোগ দেন না। এ কথাটা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিয়া বলিতেছি। ফেগুণাসার গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসু মহোদয় জীবিত কালে নিজব্যয়ে তাঁহার নিজ বাটী হইতে মালখানগর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন। অধুনা ঐ রাস্তাটী সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র দাস মহাশয় আমাকে বলিলেন যে মাঝে স্বর্গীয় আনন্দ চন্দ্র দাস প্রমুখ গ্রামের সকলে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকেল বোর্ডে দরখাস্ত দিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন। কাজেই এরূপ অভাব ও অভিযোগের যাহাতে প্রকৃত মীমাংসা হয় তৎসম্বন্ধে সম্মিলনীর মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ অন্যান্য গ্রামেও দুই চারিটি অভাব অভিযোগ শুনিলাম।

(৬) গভর্মেণ্ট যেমন ম্যালেরিয়ার বীজাণু কিরূপভাবে উৎপন্ন হয় তাহা দেখাইবার জন্য নানা গ্রামে, মহকুমায় উপযুক্ত ডাক্তারের সাহায্যে ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ণের দ্বারা বক্তৃতা করাইতেছেন। তদ্রূপ বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে, উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক দ্রব্য সমূহের চিত্র প্রদর্শন করিয়া গ্রাম্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন তাহা হইলে বেশ সুফল হয়, কারণ শিক্ষা জিনিসটাকে আমোদের ভিতর দিয়া প্রচার করিলে অতি সহজে সুফল প্রসব করে।

আমার প্রস্তাবিত বিষয়গুলির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আপনারা আলোচনা করিয়া মন্তব্য স্থির করিবেন।

চিকিৎসা সম্বন্ধেও কোন কোন গ্রামে হাতুড়ে ডাক্তার কবিরাজ ছাড়া অন্য উপায় নাই। তবে ক্রমশঃই এ সকলের দিকে গ্রামের লোকের দৃষ্টি ধাবিত হইতেছে। আমার বিবরণী দীর্ঘ হইতেছে, কিন্তু এখানে একজন নিঃস্বার্থ মহাপুরুষের নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন ঘোষ। নিবাস হাঁসাড়া। ইনি সামান্য ইন্স্পেক্টিং পণ্ডিতের

কার্য্য করিতেন। উপস্থিত ইঁহার বয়স প্রায় বায়াত্তর বৎসর। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই ইঁহার মনে নিজ গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা পারেন নাই। ইনি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত গ্রামে নিজ অভিলষিত দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে না পারিবেন ততদিন নিজ বাসপল্লীর মৃত্তিকা স্পর্শ করিবেন না। এ জন্য তিনি শরীরের প্রতি বিন্দু মাত্রও দৃক্‌পাত করেন নাই, অর্থসঞ্চয়ের জন্য সময় সময় এক বেলা মাত্র দু'টী ভাত খাইয়া রহিয়াছেন। এরূপভাবে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা সঞ্চয় হইলে তিনি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারিলেন যে দশ হাজার টাকার কমে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইতে পারে না। পদ্মলোচন বৃদ্ধ বয়সেও তাহাতে নিরাশ হইলেন না। তিনি সারারাত্রি জাগিয়া শিশুপাঠ্য বহি রচনা করিয়া নানারূপ ক্লেশ সহিয়া গত বৎসর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পদ্মলোচন বাবুর এই সাধু উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া Text-book committee র কোন কোন উদার মহাত্মা এবং ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। বৃদ্ধের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। আমরা কিছুকাল এই মহাত্মার সহিত এক ছাত্রাবাসে ছিলাম। সে সময় দেখিয়াছি সারারাত্রি প্রদীপের কাছে বসিয়া বৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। এমনি তাঁহার দৃঢ়তা ছিল। একবার তিনি বিক্রমপুরে কোন আত্মীয় বাড়ী চলিয়াছেন—মাঝিকে বলিয়া দিয়াছেন নৌকা যেন হাঁসাড়া গ্রামের মধ্য দিয়া না যায়। সোজা রাস্তা বলিয়া মাঝি হাঁসাড়া গ্রামের মধ্য দিয়াই নৌকা চালাইয়া দিয়াছে। বৃদ্ধ হঠাৎ জাগিয়া দেখিতে পাইলেন যে মাঝি তাহার মতবিরুদ্ধে হাঁসাড়ার খাল দিয়া নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে। পদ্মলোচন বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন 'লগ্‌গী বাইস না! সর্ব্বনাশ! গ্রামের মাটী ছোঁয়া যাচ্ছে! বৈঠা বা!' এমনি তাঁহার দৃঢ়তা ছিল! সাধু যাহার ইচ্ছা জগদীশ্বর তাহার সহায়। ভগবান মহাপ্রাণ পদ্মলোচনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের দালান উঠিয়াছে। পদ্মলোচন সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ দশ হাজার টাকা গ্রামের কল্যাণের জন্য দান করিয়াছেন। এমন দান—এমন মহাপ্রাণতা বর্ত্তমান যুগে অতি বিরল! যাহার টাকা আছে, তিনি দান করিতে পারেন—কিন্তু এমন ভিখারী সাজিয়া দান করা কত বড় মহাপ্রাণতার

পরিচায়ক। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির আদর্শ বিক্রমপুরের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে অনুসৃত হউক।

উপসংহারে কতকগুলি কথা অতিশয় সঙ্কোচের সহিত বলিতে হইতেছে—কিন্তু না বলাও সঙ্গত হইবে না। কারণ আপনারা আমার দ্বারা দেশবাসীর মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। প্রায় প্রতি গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরাই বলিয়াছেন যে যাঁহারা সম্মিলনী সভার নেতা তাঁহারা দেশকে ভাল বাসেন কি? কেহ কোন দিন ভুলেও দেশে আসিতে চাহেন কি? আমরা কি অবস্থায় আছি, দেশের কি পরিণতি হইতেছে এ সব যদি তাঁহারা একবারও স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতেন তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতাম। অর্থের কথা দূরে যাক্। আমাদের দেশে যাঁহারা বড় আছেন তাঁহাদের সহিত আমাদের কতটুকু সম্পর্ক? তাঁহারা কি গ্রাম ভালবাসেন না দেশবাসীর সহিত সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছা করেন?

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে দেশে যেমন কংগ্রেস, কনফারেন্স বা সাহিত্য সম্মিলন হয়, তেমন প্রতি বর্ষে একবার বিক্রমপুরবাসীর সম্মিলন হওয়া চাই। ভাবের আদান প্রদান চাই। যাহাতে প্রতি বৎসর বিক্রমপুরের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ একটী সভার অধিবেশন হইয়া দেশহিতজনক নানা বিষয়ের আলোচনা হয় তৎপ্রতি মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। *

---

* শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ বার এট্‌ল মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা ষ্টুডেণ্টস্ হলে 'বিক্রমপুর' সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।